নিবেদন

অহং-চৈতন্য যখন চিত্রকল্পে প্রবেশ করে, তখন অবচেতনে কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না; এবং এই অবচেতন তখন সমষ্টিগত হয়ে দাঁড়ায়, সমষ্টিগত হলেই আদিম সমাজের জাদুর ক্রিয়ার মতো আর্কিটাইপ অর্থাৎ চিন্তাভাবনা এবং ইন্‌স্টিংক্ট অর্থাৎ কর্মপ্রেরণা যুগপৎ কাজ করে। কর্ম ও চিন্তাভাবনা সচেতনতায় অতি তীব্র নয়, শরতের সকালের সবুজ বনানীবেষ্টিত জলের ওপরে বিচিত্র গন্ধবহ বাতাসের মতো সমন্বয়মুখীন। তাই এর মধ্যে ব্যক্তির, যুগের, অতীতের, জাতির সমগ্র বাসনা রঙিন চিন্তাভাবনা ও কর্ম একত্র হয়ে একটি পরিমণ্ডল তৈরি করে ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতায়। এই কারণে একই সঙ্গে স্বপ্নের জাদুর মতো বিভিন্ন বিরোধী ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, বিশ্বাস ও সেন্সিবিলিটি, আত্মচৈতন্য ও অনুপ্রেরণা, ক্ষুদ্র-অহংএর সঙ্গে মহৎ-অহং একাত্ম হয়ে যায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। সুতরাং কবিতা আমার কাছে যুগের 'সমষ্টিগত অবচেতন'। এই অবচেতন চিত্রিত ছায়ার চিত্রকল্পে ধরা পড়েছে। যদিও বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে বোড্‌কিনের মতো কাব্যবিচারে একে প্রয়োগ করতে পারি নি।

স্বীকার করা ভালো, এই আলোচনাগুলো আমার পাণ্ডিত্যের প্রকাশ নয়, আসলে আমার সেন্সিবিলিটি বা সৃষ্টিশীল চৈতন্যকে সদাজাগ্রৎ, সক্রিয় ও পরিচ্ছন্ন করতে চাই, তাই আমার কালের ছোটো বড়ো কবিদের আলোছায়া-ময় বিচিত্র মনের আকাশের গন্ধরঙকে স্পর্শ করতে চেয়েছি। এবং একথা আমি জানি, এবং অ্যান্‌থনি থুইটের ন্যায় এ সত্য মানি যে মহান কবির দুর্জ্ঞেয় ঐশ্বর্যময় কদাচিৎ আবির্ভাবের চেয়ে গৌণ কবিদের কবিতার অবস্থা অনেকদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। সেদিক থেকে এই আলোচনাগুলি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে, হয়তো এ জাতীয় আলোচনা এর আগে বাংলায় হয় নি।

সমালোচনার এতো মানদণ্ড আছে যে মনে হয় কোনো মানদণ্ডই নেই। তুলনা ও বিশ্লেষণ সমালোচনার একটা অঙ্গ বটে, তাতে শিল্পের ভেতরে প্রবেশ করা যায় না, এবং মন্তব্যও শেষ পর্যন্ত শিল্পকে এড়িয়ে যায় এবং পাঠককে বিভ্রান্ত করে, তথ্যনির্ভরতা কোনো সমালোচনাই নয়, ব্যাখ্যা হয়তো শিল্পের মর্মে অনেকটা প্রবেশ করতে সক্ষম, তবু ব্যাখ্যা অনেক সময় শিল্প থেকে ভিন্ন

পথে যায়, তবু একথা স্বীকার্য সমালোচনা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিহৃদয়ের ভালো-লাগা মন্দলাগার ওপর একান্ত নির্ভরশীল, আনন্দবেদনায় আলোড়িত। সমালোচনাকে বিচার বলার মধ্যেও বিপদ লুকিয়ে আছে, এই বিচারের মধ্যে বিচারকের এক প্রকার গোপন দুর্জ্ঞেয় সংস্কার ও বেদনা কাজ করে। যদিচ এ কথাও সত্য, ব্যক্তিহৃদয়ের অনুভূতিবেদনার আলোড়নেও কোনো সূক্ষ্ম বিচারবোধ সক্রিয়। আর সংগঠিত জ্ঞানকে যদি সমালোচনার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করি তাহলে তো চোরের সপক্ষেও উকিলের সওয়াল করতে বাধে না, তাকে জিতিয়ে দিতে কোনো বিবেকের দংশন হয় না। বুদ্ধি এবং হৃদয় দুটিই সমালোচনার ক্ষেত্রে একান্ত জরুরি, কবি যেমন অভিজ্ঞতার বাঙ্ময়-রূপ দান করেন শিল্পে, সমালোচককেও বইয়ের অভিজ্ঞতার সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতাকে একান্ত গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং কবিতা বুঝবার আগেই তার বেদনা হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় বলে আমার মনে হয় না, কারণ হৃদয়ঙ্গম না করলে উপভোগ হয় না, উপভোগ না করলে হৃদয়ঙ্গম হয় না। এবং এমনি-ভাবেই বিশিষ্ট স্থান ও কালে একই শিল্পের ভিন্নতর ব্যাখ্যা চিরন্তনতার দাবি করতে পারে। সমালোচনা ব্যক্তির নিরিখে পরিণামে দাঁড়ালেও রবীন্দ্রনাথের মতো পূজা বলতে আমি নারাজ। কিন্তু সমালোচনায় রিডের ভাষায় একই সঙ্গে সহানুভূতি ও অনুভূতির একাত্মতা থাকা বাঞ্ছনীয়। এর সাহায্যেই কবির অভিজ্ঞতালব্ধ মৌল অনুভূতির রাজ্যে হয়তো আমরা কিছুটা পৌছুতে পারি। কবির রচনায় মৌল অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করবার দাবিটাই সমালোচকের প্রধানতম কর্তব্য, যদিও এটা নির্মম সত্য সেই মৌল অনুভূতি কবিও হারিয়ে ফেলেন, পাঠকও অনুরূপভাবে ধরতে পারেন না, তবু শব্দের সাহায্যে সেই অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলে যাতে পৌছুতে পারি তার যথাসাধ্য চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য, তা না হলে কবির উদ্দেশ্য থেকে আমরা একেবারে স্খলিত হবো। রুচির সংশোধন করা যদি সমালোচনার কর্তব্য হয়, তাহলে শিল্পের উপলব্ধি থেকে আমাদের বঞ্চিত থাকতে হবে, রুচির সংশোধন সমাজ-সংস্কারকের কর্তব্য। কবিতা শেষ পর্যন্ত এজরা পাউণ্ড কথিত 'দিশ্‌তুঙ', সেখানে কোনো একটি উপাদানের স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয় না, প্রকৃতির মতো জটিল গভীর ব্যাপক।

পাশ্চাত্ত্যে আধুনিক কবিতার শুরু বোদ্‌লেয়ার থেকে, 'প্রতিষঙ্গ' কবিতায় তার উপাদান ও রূপগঠনের ইঙ্গিত আছে, এবং লোর্কার 'পিচ্ছিল রক্তে নীরব

সাপের গান গুমরে কাঁদার' মধ্যে সমাজ ও ব্যক্তির ক্ষতাক্ত চিহ্ন নিহিত। পরে জুলি লাফর্গের কবিতায় কাব্যের রূপগঠনে, ছন্দস্পন্দ ও ধ্বনির পরিবর্তনে, কথ্য ও বিভিন্ন ভাষা ও নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহারে নতুন দিকের আবিষ্কার দেখা দিয়েছে, অথচ শূন্যতাবোধের সঙ্গে অতীতের স্মৃতি ও সৌন্দর্য একই ধারায় চলেছে, এরও পরে অ্যাপোলিন্যার নিয়ে এলেন চমকপ্রদ আকস্মিকতা, নির্দেশাত্মক বাক্য, কিউবিস্ট ছবির চলচ্চিত্রতা, গল্পহীন কাহিনীর মধ্যে সময় চেতনার ফর্মের বৃত্ত। এবং এলিঅট অ্যাপোলিন্যার ও মায়াকোভস্কি থেকেও দ্বিতীয় দশকের মনস্তত্ত্বের নতুন আবিষ্কারের দাবিতে রূপহীন রূপধর্মিতাকে ঐতিহ্যের পথে স্বীকার করেই নতুন পথে এগোলেন, এখান থেকেই আমাদের আলোচনার শুরু। সুতরাং কবিকে এলিঅটের ভাষায় যেমন একদিকে কবিতার সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হয়, তেমনি সমাজে তার স্থান সম্বন্ধেও অবহিত হতে হয়। এবং এই স্থান নির্ণয়ের ব্যাপারেই কবির আত্মবিশ্লেষণ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। অনিশ্চয়তা, বিরোধ ও সন্দেহের মধ্য দিয়েই আত্মবিশ্লেষণের পথে সংশ্লেষণকে গ্রহণ করতে হয়, এটি হলেই সার্থকতা। বাংলা কবিতায় এটি যদি এসে থাকে, তাহলেই সে বিশ্বের দরবারে আপনার স্থান দাবি করতে পারে, এবং নিজের রুচি ও সংস্কার ব্যতিরেকেও ভালো কবিতা আস্বাদন করবার নিরপেক্ষ ক্ষমতার আনন্দ যদি দিতে পারে, তাহলেই বাংলা কবিতার গৌরব।

এই গ্রন্থের প্রায় সব প্রবন্ধই বিভিন্ন সময়ে 'লা পয়েজি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শঙ্খ ঘোষের নির্দেশমায় বিনয় মজুমদারকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে কৃতার্থবোধ করছি। শেষের দিকে বিজ্ঞাপিত অনেক কবিকে স্থানাভাবে বাদ দিতে হয়েছে বলে দুঃখিত। ইচ্ছে আছে, ষাটের দশকের কবিদের একটা চেহারা স্পষ্ট হলে এঁদের নিয়ে নতুনভাবে পৃথক আলোচনা করবার। যদিও দশকানুযায়ী কবিদের শ্রেণীকরণ আমি স্বীকার করি না, তবু মার্কিনি প্রভাব বড়ো অদম্য, কারণ বোদ্‌লেয়ার ও মালার্মে একই দশকে কবিতা রচনা করলেও তাঁদের মনোভঙ্গি একেবারে পৃথক। আর পঞ্চাশে যাঁরা কবিতা লিখেছেন তাঁরা ষাটেও লিখেছেন, পঞ্চাশে লিখতে গিয়ে যে ভাবনায় উদ্দীপিত হয়েছিলেন, সেটাই যদি তাঁদের জন্ম পরিচয় হয়, ভবিষ্যতে তাঁদের এগোবার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে মনের গোপনে আকাঙ্ক্ষা জাগে, আমার কবিতার আলোচনা আমার বইয়েই করা উচিত ছিল বাংলা সাহিত্যের

অবস্থার বৈগুণ্যে, কিন্তু আমার সমালোচক সত্তা তাকে নিবৃত্ত করতে বাধ্য করেছে। এই বইয়ে যাঁদের অন্তর্ভুক্ত করি নি, তা নিয়ে আমার কোনো অপরাধবোধ নেই, অনেককে যাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেছি তাঁদের সম্বন্ধে আমার একটা পাপবোধ কাজ করছে। আলোচনায় কালানুক্রমিক ধারা আমি রক্ষা করি নি, কারণ আমি জানি, কোনো লেখকের বিশিষ্ট লেখায় তাঁর মৌল গুণগুলি নিহিত থাকে, তাকে উদ্ঘাটন করতে পারলেই আমি সার্থক, আর যেখানে আমি ইতিহাস লিখছি না। অসাবধানতার জন্যে কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ রয়ে গেল বলে লজ্জিত।

এই গ্রন্থপ্রকাশের পুরো দায়িত্বই নিয়েছেন আমার বাল্য সহপাঠী শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য, এই সঙ্গে আধুনিক কবিতার ওপর আলোচনার বইয়ের প্রকাশের দুঃসাহস তো আছেই, সুতরাং তাঁকে আমার বন্ধুত্বের উষ্ণ উত্তাপ দেওয়া ছাড়া আর কিছু নেই। বাল্যবন্ধু বলেই আমার অত্যাচার এমনভাবে সহ্য করেছেন। এবং বই ও কাগজের মন্দার দিনে এই অহেতুক অত্যাচার অন্য কেউ হলে সহ্য করতেন বলে মনে করি না। শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীসুকুমার সেন ও ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র যে উৎসাহ দেখিয়েছেন এই বইয়ের প্রকাশের ব্যাপারে, তাতে তাঁদের অকৃত্রিম স্নেহই ছাত্রের প্রতি বর্ষিত হয়েছে, এঁদের আমি প্রণাম জানাই। আমি অভিনন্দন জানাই সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কসের কর্মচারীদের দ্রুত কর্মতৎপরতা ও সহনশীলতার জন্যে।

বার্ণিক রায়

উৎসর্গ

গৌণ কবিদের উদ্দেশ্যে শোকগাথা

…এরা ভুল জায়গায় ও ভুল সময়ে বাস করেছিল,
আগুন ধরাতে পারতো এরা কিন্তু একটা স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়েছে
সমস্ত শব্দকে এরা জানতো, কিন্তু শব্দ নিরূপণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল
তাদের ভূতকে কণ্ঠরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এদের সমস্ত বই
লাইব্রেরিতে সমুদ্রে ডুবে-যাওয়া জাহাজের ভাসমান টুকরোর মতো
এদের সমস্ত নয়, কিছু নাম আমরা ইস্কুলে শিখি কিন্তু জীবন সংক্ষিপ্ত বলে
কদাচিৎ এদের কবিতা আমরা পড়ি, শুধু আকরগ্রন্থ নির্দেশে
কিংবা নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে আমরা পড়ি
এই সমস্ত লেখাকে যখন উন্নত শ্রেণীর সম্মানে গণ্য করা হয়, তখন কেবলমাত্র
ভিত্তি হলো স্বতন্ত্র হওয়া কিংবা স্বাদগন্ধহীন হওয়া।

তা সত্ত্বেও, এবং তাদের জন্যেই আমরা তাদের সহধর্মিণীর পাণিপ্রার্থী,
(তাদের সহধর্মিণীরা তাদের চাইতে অন্য রকম উপায়ে তরুণী থেকেই যায়)
আমরা পাণিপ্রার্থীরা প্রত্যেকের কবরে পারিতোষিক ঝুলিয়ে রাখতে
ঠিক কাজই করি·
যেমন সে যদি ধনী হতো, নিজের ওপর সে নিজেকে ঝোলাতে পারতো
এসব অধমর্ণেরা আমাদের ঘৃণা বিসর্জন দেয়,
যখন আমরা জন্মেছিলুম তখন তাদের সম্পর্কে খারাপ কিছু কি
লিখিনি আমরা ?

লুই ম্যাক্‌নিস্‌

সূচি

শব্দ শব্দ শব্দ

কবিতার শব্দই চৈতন্য : এই চৈতন্য ব্রহ্মোপলব্ধির ব্যাপকতর শুভ্রতায় সাগরফেন নয়, চিত্রেসংগীতে অলৌকিক জাদুস্পর্শে অভিজ্ঞ-ইন্দ্রিয়ের বিচিত্র প্রবাহস্রোত। এই প্রবাহ-স্রোতের অর্থসীমা সাগরমুখী নদীর মতো স্পন্দিতস্পন্দে গতিবান। যুগ যুগান্তের চৈতন্য কবির ক্ষণিক ধ্বনির অনুষঙ্গে বর্তমান পেরিয়ে ভবিষ্যতের নদীর বুকে দূরান্বিত অর্থযুক্ত সংগীতের স্রোত নিয়ে বিশ্বসৃষ্টির প্রথম উষার মতো অনির্বচনীয় পবিত্রতায় মুখর।

সাম্প্রতিক বিশ্ববোধের পটভূমিকায় উপরি-উক্ত কাব্যচেতনা ধূলি মলিন। শব্দের ক্রীড়ামত্ততায় বস্তুপৃথিবী সংগীতের ধ্বনিচিত্রের গন্ধে আমোদিত। শিল্পসৃষ্টিতে একান্ত বুদ্ধির মুখ্য সক্রিয়তা নেই, কবিতা রসের ব্যাপার, 'কিন্তু এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস।' নতুবা আরো এগিয়ে বলা যায়, নীরবতার সংগীতবিদ্, musicienne de silence, কাব্যসংগীতের সুরব্যঞ্জনাই কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু। বাচ্যার্থ ব্যতিরেকে রসধ্বনির প্রশ্ন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে অসম্ভব, তা সত্ত্বেও, আনন্দবর্ধন সংগীতের রসধ্বনি বিচারে পদহীন বর্ণযুক্ত ধ্বনির রস উদ্বোধক শক্তি স্বীকার করেছেন। সংগীতের বর্ণধ্বনিকে কবিতার রসব্যঞ্জনার উপায় হিসাবে স্বীকার করে নিলে অর্থের শক্তি অনেকটা কমে যায়, এ শুধু অভিধাবিভক্ত ব্যঞ্জনা অর্থই নয়, যে কোনো অর্থই বাধিত হয়, বর্ণধ্বনির নির্বিশেষ রসব্যঞ্জনাই অর্থের প্রতীতি জাগিয়ে তোলে। সংগীতের ক্ষেত্রে পদহীন বর্ণধ্বনির সামঞ্জস্য রসের উদ্বোধনে সাহায্য করে; কবিতার ক্ষেত্রে পদের অর্থ ঈপ্সিত মহাচৈতন্যের উপলব্ধির পথে অন্তরায়, কিন্তু তবু বর্ণধ্বনি পদ বাক্যছন্দ মিল অনুপ্রাস স্তবকের কৌশলে সংগীতের রসধ্বনি কাব্যের আকাশে মুখরিত করতে পারা যায়। মালার্মের কাব্যসাধনায় তারই ইঙ্গিত সুদূর গন্ধবহ। ধ্বনি এখানে চিরন্তন, শাশ্বত : মন্ত্রের উপলব্ধির মতো ব্যাপক, গভীরতায় অন্তর্লীন, দূরাতীত আদিম জনগণের ভাষার মতো ধ্বনিবর্ণকর্মচিন্তাপরিবেশের অসংলক্ষ্যক্রম।

কবিতাঃ চিত্রিত ছায়া

ক. কোন দূর দারুচিনি লবঙ্গের সুবাসিত দ্বীপ
করিতেছে বিভ্রান্ত তোমারে

*　　*　　*

কোন দূর কুহকের কূল
লক্ষ্য করি ছুটিতেছে নাবিকের হৃদয় মাস্তুল
কেবা তাহা জানে!
অচিন আকাশে তারে কোন কথা কয় কানে কানে? (নাবিক)

খ. শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের
সব লেনদেন।

গ. স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে বলে যায়ঃ স্থবিরতা সবচেয়ে ভালো

ঘ. আসন্ন সন্ধ্যার কাক—করুণ কাকের দল খোড়ো নীড় খুঁজি
উড়ে যাবে,

পদধ্বনিকে অবলম্বন করে বস্তুর সঙ্কেতরূপে ধারণার জন্ম দেয়। শব্দ প্রকাশে প্রতিটি অক্ষরের ধ্বনি উচ্চারিত হয়, প্রতিটি বর্ণধ্বনির পরই বিরাম, এই বিরামের পর অন্য বর্ণধ্বনি, ফলে পূর্বোক্ত ধ্বনি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার রেশ এবং রণন, তারি সঙ্গে ধারণা এগিয়ে চলছে, এমনি ভাবে শব্দের অন্ত্য-ধ্বনির সামান্য স্থায়ী বিরামে পূর্বোক্ত স্মৃতিস্নাত ধারণা সামগ্রিক ধ্বনি সৃষ্টি করে বস্তুর প্রতীকরূপী ভাবনার জন্ম দেয়। ধ্বনিই এখানে চিরন্তন, শাশ্বত, মন্ত্রে এই রীতিই চমৎকার অভিব্যক্ত। ন্যায় মীমাংসার এই সত্যসিদ্ধান্তই কাব্যের ধ্বনিসঙ্কেতকে ভাবদ্যোতিত ও রসব্যঞ্জিত করে তোলে।

হুইটমানের ভাষায় শব্দ হচ্ছে আত্মিক, এবং আত্মিক বলেই শ্রুতি-ইন্দ্রিয়ের পথে অতীন্দ্রিয় রহস্যলোকে যেতে পারে, ধ্বনির সংগীতে বাস্তব জগতের সমস্ত বাধা অপসারিত হয়ে যায়, অর্থসঙ্কেতের চেয়েও আবেগরঞ্জিত সংগীতের স্বরলিপি তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। ঐ সংগীতের সুরে শ্রোতার হৃদয়ে অনাদি বাসনালোকের রঙিন চিত্র উদ্বোধিত হয় বলেই সে আনন্দলোকের মধ্যে লীলা বিচরণ করে। এই ধ্বনি প্রসঙ্গে ইয়েট্স্ যে-কথা বলেছিলেন তা অনস্বীকার্যঃ সমস্ত ধ্বনিই অজ্ঞাত অথচ সংহত অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে অথবা আমাদের মধ্যে নিশ্চিত অশরীরী শক্তিকে ডেকে নামিয়ে আনে, আমাদের হৃদয়ের ওপরে এই অশরীরী শক্তির পদধ্বনিকেই আমরা অনুভূতি বা ইমোশন বলি। উগোর ভাষায়ঃ

কবিতা : চিত্রিত ছায়া

Le mot qu' on sache est un être vivant, le mot est verbe, et le verbe est Dieu.[১]

শব্দসমষ্টি নিয়ে কাব্য সৃষ্টি হয়, এই কাব্য শব্দের পূর্ব নির্দিষ্ট অর্থের সামগ্রিক ঐক্য শুধু প্রকাশ করে না ; শব্দের বা পদের নির্দিষ্ট অর্থটি শব্দব্রহ্মের মতো বাক্যস্রষ্টার মনে থাকতে পারে, শ্রোতার হৃদয়ে পদের ধ্বনিমাধুর্য তার বাসনাকে উদ্বোধিত করে, অনুমান-অর্থ প্রতীতির সাহায্যে যথার্থ রসব্যঞ্জনা জাগায়। এবং বাক্যধৃত পদগুলি তাদের বিভিন্ন সংসর্গের ফলে সম্পর্কজনিত চিন্তাকে জাগ্রৎ করে। বিচ্ছিন্ন শব্দের অর্থে সত্তা বা অস্তিত্বের বস্তুধারণা জড়িয়ে আছে, এবং তখন এর মধ্যে শব্দের মৌল চারিত্র্যধর্মও একাত্ম হয়ে আছে, কিন্তু বাক্যের মধ্যে বিচ্ছিন্ন শব্দ বা পদের আবাপ বা অনুপ্রবেশ এবং উদ্ধার বা নির্যাস এবং বাক্যের তাৎপর্যে ঐক্যজনিত বৈচিত্র্যই সাহচর্যঅনুষঙ্গ সম্পর্কের ফলে বিচার বা জাজ্‌মেণ্ট সৃষ্টি করে, পদের এই বিচিত্র ক্রিয়ায় জ্ঞানের উদ্‌ভাবন প্রত্যক্ষ অনুমান বা সাদৃশ্য জ্ঞানের চেয়ে একান্ত আলাদা। শব্দের অভিধার দ্বারা বাক্য সৃষ্টি হলেও বাক্য অভিধামূলক জ্ঞানের আকর নয়। শব্দের বিশেষ চারিত্র্যধর্ম অভ্যাস আতিশয্যে, স্মৃতিচালিত হয়ে বাক্যগঠনে একটি সামগ্রিক সম্পর্কজনিত তাৎপর্য সৃষ্টিতে সহায়তা করবার পর বাক্যের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী অভিধা গৌণভাবে কাজ করে। চক্ষু যেমন লাল নীল বিভিন্ন বর্ণের উৎপাদনের মূল, শব্দও তেমনি বাক্যের সম্পর্কে এসে বিভিন্ন বিচারের সৃষ্টিকর্তা। শব্দের কার্যকারিতা একই, সংসর্গঅনুষঙ্গে, সম্পর্কে, অভ্যাসে, আতিশয্যে বিভিন্ন নয়, অভিধাকে এড়িয়ে নয়, ছাড়িয়ে, তাৎপর্য লক্ষণাক্রান্ত হয়ে রসব্যঞ্জকত্ব লাভ করে। প্রভাকরের এই তত্ত্বই আধুনিক লিরিক কাব্যমীমাংসায়, ধ্বনিবিচারের সমান্তরালে একান্ত সাহায্যকারী ও ফলপ্রসূ। ব্যাকরণের স্ফোটবাদ বৈদান্তিক অদ্বয় চিন্তায় শ্বেতগন্ধ ; অনুভূতি-অভিজ্ঞতার রাজ্যকে প্লেটনিক আইডিয়ায় ডুবিয়ে ব্যক্তিমনের ও চৈতন্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিকার।

কবির মনে কাব্যকে যখন সংগীতের সঙ্গে একাত্ম করবার চেতনাঅভিপ্রায় কাজ করে, তখন শব্দের বা পদের ধ্বনিকেই ব্যঞ্জক হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এই ধ্বনিগুলি মন্ত্রের মতো নিনাদী, জাদুর মতো সম্মোহনী, অভিশাপের মতো অনুভূতির অন্ধকার ; প্রার্থনার মতো উদ্দীপ্ত, উদার ; জাদুর আলোকস্বপ্নের

মতো মধুময় অথবা দুঃস্বপ্নের ঘনঘোর বিকার। এক কথায় জাদুর সম্মোহন, প্রার্থনা, স্বপ্ন, কাব্যের বর্ণধ্বনি অঙ্গে অঙ্গে অসংখ্য তরঙ্গ সম্মোহন সৃষ্টি করে। সমস্ত অভিজ্ঞতার ভঙ্গি তরঙ্গায়িত লীলায় শব্দের মধ্যে নৃত্যসুরভি ছড়াতে থাকে। এই কারণেই প্রতীকী বা আধুনিক সংগীতবাদী কবিতার স্রষ্টারা মন্ত্রের ও জাদুর সাহায্যে আদিম জনগণের ভাষার ও শব্দের ব্যবহারের তাৎপর্য ইঙ্গিত করতে চেষ্টা করেছেন, চেষ্টা করেছেন শিশুর ব্যবহৃত ধ্বনির তাৎপর্যে কোন্ লক্ষ্যার্থে ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। আদিম জনগণের ভাষায় ব্যাকরণগঠিত সংহতি ও নির্দিষ্টতা নেই, অথচ বাক্যের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি অনু, বা উপসর্গ, প্রত্যয়, যার কোন অর্থ আপাতদৃষ্টিতে নেই—একটি সামগ্রিক ধ্বনি সমন্বিত অর্থ সৃষ্টি করে। শব্দগুলির আপাত অর্থ না থাকলেও প্রসঙ্গপরিবেশে ও স্থানিকতার মাহাত্ম্যে মূল উদ্দেশ্য ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। শব্দ উদ্দেশ্যের বাহন ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু উদ্দেশ্য ও উপায় পরিবেশ চিন্তার আকাঙ্ক্ষায় ধ্বনির অনুভূতিতে একাত্ম হয়ে ওঠে। এমনিভাবে সমস্ত প্রসঙ্গ-পরিবেশ ব্যাপ্ত ও দীপ্ত হয়ে ওঠে। পদের ধ্বনির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের প্রসঙ্গ আত্মাও দেহের মত একাত্ম হয়ে যায়। সমস্ত উচ্চারণের মধ্যেই যেন মুহূর্তের অনুজ্ঞাত-উদ্দীপনা কাজ করে। শব্দের উচ্চারণের অর্থ নির্ভর করছে সাঙ্কেতিক আপেক্ষিকতার ওপর; তাদের মানসিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিবেশ-প্রসঙ্গে অর্থ সংগৃহীত হয়, আগে থেকেই সুনির্দিষ্ট থাকে না, তাদের ব্যবহারে কার্যে মানসে শব্দের অর্থ নির্ণীত হয়, তারই ফলে উচ্চারিত শব্দ শ্রোতার চিত্তে বাসনাস্নিগ্ধ কর্ম ও আনন্দ প্রেরণা জাগায়। আদিম জনবাসীদের মতো শিশুদের নিরর্থ ধ্বনি উচ্চারণের অর্থ পরিবেশ ও অনুভূতি প্রকাশের সঙ্গে একাত্ম। শব্দের ধ্বনি অর্থকে প্রতিফলিত করে না এখানে, চিন্তার দ্বারা প্রতিফলিতও হয় না, ধ্বনি ও আবেগের সঙ্গে লক্ষ্যের দিকে এক। ধ্বনির প্রভাবে বা ভাষার প্রভাবে অর্থ গড়ে ওঠে। উপমা সাদৃশ্য বিমূর্তভাব নির্বিশেষ অনুভূতির আলোক শব্দকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের ক্ষমতা দান করে। কিন্তু আধুনিক কবিদের ভাষাশিল্পের ধ্বনিমাধুর্যে কবির অভীপ্সিত প্রসঙ্গপরিবেশ ও লক্ষ্য যেমন ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে, ধ্বনির সঙ্গে ঈপ্সিত লক্ষ্যার্থে একই সঙ্গে রণিত হয়ে ওঠে, তেমনি ইঙ্গিতে অনুষঙ্গে চৈতন্যের অতিরিক্ত ভাবসংযোজনে অর্থকে রসমুখী করে তোলে। রিচার্ডস্ ভঙ্গিবাদী, ফলে আধুনিক কাব্যের এই

ধ্বনি ইঙ্গিত বাদ দিতে বাধ্য হয়েছেন, এলিয়টের মধ্যেও এই চৈতন্য সক্রিয়, যে কারণে ভালেরিকে এককালে নিন্দাবাদ করেছেন। কিন্তু ভারতীয় অলংকারের ধ্বনিবাদীর চিন্তার আলোকে আধুনিক কাব্যের মর্মরহস্য উদ্‌ঘাটিত করা অসম্ভব নয়। আধুনিক কবিতার সঙ্গে অর্থ ও ধ্বনির দূরত্বের বা প্রাধান্যের সম্পর্কটি যদি একটু সংকুচিত করতে পারা যায়, নতুবা উল্টে দেওয়া যায়, তাহলে ধ্বন্যালোকের বিভা কারো প্রতিভায় ন্যস্ত হতে পারে না। পদের বর্ণ ও অর্থের সম্পর্কের মধ্যে অর্থকে চিদ্রূপ বলা হয়েছে, বর্ণকে বলা হয়েছে অঙ্গরূপ, কিন্তু বর্ণের অঙ্গের ধ্যানে চেতনা যদি আলোকিত কুসুমের সঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয়, তাহলেই তো বস্তু ধ্বনি অর্থের সঙ্কেত মাধুর্য একই সঙ্গে মালার্মের কবিতার শূন্য অরূপের বুকে প্রণয়ীর মতো শয়নের আনন্দ লাভ করতে পারে। বর্ণের ধ্বনি-গতির ছন্দ সংকেতেই লক্ষ্যাভিমুখী।

এই রীতির সাহায্যে প্রথম কবিতাটি যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে ধ্বনির সংগীতই প্রথমে আমাদের মুগ্ধ করে। বুদ্ধদেব বসু প্রায় কুড়ি বছর আগে বনলতা সেন কাব্যের আলোচনা কালে একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন যে জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য শুধু 'একটি সুর, আর কিছু না।' এই সুরেই যেন মজে যায়, সুরের সাহায্যেই একটি পরিবেশ সর্বপ্রথম ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের চৈতন্যে আঘাত দেয়, চৈতন্যের ঐ সুরময় মত্ততার নীলগন্ধের অতীন্দ্রিয় লোকে অভিধা বোধির কাজ শুরু হয়, শুদ্ধ অনুভূতি চেতনার রঙের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কবিতার ব্যঞ্জনাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। ছন্দ সংগীতের নদীস্রোত মাত্র, ধ্বনির স্রোত অনবরত বয়ে চলেছে, এ যেন শেষ হতে চায় না, বাক্যের আকাঙ্ক্ষার চেয়েও ছন্দের সংগীতের আকাঙ্ক্ষা অবিশ্রাম গতিতে সামনের দিকে নিয়ে চলে। পরম্পর শব্দবিন্যাসের ফলে, সুমিত ছন্দের সৌকর্যে, ধ্বনি প্রতিধ্বনি ও যতিস্থাপনে পদের বিচ্ছিন্ন অভিধা লুপ্ত হয়ে গেছে, কোন দূর দারুচিনির অর্ধযতি পর্যন্ত রেশরঞ্জিত ধ্বনিগুলি শীতের সকালের বাতাসের নীল শুভ্রতার সংগীত বয়ে আনছে, 'কোন' পদে যে ধ্বনি আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বেজে চলছিল, 'দূর' পদধ্বনির আঘাতে অন্য সুর যুক্ত হলো, কিন্তু পূর্বোক্ত পদের 'ন্' তখনও স্মৃতিধ্বনির মধ্যে লীলায়িত হয়ে চলেছে, 'দারুচিনির' মধ্যে পূর্বোক্ত প্রত্যেকটি স্বর যেন একসঙ্গে সম্মিলিত হয়ে একটা সুরের ঝড় সৃষ্টি করলো, পরের 'লবঙ্গের' ধ্বনির যুক্তব্যঞ্জনের 'ন্' গুলি আরেকবার রণিত হয়ে উঠলো।

কিন্তু এই রণনের সঙ্গে সঙ্গে ‘ল’ ‘র’ এই ধ্বনি দুটিকেও গৌণভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে অন্য সুরের ‘আকাঙ্ক্ষাকে’ জাগিয়ে দিলো, পরের ‘সুবাসিত’-এর ‘ত’ ও ‘দ্বীপের’ ‘দ’-এর মধ্যে ধ্বনিসাম্যের শ্রুত্যানুপ্রাস সৃষ্টি হলো, এবং বাক্যের আদিতে ‘ক’ ধ্বনি এবং দ্বীপের ‘প’ ধ্বনির সঙ্গে একটা সাদৃশ্যবোধ জাগিয়ে সংগীতের সমের মতো কাজ করলো। আবার পরের লাইনে ‘র’ ‘ত’ ‘ন’ ‘ম’ ‘ব’ এর সুরের ঝড় বয়ে গেল। ‘ব’ এর সঙ্গে ‘ভ’ এর শ্রুত্যানুপ্রাস এখানে বিশেষ আকর্ষণীয়। অনুপ্রাসের দিক থেকে আলোচনা করলে প্রথম পঙক্তিতে ‘ক’ মাত্র একবার ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু ‘ক’ ও ‘প’ এর ধ্বনি সাম্যে এক প্রকার সংগীত জাগছে। ‘দ’ তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু ‘ত’ এর সঙ্গে ‘দ’ এর শ্রুত্যানুপ্রাস ঘটেছে, ‘র’ ব্যবহৃত হয়েছে তিনবার, এই ‘র’ পরের পঙক্তিতে ঝঙ্কার তুলেছে, ‘ন’ ব্যবহৃত হয়েছে দু’বার, কিন্তু ‘ঙ’ এর সঙ্গে আনুনাসিক্য ধ্বনির অনুপ্রাস, ‘চ’ ‘ল’ ‘ব’ একক সুরের বৈচিত্র্য আনছে, স্বরবর্ণের অনুপ্রাসের মধ্যে ‘উ’ ‘ঊ’ দুয়ে মিলে তিনবার ‘উ’ ধ্বনি সৃষ্টি করেছে, এর ‘ই’ ‘ঈ’ দুয়ে মিলে তিনবার চারবার ‘ই’ ধ্বনি সৃষ্টি করেছে। রীতির বিচারে যদি রসধ্বনির সিদ্ধান্ত নির্ণয় করতে হয়, তাহলে অভিনবগুপ্তের মতো একে উপনাগরিকায় স্থাপিত করে শৃঙ্গার-করুণের বিলম্বিত বিরহ-আকাঙ্ক্ষা-ধ্বনি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে বলে স্বীকার করবো। রোমান্টিক অভিসার নাবিকের গতিছন্দে সমুদ্রের দিগন্ত বিস্তারতায় নিরবিচ্ছিন্ন কালজ্ঞানের সময় চেতনাস্রোতে এগিয়ে চলেছে।

সাহিত্যরীতির সমালোচনায় সংগীতের সুর কাব্যের ক্ষেত্রে কি প্রভাব বিস্তার করছে, তার আলোচনা শুরু হয়েছে অনেকদিন ধরে, শ্রুত্যানুপ্রাস ও গুপ্ত অনুপ্রাসের সাহায্যে। যথাক্রমে ত, থ, দ, ধ, এবং ব, ভ, ম, দ্বিতীয়টিতে বৈচিত্র্যের সাম্য সৃষ্টি হয়। এই রীতিতে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিকে একটি রীতিতে বিশ্লেষণ করা যায় ও এক শ্রেণীতে ফেলা যায়, অর্ধব্যঞ্জন ও রণিত : র্, ল্, ন্, ম্, ঙ্, ঞ ; মহাপ্রাণ : খ্, ঘ্, থ্, ধ্, ফ্, ভ্ : হ্, ঠ্, ড্, ক্ষ্ স্পৃষ্টবর্ণ : ক্, গ্, ত্, দ্, প্, ব্, ঘৃষ্টধ্বনি, চ্ ছ্ জ্ ঝ্ এর সঙ্গে শ্, ষ্, স্। অর্ধস্বর ই, উ, প্রসৃত স্বর, ই, ঐ, এ, আ ; কুঞ্চিত স্বর, ঔ, ও, উ। ধ্বনির উচ্চারণ সৌকর্যে ব্যাকরণকে লঙ্ঘন করেও সবগুলিকে একসঙ্গে বাঁধতে হয়েছে। দ্বিতীয় রীতি পরাবৃত্তি বা Chiasmus ‘কবে সে আসিবে, আসিবে সে কবে,’

এই বর্ণধ্বনির উলোটপালট সংগীতের সারগমের মতো, বিভিন্ন পুনরাবৃত্তির মতো। শুধু ব্যঞ্জনবর্ণ নয়, স্বরধ্বনির পরাবৃত্তিও কবিতার সংগীতের ক্ষেত্রে দর্শনীয় ও শ্রবণীয়। সংগীতের সংকোচন ও বৃদ্ধিও কবিতায় বর্ণধ্বনির বিন্যাস ব্যাপারে বিশেষ আলোচ্য। গানের ক্ষেত্রে স্থায়ীকে যেমন দীর্ঘায়িত ও পুনরাবৃত্ত করে তুলতে পারা যায়, কবিতার বর্ণকেও এমনিভাবে বৃদ্ধি বা পুনরাবৃত্ত করতে পারা যায়। ব্যঞ্জনবর্ণের দুটি পরস্পর বিন্যস্ত ধ্বনি শেষের দিকে বা মাঝে স্বরবর্ণের দ্বারা বিভক্ত হয়ে পুনরাবৃত্ত হলো, এতে বৈচিত্র্য, বিস্তার এবং ধ্বনিসাম্য চমৎকার ঘটে। যেমন, 'কোন দূর দারুচিনি'র 'দূর' ও 'দারুর' ব্যবহার। সংগীতের সংকোচন তার উল্টো, 'শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ' আমাদের ঘুমের 'ঘ্' ও 'র্' 'ঘ্রা'তে মিলেছে। কবিতার ভাবপ্রকাশে ধ্বনির এই কারচুপি বিশেষ সহায় হয়ে ওঠে।

প্রত্যেক ব্যঞ্জন ও স্বর বর্ণের মধ্যেই সংগীতের সুরের স্তর শ্রুতির বিস্তার তরঙ্গে অল্প পরিমাণে কাজ করে থাকে। মাণ্ডুকী গ্রন্থে উক্ত স্বরোৎপত্তির কারণ মেনে নিয়ে যদি বর্ণের শ্রেণীভাগ করি তাহলে দেখতে পাবো বর্ণের মধ্য দিয়ে সংগীতের ষড়জাদি সুর কাজ করছে, ধ্বনিকম্পনের ফলে চিত্র আনছে, সেই চিত্র অনুভূতির রঙে রঙিন, এই অনুভূতিময় রঙিন চিত্রধ্বনি বিভিন্ন রাগ-রাগিণীরই অস্পষ্ট কুহেলী আলো আনছে। মাণ্ডুকীতে বলা হয়েছে কণ্ঠ থেকে ষড়জ্, শির থেকে ঋষভ্, নাসিকা থেকে গান্ধার, উরঃ থেকে মধ্যম, উরঃ, শির ও কণ্ঠ থেকে পঞ্চম, ললাট থেকে ধৈবত, সমস্ত অঙ্গের সন্ধি থেকে নিষাদ। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে এই নিয়মানুসারে ভাগ করে সংগীতের সুরে ওপরের রাগরাগিণীর মধ্যে বিন্যস্ত করা যায়। এই বিন্যাসের ফলেই সুরের চিত্র ও রঙ নেচে ওঠে। ষড়জের কমলা, ঋষভের পিঞ্জর, গান্ধারের ধুস্তর, মধ্যমের কুন্দ, পঞ্চমের শ্যাম, ধৈবতের পীত এবং নিষাদের বিচিত্র রঙ ধ্বনির সাহায্যেই চিত্ররূপ গন্ধ সৃষ্টি করে। এই চিত্ররূপ গন্ধই রসের ব্যঞ্জক।

De scintillations sitôt le septour এর অর্থ সম্বন্ধে আমাদের মন প্রথমে সজাগ হয় না, ধ্বনির গোপন কারুকার্য, ছন্দের গতি, সুরের উত্থান-পতন এক অজ্ঞাত দূরান্তর ইঙ্গিত মনের মধ্যে ঢেউ জাগিয়ে গেল। তারার ধ্বনির সাতের অর্থ নেই, অথবা অর্থ যা আছে তা প্রচলিত ফরাশি জাতির ধাঁধার, কিন্তু মালার্মে সংগীতের পরিবেশই সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। জীবনানন্দ

'সাতটি তারার তিমিরে' শব্দগুচ্ছের মধ্যে সপ্তর্ষির ইঙ্গিত হয়তো এনেছেন, কিন্তু ধ্বনিগুলির তরল ছন্দগতি বিলম্বিত বিরহ সুরকে জাগিয়ে তুলছে। ঠিক এমনিভাবে সংগীত সৃষ্টি করেছেন মালার্মে aboli bibelot d'inanite sonore.[২] মালার্মের সংগীতে সুরসংগতির সিম্ফনি কাজ করছে, সুর দ্বিগুণিতক হয়ে ঝড়ের মতো আবহাওয়া সৃষ্টি করছে, তা ছাড়াও শব্দ ধ্বনির মধ্যে আদিমতম জাদুস্পর্শ আরোপ করবার প্রবণতা বেশি। মালার্মের অরূপ শূন্য, এই শূন্যকে ধ্বনি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মূর্ত করতে চেয়েছেন, ধ্বনির জন্যেই ছন্দ এসেছে, অথচ ধ্বনি ছন্দ এই শূন্য অরূপের ভাব বিকাশে একান্ত আবশ্যিক নয়, ফলে ভাব তাঁর কবিতার মর্মরহস্যে এক বিরোধাভাসের কাজ করছে। এই বিরোধকে প্রশমিত করেছে মন্ত্রধ্বনির জাদুস্পর্শে। ভালেরির কবিতার গন্ধ-স্রোতে ভারতীয় রাগিণীর উচ্ছল স্রোতপ্রবাহের করুণ বিরহ অনবরত ঘুরে ঘুরে মর্মবীণা বাজায়। ধ্বনি, সুর ও সংগীতের সাহায্যে রসব্যঞ্জনা সৃষ্টি করবার অপরিসীম শিল্পনৈপুণ্যের রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানের কিছুসংখ্যক গানে বিদ্যমান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য হলো যে রবীন্দ্রনাথের গানের অর্থের মধ্যে একটা একটা সুর ও সংগীত অহরহ বাজে, মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে, সুরের মধ্যে যে ভাববীণা মর্মরিত হয়ে উঠছিল, প্রতীয়মান অর্থের উপলব্ধি তাকে অনেক দূরে ছড়িয়ে দিল। তিনটি উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট হবে, রবীন্দ্রনাথের গানটি অনুপ্রাসধ্বনির সহজ সুরের এলাকা ছাড়িয়ে গোপন ধ্বনি ছন্দের রহস্যে অনুপ্রবেশ করেছে এবং সেই সুরের চেয়েও অর্থের সুর এখানে কাজ করেছে বেশি ;

> আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি
> আমি শুনবো বসে আঁধার ভরা গভীর বাণী
> আমার এ দেহ মন মিলায়ে যাক নিশীথ রাতে
> আমার লুকিয়ে-ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে
> থাক্-না ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি।

> **Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui**[৩]

বা, **Oui ; c' est pour moi, pour moi que je fleuris, deserte**[৪]

কবিতা : চিত্রিত ছায়া

অথবা : Tes pas, enfants de mon silence
Saintement, lentment place´s. Valery. Les Pas[৫]

নতুবা : Delicieux demon desirable et glace ![৬]

জীবনানন্দের রীতি ভালেরির, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও এর সাদৃশ্য প্রচুর, সুরের স্রোত ভালেরির মধ্যে যেন এগিয়ে চলেছে, এর সঙ্গে জীবনান্দের চতুর্থ কবিতাটি পঠিতব্য ; কিন্তু ভালেরির সাধনার গুরু মালার্মে, জীবনানন্দ দুইকেই আত্মসাৎ করেছেন। কিন্তু জীবনানন্দ চির রোমান্টিক, গতি ধ্বনি নরম গন্ধ আলো চেতনাই তাঁর একমাত্র বস্তু, এরি জন্যে তিনি মাঝে মাঝে পালিয়ে গেছেন। কিন্তু জীবনানন্দের মধ্যেই কাব্যরীতির সামগ্রিক প্রকাশ, বোদ্‌লেয়ার থেকে সুররিয়্যালিজমের সকল ধারার বেণীবন্ধন হয়েছে, এই কারণেই বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে তাঁব বিশেষণ দিয়েছেন। জীবনানন্দের মধ্যে যে যুক্তিগ্রাহ্য বুদ্ধিদীপ্ত স্পষ্টালোক অপেক্ষিত ছিল, গঠন কারুকার্যে সুধীন্দ্রনাথ তাকে পূর্ণ করলেন, কিন্তু কবিতার চরিত্রগত ভাবনায় দুজনে প্রায়শ এক, এবং তীক্ষ্ণ অনুভূতির উপলব্ধির প্রকাশে জীবনানন্দ সিদ্ধ।

রীতি বিচারে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের ভাষা ওজঃ গুণান্বিত, পরুষা বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত, এই পরুষা দীপ্ত ও রৌদ্রাদি রসের ব্যঞ্জক, অদ্ভুত রসও এর মধ্যে ব্যক্ত হতে পারে। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কাল ও প্রেমের স্রোতের ক্ষণ ভঙ্গুরতা স্তব্ধজমাট বীরত্বের প্রকাশক, ইন্দ্রিয়ের উক্তিউপলব্ধির এই বিরোধ তাঁর কাব্যে সচকিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর গঠনরীতি বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আলোচ্য।

কবিতার এই রীতির পাশেই স্ফোটবাদী কবিতার অভিধা বিশেষভাবে সক্রিয়। শব্দের অভিধার সঙ্গে বিচার ও জ্ঞানের কার্যকারণ সম্পর্ক নিশ্চয় আছে, কিন্তু এখানে শব্দই কার্যকারণ শক্তিতে বাক্যের শেষ বিচারে ব্যবহৃত হয়, বাক্যের সংসর্গ সংগম সব গৌণ। স্ফোটের ব্রহ্মবাদী অভিধা বিশ্বজ্ঞানের মতো সার্বিক, চির সত্য, পূর্ব নির্ধারিত। লক্ষণা এলেও এর প্রারম্ভিক অর্থ থেকেই আসে। শব্দ হচ্ছে এই মানসিক চৈতন্য অর্থাৎ পশ্যন্তী। ভালেরির পরবর্তী কবিতা পার্নেশিঁয়ার কবিতা এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় এই রীতির চমৎকার প্রকাশ। সুধীন্দ্রনাথ উক্তি-উপলব্ধির অদ্বৈত কামনা করেছেন, আধার ও আধেয়কে এক করে দেখেছেন, কবিতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যথাসাধ্য অনুশীলনের প্রতি তাঁর আস্থা, দৈবী

প্রেরণায় তাঁর বিশ্বাস নেই। কবি স্বকালে নিহিত থাকা সত্ত্বেও ক্ষণবাদের ধ্রুপদী চিরন্তনতায় বিশ্বজননীন, সাঙ্কেতিক কবিতার ইন্দ্রিয়ঘন নৈর্ব্যক্তিক শব্দ চেতনা তাঁর কাব্যে রয়েছে। 'সংবর্তের' ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন, 'মালার্মের প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট, আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দ প্রয়োগের পরীক্ষারূপেই বিবেচ্য।' তাঁরই ভাষায় বলতে হয় কাব্যাদর্শে ভাব ও ভাবনা, আধার ও আধেয় একাত্ম। মালার্মের শূন্য অরূপের পরম শুভ্রতাকে পাবার জন্যে শব্দের ও সংগীতের সাহায্য নিয়েছেন। সংগীতেয় সুর যত সহজে চরম বেদনার পথে শ্বেতগন্ধ ছড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে, অন্য কোন কিছুই পারে না। মালার্মেও কালের গতিকে টুঁটি চেপে ধরে স্তব্ধ করে বিশ্বপটভূমিকায় তাকে ছড়াতে চেয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে কাল একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর কালের চঞ্চল নৃত্যের মধ্যে পৃথিবীর শ্রেয় ও প্রেয়ও বদলে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে, এই চলে যাওয়ার নৈর্ব্যক্তিক বেদনাই তাঁর কাব্যের ফলশ্রুতি। কিন্তু তাঁর কাব্যের এই চঞ্চলতা ভাষা ছন্দে ধ্বনিতে জমাটবেঁধে গেছে, ইনিড পড়লে যে স্তব্ধ অস্ত্যর্থ গথিকরূপে আমাদের দৃষ্টি ও মন স্তম্ভিত হয়, এও অনেকটা তাই। একথা অনেক সমালোচকই পূর্বে বলেছেন। এবং এই বিরোধিতার জন্যে, ভাষার জমাটবাঁধা স্বেচ্ছাকৃত দুর্গমতার জন্যে ফরাশি প্রতিটি কবিতার সংগীত ইঙ্গিত ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, জর্মান সম্বন্ধে আমার অক্ষমতা এ প্রসঙ্গে কিছু প্রকাশ করতে নিষেধ করছে, কিন্তু ইংরেজি ও ফরাশি কবিতার মূলের সঙ্গে তাঁর অনুবাদগুলি মিলিয়ে পড়লেই পার্থক্য চমৎকার চোখে পড়ে। জীবনানন্দের চেতনায় যা সহজ স্বাভাবিক, সুধীন্দ্রনাথের কবিকল্পনায় সেক্ষেত্রে অনেক কৃত্রিম বলে মনে হয়। সুধীন্দ্রনাথ জ্ঞানীর আভিজাত্য সর্বত্র প্রকাশ করেছেন, অনেক জায়গায় অনুভূতি জমাট করতে গিয়ে শুষ্ক বুদ্ধির বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। যেমন :

> শান্ত শিব, সুন্দরের অসীম সুষমা
> অন্বিষ্ট নির্বাণ আর সর্বদর্শী ক্ষমা
> বীতশোক তথাগত সাঙ্গ কর্মফল
> তন্মাত্রের অঙ্গীকারে পুনরবিকল॥

অথবা, সবুজের স্বরগ্রাম ফাল্গুনের রৌদ্রে হিরণ্ময়

অথবা, নিষ্ফল স্বেদ, বৃথা নির্বেদ
মিছে কাঁদা
যাচক হস্ত অনভ্যস্ত
মৌনী বীণারে মিছে সাধা।

অথবা, সপ্তুতুরগ রবি আগত সহসা উদয় শৈল শিখরান্তে
শাপ বিমোচিত বসুধা বন্দে তারণ চরণোপান্তে।
.........এবং পরপারে

নিষ্ফল, স্বেদ, নির্বেদ অনভ্যস্ত, সপ্তুতুরগ, অন্বিষ্ট, নির্বাণ, তথাগত, তন্মাত্র প্রভৃতি জানলে কবিতা আর দুরূহ লাগে না ঠিকই, যুক্তব্যঞ্জনের ঝঙ্কার যথার্থই গাম্ভীর্য আনছে, কিন্তু শব্দগুলি তাঁর বিশিষ্ট চারিত্র্যধর্ম নিয়ে বসে আছে, তাদের অভিধাকে বাক্যের ধ্বনিতরঙ্গে মিলিয়ে সংগীতের সুর আনে না, পরিবেশ সৃষ্টি করে না। এ প্রসঙ্গে ভালেরি, রিল্‌কের কবিতায় মূলানুসন্ধান একান্ত আবশ্যক। আবার তাঁদের সঙ্গে তাঁর যোগসাদৃশ্যও হবে গঠন প্রকৃতিতে, চৈতন্যে নয়। সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ধারায়ই রোমাণ্টিক, ক্ষণবাদ সত্ত্বেও রোমাণ্টিক চেতনা তাঁর কাব্যে কাজ করেছে। কিন্তু রোমাণ্টিক চেতনার সঙ্গে দুরূহ শব্দের গম্ভীর বিন্যাস, সংগীতশূন্য শুষ্ক যুক্তি, সমন্বিত সুমিত সংহতি, স্রোত ও অভিসারকে ব্যাহত করেছে। এমন কি 'নিষ্ফল স্বেদ' চটুল ছন্দে বেমানান হয়েছে। তাঁর উক্তি-উপলব্ধির একাত্মতা রক্ষিত হয় নি। আধুনিক কবিতা বিচারে এ সত্য অনুধাবনীয়॥

১. সকলের জানা শব্দ জীবন্ত হয়ে ওঠে, শব্দ হয় শব্দ এবং শব্দ দেবতা।
২. ধ্বনিময় শূন্যতা থেকে ক্ষুদ্র অলংকারমণি বিলুপ্ত।
৩. কুমারী, চিরন্তন এবং সুন্দর ক্ষণ।
৪. হ্যাঁ, এ আমার জন্যে, আমার জন্যে যা আমি পুষ্পিত করি, নির্জন
৫. তোর পা আমার নীরবতার শিশু, পবিত্রভাবে, ধীরে স্থান খুঁজে নেয়।
৬. শয়তান আনন্দময় মনোরম এবং বঙ্ক।

কবিতা ও দুর্বোধ্যতা

আর্মস্ট্রঙ চাঁদে নেমে পাথরগুলি দেখে বিস্মিত ও অভিভূত হয়েছিলেন, বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন : 'আকাশ ছিল অন্ধকার, কিন্তু চাঁদের পৃষ্ঠদেশ দিবালোকের মতো মনে হচ্ছিল, এবং তামাটে রঙের মতো দেখাচ্ছিল। একটা ভারি অদ্ভুত আলোর প্রভাব পৃষ্ঠদেশে রয়েছে, যার ফলে চাঁদের দেশকে মনে হয় রঙ বদলাচ্ছে। আমি একে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারি না।' এই দুর্বোধ্যতা প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক, মানুষের জ্ঞানের বাইরে, জ্ঞান আহরণ করবার পরেও সৃষ্টির রহস্য আমাদের দুর্বোধ্য করে রাখবেই, কারণ আমরা সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত, স্রষ্টা নই। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে কবিই স্রষ্টা, সুতরাং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে রহস্যময় এইরকম কিছু দুর্বোধ্যতা থাকবেই। কারণ শব্দের মধ্যে অর্থ একটা বহিরাবরণ মাত্র, অর্থ ছাড়িয়েও অর্থহীন অর্থ রয়েছে, অর্থহীন ধ্বনিময় অর্থ রয়েছে, চিত্রের রঙ রয়েছে, সেগুলি আবার আমার ইম্‌পাল্‌সে বাইরের ঘটনার উত্তেজনার মধ্য দিয়ে এলে মনের মধ্যে অতীত অভিজ্ঞতার সংঘাতে ও সংঘর্ষে নূতন সংবেদনা ও বেদনা জাগায় ; অতীত বর্তমানে, ঘটনার ফলে, ইম্‌পাল্‌সের মধ্যে ঝড় বয়ে যায়, তাতে কোনো একটা ইম্‌পাল্‌স কাজ করে না, জটিল রহস্যময় কতকগুলি ইম্‌পাল্‌স এক হয়ে আমাদের মানসিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াকে জটিল করে তোলে, সেই জটিলতার কিছু অংশ হয়তো শব্দের লীলায় কাব্যে প্রকাশ পায়, এবং প্রকাশিত বেদনা যখন পাঠকের চিত্তদুয়ারে একই উপায়ে ইম্‌পাল্‌সের সাহায্যে আঘাত করে, তখনও আবার সেই জটিলতা নূতনতর বেদনা ও সংবেদনাকে উদ্‌ভাসিত দিগন্তের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এমনি করেই যুগ যুগ ধরে সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটছে কবিতার সাহায্যে। সুতরাং দুর্বোধ্যতা আমাদের রক্তে, রক্তের গতিপ্রবাহে, ধ্বনির লীলায়িত তরঙ্গে, সৃষ্টির অস্তিত্বে। বুদ্ধি সেখানে দুর্বোধ্যতাকে নিবিড় করবার জন্যে সহায়তা করে, বুদ্ধির সঙ্গে দুর্বোধ্যতা মিলে জীবনের বিরোধমূলক রহস্যময় জটিলতর জীবনবৃত্তকে পরিপূর্ণ করে তোলে। ডিলান টমাসের বিশ্বাসের মতো, অনতিবাহিত জীবন আমাদের নূতন পথে নিয়ে যাবে এবং প্রাচীন মিথ্যা

ভূমিতে জলছে আর বাতাস চড় চড় শব্দ করছে, এবং অর্ধ অন্ধ করে দিচ্ছে।[১] অর্থাৎ দুটোই সত্য। আলো জলছে যেখানে, সেখানেও ছায়া লুকিয়ে হাসছে, এটা যেমন বাইরে সত্য, তেমনি শাদা আলোর ভেতরেও বিচিত্র রঙ শাদাকে চেতিয়ে দিচ্ছে; তাই ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে যখন শরতের সূর্যের আলো সকাল বেলায় ঝলমলিয়ে ওঠে, তখনই আমাদের শিব-পার্বতীর সৃষ্টিরহস্য সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের মতো দূরতর রহস্যবোধকে নিবিড়তর করে, যূথী ফুলের গাছের পাতার নিবিড় ফাঁকের মধ্য দিয়ে যখন বাদল আকাশের বিষন্ন অন্ধকার কান্নার জলের ধারায় বেদনার স্রোতকে রঙিন হওয়ার উদ্বেলিত করে তোলে, তখনই আমরা সৃষ্টির অস্তিত্বের বেদনার সঙ্গে একাত্ম হই, জল যখন মাটিকে ছুঁয়ে যাবার বিরহে কাঁদে, তখনই আমাদের কান্না সাড়া পায়। একক ইম্‌পাল্‌সের অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব, তেমনি একমুখী স্পষ্টতা অবান্তর। সেন্টিমেন্টাল রোমান্টিক কাব্যে এই একমুখীনতা রয়েছে বলেই আমাদের চেতনায় ক্লান্তির অন্ধকার নামায়, সেখানে ইয়েট্‌সের কাব্যের The fury and mire of human veins আমাদের সামগ্রিক অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দেয়। আবার ইংরেজি নকল ক্লাসিক কাব্যের স্পষ্টতা যেখানে আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিতে নিঃসাড় করে রোমান্টিকদের আলোআঁধারময় রহস্য আমাদের বেঁচে থাকবার তাৎপর্যকে নিবিড় করে। যুগ যতো পাল্টায়, মানুষের মনও পাল্টায়, কাব্যের মধ্যে সেই রূপান্তরিত রূপটাকে প্রত্যক্ষ করি, তাই ভার্জিলের মতো ইনিড রচিত হয় না, কিন্তু আনাবাস্‌ রচিত হয়। এবং কাব্যের ফর্মে অনুভূতিতে পরিবর্তন দেখা দিতে বাধ্য।

ইংরেজিতে সাম্প্রতিককালে তিনটি শব্দ চোখে পড়ছে, এলিয়ট ব্যবহার করেছেন 'ডিফিকাল্টি', হার্বার্ট রিড ব্যবহার কবেছেন 'অবস্‌কিউরিটি', এম্পসন ব্যবহার করেছেন 'এ্যাম্বিগুইটি'। এলিয়টের 'ডিফিকাল্টি' সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত; তাঁর ভাষায় 'ডিফিকাল্টি' ও 'অবস্‌কিউরিটি' সমার্থক, কিন্তু এম্পসন 'এ্যাম্বিগুইটি' অর্থে বলতে চেয়েছেন শব্দের সূক্ষ্ম পরিবর্তন, অর্থাৎ একই ভাষার মধ্যে বিকল্প প্রতিক্রিয়া, বিরোধী অনুষঙ্গে সিদ্ধান্তের অস্থিরতা, অর্থাৎ একই সঙ্গে অনেক অর্থ ও বস্তুকে দ্যোতিত করে। রিড 'এ্যাম্বিগুইটি' ও 'অবস্‌কিউরিটি'র মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে বলেছেন: "'এ্যাম্বিগুইটি' ব অস্পষ্টতা ব্যাকরণগত, 'অবস্‌কিউরিটি' বা দুর্বোধ্যতা কল্পনাজাত।'

'এ্যাম্বিগুইটি'র মধ্যে দুটি অর্থের সংঘর্ষজাত বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতাই প্রধান, কিন্তু দুর্বোধ্যতার মধ্যে দুটি বা বহু অর্থ বা যুক্তির মিশ্রণের কোনো প্রশ্ন জড়িত নয়, কবির মানসিক অনুভূতির সামগ্রিকতার মধ্যে অনিবার্যভাবে একটা রহস্যের পর্দা পাঠককে আনন্দের তীব্রতায় ব্যাকুলতর আকাঙ্ক্ষায় নিরন্তর টেনে নিয়ে যায়। দুর্বোধ্যতা কবির অভিপ্রেতও নয়, পরিত্যাজ্যও নয়, মানুষের শরীরের রক্তস্রোতের মতো একান্ত অবশ্যম্ভাবী। বাজে কাব্য অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে, কাব্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে অনুভববেদ্য কিছু যদি না থাকে তাহলে তাকে ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করলে একটা অস্পষ্টতার চমক সৃষ্টি হয়, এবং তা ব্যর্থ, আবার যা প্রকাশযোগ্য তাকে যদি উপযুক্ত ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করা না যায়, তাহলেও অস্পষ্টতা আসতে বাধ্য, এবং বাজে কাব্যের সৃষ্টি হয়, যথাক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ এবং বিহারীলাল এর উদাহরণ।

তবে একথাও স্বীকার্য, অস্পষ্টতা বা 'এ্যাম্বিগুইটিকে' আমরা পরিহার করছি বটে, কিন্তু বিশ্লেষণ করতে হলে ঐ উপায়ে ভাগ করা ছাড়া উপায় নেই, এবং কোনো কোনো কবি যে ঐ উপায়ে অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেন না, তা জোর করে বলা যায় না। কারণ ক্রোচেকথিত উক্তি-উপলব্ধির একাত্ম প্রকাশ অন্তত মালার্মে এবং ইয়েট্সের মধ্যে নেই। কিন্তু ইয়েট্স অভিজ্ঞতাকে এতোই সার্থক রূপ দিয়েছেন, তিনি কি উপায়ে করেছেন আমরা তা জানতে চাই না, অবনীন্দ্রের ভাষায় পাখির চলার গতিটাই দেখি, কলকব্জা দেখি না। এখানে সৃষ্টির শিল্পনৈপুণ্য।

বর্তমান বিংশ শতাব্দীর কাব্য যেমন পরিবর্তিত রূপান্তরিত, তেমনি তার সংজ্ঞাও পরিবর্তিত রূপান্তরিত, এবং এই রূপান্তরিত সংজ্ঞা রিচার্ড্সের আলোচনায়ই প্রথম ধরা পড়েছে, এবং তাঁর কাব্যের সংজ্ঞা থেকেই বুঝতে পারছি, কবির অভিজ্ঞতার প্রকাশই কাব্য, এই অভিজ্ঞতা কম বেশি ভেঙে ছত্রভঙ্গ করে দেয়, যদি এর মধ্যে বাইরের উপাদান হঠাৎ ঢুকে পড়ে। সুতরাং কবির অভিজ্ঞতার সামগ্রিকতার মধ্যে জটিলতা ও বিরোধ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। এই জটিলতা বিরোধ দ্বন্দ্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভাষায় শিল্পরূপের ঐক্য পায়, সুতরাং ভাষাতেও এই বিরোধ জটিলতা দুর্বোধ্যতা উপমা প্রতীক চিত্রকল্পে ও সুরসংগীতের সাহায্য প্রকাশ পায়। এই কথাই টি. এস. এলিয়ট 'দি মেটাফিজিক্যাল পয়েট স' প্রবন্ধে সুন্দরভাবে বলেছেন যে আমাদের সভ্যতা

বিরাট বৈচিত্র্য ও জটিলতাকে হৃদয়ঙ্গম করে, এবং এই বৈচিত্র্য ও জটিলতা আমাদের সূক্ষ্ম সেন্সিবিলিটির ওপর যখন খেলা করে তখনই বিচিত্র ও জটিল ফল উৎপাদন করে। প্রয়োজনানুসার ভাষাকে তার অর্থের মধ্যে বাধ্য করবার জন্যে, বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে, কবিকে অবশ্যই আরো অধিক বুদ্ধির দ্বারা শক্তিশালী ও ব্যাপক হতে হবে, আরো পরোক্ষ, আরো নির্দেশে ইঙ্গিতবহ হতে হবে।[২]

সুতরাং কাব্যে কবি সংবাদতথ্যদাতার মতো বস্তুজগৎকে উপলব্ধি ছাড়া প্রকাশ করেন না, বরং বস্তু ও জগৎ কবির মনের দ্বারা নূতনভাবে সৃষ্ট হয়ে ভাষায় প্রকাশিত হয়। ইমোশনজাত অভিজ্ঞতার সামগ্রিক ঐক্যের বাঙ্ময় প্রকাশই যদি কাব্য হয়, তাহলে দুর্বোধ্যতা অভিজ্ঞতার এবং যুগেরও, কারণ যুগকেই কবি অভিজ্ঞতায় টানেন। এই অভিজ্ঞতাকে তৈরি করা যায় না। হয়ে ওঠে, এই হয়ে-ওঠা অভিজ্ঞতার প্রকাশের ভাষাও যদি ক্রোচের স্বপ্নের অনুভূতিতে ফুলফোটার মতো বা ঝর্নার জলের মতো হয়ে ওঠে তাহলে এর চেয়ে সার্থকতা কবির জীবনে আর কি থাকতে পারে! যদি এর প্রকাশ এভাবে না হয়ে উঠতে পারে, ভালেরির মতো নির্মাণ করতে হয়, তবে মালার্মের পথে শব্দের ব্যায়ামই করতে হবে। শব্দের নির্মিতিতে আস্থা রেখেও ভালেরি স্বীকার করেছেন কবিতার প্রকাশিতব্য সামগ্রিক অভিজ্ঞতা দৈবাৎ অতর্কিতে অজান্তে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো বিদ্যুৎ-দীপ্ত হয়ে ওঠে, সেই বিদ্যুৎ-দীপ্ত অভিজ্ঞতাকে পাবার জন্যেই শব্দের সাহায্যে রূপের প্রয়োজন। এই শব্দও ব্যাবহারিক ভাষা নয়, প্রাত্যহিক ভাষা নয়, উপলব্ধিহীন যান্ত্রিক শব্দ নয়, কবির অন্তরের উপলব্ধিজাত বেদনাবিদ্ধ ধ্বনিময় ভাষা, অনুভববেদ্য অভিজ্ঞতার প্রকাশ শব্দের এই সচেষ্ট প্রকাশে সার্থকতা পায়। মালার্মে ভালেরি এলিয়ট ইয়েট্স্ সারাজীবন এই চেষ্টাই করে গেছেন। সুতরাং কবিতাবিচারের সময় পাঠক যদি সমগ্র কবিতাটি পড়ে এক নিমেষেই কবির প্রথম-পাওয়া হয়ে-ওঠা বিদ্যুৎদীপ্ত সামগ্রিক অভিজ্ঞতার ঐক্যকে আপন অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে চিত্রধ্বনি-সুররূপে স্থাপিত করতে পারেন, তাহলে বিচারের আদ্ধেক সমস্যা দূর হয়ে যায় এবং সেই মূল লক্ষ্য স্থির করে ভাষাছন্দসুরচিত্রকল্প, অর্থহীন ধ্বনি, লাফানো ভঙ্গি, আপাতযুক্তিবিশৃঙ্খলা, ভাঙা চিত্রকল্প, শব্দের দ্ব্যর্থ, উপমা, সম্মিলিত বস্তু-বিন্যাস, আরোপিত অর্থ, সাঙ্কেতিক অনুষঙ্গ, প্রতীকধর্মিতা, আইডিয়া, রূপক,

সংগীত, নির্দেশাত্মক বাক্য ও শব্দ, ছেদহীনতা, নূতন শব্দনির্মাণ, বিরোধী শব্দ ও ধ্বনির সমন্বয়, অলংকার, মিথ্, জাদু, ব্যাকরণের বিপর্যয়ে বিশেষ্যের বিশেষণ রূপ, বিশেষণের বিশেষ্যরূপ, বিশেষ্যের ক্রিয়ায় পরিণতি, দুই প্রতিপদসহ সর্বনাম, মিশ্রশব্দ, স্ল্যাঙ, গোষ্ঠীর ভাষা, বিমূর্ত ও মূর্তশব্দের ছবি ও স্বরে প্রকাশ, ছন্দস্পন্দ, অন্ত্যমিল, মধ্যমিল, বাক্য সাজাবার ও অক্ষরবিন্যাসের রীতি, যুগবাহিত কাব্যের ফর্ম, এবং চিত্র ও সংগীতের ফর্ম—প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচার করতে কষ্ট হয় না। কিন্তু পাঠককে এ সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন এবং সাহিত্য-ধারা সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। এবং অবহিত না হলেই জটিল আমাদের কাছে সরল ও মূঢ় হয়ে দাঁড়ায়, তখন গালাগালি করতে বাধে না। কারণ মূঢ়তাই জঞ্জাল সৃষ্টি করে।

প্রত্যেক যুগেই দেখা যায় সাধারণ পাঠক প্রচলিত কাব্যধারায় অত্যধিক অভ্যস্ত, তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না বলেই কাব্যকে দুর্বোধ্য বলে গালাগাল দেয়, ড্রাইডেন পোপ থেকে সরে এসে কোলরিজ ওয়ার্ডস্বার্থ নূতন ধরনের কাব্যরচনা করেছিলেন বলেই আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল, 'খ্রিস্টাবেল' রচনার পর কোল্‌রিজ শুনেছিলেন 'প্রলাপের অসংলগ্ন সংগীত', 'এন্‌শিয়েন্ট মারিনা'র রচনার পর শুনেছিলেন 'জর্মান সাব্‌লিমিটির প্রতি এক ওলন্দাজের চেষ্টা।' সুতরাং ভিক্টোরীয় যুগের কাব্যের ঐতিহ্যের প্রতি অটুট ভক্তি, পরিবারের ঐতিহ্যময় আনুগত্য, জমিদার ও প্রজার, এবং প্রভু ও ভৃত্যের ব্যক্তিগত সম্পর্ক যখন সমাজে চুরমার হয়ে গেল, নূতনবোধ ও কাব্যে নূতন রূপ দেখা গেল, তখন এই প্রচলিত সমাজে অভ্যস্ত মানুষেরা স্বভাবতই বিংশ শতাব্দীর কাব্যে বিশেষ করে এলিয়টের ও ইয়েট্‌সের শেষের যুগের কাব্যে বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল। এটা যেমন পাঠকের দিক থেকে ত্রুটি, তেমনি কবিদের তরফ থেকেও ত্রুটি রয়েছে, যার ফলে পাঠকের মনে অস্পষ্টতা গড়ে ওঠে। পাঠক ও লেখক দুয়ে মিলেই যে বিভিন্ন অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করতে পারেন, এলিয়ট ১৯৩৩ সালে 'দি ইউজ্ অব্ পয়েট্রি এ্যাণ্ড্ দি ইউজ্ অব্ ক্রিটিসিজম্' প্রবন্ধে বিভিন্ন দুর্বোধ্যতার উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন যে বহু কারণে কাব্যে দুর্বোধ্যতা আসতে পারে, 'প্রথমত কবির ব্যক্তিগত কারণ যা তাঁকে দুর্বোধ্যভাবে প্রকাশ করতে বাধ্য করে, কারণ অন্যভাবে প্রকাশ করতে পারেন না,...অথবা নূতনত্বের জন্য দুর্বোধ্যতা,...

কবি নিজেই বলেছেন কিংবা নিজের কাছেই বলেন কবিতা দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছে, এই সতর্ক বাণীতে সাধারণ পাঠক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে, চতুর হতে গিয়ে তার বুদ্ধিকে দুর্বোধ্য অন্ধকারময় করে তোলে, কিছু পাবে বলে কঠোর দৃষ্টিতে তাকায়।...এবং সর্বশেষ দুর্বোধ্যতা তৈরি হয় পাঠকের জন্যে, লেখক যে সমস্ত বস্তু বাদ দিয়ে গেছেন, পাঠক সেগুলি খুঁজতে অভ্যস্ত, সুতরাং যা নেই তার জন্যে পাঠক বিভ্রান্ত হয়ে হাতড়ে বেড়ায়, এক প্রকার অর্থের জন্যে তার মাথাকে হতবুদ্ধি করে তোলে, যে-অর্থ সেখানে নেই, সেখানে আছে বলেও মনে হয় না।' সুতরাং এ ক্ষেত্রে দরকার হলো কবিতা ও সমালোচনা সম্বন্ধে প্রকৃত অবহিত হওয়া। কাব্যের দুর্বোধ্যতার আলোচনায় কবির অভিজ্ঞতার দিক থেকে ধরলে প্রথমটিই স্বীকার্য, সেই আলোচনাই কাঙ্ক্ষিতব্য।

রোমান্টিক আলোচনা থেকেই কাব্যের দুর্বোধ্যতার স্বীকৃতি প্রথম দেখা দিয়েছে, সেই দিক থেকে লঙিনাসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইতালীয় ন্যায় ও অলংকারের অধ্যাপক ভিকোর লেখা থেকেই আধুনিক কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে শব্দের মধ্যে জাদুর লীলা, উপমার প্রাধান্য, মিথ্ ও শব্দের একাত্মতা, আদিম সংস্কৃতির মধ্যে কাব্যিক জ্ঞান থেকে প্যাগান দর্শনের ধারণা, প্রভৃতি বোধ গড়ে ওঠে। মিথ্ যেমন তাঁর কাছে কাব্যিক ভাষা, তেমনি কল্পনাই হচ্ছে জ্ঞান। কল্পনা তাঁর কাছে জ্ঞান বলে উপমাই হচ্ছে কাব্যের যুক্তি, উপমার কাজই হলো জড়বস্তুকে মানবিক অনুভূতি ও আবেগে আবৃত করা, উপমা হচ্ছে তাঁর কাছে সংক্ষিপ্ত উপকথা (fable) যা শব্দে প্রকাশিত, কিন্তু এর মধ্যে সেই আদিম অযৌক্তিকতা জড়িয়ে রয়েছে, তাঁর কাছে আদিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি হব্সের মতো সংকীর্ণ নয়, বরং সে সমাজ ছিল পিতৃপ্রধান ও বীরের, ধীরে ধীরে কল্পনার মধ্য দিয়ে মিথ্ ও সঙ্কেত পেরিয়ে নবজাত উপমার ভেলায় সে এগিয়ে গেছে। সুতরাং কাব্যবিচারে উপমাপ্রাধান্য সমগ্র জীবনের রূপকে ধরবার প্রচেষ্টাকেই প্রকাশ করছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভিকোর এই মত ক্লাসিকপন্থীদের ভালো না লাগলেও গোপনে অনেকের মনে প্রভাবপাত করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজি সাহিত্যে ব্ল্যাকওয়েল জন ব্রাউন মনোবোডো রবার্ট উফ, জর্মানে হের্দের, ফরাশি দেশে রুশো, উনবিংশ শতাব্দীতে মালার্মে ভালেরি ইয়েট্স,

বিংশ শতাব্দীকে এলিঅটকে প্রভাবিত করেছে। সমস্ত মত স্বীকার না করলেও 'সিয়েঞ্জা নুওভা'র দ্বারা ক্রোচে প্রচণ্ড প্রভাবিত হয়েছিলেন, বের্গসঁ এ মত গ্রহণ করেছিলেন। উপমা ও চিত্রকল্পাত্মক আদিম যুগের ভাষা যে একালেও আমরা আমাদের ভাবনায় ও চিন্তায় প্রয়োগ করি ভিকোর পথ ধরেই ফ্রয়েড সে কথা বলেছেন, রিচার্ডস তাঁকে বিশ্লেষণ করেছেন। এবং এই পথ ধরেই রিড সিদ্ধান্ত করেছেন যে দুর্বোধ্যতা স্বভাবত কবির মধ্যে নেই, রয়েছে আমাদের মধ্যে। কৃত্রিম বা অযথার্থ হবার বিনিময়ে আমরা পরিচ্ছন্ন ও ও যুক্তিনিষ্ঠ হই।[৩]

শব্দের সামান্য পার্থক্য ও বিরোধের সাহায্যে যে অস্পষ্টতা, এম্পসন সাতটি অধ্যায়ে তার সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম অস্পষ্টতার জন্ম হয় একই সঙ্গে বিভিন্ন উপায়ে বিস্তারিত বর্ণনা যখন কার্যকরী করে তোলা হয়। সদৃশ বস্তুকে বিভিন্ন তুলনায়, এবং বিভিন্ন পৃথক বস্তুকে বিপরীতভাবে সাজিয়ে, তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও খণ্ডিত উপমা ব্যবহার করে, ছন্দস্পন্দের দ্বারা নূতন অর্থের ব্যঞ্জনায় এর সৃষ্টি। দ্বিতীয় অস্পষ্টতার জন্ম হয় দুটি বা ততোধিক বিকল্প অর্থ যদি একটি শব্দের মধ্যে জড়িয়ে থাকে। তৃতীয় অস্পষ্টতার জন্ম হচ্ছে একই সঙ্গে দুটি বিভিন্ন অর্থ যদি কবিতায় দেওয়া থাকে। চতুর্থ অস্পষ্টতার কারণ বিকল্প অর্থগুলি যদি জটিল মানসিকতা প্রকাশের জন্যে মিলিত হয়। পঞ্চম অস্পষ্টতার জন্ম লেখকের বিভ্রান্তি থেকে, কোনো আইডিয়া স্থির নেই, লিখতে লিখতে আবিষ্কার করছেন। ষষ্ঠ অস্পষ্টতার জন্ম হচ্ছে কবিতায় প্রকাশিত শব্দগুলি অসংলগ্ন ও বিরোধী, কিন্তু পাঠককে বাধ্য করা হচ্ছে ব্যাখ্যা আবিষ্কারের জন্যে। সপ্তম অস্পষ্টতার জন্ম হচ্ছে লেখকের মনের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদের জন্যে, তার ফলেই পরিপূর্ণ বিরোধময় প্রকাশ। বলাবাহুল্য, বিশ্লেষণের জন্যে এমনি ভাগ করা হয়েছে, কিন্তু এই উপায়ে কবি ভাবেন না বা নির্মাণ করেন না। আর এম্পসন বিরোধ ও বিকল্প অর্থকেই গণ্য করেছেন। এগুলি ছাড়াও আরো অনেক কিছু আছে কবিতায়। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে মম্মটের 'কাব্যপ্রকাশে' কাব্যের ষোল প্রকার দোষের কথা উল্লিখিত আছে,[৪] তার মধ্যে অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতাও রয়েছে। 'সন্দিগ্ধ' বলতে তিনি অস্পষ্টতা বুঝিয়েছেন, বলেছেন : 'আলিঙ্গিত স্তত্র ভবান্‌দম্পারায়ে জয়শ্রিয়া আশী : পরম্পরাং বন্ধ্যাং কর্ণে কৃত্বা কৃপাং কুরু।' এখানে 'বন্ধ্যাং' শব্দটি অস্পষ্ট, কারণ

শব্দটিতে বন্দীরমণীকে বোঝায়, আবার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত। দুর্বোধ্যতা বোঝাতে 'ক্লিষ্ট' বলতে চেয়েছেন। 'অত্রিলোচনসম্ভূত জ্যোতিরুদ্গমভাসিভিঃ সদৃশং শোভতেঽত্যর্থং ভূপাল! তব চেষ্টিতম্।' এখানে অত্রিলোচনসম্ভূত চন্দ্রের জ্যোতিকে জ্যোৎস্না ধরা হয়েছে। এসব আলোচনার কোনো মানে নেই, আনন্দবর্ধনই এ ব্যাপারে আমাদের প্রকৃত পথে চালিত করেন, অস্পষ্টতা দুর্বোধ্যতা এবং অন্যবিধ প্রচলিত দোষও কাব্যে প্রযুক্ত হতে পারে রসের প্রকাশের উপযোগী হলে। রসের প্রকাশ ঘটলে সাধারণ দোষও গুণ বলে গ্রাহ্য হয়। কারণ সৎকাব্যে প্রতিটি শব্দ তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে রসোপযোগী হয়ে ওঠে, অন্য শব্দের ব্যবহারের কথাই ওঠে না, 'উক্ত্যন্তরাশক্যচারুত্বব্যক্তিহেতুঃ শব্দঃ'; তিনি ঘোষণা করেছেন কেবল শাস্ত্রের নিয়ম প্রতিপালন করবার জন্যে নয়, রসাভিব্যক্তির প্রয়োজনানুসারে সন্ধি ও সন্ধ্যঙ্গ যোজনা করতে হবে—সন্ধিসন্ধ্যঙ্গঘটনং রসাভিব্যক্ত্যপেক্ষা নতু কেবলয়া শাস্ত্রস্থিতিসম্পাদনেচ্ছয়া।' কারণ, রসাক্ষিপ্ত কবিচিত্তে রসোপযোগী কাব্যফর্ম সৃষ্টিকালে, শব্দ ও অর্থ এমন আবেগের পূর্ণতায় অভিনবরূপে প্রকাশ পায়, সেখানে তাদের আলাদা করা যায় না।[৫] সুতরাং তথাকথিত শব্দের বাছবিচারের কোনো মূল্য নেই।

ভিকো যথার্থই ধরেছিলেন কবিতার ব্যাপারটা পুরো উপমা চিত্রকল্প ও সঙ্কেতের ব্যাপার। উপমা কবির মতে জড় ও প্রাণ বস্তুকে শুধু তুলনা করে না, একটা বিশেষ চিত্রকল্পের মধ্যে কবির দেখা বিভিন্ন বস্তুকে সংশ্লেষণে ঐক্যময় করে তোলাই তার ধর্ম। তুলনার চেয়েও সংশ্লেষণজাত ঐক্যই হলো আজকের উপমার প্রধান কথা। উপমার মধ্যেও ছবি রয়েছে, কিন্তু সংশ্লেষণ করতে গিয়ে উপমার একটা বস্তু অন্য বস্তুকে গ্রাস করে, ঢেকে ফেলে। তাই এখনকার কবিরা উপমার চেয়েও চিত্রকল্পে শান্তি ও স্বস্তি পায়, কারণ এখানে কেউ কাউকে ঢেকে রাখছে না, গ্রাস করছে না, একটার সাহায্যে আর একটাকে আবিষ্কার করছে, তুলনার বদলে সাদৃশ্য অজানা বস্তুকেও ছবির নিবিড়তায় সতেজতায় পরিচিত করে তোলে, অর্থাৎ সংশ্লেষণের পরেও অপরিচয়ের পরিসর দূর করে দেয়, তাই রেভের্দির ভাষায় বলা যায় যে বিশিষ্ট চিত্রকল্প যখন সৃষ্টি হয় তখন তুলনা করে না, দুই দূর রিয়্যালিটিকে এক করে দেয়, যায় সম্পর্ককে কবিমন কেবল গ্রাস করেছে।[৬] এই চিত্রকল্প কবির

কাছে স্বপ্নের মতো অনুভূতির ঐক্যে প্রকাশ পায়। আর সঙ্কেত বা প্রতীকের কাজ হলো ছবির সাহায্যে একটি সর্বজনীন ধারণাকে গড়ে তোলা, যে ধারণার মধ্যে দুটি বস্তুর অর্থের তুলনা নেই, চিহ্নের বা ছবির মূল্য শুধু নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত, অন্য যে কোনো অর্থই বহুবিধ নামান্তর বা অর্থহীনতার নামান্তর, গোলাপ লাল ও তার রূপ—এই শুধু তার চিহ্নের অর্থ, এছাড়া আর যে কোনো অর্থই আরোপ করি না কেন তা আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়, দুলিয়ে দিয়ে যায়, আলোছায়ার রহস্য এনে দেয়। কবিরা এই কারণেই, চেতনাকে ও সেন্সিবিলিটিকে প্রসারিত করবার জন্যেই সঙ্কেতের ব্যবহার করেন, যাতে নির্দিষ্টতা থাকে না, শুধু দিগন্তবিস্তার ঘটতে থাকে। তাই এখানে উপমার তুলনা নেই, চিত্রকল্পের ছবির নির্দিষ্ট সীমাকে সে পেরিয়ে চলে যায়। এর পরেই আসে সংগীত ও সুর, এর চিহ্নমূল্যও নেই, তাই নির্দিষ্ট কোনো অর্থও নেই, ধ্বনি ও সুর নিদিষ্ট অর্থের পাহারা পেরিয়ে, ছবির সীমানা ভেঙে চেতনঅচেতন মনে অতীতবর্তমানের অভিজ্ঞতার সংশ্লেষণে ও বিরোধে বের্গসঁ'র কালের গতির মতোই জানা-অজানাকে দুলিয়ে অসীমের পথে আমাদের টেনে নিয়ে যায়, তাই উপমা চিত্রকল্প সঙ্কেত পেরিয়েও সুরে এসে কবিতা আমাদের অসীমে মুক্তি দিয়ে যায়। এই কারণে কবিতার ক্ষেত্রে সংগীতের সুর অবশ্য স্বীকার্য। এই সঙ্গে মিথ্‌ ও স্বপ্নকেও কবিতার আলোচনায় গ্রহণ করতে হয়, কারণ মিথ্‌ শুধু একটা ছবি বা কাহিনী সঙ্কেত বা ধ্বনি নয়, কারণ মিথের মধ্য দিয়ে জন্মমৃত্যু অতীতবর্তমান, স্বপ্নআকাঙ্ক্ষা, মূর্ত ছবি ও অমূর্ত ভাব, জাতীয় চেতনার ঐতিহ্যবাহী অদৃশ্য অথচ গূঢ়রক্ত প্রবাহ, শব্দধ্বনি ও ভাষাবিন্যাস সামগ্রিক ঐক্যে ইতিহাসের জীবন্ত স্রোতের মতো সংবেদনশীল কবিচিত্তে আঘাত দেয়।[৭] তাই মিথ্‌কে নিয়ে কবি উপলব্ধির নূতন মিথ্‌ ভাষায় সৃষ্টি করেন স্বপ্নের সঙ্কেতময় অনুভবে। এতে জাতীয় ঐতিহ্য ও নিগূঢ় স্বপ্নের স্বাভাবিক কল্পনাজাত অনুভূতি একই সঙ্গে সক্রিয়। এলিঅট ও ইয়েট্‌স এর সার্থক উদাহরণ।

পাউণ্ড ইমেজিস্ট ও হাইকু কবিতার সংক্ষিপ্তি, সংহতি ও সঙ্কেতের মধ্যে এই দুর্বোধ্যতা এনেছেন; ব্যক্তিগত অর্থ আরোপ, নির্দেশ বাক্য, একই সঙ্গে অনুবাদ, অভিযোজন, উদ্ধৃতি, ছবি, নির্দেশ, প্যারডি, অনুকরণ করবার ফলে দুর্বোধ্যতা এসেছে; শব্দের অনুপ্রাস, দুই অক্ষরের মিল, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, নূতন

শব্দ গ্রহণ, ধাতুরূপে নূতন উপাদানের অনুপ্রবেশ, শব্দতত্ত্ব, কথ্য শব্দে আদি-ধ্বনির স্থান পরিবর্তন, অন্য অক্ষর নিয়ে ভিন্ন উপায়ে শব্দসৃষ্টি, সামনে পেছনে একইভাবে শব্দ পাঠ প্রভৃতি উপায়ে জয়েসের মতো শব্দের দুর্বোধ্যতা এনেছেন পাউণ্ড। এই সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন কাব্যের ফর্মে সংগীতের ফর্ম ও সুরের বিন্যাস, ফিউগ (fugue) ও কাণ্টোজ এক হয়ে গেছে। এলিঅট তাঁর শিষ্য হয়েও শব্দের এতো কেরামতি দেখান নি, কিন্তু নির্দেশ, ধ্বনি, সুর, সংগীত, চিত্রকল্প, সঙ্কেত, উপমা, মিথ্‌কে অভিজ্ঞতায় চতুরভাবে প্রকাশ করেছেন; শব্দ, অর্থের বিরোধ, আরোপিত অর্থ ও ভাব-অর্থের বদলে অর্থের সংগীতের মোহ সৃষ্টি করেছেন; ভাবের, অর্থের, চিত্রের, সুরের, ছন্দের, উদ্ধৃতির, বস্তুর, বিরোধের সমাবেশের ফলে একটা অনুভূতির ঐক্য তৈরি করবার চেষ্টা করেছেন, যার ফলে সংগীতের প্রতিক্রিয়াই পাঠকের চিত্তে জাগাতে চান। ইয়েট্‌স মিথ্‌ স্বপ্ন জাদু ছন্দ সুর চিত্রকল্প সঙ্কেতের সাহায্যেও তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সুররেয়ালিস্ত ধারার সর্বশেষ সার্থক রোমাণ্টিক ডিলান টমাসের মধ্যে চিত্রকল্পের দুর্বোধ্যতায় ধর্ম ও যৌনতা গভীর জটিলতা সৃষ্টি করেছে। ইয়েট্‌সের I made my song a coat, জটিল উপমার জন্যে অস্পষ্টতা জন্মাচ্ছে, সংগীত থেকে কোট তৈরি হতে পারে, অথবা সংগীতের জন্যে কোট তৈরি করতে পারেন কবি। এলিঅটের 'stye' শব্দটায় 'পথ' ও 'চোখের পাতার ওপর ছোট ফোলা টিউমার' এই দুটো অর্থ থাকার জন্যেই অস্পষ্টতা আসছে পঙক্তিটার মধ্যে : Those who sit in the stye of contentment, meaning Death, এলিঅটের এই পঙক্তিগুলির মধ্যে ভাবের দুর্বোধ্যতা এসেছে : What we call the beginning is often end/And to make an end is to make a beginning/The end is where we start from. এটাই অর্থের সংগীত। ডিলান টমাসের কাছে অর্ধ অনুভূত অযৌক্তিক সংবেদনা ও আইডিয়ার প্রকাশের জন্যে সুররেয়ালিস্ত ধারায় শব্দের বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে উঠেছে, শব্দের অর্থ পাল্টে দিয়েছেন minstrel angle হয়েছে ministering angle, triangle landscape মানে হচ্ছে তিন কোণা ও ত্রি-ঐক্য, যিশু খ্রিস্টের ক্রুশ এবং ডাকাত, এমনি man-iron bonerailed, sea-spindle, sea-struck, all-hollowed, pinhilled, natron প্রভৃতি অবিষ্কার করেছেন। বিপর্যস্ত চিত্রকল্প

দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করেছে : when blood, spadehanded, and the logic, time/Drive children up like bruises to the thumb/From maid and hand.

বাংলাদেশে জীবনানন্দের মধ্যে দুর্বোধ্যতা আধুনিক কাব্যে প্রথম দেখা যায়, শক্তি সুনীল অলোকরঞ্জন রমেন্দ্রকুমারের মধ্যে এই দুর্বোধ্যতা রয়েছে, অস্পষ্টতা বিষ্ণু দে'র কাব্যে, এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় শঙ্খ ঘোষ তরুণ সান্যাল এঁদের সকলের কবিতায় এই অস্পষ্টতা ধরা পড়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের কাব্যের তুলনায় এ দুর্বোধ্যতা বা অস্পষ্টতা বিশেষ কিছু নয় ॥

১. I have longed to move away but am afraid.
Some life yet unspent might explode
Out of the old lie burning on the ground
And cracking into the air, leave me half blind.

২. Ambiguity itself can mean an indecision as to what you mean, an intuition to mean several things, a probability that one or other or both of two things has been meant, and the fact that a statement has several meanings. পৃঃ ৬ Seven Types of Ambiguity.

৩. We see, therefore, that essentially obscurity lies not in the poet, but in ourselves. We are clear and logical at the cost of being superficial or inexact. Obscurity in Poetry, Collected Essays P. 98.

৪. দুষ্টং পদং শ্রুতিকটুচ্যুত সংস্কৃত্যপ্রযুক্তমসমর্থম্।
নিহতার্থমনুচিতার্থং নিরর্থকমবাচকং ত্রিধাশ্লীলম্ ॥
সন্দিগ্ধমপ্রতীতং গ্রাম্যং নেয়ার্থমথ ভবেৎ ক্লিষ্টম্।
অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশং বিরুদ্ধমতিকৃত্ সমাসগতমেব ॥

৪. রসাক্ষিপ্ত তয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়োভবেৎ অপৃথগ্ যত্ননির্বর্ত্যঃ সোঽলংকারো ধ্বনৌ মতঃ।

৬. L'image est une création pure de I'esprit……on crée, au contraire, une forteimage, neuve pour l'esprit, en rapproachant sans comparaison deux réalités distantes dont l'esprit seul a saisi les rapports. Poems 1939-45.

৭. সম্ভবত ভিকোকে অনুসরণ করেই মিথ্ সম্বন্ধে ভালেরি বলেছেন : 'মিথ্ সব কিছুর জন্যে ব্যবহৃত একটি শব্দ, ভাষার ওপর ভিত্তি করে এ সমস্ত কেবল রয়েছে। এমন দুর্বোধ্য কোনো শব্দ নেই, এমন উন্মার্গগামী কোনো গালগল্প নেই, এমন অসংলগ্ন কোনো মন্তব্য নেই যার মানে আমরা বার করতে পারি না। অদ্ভুত ভাষার জন্যে যে কেউ সর্বদা একটা অর্থ গ্রহণ করতে পারে।…মিথ্ হচ্ছে আমাদের কর্মের ও প্রেমের প্রকৃত আত্মা। অপচ্ছায়া বা ফ্যান্টমের অনুসরণেই আমরা কেবল কাজ করতে পারি। আমরা যা তৈরি করি তাকেই কেবল আমরা ভালোবাসতে পারি।'

ঐতিহ্য চিন্তা ও বাংলা কাব্য

সম্ভবত এলিঅটের পরেই সমগ্রবিশ্বে ঐতিহ্য সম্বন্ধে লোকে ভাবতে আরম্ভ করেছে, ঐতিহ্যের সঙ্গে যদিচ ক্লাসিক কাব্যের একটা অঙ্গাঙ্গি যোগ রয়েছে, তবু ঐতিহ্য সেখানে ধারানুসরণ এবং পূর্ববর্তীর অনুকরণ। কিন্তু ঐতিহ্যকে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি এবং ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন ও উন্নতির প্রেক্ষাপটে বিচার সাহিত্যের ক্ষেত্রে এলিঅটের কৃতিত্ব। যদিও এলিঅটের আগে ১৯০৭ সালে ইয়েট্স ঐতিহ্য ও কবিতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ১৯১৩ সালে পাউণ্ড একটি ছোট্ট সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন, হয়তো এই প্রবন্ধটিই এলিঅটকে আরো গভীরভাবে ভাবিয়েছে। হেগেলে ও সমাজতত্ত্বে ঐতিহ্য সম্বন্ধে যে চিন্তা ভাবনা আছে, তাকে শৃঙ্খলাবিন্যস্ত করেই এলিঅট 'ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত প্রতিভা' নামে চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। রুশ সাহিত্যে যদিচ ঐতিহ্য এলিঅটের ভাবনারই সমধর্মী, তবু তার মূল উৎস হয়তো হেগেল থেকেই, কিন্তু একথা অস্বীকার করলে চলবে না যে ১৯৩২ সালে গোর্কির ঘোষণার পর থেকেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অঙ্গস্বরূপ ঐতিহ্যের কথা এসেছে, সেখানে এলিঅটের প্রভাব পড়ে নি, একথা জোর করে বলা যায় না। তবে 'পড়ো জমি'র লেখক বলেই হয়তো এলিঅটের নামোল্লেখ সেখানে নেই। বাংলাদেশে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এলিঅট থেকেই, এলিঅটের প্রবন্ধকে ভিত্তি করেই সুধীন্দ্রনাথ 'ঐতিহ্য ও টি. এস্. এলিঅট' প্রবন্ধটি ১৯৩৪ সালে রচনা করেন এবং এর পর বিষ্ণু দে 'সাহিত্যের 'ভবিষ্যতে' এলিঅটের পথ ধরেই বাংলা সাহিত্যে ঐতিহ্যের আলোচনা করেন। স্বাধীনতাউত্তরকালে বামপন্থী লেখক গোষ্ঠীর কাছে এবং সমাজধর্মী বাস্তববাদী লেখকের কাছে ঐতিহ্য এখন অবশ্যম্ভাবী বস্তু, এমনকি যাঁরা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় ভোগেন, লিরিকের বেদনার মধ্যে বিশ্বের মুক্তির বেদনা দেখেন, তাঁরাও এলিঅটের ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেন। এখানে আর একটা তথ্য মনে রাখা দরকার সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে এলিঅটের সাহিত্যতত্ত্ব স্বীকৃত হলেও এলিঅটকথিত ঐতিহ্য অনেকাংশে প্রত্যাখ্যাত। এলিঅট ঐতিহ্যের মধ্যেই ইতিহাসবোধকেই গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, সুধীন্দ্রনাথ ফ্রয়েডপন্থী মনোবিজ্ঞানীদের পথ ধরে 'ঐতিহ্যের সঙ্গে অবচৈতন্যের

সমীকরণে' স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন, এলিঅট যেখানে ইতিহাসের পথ ধরে নবীন উদ্‌ভাবনার কথা বলেছেন, সুধীন্দ্রনাথ সেখানে এই নবীন উদ্‌ভাবনার কথা একেবারে অস্বীকার করেছেন, কারণ কাব্যের যা মূলধন, আবেগ ; তা চিরন্তন, উত্তরাধিকারসূত্রে তাকে পাই, আমাদের ভাবনা ও বেদনায় তার আয়বৃদ্ধি ঘটে মাত্র। এই ভাবনা ও বেদনার মধ্যেই কবির মৌলিকত্ব। সুধীন্দ্রনাথের বৃত্তি বা রেসিডিও-এর আলোচনায়ও সেই একই কথা রয়েছে। সম্ভবত সুধীন্দ্রনাথের অবচৈতন্যের ঐতিহ্য বাংলাসাহিত্যে পরবর্তীকালে তেমন স্বীকৃত ও গৃহীত হয় নি।

একজন মহিলা সমালোচক হেগেলের 'আউফ্‌হেবেন' (aufheben) শব্দটির মধ্যে ঐতিহ্যের প্রকৃত তাৎপর্য অন্বেষণ করেছেন, এর মধ্যে তিনটি অর্থ রয়েছে, প্রথম অর্থ শেষ করা ; দ্বিতীয় অর্থ ধরে রাখা, বয়ে নিয়ে যাওয়া, ভালো উত্তরাধিকারে ব্যবহার করা ; তৃতীয় অর্থ উন্নীত করা এবং উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করা। এই তিনটি অর্থই যথাক্রমে ঐতিহ্যের মধ্যে বিধৃত।

ইয়েট্‌স বলতে চান তিন শ্রেণীর লোক পৃথিবীতে সুন্দর জিনিস তৈরি করেছে, অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করেছে সর্বাঙ্গসুন্দর আচার ও ব্যবহার, কারণ পৃথিবীতে তাদের স্থান জীবনের ভয়ের থেকে অনেক উচ্চে ; দ্বিতীয়ত গ্রামের অধিবাসীরা তৈরি করেছে সুন্দর গল্প ও বিশ্বাস, কারণ তাদের হারাবার কিছু নেই, তাই তাদের ভয় নেই ; তৃতীয়ত, শিল্পীরা বাকি জিনিস তৈরি করেছে, কারণ বিধাতা তাদের চঞ্চলতা দিয়ে পূর্ণ করেছেন। এই নির্ভীক স্বাধীনতাকেই ইয়েট্‌স দীর্ঘ ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত দেখতে পেয়েছেন, এর ফলেই জীবনে ও শিল্পে বিশুদ্ধ উপলব্ধির সাক্ষাৎ ঘটে। অর্থাৎ মানব ও বিশ্বজীবনের চিরন্তন মৌলস্বরূপ ঐতিহ্যের কথায় বলতে চেয়েছেন ইয়েট্‌স, যার অপর নাম মুক্ত জীবনপ্রবাহ। ঐতিহ্যকে এমনিভাবে না দেখে, বস্তুগতভাবে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখতে চেষ্টা করেন পাউণ্ড। তাঁর প্রথম কথাই হচ্ছে ঐতিহ্য হচ্ছে সৌন্দর্য যাকে আমরা রক্ষা করি, এ ঐতিহ্য আমাদের বাঁধবার শৃঙ্খল নয়। ঐতিহ্য কোনো বিশেষকাল থেকে শুরু হয় নি, এর স্রোত বহু কাল থেকে চলে এসেছে। পৃথিবীতে দুটি বিরাট লিরিকের ঐতিহ্য চলে এসেছে, একটি গ্রীসের, অন্যটি প্রভাসেঁর। প্রথমটি থেকে বস্তুত প্রাচীন জগতের কবিতার উৎপত্তি, দ্বিতীয়টি থেকে প্রকৃত আধুনিক কবিতায় শুরু।

গ্রীসেরও আগে ব্যাবিলিয়ন ও হিট্টি ঐতিহ্য ছিল, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আমরা আজ কিছুই জানতে পারি না। এ ছাড়া ইজিপ্ট চীনা জাপানি উরুক প্রভৃতি দেশের কবিতা ও ঐতিহ্য ছিল, গ্রীস ও প্রভাসঁর কবিতায় সংগীত ও কবিতা একাত্ম ছিল বলেই ছন্দস্পন্দ ও মাত্রায় তারা এমন উচ্চ স্থান অধিকার করতে পেরেছিল। প্রভাসঁর কান্‌ৎসন্‌-ই ইতালিতে এসেছে, দান্তে ও তাঁর সমকালীন ব্যক্তিরা গ্রহণ করেছেন, এখান থেকেই সংগীতে সোনাটা তৈরি হয়েছে, এমনি করেই আবার ইতালি থেকে ফরাশি, ফরাশি থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এর প্রভাব এসেছে ঐতিহ্যের ধারায়। প্রভাসঁর canzone ইতালিতে ক্যান্‌ৎসোনে ও সনেট হয়েছে, জর্মানে minnesang হয়েছে, এবং ইংরেজিতে এলিজাবেথীয় কবিতার বহু ফর্মে রূপ পেয়েছে। প্রভাসঁও তার ঐতিহ্য পেয়েছে লাতিন থেকে। মূলে প্রত্যাবর্তন সতেজ করে, কারণ এই মূলে প্রত্যাবর্তনের মানে প্রকৃতিতে ও যুক্তিতে প্রত্যাবর্তন। যে মানুষ মূলে ফিরে যেতে চায়, চিরকালের যুক্তিপূর্ণ আচাররীতি ব্যবহার করতে ইচ্ছা করে সে। এটা সে চায় স্বাভাবিকভাবে যুক্তিপূর্ণভাবে এবং স্বজ্ঞামূলকভাবে, সে পাণ্ডিত্য চায় না, সংগীত চায়। ফ্রিভর্স-এর রূপ প্রকৃতভাবে ইউরিপিদিসের নাটকের পঙক্তির মধ্যেই প্রথম অস্পষ্টভাবে মেলে, কারণ কবিচিত্তে বস্তুর অনুভূতিতেই ছন্দের মিলের ঝঙ্কারের সৃষ্টি। কবিতায় কি ধ্বনি ও টেম্পো ব্যবহৃত হবে তা নির্ভর করে অক্ষরের ও উচ্চারিত ধ্বনির প্রকৃতির ওপর, সুরসমন্বিত ছন্দস্পন্দ ও সংগীতের নিয়মের ওপর। এবং এমনিভাবেই আনুপ্রাসিক, অক্ষরমূলক, ঝোঁকপ্রধান, মাত্রাপ্রধান ছন্দের সৃষ্টি। এগুলি সংগীত ও শিল্পের ইতিহাস প্রগাঢ়রূপে না জানলে শুধু অনুকরণ করে জানা যায় না। সুতরাং ঐতিহ্যবোধ একান্ত দরকার। পাউণ্ড এখানে ছন্দ এবং ধ্বনির দিক থেকে ঐতিহ্যের উৎস খুঁজতে চেষ্টা করেছেন।

এরপর এলিঅটই ঐতিহ্যকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা দার্শনিক ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। আমরা যখন কোনো কবির রচনার মধ্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করি এবং তাঁকে বিচার করে তৃপ্তি পাই, তখন বুঝতে হবে এই স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে মৃত কবিদের ও পূর্ব পুরুষদের অবিনশ্বরতা গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে, এ শুধু কৈশোরকালের রচনায় নয়, জীবনের পরিপূর্ণতার সময়ও। ঐতিহ্য পূর্ব যুগের অনুবর্তন নয়, একে উত্তরাধিকার

সূত্রে পাওয়া যায় না, বিরাট পরিশ্রমে একে লাভ করতে হয়। এর মধ্যে ইতিহাসবোধ জড়িত হয়ে রয়েছে, পঁচিশোত্তর কবির পক্ষে এই ইতিহাসবোধ অপরিহার্য। ইতিহাসবোধ একটা অনুভূতিময় প্রত্যক্ষ ধারণা, যার মধ্যে অতীতের অতীতধর্মিতা শুধু নয়, বর্তমানও রয়েছে, যে লোকের মধ্যে ইতিহাসবোধ রয়েছে, সে শুধু নিজের যুগের কথা লেখে না, হোমর থেকে সমগ্র য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুভব তার মধ্যে থাকে, এবং সেই সঙ্গে তার নিজের দেশের সাহিত্য একই সঙ্গে থাকে, এমনিভাবেই যুগপৎ শৃঙ্খলা রচনা করে সে। ইতিহাসবোধ হচ্ছে একই সঙ্গে চিরন্তন ও তাৎক্ষণিকের মিলন, চিরন্তন বা সময়হীনতা এবং তাৎক্ষণিক উপলব্ধি ঐতিহ্যকে সৃষ্টি করে। এই ঐতিহ্যবোধই লেখককে তাঁর সমকালীন লেখকদের মধ্যে তাঁর স্থান সম্বন্ধে নিবিড়ভাবে সচেতন করে তোলে। সুতরাং কোনো কবির নিজস্ব কোনো মানে নেই, তাকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ও মৃত কবিদের মধ্যে স্থাপিত করতে পারলেই তার তাৎপর্য গভীরভাবে বোঝা যায়, প্রাচীনকে স্বীকার করেই তার অভিনবত্ব। শিল্পে উন্নতি বলতে কিছু নেই, কিন্তু তার উপাদান সর্বকালে এক থাকে না। কবির ব্যক্তিগত মনের চেয়ে তাঁর স্ব-কালের মনকে জানাই বড়ো ব্যাপার, কালের মনের ব্যাপারটাই পরিবর্তিত হয়, এই পরিবর্তিত সমস্ত কিছু গ্রহণ করে বলে এর মধ্যে উন্নতি দেখা যায়। ব্যক্তিগত মন ঋদ্ধও নয়, সঞ্চারিত হতেও পারে না, কিন্তু এই ব্যক্তিগত মন যদি কালের ও ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তাহলে ব্যক্তিগত অনুভূতির আত্মবিসর্জন ঘটে, ব্যক্তিত্বের এই নিরন্তর বিসর্জনের ফলেই নৈর্ব্যক্তিক শিল্প সৃষ্টি হয়, এই নৈর্ব্যক্তিক শিল্পই সাহিত্যের কাম্য, রোমান্টিক কাব্যের মধ্যে যা অবহেলিত হয়েছিল। আসলে কবির মন অনুঘটক বা ক্যাটালিস্টের মতো। যখন অক্সিজেন ও সাল্‌ফার ডাই-অক্সাইড প্ল্যাটিনামের সূক্ষ্মতন্তুর উপস্থিতিতে মেশে, তখন সাল্‌ফারাস এ্যাসিড তৈরি হয়। প্ল্যাটিনাম না থাকলে এ্যাসিড তৈরি হতো না, অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার প্ল্যাটিনামের কোনো বিকার ঘটে না, প্ল্যাটিনাম নিরপেক্ষ অপরিবর্তিত নির্জীব হয়ে থাকে। কবির মন হচ্ছে প্ল্যাটিনামের টুকরো, প্ল্যাটিনামের মতোই কবির মন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর কাজ করে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিল্পী অভিজ্ঞতার সঙ্গে সৃষ্টিক্রিয়াকে আলাদা রাখেন, অভিজ্ঞতাকে উপাদান হিসেবে কাজে লাগান।

বলা বাহুল্য, এলিঅটের উপরোক্ত বক্তব্য তাঁর 'পড়ো জমি'র রচনার ভূমিকা, তাঁর শিল্পিসত্তার স্বরূপ আবিষ্কার। তিনি যখন বর্তমানের সঙ্গে অতীতের অতীতধর্মিতা মেলাতে বলেন, বা সচেতন বর্তমানের কথা বলেন, তখন হেগেলীয় দুই বিরোধী শক্তির মিলনের কথাই বলেন, যার সাহায্যে তৃতীয় নূতনের জন্ম হয়। অনুঘটকের উপমার মধ্যে দুই গ্যাসের সংমিশ্রণে এ্যাসিডের উৎপত্তি নির্ণয়ে, হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিই স্বীকৃত। যদিও এলিঅট এ্যাব্‌স-লিউট্‌ স্বীকার করেন না, কিন্তু আত্মসচেতন এ্যাব্‌সলিউট্‌ যেমন মুক্তির জন্যেই সীমার দিকে চলেছে, তেমনি সীমাও মুক্তি লাভের জন্যে এ্যাব্‌সলিউটে যাত্রা করছে, আইডিয়ার এই মুক্তিই ইতিহাসে বিধৃত। কিন্তু এর যোগ সাধন করে মানুষের ইচ্ছা, অথবা তার সক্রিয় কর্ম। সুতরাং আইডিয়া এবং মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-উদ্ভূত সক্রিয় কর্মই ইতিহাসকে পরিপূর্ণতার পথে নিয়ে চলে। এলিঅটের সচেতন বর্তমানের সৃষ্টির মধ্যে, অতীত ও বর্তমানকে যোগ করবার সেতুরূপ কবির ভূমিকা ব্যক্তিগত ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত সক্রিয় কর্মকেই দ্যোতিত করছে, এমনি করে কবি বা সাহিত্যিক যুগ যুগ ধরে অতীতের স্রোতটিকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করে ভবিষ্যতের ব্যাপ্ত প্রসারে অনবরত এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, হেগেলে যেমন এই সীমা মুক্তির মধ্যে মুক্ত, এলিঅটের ইতিহাস-বোধও এমনিভাবে প্রসারিতকালে উন্মুক্ত। হেগেলের ইতিহাসতত্ত্বে, জাতিতত্ত্বে, নীতিতে, বীরধর্মে, রাষ্ট্রমুক্তিতে প্রচুর কৌতুক ও ভুলের উপাদান থাকলেও স্রোতের চিন্তা পরিবর্তীকালে অনেককে প্রভাবিত করেছে।

এলিঅটের পূর্বে সমাজতত্ত্বচিন্তাবিদ লিওনার্ড টি. হব্‌হাউস ঐতিহ্য সম্বন্ধে 'সামাজিক বিবর্তন' বইয়ে যে কথা বলেছেন এলিঅটের সঙ্গে তার বহুল পরিমাণে সাদৃশ্য রয়েছে। সমাজের ঐতিহ্যের সঙ্গে বংশগত চেতনার মিল দেখেছেন। এলিঅট বলেছেন ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতে পারি না, হব্‌হাউস বলেন বংশ থেকে উৎপত্তি হলেও ব্যক্তি তার ক্ষমতার সাহায্যে আরও অনেক দূরে নিয়ে যায়, এমনিভাবে স্রোতকে টেনে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন হচ্ছে ঐতিহ্য নিয়ে এতো মাথা ঘামাচ্ছি কেন? এ কথাগুলো কি আমরা জানতুম না? সবই জানতুম। ১৮৩২ সালে গ্যেটে স্পষ্ট বলেছিলেন: 'আমাদের সম্পর্কে আমরা যা কিছুই চিন্তা করি না কেন, আমরা প্রকৃতপক্ষে সমষ্টিগত জীব।' তলস্তয় 'যুদ্ধ ও শান্তি' বই সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাচীন

ঐতিহ্যকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পর ব্যক্তিগত হৃদয়োচ্ছ্বাস এমন এক উৎকেন্দ্রিক সীমায় এসে পৌঁছেছিল, যাতে আমরা নিজের দেশের জাতি ধর্ম ঐতিহ্য ভুলতে বসেছিলুম এবং বিশ্ব সম্বন্ধে অচেতন হয়ে পড়েছিলুম, ব্যক্তিহৃদয় যতক্ষণ না বস্তুর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে পারছে, ততক্ষণ পাঠকের মনেও যে হৃদয়কে সঞ্চারিত করতে পারা যাচ্ছে না, একথাটা ভুলতে বসেছিলুম, ভুলতে বসেছিলুম কবিতায় শব্দই হচ্ছে মাধ্যম, এই মাধ্যমের সাহায্যেই ইম্প্রেশন ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ হয় এবং সৃষ্টি হয়, মাধ্যমকে বাদ দিয়ে অনুভূতি প্রকাশের কোনো মানে হয় না। বেল্ ও ফ্রাই যেমন অসাধারণ ইমোশনের উৎপত্তি-কারক হিসেবে 'সিগ্নিফিক্যাণ্ট ফর্ম' বা 'তাৎপর্যপূর্ণ রূপগঠনে'র কথা বলেছিলেন, এলিঅটও কবিতারজীবনের মধ্যে 'সিগ্নিফিক্যাণ্ট ইমোশনের' প্রকাশ দেখতে চেয়েছেন।

সবচেয়ে গোলমেলে ব্যাপার হচ্ছে বাঙালির ঐতিহ্য নিয়ে। বাঙালির ঐতিহ্য কোথায়? রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতিতে নয়, ধর্মে নয়, বিদ্রোহে নয়, সংগঠনে নয়, কিসের মধ্যে তার জাতিগত ও দেশগত ঐতিহ্য লুকিয়ে রয়েছে? সে কি কান্নায়, সে কি আবেগে, সে কি প্রেমে সে কি লিরিকে, সে কি বিচ্ছিন্নতায়, একাকিত্বে, বিষণ্ণতায়? এর কোনোটাই সদর্থক নয়, আবার নঞর্থক নয়। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালি হিসেবে আজ কারো যদি বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে, তাহলে দুটো উপাদান তার মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে: এক: বিষণ্ণ ভাবুকতা; দুই: আত্মগর্বের পরিপ্রেক্ষিতে তার একক শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু এ দুটোর কোনোটাই ধোপে টেকে না। হয়তো অনেকে আলস্যই বাঙালির জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ধরবেন। পণ্ডিতদের চর্বিত কথা তুলে বলা যায় বাঙালির জাতীয় রক্তে কোল মুণ্ডা প্রভৃতি অস্ট্রিক ধারার স্রোতই অক্ষুণ্ণ। অস্ট্রিক জাতির একটা শাখার নাম 'ম্যুউঙ', এই 'ম্যুউঙ' থেকেই ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে আর্যভাষায় 'বঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি। ভাষার অবদানের মধ্যে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অবদান প্রায় অর্ধাংশ। যদিচ ভাষার সাহায্যে জাতিতত্ত্ব প্রকাশ করা যায় না, কারণ ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে আয়ত্ত হতে পারে, রূপান্তরিত হতে পারে, কিন্তু জাতি বংশগত পরিচয়ে শরীরের বিশেষ আকারের মধ্যেই সীমিত। বিভিন্ন জাতির মধ্যে গুণগত পার্থক্য বা শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ

করাও পণ্ডশ্রম, কতগুলি সামাজিক বিধিনিষেধের জন্যেই পার্থক্য চোখে পড়ে। এই সামাজিক অবস্থার সঙ্গে ভূপ্রকৃতিকে মেলানো যেতে পারে। প্রকৃতি মানুষের বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম সমাজপরিবেশ, বাংলাদেশের সজল শ্যামল আবহাওয়া, নদীমেখলা বাংলা প্রকৃতির বেগবান গতি, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও আত্মীয়তা বাঙালির জাতীয় চরিত্রে মধুর আর্দ্রতার বিষণ্ণ চেতনা এনে দিয়েছে, প্রকৃতির সঙ্গে এখানে সংগ্রাম বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, সমমর্মিতাই তার চেতনার প্রধান কথা, এই সঙ্গে প্রান্তিক প্রদেশের বৈচিত্র্য তার চিত্তকে বিস্ময়বিমূঢ় করেছে, উত্তরের পার্বত্য প্রদেশ, দক্ষিণের সমুদ্রগর্জিত প্রত্যন্ত, পশ্চিমের রুক্ষ ধূসরতা বাংলার প্রাণকেন্দ্রের পদ্মটিকে আরও উজ্জ্বলতর করেছে। সুতরাং পূর্ব প্রান্তের খর্ব কৃষ্ণকায় অস্ট্রিক জাতির রক্তের মধ্যে প্রকৃতির এই প্রভাব তার মনোভাবকে রূপান্তরিত করেছে, বৈশিষ্ট্য দান করেছে। অস্ট্রিকের সঙ্গেই উত্তরের ইঙ্গোমোঙ্গলোয়েড ও পশ্চিমের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মিল হয়েছে। এই তিন ধারা পরস্পরের মধ্যে প্রভাবপাত করেছে, স্বাতন্ত্র্য রচনা করে নি। পূর্বপ্রান্ত আর্যদের দ্বারা অধ্যুষিত হয় নি, অধ্যুষিত হয় নি বলেই বেদনিয়ন্ত্রিত জীবনধারা এর মধ্যে অপ্রচলিত। এখানে বর্জন নয়, গ্রহণ; তাই প্রকৃতি ও মানুষের হৃদয়ে প্রেমের যুগ্ম বেণী রচিত হয়েছে, মানুষের হৃদয়স্থিত আত্মপুরুষ বিবিক্ত নয়, নেতি নেতি করে এগোয় না, ইহজগৎ বর্জনের মধ্য দিয়ে পারমার্থিক মুক্তি খোঁজে না, সকলকে গ্রহণ ক'রে, সকলের সঙ্গে অদ্বয় অনুভূতির সাহায্যে, স্ব-সংবেদ্য বেদনার সহজানন্দের মধ্যেই পরম শান্তি, মুক্তি। সম্ভবত সব জাতীয় চৈতন্যের মধ্যেই আদিস্তরে প্রকৃতির প্রভাব অনুযায়ী কমবেশি এই চেতনা লক্ষ্য করা যাবে, কিন্তু যেহেতু বাঙালি আর্যদের দ্বারা নিন্দিত ও পরিত্যক্ত, আর্যঅধিকার এখানে বিশেষ কোন চিহ্ন মুদ্রাঙ্কিত করতে পারে নি, সেইহেতু আদি স্তরের এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তাই বাঙালি প্রেমে আবেগে করুণরসে সীমিত-সৌন্দর্যে বারংবার বিহ্বল। খ্রিস্টপূর্ব দশমনবম শতকে প্রথম আর্যআক্রমণ হয়, পরে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠপঞ্চম শতকে আর্যআক্রমণ হয়, তৃতীয় স্তরে খ্রিঃ পূঃ তৃতীয়দ্বিতীয় শতকে মৌর্য শাসনকালে আর্যদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শেষের দুই স্তরের আর্যঅধিকার যথাক্রমে অর্ধমাগধী ও মাগধী প্রাকৃতকে এক করে বাংলাদেশে মাগধী প্রাকৃতের রাষ্ট্রভাষা তৈরি করে। কিন্তু বাংলাদেশের

বৃহত্তম জনগণের মধ্যে এখানকার জাতীয় ভাষা প্রচলিত ছিল, তাকে রূপান্তরিত করা সহজসাধ্য হয় নি, এবং সেই সঙ্গে তাদের আর্যায়িত করাও সম্ভবপর হয় নি, এখানে কায়স্থব্রাহ্মণ এসে বসতি করে নি, জন্মগ্রহণ করে নি, কান্যকুব্জ থেকে জোর করে আনা হয়েছে, ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এখানকার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে দিয়েছে, আর ব্রাহ্মণ কায়স্থের ব্যাপারটাও দশমএকাদশ শতকের খুব আগে নয়। বাংলার এই যে জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যার পরিচয় মেলে চর্যাপদে, দোঁহায়, গীতগোবিন্দে। চর্যাপদের যে ধারা সে ধারাই বৈষ্ণব কবিতায় শাক্ত গীতিকায় ধরা পড়েছে, এই গীতিকবিতার পাশে আখ্যানকাব্যের মধ্যেও সেই একই বেদনার প্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামদাসের মহাভারত, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মৈমনসিংহগীতিকা, মুসলমানী কাহিনী, বাউল প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সেই একই চেতনার প্রকাশ, অথর্ববেদের মন্ত্রগুলিকে আর্যায়িত করবার জন্য যে চেষ্টা দেখা গেছে, বাঙালির এই সব কাব্যকে আর্যায়িত করবারও সেই চেষ্টা লক্ষিত হয়, হয়তো হাজার বছরের সাহিত্যে কখনো গ্রামীণ সাহিত্যকে অতিক্রম করে নাগর সভ্যতার সাহিত্য মাথা চাগিয়ে উঠবার চেষ্টা করেছে; জয়দেব, বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্র তার প্রমাণ, তবুও তার জাতীয় চরিত্রের সেই স্ব-সংবেদ্য অদ্বয় অনুভূতিজাত সহজানন্দ কখনো দূরীভূত হয় নি। হৃদয়ের অভ্যন্তরেই সমগ্র শান্তি আনন্দ অদ্বয়সুখ বিরাজ করছে, তার জন্যে বাইরে যাবার, তন্ত্রমন্ত্র শাস্ত্রের প্রয়োজন নেই; 'উজুরে উজু ছাড়ি মা জাহুরে বঙ্ক/নিয়ড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক।' এই কারণেই চিত্তশুদ্ধি প্রয়োজন, চিত্তশুদ্ধি হলেই বস্তু ও মন একাকার হয়ে যায়, নিম্নগ শক্তি উর্ধ্বে আনন্দের স্রোত বইয়ে দেয়, ভালোমন্দের বিরোধ থাকে না, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার সাহায্যে সহস্রারে উন্নীত হয়, যতক্ষণ উন্নীত হতে না পারছে, ততক্ষণই বেদনা। তাই অবিদ্যা থেকে মুক্তির জন্য চিত্তশুদ্ধির কারণে যেমন শূন্যতারূপী প্রজ্ঞার প্রয়োজন, যেমনি সকলের দুঃখে দুঃখী হবার জন্যে, সকলের অন্তরে নিজেকে অনুভব করবার জন্যে করুণার প্রয়োজন, এই শূন্যতা ও করুণার যুগ্ম স্রোতেই তো চর্যাপদের অদ্বয়সুখ। এই হলেই তো আবার অন্তরস্থিত যোগিনীর মুখ চুম্বনে কমলরস পান করি, এবং এই অন্তরস্থিত যোগিনীই তো বিশ্বচরাচরের সর্বভূতে ও বস্তুতে বিলসিত। এই

দেহস্থ ও বহিরস্থ শক্তির পূর্ণ মিলনেই পরিপূর্ণ আনন্দ : 'জোইনি তঁই বিনু খনহিঁন জীবমি/তো মুহ চুম্বি কমলরস পীবমি।' মধ্বাচার্য বল্লভাচার্য যতো তত্ত্ব কথাই স্বরূপশক্তি রাধিকা সম্বন্ধে বলুন না কেন, রাধার মধ্যে মর্ত্য প্রেমের সকল আকর্ষণ পুঞ্জীভূত রয়েছে, পুঞ্জীভূত বেদনার সকল কিছু নিয়েই রাধা তার অন্তরস্থ কৃষ্ণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছে, এ কৃষ্ণ বাইরে নেই, অন্তরস্থ বেদনার মধ্যেই রয়েছে, যাকে পেলে বিশ্বকে পাওয়া যায়, 'সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার/হরিরহ মানস সুরধুনি পার।' তাই জন্যে দুর্গম পথে তার যাত্রা, এই যাত্রার যে পরিণতি যে আনন্দ, তা চর্যাপদের মহাসুখের পরম আনন্দ, 'জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ/দশাদিশ ভেলা নিরদন্দা/আজু মঝু গেহ গেহ করে মানলুঁ/আজু মঝু দেহ ভেলা দেহা।' তখন রূপের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না, প্রতি রূপের মধ্যে নিজেকে দেখতে পাওয়া যায়, এই দেখতে পাওয়াই অদ্বয় বা বিশ্বানুভূতি। শাক্তগীতিকায়ও এই বিশ্বানুভূতিই গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে, জগৎকে ভালোবাসলেই মাকে ভালোবাসা হয়, মাকে ভালোবাসা হলেই জগৎকে ভালোবাসা হয় : 'ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি, জেনেও কি জাননা/মাটির মূর্তি গড়িয়ে মন করতে চাও তার উপাসনা।' এই চিত্তশুদ্ধির জন্যে হৃদয়কেই অবলম্বন করতে হয়। বাঙালি চরিত্রের মধ্যে এই তান্ত্রিকসুলভ হৃদয়ানন্দ একটা বিশেষ ধারা সৃষ্টি করেছে। ভারতচন্দ্র যতোই রাজসভার বিদ্যা ও বুদ্ধি এবং রাজার চাটুকারি করুন, যখন সাহিত্যিক হিসেবে বাঙালির চিত্র আঁকছেন, তখন তাঁর মধ্যে এই অদ্বয় অনুভূতিই সক্রিয়, সেখানে ঈশ্বরী পাটনি রাজ-ঐশ্বর্য ধনদৌলত কিছুই চায় না, স্নেহপ্রেমের বন্ধনে সকলের মধ্যে আপন হৃদয়ের মুক্তিই তার কাম্য।

এই যে হৃদয়ের পরম শান্তি, অদ্বয় অনুভূতি, তা শান্তিবাদী প্রাগার্য দ্রাবিড়দের মধ্যেও ছিল, তাই যুদ্ধনিপুণ জাতিরা এখানে সহজে অধিকার স্থাপন করেছে। ভারতীয় ঐতিহ্যে বিদেশাগত জাতিরাও যখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, তখন নূতন যোদ্ধজাতি এসেছে। এই কারণেই ভারতের বুকে আর্য অধিকারের পরেও গ্রীক, ব্যাকৃট্রিয়া, আর্থিয়ান, শক, কুষাণ, হুণ, আরব, তুর্কি, আফগান, পার্সি, পাঠান, মোগল, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, ফরাশি, ইংরেজ সহজে এসেছে, অধিকার করেছে, শাসন করেছে, আর আমাদের বিশ্বজনীন

শান্তির আদর্শজনিত হৃদয়ের এই দুর্বলতার জন্যেই হয়তো আজও ভারতকে গ্রাস করবার জন্যে সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

বাঙালির সংস্কৃতির ঐতিহ্যে বর্তমানে তিনটি ধারা এসে মিলেছে, অনার্য সভ্যতা থেকে একান্ত নিজস্ব রূপ, ভারতীয় সংস্কৃতি, যা বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে রয়েছে, তৃতীয়ত পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি। এই তিনটির কোনোটাকেই আজ বর্জন করা সম্ভব নয়। অস্ট্রিক জাতির মনোভঙ্গির এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লিরিকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই লিরিকেই বাঙালির শ্রেষ্ঠত্ব, উনবিংশ শতাব্দীতে রোমান্টিক কাব্যের প্রভাবে এই রোমান্টিক চেতনা আরও তীব্র বেগ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যার সর্বোচ্চ পরিণতি। রবীন্দ্রনাথ যে শ্রেষ্ঠ কবি তার একমাত্র কারণ এই নয় যে তিনি সর্বপ্রকার অনুভূতিকে বাণীরূপ দান করেছেন, ভারতীয় জাতীয় ঐতিহ্যের সমগ্র ধারণাকে স্বীকার করেছেন, ভারতের ও পশ্চিমের মিলন ঘটিয়েছেন, কিন্তু যেখানে তিনি অবিসংবাদিত কবি সেখানে বাঙালির জাতীয় চৈতন্যই গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে : 'আমি কান পেতে রই আমার আপন হৃদয়গহন-দ্বারে/কোন্ গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে /ভ্রমর সেথা হয় বিবাগি নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে।' মধুসূদনের রাবণের ট্রাজিক বেদনার মধ্যে যে জিনিসটা কাজ করেছে, তা হচ্ছে পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে স্নেহ প্রেম ভালোবাসার বন্ধন, এগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন বলেই তাঁর কান্না চরমে উঠেছে, মহাকাব্যের শেষ সর্গে ইন্দ্রজিৎকে চিতায় তুলে দেবার ও প্রমীলার চিতারোহণের পর রাবণ কান্নায় ভেঙে পড়েছেন : 'হায়রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে/শূন্য লঙ্কাধামে আর, কি সান্ত্বনাচ্ছলে/সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ? / 'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার ?' শুধিবে / যবে রানী মন্দোদরী—'কি সুখে আইলে / রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষকুলপতি ?' / কি কয়ে বুঝাব তারে ? হায় রে কি কয়ে ?' এ কান্না আসক্তির প্রেমের ভালোবাসার, পারিবারিক বন্ধনের, যার মধ্য দিয়েই বাঙালি তার মানসমুক্তি চেয়েছে। অথচ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘর্ষে দারুণ দ্বন্দ্ব জাগছে। পয়ারকে ভেঙে যেমন তিনি অমিতাক্ষর করেছেন, তার মধ্যে নূতন ছন্দঝঙ্কার এনেছেন, যতিছেদের বৈচিত্র্য এনেছেন, ভাবের দোলা দিয়েছেন, তেমনি মধুসূদন জাতীয় চৈতন্যকে গ্রহণ করেই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘর্ষে তার বেদনাময় রূপটি

আমাদের কাছে ফুটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও এমনিভাবে ঐতিহ্যকে স্বীকার করে ভাষাছন্দেচিত্রে তাকে নিত্য নতুন রূপ দিয়েছেন। জীবনানন্দ এই ঐতিহ্যকে ধরবার চেষ্টা করেছেন 'রূপসী বাংলা'র ধ্যানে। বোদ্‌লেয়ার প্রকৃতিকে অচেতন বলেছেন বলেই চৈতন্যময় বাংলার চিত্রপদ্মকে অনাধুনিক বলতে হবে, এর কোনো যুক্তি নেই। অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যেও রবীন্দ্রসৃত সেই ধারা, পঞ্চাশের দশক থেকে বিষ্ণু দে পুরোপুরি এই চৈতন্যে একান্ত নিমজ্জিত। সুধীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব প্রসঙ্গে একথা হলফ করে বলা যাচ্ছে না। হয়তো ক্ষণবাদী বৌদ্ধদের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের একটা ভারতীয় ঐতিহ্যগত মিল আছে। চল্লিশের পঞ্চাশের ষাটের কবিরা যদি এঁদেরকে স্বীকার করেই এগিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁরা এই ঐতিহ্যের স্রোতেই অবগাহন করেছেন, এর মধ্যে সচেতনভাবে চল্লিশের হরপ্রসাদ মিত্র, পঞ্চাশের আলোকরঞ্জন ও শঙ্খ ঘোষ এই ঐতিহ্যে পরম বিশ্বাসী। বাঙালি, ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য এই তিনটি ঐতিহ্যই এখন আমাদের বাংলা কাব্যে ও সংস্কৃতির মধ্যে নিবিড়ভাবে জড়িত। যেহেতু বিশেষ মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আমাকে কথা কইতে হয়, সেই মাটির উপযোগিতা অনুযায়ী ওই তুটি ধারা সামঞ্জস্যে সাধিত হয়েছে কিনা তার বিচার করা কর্তব্য। তবে এও ঠিক, কালে চৈতন্যেরও পরিবর্তন ঘটে, হয়তো তখন মানসিকতা অনুযায়ী বাঙালির চেয়ে ভারতীয় বা পাশ্চাত্ত্য তুটির যে কোনো একটি প্রাধান্য পেতে পারে। আর জোর করে ঐতিহ্যকে প্রচার করতে গিয়ে অকবিতা সৃষ্টির কোন মানে হয় না। কিন্তু সর্বদেশের সর্বকালের মানব-ঐতিহ্যের যে ধারাটি সবচেয়ে ফলপ্রসূ, সেটি হলো জগৎ ও মানবের প্রতি ভালোবাসা ও প্রেম[1], সেই ধারাটির সূত্রপাত বাঙালির আদি সাহিত্যে, সেখানেই এর ঐতিহ্য, এই ঐতিহ্য অক্ষয়, অব্যয় : 'পরউআর ণ কিঅউ অত্থি ণ দীঅউ দাণ / এহু সংসারে কবণ ফলু বরু ছড্ডহু অপ্পাণ।' অর্থাৎ পরের উপকার করা হয় না, অর্থীকেও দান দেওয়া হয় না, এমন সংসারে কিবা ফল, বরং নিজেকে ছাড়ো। এই আত্মবিসর্জন বা আত্মপ্রসারণেই বাঙালির মুক্তি ॥

১. ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে সুন্দরভাবে সমান হৃদয়ের ও মনের সুহাস ব্যক্ত হয়েছে :

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।

চিত্রকল্প, চিত্রকল্প ও চিত্রকল্প

১.

উপমাতেই কবিত্ব[১] কিনা জানি না, কিন্তু আজকের যুগে ইমেজেই কবিতা, এবং ইমেজেই কবিত্ব, কখনো কবিতার কয়েকটি পঙক্তির টুকরো ছবিতে, কখনো সব মিলে পরিপূর্ণ একটি কবিতাতে ইমেজ বা চিত্রকল্প স্পষ্ট ফুটে ওঠে। ভালেরির ভাষায় মিথ্ হচ্ছে এমন একটি বস্তু, ভাষার ভিত্তিতে এর মধ্যে সব কিছু রয়েছে, আমরা মিথ্-এর মধ্যে রয়েছি, এবং অনবরত 'মিথ্' তৈরি করছি। কবিরা ভাষার সাহায্যে যে-কবিতা তৈরি করেন, তা 'মিথ্' ছাড়া কিছু নয়, ঘটনা কিভাবে স্বপ্নে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই মিথের সঙ্গে ইমেজের মিল রয়েছে। মিথের মধ্যে যেমন স্বপ্নের গোপন অর্থের তাৎপর্য, সঙ্কেতের রহস্যময় ব্যঞ্জনা, অসীম ও নিবিড়তায় চিত্তের নবীন আবিষ্কারের দিগন্ত প্রসার, একটা ঐক্যধর্মী প্যাটার্নকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, ইমেজের মধ্যেও এই গুণগুলি বিদ্যমান। মিথের সঙ্গে কবিতার পার্থক্য যেমন কম, তেমনি মিথের সঙ্গে ইমেজের স্বধর্মও লক্ষণীয়।

ইমেজ-বাক্‌প্রতিমা নয়,[২] প্রতিমার স্পষ্টতা ইমেজে না-ও থাকতে পারে, 'রূপকল্প' বা 'চিত্রকল্প' অর্থাৎ চিত্র এবং চিত্রের মতো, মতোটা এসেছে মনের যোগে, চিত্রে যেমন রঙ ও রেখায় বিভিন্ন রূপ, ইমেজের মধ্যেও বিভিন্ন রূপ স্ফুটমান। ইমেজ হচ্ছে একটি শব্দ, এই শব্দ সংবেদনময় অনুভবের আইডিয়া জাগিয়ে তোলে। তাই সে কবির অভিজ্ঞতার প্যাটার্ন হয়ে ওঠে।

ইমেজকে দার্শনিকতার দিক থেকে বিচার করলে এর মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। দর্পণ-চিত্রকল্প, পরবর্তী-চিত্রকল্প, স্মৃতি-চিত্রকল্প, কল্পনা-চিত্রকল্প (mirror-image, after-image, memory-image, imagination-images) দর্পণ-চিত্রকল্প দর্শনেন্দ্রিয়ের ব্যাপার বলে মনে হয়, এই দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্যে শুধু বস্তু নয়, বস্তুর ঘটনা সক্রিয়, প্রবহমানতা বর্তমান, চোখের সাহায্যেই স্পর্শকে সে লাভ করতে পারে। কিন্তু অন্ধ ব্যক্তিও স্পর্শ এবং শ্রবণে বস্তুর অস্তিত্বের সঙ্গে প্রবহমানতা জানতে পারে, তবু দুয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য থেকে যায়, কারণ চোখের দর্শন আর মনের দর্শন এক নয়। পরবর্তী-চিত্রকল্প

হচ্ছে সেই বস্তু যাকে বর্ণনায় বোঝানো যায়, অন্ধ ব্যক্তি মাথা থেকে টুপি খুলে নেবার পরও তার মনে হয় মাথায় টুপি আছে, সুতরাং বিশিষ্ট স্থানের পরবর্তী সংবেদনা সক্রিয়, মানসিক চিত্রকল্পের মতো স্থায়ী নয়, সহজেই অস্তিত্বের সংবেদনা হারিয়ে যায়, দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেও এই পরবর্তী সংবেদনা চোখ বুজলে হারিয়ে যায়। হারিয়ে যাবার পর মনে হয় এ যেন ছিল। কল্পনা-চিত্রকল্প পরবর্তী-চিত্রকল্পের মতো প্রত্যক্ষ বস্তুতে উপস্থিত নয়। আমি যে-কোনো বস্তুর ছবির কল্পনা করি এবং ছবি আসে। এই আবির্ভাব নিয়ত অস্তিত্বের জন্যে আমাকে চেষ্টা করতে হয়। এই ছবির মধ্যে শব্দ বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এই শব্দগুলি আবির্ভূত অনুভবের জন্ম দেয় এবং প্রকৃত অনুভবকে জাগিয়ে তোলে। অন্ধ লোকও অনুভবে কল্পনার চিত্রকল্প জানতে পারে, কিন্তু প্রকৃত অনুভবের স্থানিকতায় তার কল্পনা চিত্রকল্পকে নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির রাখতে পারে না, হাতের অনুভবে স্থানের অনুভব ঘটে, স্থানের অনুভবের সঙ্গে অনুমানে অন্য বস্তুর সাদৃশ্য কল্পনা করে একটা সামগ্রিকতা বোধের কাজ করে। তবে এ কথাও ঠিক যে দৃষ্টিশক্তিবান লোক চোখের দেখায় এতো অভ্যস্ত যে সে স্পষ্ট স্পর্শেন্দ্রিয় অনুভব করতে পারে না, এমন কি অন্য ইন্দ্রিয়সংবেদনাও তার চোখের দৃষ্টির কাছে হারিয়ে যায়, এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের ঘন নিবিড়তার জন্যে আমাদের সমস্ত অঙ্গের সংবেদনা একই সঙ্গে ঘটতে থাকে, যা দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্যে হতে পারে না, এই বিভিন্ন অঙ্গের পার্থক্য তার কাছে যতোটা স্পষ্ট, দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছে ততোটা নয়। স্বপ্ন-চিত্রকল্পের মধ্যে আমাদের চারিদিকের বিষয়ের সম্পর্ক স্থিরীকৃত নয়। এই বিষয় সম্বন্ধে আমাদের সামান্য জ্ঞানই আছে। কিন্তু স্বপ্ন-চিত্রকল্পের মধ্যে প্রত্যক্ষ বস্তু নির্ধারিত, অর্থাৎ আমি কোথায় আছি বা ছিলাম জানি। শুধু যাত্রার কল্পনা করি না। হিউম বলেন, আমাদের কল্পনার আলস্যই স্বপ্ন ও রিয়্যালিটির পার্থক্যকে নিবৃত্ত করে। মায়া-চিত্রকল্প (hallucination image) ভূতের আবির্ভাব অথবা মদ খেলে যে বিভ্রান্তি জাগে—এই বিভ্রান্তির চিত্রকল্পই মায়া-চিত্রকল্প, এও স্থানে নির্দিষ্ট, চোখের স্পষ্ট দেখায় সংযুক্ত নয়। দর্শকের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, বস্তুজগতের সঙ্গে যোগও কম। অন্ধ লোকও ধ্বনি ও স্পর্শে এই মায়া-চিত্রকল্প অভিজ্ঞতায় লাভ করতে পারে। এই বিভ্রান্তির চিত্রকল্প একটা অর্থকেও জাগায়, সংবেদনা নয়, সুতরাং চিত্রকল্প বলেই গণ্য। একথা অনস্বীকার্য

ওপরের সব চিত্রকল্পের মধ্যেই চিত্রকল্পের প্রত্যক্ষ বৈশিষ্ট্য নেই, কিন্তু এই চিত্রকল্পগুলি পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। দর্শকের বিষয়বস্তু এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। স্থান কাল ও ব্যক্তির একান্ত নির্জনতা জড়িয়ে আছে। চিত্রকল্প ছাড়া আমরা ভাবতেই পারি না। দর্শনের বিচারে সাহিত্যের চিত্রকল্প তুলনায় সংযুক্ত। মানসিক চিত্রকল্প নয়, একান্তই বাস্তব। কল্পনার ভেতরে নয়, কল্পনার সাহায্যে কবিশিল্পীরা চিত্রকল্প তৈরি করেন। অন্য একপ্রকার চিত্রকল্প হচ্ছে শুধু ধারণাকে জাগায়। কিন্তু সাহিত্যের চিত্রকল্পের মধ্যেও মানসিকতা কাজ করে, কল্পনার শক্তি যদি নতুন আবিষ্কার হয়, মৌলিক উৎসের আবির্ভাব ঘটায়, তাহলে মনের সঙ্গে এর যোগ না থেকে পারে না। দর্শনের চিত্রকল্পও সাহিত্যের চিত্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এবং সাহিত্যের চিত্রকল্প শুধু তুলনাই করে না, দুই রিয়্যালিটির বিন্যাসে ছবি ফুটে ওঠে।

তবে প্রত্যক্ষত এটাই সত্য সাহিত্যের চিত্রকল্পে ভাষার সাহায্যে মনে ছবি ফুটে ওঠে, এই ছবির মধ্যে কবির অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধির সঙ্গে পাঠকের উপলব্ধির সংযোগ ঘটে, যদি কবির অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা এক হয়, তাহলে sense-impression একই হবে, বরং দুয়ে মিলে আরো নিবিড় হবে। চিত্রকল্পের মধ্যে কবির আত্মিক স্বজ্ঞাজাত আইডিয়া গোপনভাবে বীজের মতো কাজ করছে, এবং আইডিয়ার বীজ প্রকাশ পাচ্ছে ইন্দ্রিয়ঘন সংবেদনায়, এবং আইডিয়া থেকে আহৃত ইন্দ্রিয়ঘন সংবেদনার চিত্র চিত্রকল্পে চিন্তায় রূপান্তরিত হয়। যখন চিত্রকল্পের মধ্যে চিন্তা অর্থ ও সংবেদনময় ছবি একত্র মিশে যায় কবির আত্মিক স্বজ্ঞার সংযোগে, তখনই ম্যাক্‌লিশের ভাষায় কবিতা অর্থ প্রকাশ করে না, হয় : A poem should not mean/But be. এই কারণেই চিত্রকল্প শুধু অনুভূতি প্রকাশের নিবিড়তা আনে না, সংক্ষিপ্ত উপায়ে সাধারণ চিন্তার প্রকাশ ঘটায় না, সব ছাড়িয়ে একটা সামগ্রিকবোধের রহস্য সমস্ত কবিতার মধ্যে সঞ্চারিত করে দেয়। মূর্ত-অমূর্ত, বিষয়ের নিবিড়তা, অস্পষ্টতা, কবিতার বিভিন্ন স্তবক ও পঙক্তি, অনুষঙ্গ ও ব্যঞ্জনার সাহায্যে একটা পরিবেশ রচনা করে, এই সামগ্রিক পরিবেশ থেকেই ইমোশন জাগে।

শেলি এই চিত্রকল্পের মধ্যে বস্তুর স্থায়ী সাদৃশ্যের উন্মোচন দেখেছেন, তার ফলেই চিত্রকল্প জীবনসত্যে অংশীদার হয়। এই স্থায়ী সাদৃশ্য থেকেই গুপ্তসাদৃশ্যের কথা কোনো কোনো আলোচক বলেছেন, এই গোপন সাদৃশ্যই

চিত্রকল্পের রূপে প্রকাশ পায় এবং এই সাদৃশ্যের ধারণা থেকেই উপমার সঙ্গে চিত্রকল্পের যোগের কথা অনেকে বলেছেন, কারণ উপমার[৩] মধ্যে চিত্রধর্মিতা সবচেয়ে বেশি। যেহেতু চিত্রকেই কবিরা প্রকাশ করতে চান, সেইহেতু উপমা তাঁদের কাব্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত, এ্যারিস্টটলও মেটাফর বা লুপ্ত উপমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি বলেছেন ; প্রকৃত কবিপ্রতিভাই বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের স্বজ্ঞাজাত ধারণাকে নিয়োজিত করতে পারেন। এবং এই পথেই মিডল্‌টন্ মারি মেটাফরের আলোচনায় ইন্‌স্টিংক্ট বা সহজ-প্রবৃত্তিকে প্রধান হিসেবে গণ্য করেছেন, এবং এর সাহায্যেই রিয়্যালিটিকে সে আবিষ্কার করে, অভিজ্ঞতাকে বিন্যস্ত করে। একটা অস্পষ্ট রহস্যে ও উন্নত অবস্থার আত্মিক সচেতনতায় উপমা আমাদের নিয়ে যায়। এবং স্পার্জ্যন সম্ভবত এই পথ ধরেই চিত্রকল্প সম্বন্ধে এরকম একটা কথা বলতে চেয়েছেন যে[৪] চিত্রকল্প শব্দে সমস্ত সিমিলি এমন কি মেটাফর পর্যন্ত ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ চিত্রকল্প উপমারই নামান্তর। কিন্তু মারি এ সত্য স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি যে চিত্রকল্পকে যদি কল্পনা শক্তির শক্তিশালী উপায়স্বরূপ ধারণা করা যায়, তাহলে উপমা অর্থাৎ মেটাফর ও সিমিলি থেকে অনেক মূল্যবান হয়ে ওঠে, ব্যাপকতর স্থান গ্রহণ করে, যদিচ চিত্রকল্পের মধ্যে সিমিলি ও মেটাফর মৌলিক একাত্মে বিন্যস্ত। ফার্‌লঙের ভাষায় বলা যায়, কল্পনার সঙ্গে চিত্রকল্প যুক্ত হলে নবীন আবিষ্কারের শক্তি এবং মৌলিকতার উৎস বেরিয়ে আসে, কারণ কল্পনা বস্তুর মধ্যে মুক্তি আনে, তীব্র অনুভূতির বৈচিত্র্য আনে, পরিব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে আসে। তাই লুইস্ চিত্রকল্পের মধ্যে সাদৃশ্যগত চিত্রের সংঘর্ষ ও টেন্‌সনের বদলে উষ্ণতা ও আলোক অনুভব করতে পেরেছেন এবং দেখতে পেয়েছেন। সুতরাং তিন রকম চিত্রকল্পকে পাচ্ছি। (১) মানসিক চিত্রকল্প (২) অলংকারধর্মী চিত্রকল্প (৩) চিত্রকল্পের প্যাটার্ন, যে প্যাটার্নের মধ্যে সাঙ্কেতিক কবিদৃষ্টির রূপময় প্রকাশ ঘটে এবং কবির চেতনায়ই এটা ঘটতে পারে। এই চিত্রকল্পগুলিকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন বিভাগে বিন্যস্ত করতে পারা যায়, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শ, জৈব (যেমন হৃদ্‌স্পন্দনের সচেতনতা, শ্বাসকষ্ট) কাইনেস্থেটিক (পেশীর টেন্‌সন ও গতি) কাব্যে বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কখনো থাকে, কখনো একসঙ্গে থাকে, কখনো পরস্পর মিশে যায়, একটি ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের

স্থান গ্রহণ করে, রূপান্তরিত হয়, যার ফলে সিনেস্থেসিয়া ঘটে, যেমন 'বেদনার গন্ধ'। এছাড়া একই রকম ভাব ও ভাবনাকে প্রকাশ করবার জন্যে যদি বিভিন্ন চিত্রকল্পের সমাহার ঘটে তাহলে তা হবে পুঞ্জিত চিত্রকল্প (Image-cluster). আর বিশেষ চিত্রকল্পের বিশেষ সংবেদনা যদি অন্য চিত্রকল্পের অপর সংবেদনায় ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যেতে যেতে একটা শৃঙ্খলার ঐক্য তৈরি করে, তাহলে এটা হবে শৃঙ্খলা চিত্রকল্প (Chain imagery).

রবিন স্কেল্‌টন তাঁর 'দি পয়েটিক প্যাটার্ন' বইয়ে চিত্রকল্পের বহু শ্রেণীভাগ করেছেন। বিভিন্ন অর্থকে সুস্পষ্ট করেছেন চিত্রকল্পের ব্যাখ্যায়। ১. সাধারণ চিত্রকল্প : একটি মাত্র শব্দ যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধারণার আইডিয়াকে জাগিয়ে তোলে, যেমন ঠাণ্ডা, উজ্জ্বল, শক্ত, হাত, বাড়ি ইত্যাদি। ২. বিমূর্ত চিত্রকল্প : একটা শব্দ যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধারণার কোনো আইডিয়া জাগায় না, যেমন সত্য, ন্যায়, জ্ঞানী। ৩. অব্যবহিত চিত্রকল্প : একটা চিত্রকল্প মূলত স্পর্শ ধ্বনি দৃশ্য গন্ধ ও স্বাদের আইডিয়া জাগাতে ব্যস্ত, যেমন হলদে, উচ্চকিত, এ্যাসিড। ৪. ছড়ানো বা বিস্তৃত চিত্রকল্প : একটা চিত্রকল্প অপ্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়কে চেতিয়ে তোলে, অথবা কোনো বিশেষ ইন্দ্রিয়ে সীমাবদ্ধ নয়, আলস্য, বিদায়, উৎসাহ, ক্লান্তি। ৫. বিমূর্ত চিত্রকল্প : একটা বিমূর্ততা ইন্দ্রিয়গত আইডিয়ার ধারণা জাগাতে চেষ্টা করে। যেমন সমাসোক্তি, সত্য, দয়া, প্রেম, ন্যায়। ৬. মিলিত চিত্রকল্প : শব্দ সমূহের সমাবেশে একটি প্রকৃত চিত্রকল্প ধরে রাখে। নিখুঁত ছুরি, লাল বিপ্লব। ৭. জটিল চিত্রকল্প : শব্দসমূহের সমাবেশে একটি প্রকৃত চিত্রকল্পের চেয়েও অনেকগুলি চিত্রকল্প ধরে রাখে, সোনালি ডাফোডিল, তিক্ত অন্ন। ৮. সম্মিলিত বিমূর্ত চিত্রকল্প : শব্দসমূহের সমাবেশে একটি বিমূর্ত চিত্রকল্প ধরে রাখে, কোনো প্রকৃত চিত্রকল্প নয়, যেমন, মহান সত্য, প্রকৃত দয়া। ৯. জটিল বিমূর্ত চিত্রকল্প : শব্দসমূহের সমাবেশে একটির চেয়ে বেশি বিমূর্ত চিত্রকল্প ধরে রাখে এবং কোনো প্রকৃত চিত্রকল্প নয়, বিশ্বস্ত বদান্যতা, আন্তরিক প্রেম। ১০. বিমূর্ত সম্মিলিত এবং বিমূর্ত জটিল চিত্রকল্প : একটি জটিল বা সম্মিলিত চিত্রকল্প, যার মধ্যে চিত্রকল্পের চেয়ে বিমূর্ততা বিশেষিত হয়, সোনালি বিশুদ্ধতা, ঠাণ্ডা পবিত্র।

সুতরাং চিত্রকল্পের তিনটি কাজ : সঙ্কেত, মেটাফর ও সিমিলি। 'যেন''মত' শব্দ ব্যবহারে তুলনার নামই সিমিলি বা বাচ্য উৎপ্রেক্ষা, দুই বিসদৃশ বস্তুর

সাদৃশ্যের একত্র মিলন যেখানে ঘটে, অর্থাৎ যেখানে উপমেয় ছাড়া অন্য তুলনা-বাচক সাধারণ ধর্ম বা উপমান লুপ্ত থাকে, তাকে মেটাফর বা লুপ্তোপমা বলা যায়, সাদৃশ্যের মধ্যেও উপমেয় অর্থাৎ প্রকৃত বস্তুর বর্ণনা প্রাধান্য পায় বলে চিত্রকল্পের রিয়্যালিটির সঙ্গে এর সাদৃশ্য অনেকে লক্ষ্য করেছেন। রূপক চিত্রকল্প কবিতায় আপাত স্বাধীন মনে হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কন্‌সেপ্ট বা ধারণা এবং আইডিয়ার সঙ্গে একাত্ম। সঙ্কেতকল্প চিত্রকল্প (Emblematic Image) কবিতায় এর চিত্রকল্প স্বাধীন মনে হলেও, কন্‌সেপ্ট ও আইডিয়ার সঙ্গে প্রকৃত তুলনার ওপর একান্ত নির্ভরশীল। নকল (Transcript) এই চিত্রকল্পের মধ্যে অনুষঙ্গের মূল্য প্রচুর, বহু অর্থ এর মধ্যে জড়িয়ে আছে, এই অর্থে অনেক সময় স্বাধীন, তবুও একটি মাত্র মৌলিক তাৎপর্যেই এর লক্ষণা সুস্পষ্ট। চিহ্নের মধ্যে সাঙ্কেতিক মূল্য আছে, তবে কবিতায় অধীনস্থ হয়ে হয়ে থাকে। কিন্তু কবিতায় সঙ্কেতই হচ্ছে চিত্রকল্পে প্রধান বস্তু, সঙ্কেতের মধ্যে যে চিত্রকল্প ফুটে ওঠে, অনুষঙ্গের মূল্য ও বহু বিচিত্র অর্থের বিস্তার অত্যন্ত বেশি, এবং এগুলি কারো ওপর নির্ভর করে না, তুলনায় নয়, সমীকরণ-জাত একাত্মতায় নয়, কন্‌সেপ্ট বা আইডিয়ার সঙ্গে নয়, নিজের গুণের মধ্যেই বিদ্যমান, অর্থের সীমাও অনুষঙ্গে উধাও হয়ে যায়, স্বরূপে একাত্মতাই হলো এর প্রধান বিষয়, শুধু আইডিয়ার অনুষঙ্গে, বিশেষ ব্যবহারের রীতিতে, স্বীকৃত ঐক্য সম্পর্কের একত্র সমাবেশে সঙ্কেতের বিষয়বস্তু চেনা যায়। সঙ্কেত স্বাধীন ও মুক্ত, শুধু চেতিয়ে তোলে। কবিতায় চিত্রকল্প যদি পৃথক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে এবং সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে ব্যবহৃত হয়, তাহলেই এই চিত্রকল্প সঙ্কেত হয়। সঙ্কেত কখনো বিমূর্ত চিত্রকল্প হতে পারে না, বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না, আরোপিত নৈতিক তাৎপর্যও আনতে পারে না। বহুবিধ অর্থ ও বিচিত্র অনুষঙ্গ এর মধ্যে জড়িয়ে থাকে, এবং সঙ্কেতের সার্থকতা নির্ভর করবে পাঠকের মনে কতখানি এই বহু বিচিত্র অনুভূতি ও অনুষঙ্গ জাগাতে পারে, রহস্যের স্তরে নিয়ে যেতে পারে। কারণ কবি ও পাঠক দুয়েরই সামগ্রিক মন কাজ করে। সুতরাং প্রত্যেক অলংকার ও চিহ্নই ছবি, কিন্তু ছবি যখন সঙ্কেতের স্তরে গিয়ে পৌছয়, সাদৃশ্য তুলনা রূপকের বুদ্ধির সীমা ছাড়িয়ে যায় কবির মনের বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে, আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশ যখন আত্মো-পলব্ধিতে গিয়ে পৌছয়, তখনই চিত্রকল্পে সঙ্কেতের সামগ্রিকতা দেখতে পাওয়া

যায়। স্কেল্‌টন বলেন যে বাচ্য উৎপ্রেক্ষা থেকে সঙ্কেতে, ফ্যান্সি থেকে কল্পনায় ও কবিদৃষ্টিতে পৌঁছলেই চিত্রকল্প সার্থক হয়ে ওঠে। বিশুদ্ধ অনুপ্রেরণায় এর উৎপত্তি, কবির অবচেতনে এর তাৎপর্য নিহিত। তাই সর্বব্যাপক। মারির সঙ্গে এই বক্তব্যের তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

২.

সংজ্ঞা, শ্রেণীভাগ ও উৎপত্তির পরই পাঠকের তরফ থেকে চিত্রকল্পের প্রতিক্রিয়া কিভাবে ঘটে তা জানা আবশ্যক। কবির চৈতন্যে কল্পনার রঙে বস্তুজগতের রিয়্যালিটির একটা প্যাটার্ন গড়ে ওঠে, এই প্যাটার্নকে প্রকাশ করে চিত্রকল্প, সুতরাং চিত্রকল্প একটা রূপ, কিন্তু এই রূপের মধ্য দিয়ে কবির সমগ্র চৈতন্য এবং কল্পনাশক্তির সামগ্রিকতা প্রকাশ পায়। তাই পাঠক চিত্রকল্পের মধ্যে লুইসের ভাষায় সতেজতা লাভ করে, এই সতেজতা আসে অভিনব ভাষার প্রকাশে ; তার সঙ্গে নিবিড়তা, শিল্পসৃষ্টির প্রধান গুণই হলো নিটোল সংহতি এবং সর্বোপরি পাঠকের মনের মধ্যে নূতন ভাবের জাগরণ। সতেজতা ও নিটোলতা থেকেই এই রহস্যময় ব্যক্তিক জাগরণ ঘটে। কবির চৈতন্য যেমন প্রসারিত চিত্রকল্পে, পাঠকের অভিজ্ঞতা ও সেন্সিবিলিটিও প্রসারিত হয় এই চিত্রকল্পের সংবেদন অনুভবে। তাই তার অভিজ্ঞতার অনুভব জটিল, সমৃদ্ধ, প্রত্যক্ষ অস্পষ্ট, রহস্যময়, ব্যাঙ্গাত্মক, সঙ্কেতময়, মিথ্‌যুক্ত, ঘনইন্দ্রিয়ময়, ঐক্য-সমন্বিত ও সামগ্রিক হয়ে ওঠে। রিচার্ডসের ভাষায় বলা চলে এতে আমাদের ইম্‌পাল্‌স ও এ্যাটিচুডের একটা সমতা প্রাপ্তি ঘটে। কবির চিত্রকল্পের মৌলিক ও সতেজগুণে একটা আন্তরিকতার স্পর্শ পাঠককে অভিভূত করে, আমরা এর ব্যাখ্যা করতে পারি না, উপলব্ধি করি, উপলব্ধিটাই কবিতার ক্ষেত্রে চরম বস্তু। পাঠকের কাছে চিত্রকল্প কবির বিষয়বস্তু উজ্জ্বল করে, তাঁর মেজাজ প্রকাশ করে, লেখকের চিন্তা মূর্তিময় হয়ে ওঠে, পাঠকের ইচ্ছা ও প্রবণতাকে চালিত করে এবং পাঠকের প্রত্যাশাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং কবি যা প্রকাশ করতে চান সাদৃশ্যে সঙ্কেতময় অর্থে স্থানকালবস্তুর ঘটনার সমাবেশে, চিত্রকল্পেই তা সার্থক হয়ে ওঠে। পঙক্তির চিত্রকল্পগুলি একটা কবিতার সামগ্রিক চিত্রকল্পের অংশ, কিন্তু অংশগুলির জৈব ও সুসমঞ্জস সমন্বয়ই সামগ্রিক ঐক্যকে টেনে আনে। একই চিত্রকল্পের বা শব্দের পুনরাবৃত্তি তাৎপর্য বহন

করে, অথবা একই কাব্যে বিভিন্ন প্রকার চিত্রকল্প ব্যবহৃত হলে পরস্পরকে সম্পর্কান্বিত করে ; যেমন, 'পড়ো জমি'। এমনিভাবে চিত্রকল্প শুধু কবির চিন্তা অনুভূতি বিষয়কে প্রকাশ করে না, সমগ্র শিল্পের তাৎপর্য প্রকাশ করে, মিথ্‌কে উদ্দীপ্ত করে, কিন্তু তাঁর নিজের চৈতন্যের দ্বারা স্বাতন্ত্র্য পায়। স্বপ্ন যদি ব্যক্তিগত মিথ্‌ হয়, মিথ্‌ একটা জাতির স্বপ্ন। সুতরাং চিত্রকল্প যদি মিথের তাৎপর্য সঙ্কেত প্রকাশ করে, তাহলে সমগ্র জাতির স্বপ্নবাসনার সঙ্গে পাঠকের মিলন ঘটে।

চিত্রকল্পই পাঠককে নিশ্চিত করে লেখকের স্বাতন্ত্র্য ব্যাপারে, কবিতার নীচে লেখকের নাম যদি নাও থাকে, চিত্রকল্পই বোঝাতে পারে এটা কোন্‌ লেখকের, কবির অভিজ্ঞতামর্জিরুচিও ধরা পড়ে, চিত্রকল্পের সাহায্যেই কোনো নাটকের বা কবিতার বিশেষ সুর পরিবেশ মর্জি বিশ্লেষণ করা যায়, মূল ভাব প্রকাশ পায়, যেমন 'ম্যাক্‌বেথে' ঢিলে পোশাকের চিত্রকল্প, 'হ্যামলেটে' রোগবীজাণুর চিত্রকল্প, রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘরে' চিঠির চিত্রকল্প, এবং কবিতা বা নাটকের গঠনও এর সাহায্যে সুস্পষ্ট হয়। আর এই চিত্রকল্পের ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসে সঙ্কেত, এই সঙ্কেত কখনো লেখকের বোধকে চিহ্নিত করে, কখনো জাতির মৌলিক প্যাটার্নকে সম্পর্কান্বিত করে, কখনো একই সঙ্গে এই দুয়ের কাজ হয়। এই কারণেই লুইস্‌ চিত্রকল্পকে জাদুদর্পণ বলতে চেয়েছেন, যার মধ্যে বিভিন্ন বিষয় প্রতিবিম্বিত হয়।[৫]

চিত্রকল্পে সঙ্কেত বাহিত হয় কিনা এ নিয়ে বিরোধ আছে। লুইস্‌ বলেছেন কবিতায় চিত্রকল্প কদাচিৎ বিশুদ্ধ সাঙ্কেতিক হয়ে ওঠে, কারণ কবিতার বিভিন্ন প্রসঙ্গ একটা অনুভূতির স্পন্দন জাগায়, সুতরাং পাঠকও তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এই প্রসঙ্গজাত অনুভূতিতে সাড়া দেয়। কিন্তু অনুভূতি আরো গভীরতর হয়, চৈতন্যের তলদেশে গিয়ে পৌঁছয়, সামগ্রিকতাকে স্পর্শ করে যদি সঙ্কেত এর মধ্যে আবিষ্ট হয়। বার্ক্‌ এ সম্বন্ধে স্পষ্ট বলেছেন : সাঙ্কেতিকতা ছাড়া চিত্রকল্পের আলোচনা চলতেই পারে না, কবির চিত্রকল্প সাঙ্কেতিক সম্পর্কেই পরস্পরে সংগঠিত হয়। কবিতায় যে রূপ বা ফর্ম তৈরি হয়, তা কবির অনুভূতিজাত টেন্‌সন ও দ্বন্দ্ব থেকে, তার মধ্যেও এই সঙ্কেত কাজ করে। কারণ সঙ্কেতের অনুষঙ্গ পরিবেশরহস্য আরো প্রসারিত। বিশেষ চিত্রকল্পকেই কবিরা সঙ্কেতে নির্ধারিত করেন, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'ঝড়', 'রক্তকরবী'।[৬]

আধুনিক পাঠকেরা আধুনিক কবিতায় চিত্রকল্পের দুর্বোধ্যতায় অসন্তুষ্ট। লুইস্ বলেন দ্রুত পরিবর্তমান সময়ই চিত্রকল্পকে অর্থহীন ও দুর্বোধ্য করে, অনেক চিত্রকল্পের বিষয়বস্তু সাধারণের অপরিচিত বলে কোনো অনুষঙ্গ জাগায় না, সাধারণ মাধুর্য তারা হারিয়ে ফেলেছে, বক্তব্য বা বিবৃতি আজ নেই, শুধু চিত্রকল্পের মাধ্যমেই বিষয়-অনুভূতির অনুষঙ্গ ফুটিয়ে তোলে বলে অনেক পাঠকের বিরূপতা, আরো বিরূপতা ঘটে বর্তমান জগতের বিশৃঙ্খল জটিলতাকে আইডিয়ার অনুভবে চিত্রকল্পে কবি প্রকাশ করেন বলে। এই বর্তমান জটিলতা কবির সেন্সিবিলিটির অঙ্গ, তাকে এড়িয়ে কোনো কিছু ধরা যায় না, তাই এই সেন্সিবিলিটির চিত্রকল্পও জটিল। যেমন জীবনানন্দের বিচ্ছিন্নতা বোধের শূন্যতায় রূপের তরঙ্গ গন্ধের স্বরে ভেসে যায়। পাঠককে এই বিষয়ে সচেতন হতেই হবে, কবির দায়িত্ব নয় এটা। তবে পাঠক প্রত্যাশা করবে যাতে দুয়ের মধ্যে সঞ্চরমানতার মাধ্যমের সাধারণ একটা গুণ থাকে।

৩.

কবির দৃষ্টির দিক থেকে চিত্রকল্প আলোচনা করলে চিত্রকল্পের যাথার্থ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবিসত্তা আজ তার অভিজ্ঞতালব্ধ সামগ্রিক চৈতন্য ; এই চৈতন্যের সঙ্গে যোগ ঘটে বাইরের পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ও ঘটনার, যার চৈতন্য যতো সজাগ ও সংবেদনশীল কবিদৃষ্টি বা ভিশন ততো ব্যাপক ও ব্যাপ্ত, এবং এই কবিদৃষ্টির রূপগঠনের প্রকাশও সাংশ্লেষণিক প্রক্রিয়ার মতো, জটিল ঐক্যে হয়ে-ওঠার মতো গড়ে ওঠে। যাকে দর্শনের ভাষায় being বলা যেতে পারে। এই হয়ে-ওঠা সাংখ্যের প্রকৃতির সৃষ্টির মতো নয়, কারণ প্রকৃতি থেকেই তো আমাদের জন্ম, কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টির অংশ হিসেবে প্রকৃতির অন্য অংশের সঙ্গে যোগের কামনা আমাদের মনের বাসনার স্তরে ব্যাবহারিকের অতীত রহস্যময় চেতনায় বিমূর্ত ভাবে কাজ করে, হঠাৎ চমকানো অনুপ্রেরণায় তাকেই কবি ছবির সাহায্যে মূর্ত করতে চায় নিজের কাছে, এই মূর্তরূপ স্পষ্টতার সঙ্গে ন্যায় শাস্ত্রের সুসমঞ্জস সাদৃশ্যের শুদ্ধ রূপে সুরের জাদুতে প্রকাশ পায়। এই কারণে সার্থক চিত্রকল্প বিশৃঙ্খল ছবি নয়, সংহত ছবির একটা সামগ্রিক সমন্বয়। সুতরাং চিত্রকল্পে সোপেনহাওয়ারের বুদ্ধির অতীত 'উইলই' কাজ করে, এই সোপেনহাওয়ারের 'উইলে'র মধ্যে যেমন বস্তুর স্বরূপ একাত্ম

হয়ে থাকে, বিষয় ও বিষয়ী এক হয়ে যায়, চিত্রকল্পের মধ্যেও বস্তুর স্বরূপ বা thing-in-itself একাত্ম হয়ে থাকে। তা থেকেই রিয়্যালিটি।

কিন্তু এ সবই ঘটে ইন্‌স্টিংক্ট ও অনুভবে, জ্ঞান এখানে গৌণ। এই কারণেই হয়তো শিল্পকে চিত্রকল্পের ভাষা বলা হয়। যেখানে যোগসাদৃশ্য বিরোধ উপমা একাত্মতা প্রভৃতি অলংকারের বস্তু থাকে না, অথবা সাধারণ অর্থে কোনো ছবিই থাকে না, সেখানেও হৃদয়-উদ্দীপিত সুরের বাণীর মধ্যে কবির চৈতন্যজাত চিত্রকল্প প্রকাশ পায়। স্বভাবোক্তি তার নজির, কিন্তু মানুষের প্রবলতম বাসনাই হলো ছবি দেখা। তাই আমরা সুরেও ছবি দেখি, গন্ধের কোমলতায়ও ছবি ফুটে ওঠে। আর কবির তরফ থেকে চিত্রকল্প বা ছবি সৃষ্টি করবার প্রেরণায় অন্য একটা চেতনা গোপনে কাজ করে। প্রত্যেক শব্দই অনুভবের ছবি, অনুভবময় শব্দের শরীর অনুভববেদ্য হয়ে ওঠে বস্তুজগতের সঙ্গে যদি কবির চৈতন্য যোগ সাধিত হয়ে একটা গভীর ইম্‌প্রেশন সৃষ্টি করে। কবির মনোজগতের ইম্‌প্রেশনের ফলেই শব্দের অনুভূতির তীব্রতা এবং ছবির রূপবর্ণগন্ধস্পর্শ প্রভৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইম্‌প্রেশনের এই তীব্রতা, বুদ্ধি-অতীত 'উইলের' একাত্মতা, সৃষ্টির সঙ্গে বিভিন্নভাবে যোগের বাসনা এবং তাকে রূপময় করে তোলার অভীপ্সা—এ সব থেকেই কবিতার শব্দগুলি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ে রহস্যময় হয়ে ওঠে। গদ্যের মধ্যেও চিত্র আছে, তবে সে চিত্র অসংলগ্ন, এবং প্রবন্ধের মধ্যে গদ্যের চিত্র বুদ্ধির দ্বারা একান্ত চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট, স্বাধীন নয়। সংশ্লেষণের সংগঠনের দ্বারা ফুলের মতো আত্মিক হয়ে ওঠে না। আত্মিক শক্তিই গুণময় শব্দের অর্থ, চিত্রের মধ্যে বিভিন্ন বস্তুর সংগঠনের সময় চেতনা, স্তবক, ভাবানুভূতির ক্রম অগ্রসরমানতা ও উন্মোচন, সেন্সিবিলিটিময় চিন্তার নরম আলো প্রভৃতি বস্তুকে ও বিরোধকে সংশ্লেষণ করে তোলে। এবং এই সংশ্লেষণের ফলেই চিত্রকল্প শুধু ছবি নয়, অনুভূতিময় অর্থ এবং প্রতীকিত অর্থ হয়ে ওঠে। এবং এই সংশ্লেষণ সচেতন বুদ্ধির সাহায্যে কখনোই গড়ে ওঠে না। কান্টের a priori জ্ঞানের থেকেই যেন রহস্যবোধের অর্থ ও কবিতার প্যাটার্ন এক সঙ্গে চিত্রকল্পের মধ্যে দীপ্ত হয়ে ওঠে। যদিও এই প্যাটার্নে ছন্দভাষা ভাবভাবনার বিরোধ একত্রিত হয়ে মিশে যায়। তাই বস্তুর প্রত্যক্ষ স্থূলতা রঙিন হাওয়ায় দূরান্তে মিলে গিয়ে ব্যাপকভাবে একটা

আবেশের জাদু তৈরি করে, এই আবেশের জাদুতে কবি নিজেও আবিষ্ট এবং পাঠককেও সেই ক্ষেত্রে টেনে আনেন।

স্কেল্‌টন কবির চিত্তে চিত্রকল্প নির্মাণের তিনটি স্তর দেখাতে চেয়েছেন : প্রাথমিক চিত্রকল্প হলো কবির মনের জগতে প্রকৃত বস্তুজগতের প্রতিফলন, এই প্রতিবিম্বন থেকে দ্বিতীয় স্তরের চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়, এটি প্রথমটিরই প্রতিফলন। কবির মনের বিভিন্ন স্তরে চিত্রকল্পগুলি উপস্থিত হয়ে কবির ব্যক্তিত্বের দ্বারা তাদের অবস্থান নির্ধারিত হয়ে যায়, তার ফলেই ভিশন বা কবিদৃষ্টি প্রকাশ পায়, তৃতীয় চিত্রকল্পের জন্ম দেয়। কিন্তু এখানকার এই চিত্রকল্প একান্ত স্বরূপে বিদ্যমান থাকে, যদিও প্রাথমিক চিত্রকল্পের দ্বারা উদ্দীপিত হয়। প্রাথমিক চিত্রকল্পকে ব্যাখ্যা করা যায় কনসেপ্ট দিয়ে, কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের চিত্রকল্পের সংজ্ঞা বা বিশ্লেষণ চলে না, প্রাথমিক চিত্রকল্পের সাহায্যে শুধু বোঝা যায়, তাদের কারণ নির্ণয় করা যায়, দ্বিতীয় চিত্রকল্প থেকে যে তাৎপর্য ও ইঙ্গিত আসে সেটা তৃতীয় স্তরের চিত্রকল্প, চিত্রকল্প থেকেই চিত্রকল্পের জন্ম এখানে সম্ভব। জগতের বিমূর্ততা থেকে আরেক বিমূর্ততা, যার সঙ্গে বস্তু পৃথিবীর সংজ্ঞাজাত যোগ সম্পর্কান্বিত করতে কষ্ট হয় এবং স্বতন্ত্র বিশ্বে পৃথক পরিচয়ের অস্তিত্ব নিয়ে এই চিত্রকল্প বর্তমান, বস্তুজগৎ থেকে একান্ত পরিশোধিত।

কবিতায় চিত্রকল্প বা ছবি রচনা করবার পেছনে কবির মনে সাধারণভাবে একটা শব্দের বোধ কাজ করে। প্রত্যেক শব্দই বুদ্ধির দ্বারা নিরূপিত, কোনো শব্দ যদি বস্তুকে বোঝায়, আমরা বস্তুকে বুদ্ধির সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করি, বস্তুর আইডিয়া মনের মধ্যে আগে থাকতে আছে বলেই বুদ্ধির সাহায্যে বুঝি। এবং এই বোঝার পেছনে কবি ও পাঠকের মধ্যে ব্যবধান অবশ্যম্ভাবী। কবি শব্দের দ্বারা বস্তুকে যেভাবে বুদ্ধির সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করে, পাঠক সেই ভাবে নাও করতে পারে, তার অভিজ্ঞতা বাসনাসংস্কারে একটা পার্থক্য থাকেই। কিন্তু আমাদের বাহ্যজগতের বস্তুর চিত্র সকল সংবেদনশীল মনের মধ্যে ভাবের উদ্দীপনা জাগায়, এই উদ্দীপনার ব্যাপারে সংবেদনায় কিছু হেরফের আছে, কিন্তু গুণগত পার্থক্য নেই। সুতরাং কবি যখন সাধারণ বস্তুকে চিত্রে রূপান্তরিত করে বস্তুর অতীত আবহ সৃষ্টি করতে চায়, তখন সেটা সাধারণীকৃত হয়। কবির অনুভূতিময় চিত্রকল্পে পাঠকের হৃদয় সংযোগ

তাই সুস্পষ্ট হয়। কথায় যেটা অব্যক্ত থেকে যায়, ধারণার বোধ কমবেশি থাকে, চিত্রকল্পে সেখানে বোধ স্পষ্ট সংহত, শক্তিমান উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, প্রকৃত সতেজ উজ্জ্বল চিত্রকল্প বোধকে নিবিড় পরিচ্ছন্ন সমৃদ্ধ করে। সমগ্র জগতের জটিল ঐক্যকে লাভ করতে পারা যায়। কারণ ছবি সকলের চোখের সামনে একই রকম, ছবি শুধু গোপন সঙ্কেতে একান্ত বোধের তীব্রতায় সুরের জাদুতে চমৎকারিত্বের আনন্দবোধ জাগিয়ে তোলে। কবির ছবির এই সাধারণীকরণই রসবোধের আনন্দের সহায়তা করে, সাধারণীকরণ হলেই বিশ্ববোধের ব্যাপকতা আসে, বস্তুর এই ছবিতে রূপান্তরকরণে যেমন কবির প্রসারিত অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়, তেমনি পাঠককেও ছবির সাহায্যে বিশ্বজগতের ব্যাপ্ত বিশ্বে উধাও করে দেয়। কবির ব্যক্তি অনুভূতির সংকীর্ণতা এমনিভাবে সীমাহীনতায় গিয়ে পৌছয়। ছবির নির্বাচনে যে ব্যক্তিত্বের সীমা আইডিয়া অনুভূতি আকাঙ্ক্ষা ভালোবাসা ঘৃণা পর্যবেক্ষণ, চিন্তার অনুষঙ্গ, অ্যাটিচুড বিশ্বাস বস্তু ঘটনা স্মৃতি উদ্দেশ্য যুগ সমাজ একই সঙ্গে একটা সামগ্রিক রহস্য তৈরি করে, পাঠকও নিজের অনুভূতির যোগে এক নিবিড় রহস্যে গিয়ে পৌছয়। এবং চিত্রকল্পের মধ্যেই ছন্দস্পন্দ ধ্বনিসংগীত সুরসংগতি মাধুর্য কবিতার সমগ্র প্যাটার্নের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। কবিতার প্যাটার্ন চিত্রকল্পের মধ্যেই ধরা পড়ে, চিত্রকল্প দিয়েই বোঝা যায় কবিতাটি কোন্ ধরনের। কারণ লেনিনের ভাষায় আমাদের সংবেদনা বা চৈতন্য কেবল বহির্জগতের চিত্রকল্প। সুতরাং এই সংবেদনা ও চৈতন্যের প্রকাশই চিত্রকল্প, আর চিত্রকল্পই কবিদের ব্যক্তিত্বে উদ্ভাসিত স্বতন্ত্র জগৎ। ভিন্ন ভাষায় বলা যায়, কবির সমগ্র মনের অবচেতন গহন গভীরতায় গভীর সমন্বয়ের সঙ্কেত গঠিত হয়ে ওঠে, তার ফলেই সব কিছু শক্তিকে ছাড়িয়ে ওঠে। এই কথাই আরো সুন্দর করে বলেছেন রেভের্দি, কবি যে চিত্রকল্প তৈরি করেন তা বিসদৃশ বস্তুর তুলনায় নয়, দুই দূরত্বের রিয়্যালিটির ঐক্যে যাতে কেবল আত্মিক শক্তিই এর সমর্থন জানতে পারে। বস্তুজগৎ ও মন এই দুয়ের রিয়্যালিটিই একাত্ম হয়ে রূপের প্রকাশ ঘটায়। কিন্তু তুলনায় শুধু মনটা কাজ করে, দুই ভিন্ন বস্তুকে মেলাবার সচেতন প্রয়াস থাকে। কিন্তু সমষ্টিগত অবচেতনের গভীরতা থেকে কবিমন এখানে গাছের কাণ্ডের মতো গ্রহণ ও বর্জনের দ্বারা চিত্রকল্প তৈরি করতে পারে না। বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনায় এ্যারিস্টটলের মতো স্বজ্ঞাজাতধারণাসক্রিয়থাকলেও

তুলনা করবার প্রচেষ্টার মধ্যে একটা ব্যবধান থেকে যায়। সে ব্যবধান সচেতন বুদ্ধির, কিন্তু স্বপ্নের মতো চিত্রকল্প মিথের জাদুর রূপ নিয়ে আদিম অনির্বাচনীয়-তায় আমাদের পৌছুতে পারে না। এই কারণেই লুইস্ মেটাফর ও চিত্রকল্পের পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে অপূর্ব বলেছেন যে মেটাফরের মধ্যে টেন্সন উত্তেজনার ভাষা থাকে, কারণ এর মধ্যে প্রকাশের সঙ্কুচিত সংঘর্ষ থাকে, এর ফলে একটা প্রচণ্ড অবস্থার স্তর ওঠে এবং অবস্থাগুলি আইডিয়ার ওপর পরনির্ভরশীল। কিন্তু চিত্রকল্প জীবনের তীব্র টেন্সন ভেঙে দেয়, আইডিয়া বা ভাবের জন্যে কারো ওপর নির্ভর করে না, এর ফলেই নিরাপদে সে আমাদের চিত্তকে আলোকিত করে, উষ্ণতা দেয়। এই উষ্ণ আলোকের স্নিগ্ধতাই চিত্রকল্পের সার্থকতা।

চিত্রকল্পের নির্বাচনের মধ্যে কবির হৃদয়ের ইন্দ্রিয়সংবেদনা যেমনি প্রকাশ পায় উজ্জ্বল বর্ণে, তেমনি তার আকাঙ্ক্ষা রুচি মর্জি মূল্যবোধ কবিদৃষ্টি একসঙ্গে জড়িয়ে থাকে, মিশে থাকে ; তার সুর, রূপগঠন, সঙ্কেত, প্যাটার্নের মধ্য দিয়েই মিথ্ গড়ে ওঠে। সুতরাং কবিতার ফর্ম থেকে চিত্রকল্প গড়ে ওঠে না, বা বোধকে জাগায় না, বরং চিত্রকল্প থেকেই প্যাটার্ন বা ফর্ম সৃষ্টি হয়, এবং এই ফর্ম একটা সমগ্র গোপন বোধকে জাগিয়ে তোলে। তবে গোপনবোধ ও গোপনসত্তার ইঙ্গিত থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিত্রকল্প বেরিয়ে আসে, এটাই তার কেন্দ্রবিন্দু। পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে একটা সামগ্রিক ঐক্য স্থাপন করে, একটি কবিতায় প্রতিটি চিত্রকল্পের সঙ্গে সমগ্র কবিতার যোগ যে কোনো প্রকারে মিলনের সমন্বয়ে ঘটে, তার ফলেই সামগ্রিক চিত্রকল্প থেকে একটি নিটোল চিত্রকল্প গড়ে ওঠে, চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে ভাবের গোপন সত্তা নীরব গানের আলোর মতো ভেসে ওঠে। যেমন ম্যাক্‌বেথের মিথ্যা পোশাকের চিত্রকল্প তার ব্যর্থ রাজকীয় ঐশ্বর্যকে ইঙ্গিত করে। তাই প্রসঙ্গবিহীন চিত্রকল্পের কোনো অর্থ সুস্পষ্ট অনুষঙ্গ জাগায় না।

কবি যেহেতু বিশেষ সময় ও স্থানে তাঁর অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করেন, সেইহেতু তার চিত্ররূপে বিশেষ স্থান ও কালের উদ্ভাসিত রহস্যের রূপ ফুটে ওঠে, কল্পনা যেমন স্মৃতি এবং আমাদের অবচেতনের সামগ্রিকতা নিয়ে অনুভব ও বেদনাকে জারিত করে, চিত্রকল্পের মধ্যেও সেই অবচেতন স্মৃতির পদ্মে বর্তমানের শিশিরের জল এক হয়ে থাকে। তুলনা বা উপমায় বুদ্ধির সাহায্যে দুই বস্তুর

মধ্যে সাদৃশ্যের ভেতরে সময়ের ব্যবধান থাকে, কিন্তু যেহেতু চিত্রকল্প এবং কল্পনা প্রায় সমানধর্মী, সেইহেতু এর মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না। এই কারণেই হয়তো এজরা পাউণ্ড চিত্রকল্পের সংজ্ঞা নিরূপণে বলেছেন যে চিত্রকল্প হচ্ছে এমন একটি বস্তু যা সময়ের ক্ষণ মুহূর্তে বুদ্ধির ও অনুভূতির জটিলতা প্রকাশ করে। সময়ের ক্ষণ মুহূর্ত অর্থাৎ an instant of time কবির চৈতন্যে একটি বস্তু। সুতরাং, সময় ও চিত্রকল্পের ব্যবধান স্মৃতির ভেতরেও কল্পনা করতে পারি না। সময়ের পরম্পরা নাটকের ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য, ব্যবধান স্বীকার্য। নাটকের চিত্রকল্পের সঙ্গে লিরিকের চিত্রকল্পের পার্থক্য আছে এবং পার্থক্য কল্পনা করতে পারি না বলেই অকস্মাৎ মুক্তির স্বাদ এনে দেয়, স্থানকালের সীমা উধাও হয়ে যায়, গাছের হয়ে-ওঠার মতো এক অনুভূতি সর্বশরীরে ঘন ইন্দ্রিয় সংবেদনা জাগায়, 'ফুলের মতো প্রভাত মম উঠিবে পুরে' যদিও উৎপ্রেক্ষা, তবু ফুল এবং প্রভাত দুটি চিত্রকল্প এক হয়ে গেছে জৈবিক প্রক্রিয়ায়, এই জৈবিক প্রক্রিয়াটিই চিত্রকল্পে একান্ত লক্ষণীয়। এই কারণেই হয়তো পাউণ্ড একটি চমৎকার উক্তি করেছেন চিত্রকল্প প্রসঙ্গে : It is better to present one Image in a life time than to produce voluminous work. যদি কবির অন্তর দৃষ্টি দিয়ে বিচার করি তাহলে একটি লিরিক বা পুরো মহাকাব্যই জীবসৃষ্টির ভাবের চিত্রকল্প, এবং এই চিত্রকল্পকেই গোপন সঙ্কেত সাদৃশ্যে পরস্পর সম্পৃক্ত করতে চাই ফুলের পাপড়ির মতো। ফুলের পাপড়ির মতো বলেই প্রত্যক্ষতা, সংক্ষিপ্ত সুরের প্রবহমানতা, ব্যাপ্ত পৃথিবীর আকাশবাতাস আলোয় এক হয়ে মিশে গিয়েও স্বতন্ত্রভাবে ফুটে ওঠে। কোনো বাহুল্যই সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। অথচ কবির সেন্সিবিলিটির সূক্ষ্ম জটিলতা ও অনন্তরহস্য বহির্জগতের রিয়্যালিটির সঙ্গে যোগসাধন করে।

৪.

এইসব কারণেই সাহিত্যে ইমেজিজম্ বা চিত্রকল্পবাদ গড়ে উঠেছিল পাউণ্ডের প্রবর্তনায় ১৯১২ সালে। এবং তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন হাল্মের কাছে। উদ্দেশ্য ছিল রোমান্টিক উচ্ছ্বাস ও অসংলগ্নতা বর্জন করে সংহত শব্দে যথার্থ ভাবকে প্রকাশ করতে হবে, সাঙ্কেতিক কবিতার অসীমতাকে সীমার রূপে গড়ে তুলতে হবে। প্রকাশই যদি কাব্য হয়, তাহলে কাব্যের এই রূপগঠনের

দিকে তাঁদের নজর পড়েছিল বেশি। তাঁরা ছ'টি সূত্র তৈরি করেছিলেন, ১. সাধারণ কথ্য ভাষাকে ব্যবহার করতে হবে, এবং এই শব্দ হবে যথার্থ। ২. নতুন ভাবমর্জির প্রকাশের জন্য নূতন ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করতে হবে। ৩. যে কোনো বিষয়ে কবিতা লেখা চলতে পারে। ৪. একটি চিত্রকল্পকে উপস্থাপিত করতে হবে। কবিতা যথার্থভাবে বিশিষ্টকে প্রকাশ করবে, ঝাপসা সামান্য বাক্যে কখনো কবিতার শব্দ নিয়োজিত হবে না, গম্ভীর ও সংগীত হলেও না। এই কারণেই কবির ক্ষেত্রে 'কস্‌মিক' (cosmic) শব্দের বিরোধিতা করেছেন। ৫. কবিতা কঠিন ও পরিচ্ছন্ন হবে, ঝাপসা বা অনির্দিষ্ট হবে না। ৬. সংহতিই কবিতার একমাত্র নির্যাস। বলা বাহুল্য, এইসব সূত্রের মধ্যে কবিচৈতন্যের ও কল্পনার কোনো কথা নেই, কবিতার বহিরঙ্গের প্রকাশই ব্যক্ত, রিয়্যালিটি কিভাবে চৈতন্যে চিত্রকল্প হয়ে ওঠে, সমগ্র ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে সে দিকে নজর দিতে পারেন নি বলেই কবিতাগুলি বিচ্ছিন্ন চিত্রকল্পের টুকরো হয়ে দাঁড়িয়েছে, কোল্‌রিজের ঐক্যসমন্বয়ী প্যাশন থেকে ঐক্য বিধান হয়নি। তাই বেশিদিন এই আন্দোলন চলতে পারে নি।

এখানে শুধু চিত্রকল্পের বিমূর্ত কথা বলা হলো, স্পার্জ্যন ও ক্লেমেনকে[৭] অনুসরণ করে বাংলায় চিত্রকল্পের আলোচনা সম্প্রতি কেউ কেউ করেছেন। আমার নিজের ধারণা স্পার্জ্যন ও ক্লেমেন দুজনের নীতিই চিত্রকল্প উপলব্ধি করতে সমগ্রভাবে সাহায্য করে। ওপরে বর্ণিত চিত্রকল্পের সমস্ত উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মিলবে। স্কেল্‌টন যে তৃতীয় স্তরে সাঙ্কেতিক চিত্রকল্পের কথা বলেছেন তা সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ও জীবনান্দছাড়া বাংলায় অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যাবে না। কারণ রোমান্টিক কাব্যান্দোলন থেকেই ডালাস অবচেতনের কথা বলেছেন এবং সেখান থেকেই চিত্রকল্পের ব্যবহার ও আস্বাদ আমাদের সেন্সিবিলিটিকে প্রসারিত করছে। মধুসূদনের চিত্রকল্পের মধ্যে উপমার প্রাচুর্য বেশি, যদিচ তিনি চিত্রকল্প কথাটি চিঠিতে প্রায়ই ব্যবহার করেছেন, উপমার জন্যেই তাঁর চিত্রকল্প শব্দচিত্রের স্পষ্ট প্রত্যক্ষতা ও ধ্বনির গাম্ভীর্য আমাদের মুগ্ধ করে। এগুলি দ্বিতীয় স্তরের চিত্রকল্প, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পের তরল গতিময় রঙিন জটিলতাই শব্দের সঙ্কেতকে বহুদূরে প্রসারিত করেছে, এবং এযুগের চিত্রকল্পের সার্থক জনয়িতা একমাত্র জীবনানন্দ দাশ। চিত্রকল্পের যতো শ্রেণীভাগ আছে, একমাত্র তাঁর মধ্যেই জটিলতর সঙ্কেতে কবিতায় সামগ্রিক ঐক্য লাভ করেছে।

উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার সময় আর নেই, আর একই কথা পুনরাবৃত্ত হলো বিভিন্নভাবে ঘুরিয়ে বলবার জন্যে। তাই জীবনানন্দের পক্ষেই এ কথা খাটে উপমাতেই কবিত্ব। 'পত্রপুটে' রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার মধ্যেই চিত্রকল্প[৮] সৃষ্টির রহস্য সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে, ওপরে বর্ণিত বিমূর্তভাবনা কবিতাটির মধ্যেই স্পষ্ট হয়েছে :

হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট
গুচ্ছে গুচ্ছে অঙ্গুলি মেলে আছে
আমার চারিদিকে চিরকাল ধরে
বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ রয়েছে
মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে পড়া
রসলোলুপ পাতাগুলির সংবেদনে।

১. জীবনানন্দ দাশ

২. বাক্-প্রতিমা শব্দগুচ্ছ লাতিন 'imago', 'imaginem'-এর এবং সংস্কৃতির ব্যুৎপত্তির দিক থেকে যতোই যথার্থ হোক, বাংলা শব্দের ভাবানুষঙ্গে ইমেজের সামগ্রিকতায় পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিবিড়তা ধরা পড়ে না। প্রতিমা, মনের বা বাইরের যারই হোক স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, 'তোমার প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'। 'প্রতিমা' শব্দ সংস্কৃত প্রতিম শব্দ থেকে এসেছে (প্রতি+মা+অ), সদৃশ, স্ত্রীলিঙ্গে হয়েছে প্রতিমা। 'সাদৃশ্য', 'অনুকরণ', 'দেবতা', 'প্রতিবিম্ব' 'চিত্র' 'আদর্শ' সবই বোঝায়। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগবত থেকে উদ্ধৃতি তুলে অষ্টবিধ প্রতিমার কথা বলেছেন : শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমা অষ্টবিধা স্মৃতা। ১১.২৭.২২. প্রতিমার 'মনোময়ী' রূপ চিত্রকল্পে নিশ্চয় আছে, কিন্তু এই মনোময় রূপ কি শুধু স্পষ্ট চিত্রের ভাবানুষঙ্গে ? অমলেন্দু বসু বলেছেন : 'অপর পক্ষে প্রতিম প্রতিমা প্রতিমান ইত্যাদি শব্দ নিহিত সাদৃশ্য জ্ঞাপনায় ইমেজ শব্দটির মূল লাতিন অভিধার অনুরূপ সাদৃশ্য ভাবনা পাওয়া যায়। প্রতিমা শব্দটিতে পূজাঘরের ঠাকুর বা কুমোরের মূর্তি এহেন সংকীর্ণ অর্থ না দেখে যদি কিছুটা মূল অভিধায় চলে যাই, যদি বুঝি সাদৃশ্যবোধের প্রতিরূপায়ন (সে প্রতিরূপ অঙ্গভঙ্গিতে ও অভিনয়ে সাধিত হোক, মূর্তি রচনায়, চিত্র রচনায়, ধ্বনিবিন্যাসে সাধিত হোক, সর্বক্ষেত্রেই পরিণামে সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিরূপ), তা হলেই দেখব যে বাক্-প্রতিমা শব্দটি verbal image অর্থে একান্ত সুষ্ঠু। এখানে আর একটি কথাও বলা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইমেজ অর্থে প্রতিমা শব্দটির ব্যবহার করেছেন 'রোগশয্যা'য় গ্রন্থের ১৬নং কবিতায় : 'অবসন্ন আলোকের শরতের সায়াহ্ন প্রতিমা।" সাহিত্যালোক পৃঃ ৩৪

কবিতা : চিত্রিত ছায়া

অমলেন্দু বসু যতোই ব্যাখ্যা দিন শব্দটি পেয়েছেন তিনি লুইসের কাছ থেকে : It is a picture made out of words, আর একটা কথা তিনি ভুলে যাচ্ছেন কেন শব্দার্থতত্ত্ব বা সিমান্‌টিক্‌সে শব্দের অর্থের সঙ্কোচনপ্রসারণ ঘটে। সংস্কৃতে 'প্রদীপ' শব্দের অর্থ তো যে কোনো আলোক বোঝায়, 'কিন্তু বাংলায় বোঝায় বিশেষ আকৃতির পাত্রে তৈলদাহ প্রদীপ।' আর সংস্কৃতে কালিদাস 'রঘুবংশে' 'প্রতিমাশশাঙ্ক' যেখানে বলেছেন সেখানে 'প্রতিমা' শব্দের অর্থ প্রতিচ্ছবি (replica). 'সদৃশ' অর্থে নয়। ব্যবহারের দিক থেকেও ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। সুতরাং শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই যে ভাবানুষঙ্গ একসঙ্গে হঠাৎ চমকে ওঠে, সাহিত্যের ভাষার ক্ষেত্রে তাকেই প্রয়োগ করা কর্তব্য, যদি আমার শৈল্পিক চেতনা সক্রিয় থাকে, তা না হলে মৃত শব্দ ব্যবহার করতে আমি বাধ্য। আর রবীন্দ্রনাথের উদাহরণটিকে যদি একটু তলিয়ে বিচার করা যায়, তাহলে দেখতে পাবো, 'শরতের সায়াহ্ন প্রতিমা' বলতে ইমেজ নয়, শরৎকে নারীর মতো করুণ বিষাদে স্পষ্ট মূর্তিময়ী করে তুলতে চেয়েছেন, সে নারীর সদৃশ নয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত প্রতিমায় পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংবেদনার সমন্বয় কখনোই ঘটে নি, সমাসোক্তির স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।

কিন্তু 'চিত্রকল্পে' চিত্র শব্দটি যে কোনো চিত্রকেই দ্যোতিত করে। রাফেলের ছবির স্পষ্টতা, এবং সেজানের ছবির ইমপ্রেশন, দুইই চিত্রের মধ্যে সমাহৃত। আর চিত্র শব্দের যদি ঋগ্‌বৈদিক অর্থ ধরি, সে যেমন স্পষ্ট চিত্র, তেমনি ধ্বনিচিত্রও বটে, এবং বহু বর্ণের সঙ্গে যুক্ত। এবং চিত্রের সঙ্গে 'চিৎ' শব্দের চেতিয়ে তোলার ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে, (চিৎ+অল)। এই স্পষ্ট ধ্বনি-চিত্রের সঙ্গে একটা আশ্চর্য বোধ কাজ করছে, এবং স্পষ্ট ধ্বনিচিত্রের সঙ্গে 'কল্প' শব্দ যেমন একদিকে সদৃশ বোঝাচ্ছে, যোগ্যতা বোঝাচ্ছে, তেমনি ইংরেজি 'ইমাজিনেশনে'র সঙ্গে কল্পনার নবীন আবিষ্কারের মুক্ত স্বাধীনতা আনছে, কারণ 'ক্লিৃপ' থেকেই 'কল্প ও কল্পনার' উদ্ভব, সুতরাং অনুষঙ্গ আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই অমলেন্দু বসু যে বলেছেন : 'চিত্রকল্প শব্দটিতে কেবল এক শ্রেণীর ইমেজই সূচিত হয়, যে ইমেজ visual imagination (দৃষ্টিনির্ভর কল্পনা শক্তি) দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে', একথা যুক্তিযুক্ত নয়। বরং 'ইমেজ' যে 'ইমাজিনেশনের' সঙ্গে যুক্ত চিত্রকল্পের মধ্যে তার স্বরূপ মূলত পাচ্ছি। 'আঁধার ভরা গভীর বাণী' যে ইমেজ মনের মধ্যে আনে, ইমেজের পরিবর্তে প্রতিমা শব্দ ব্যবহার করলে কখনোই তা আনে না।

৩. রবীন্দ্রনাথও অলংকারকে ছবি বলেছেন : 'কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না, ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়।…উপমা রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। চিত্র ও সংগীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ, চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ ও সংগীত প্রাণ।' সাহিত্য। জীবনানন্দ উপমা বলতে ছবি এবং মারির মতো চিত্রকল্পকেই বোঝাতে চেয়েছেন।

৪. I use the firm image here as only the available word to cover any kind of simile, as well as every kind of what is really compressed simile, metaphor. Spurgeon : The Imagery of Shakespeare.

৫. The images in a poem are like a series of mirrors set at different angles so that, as theme moves on, it is reflected in a number of different aspects. But they are magic mirrors : they do not merely reflect the

theme, they give it life and form, it is in their power to make a spirit visible.

৬. One can not long discuss imagery without sliding into symbolism. The poet's images are organized with relation to one another by reason of there symbolic kinships. We shift from the image of an object to its symbolism as soon as we consider it not in itself alone, but as a function in a texture of relationships : Burke : Attitude Towards History.

৭. বাংলায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পের আলোচনা শুরু করেন অশোকবিজয় রাহা শ্রেণীনির্ণয়ের দ্বারা, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তও পরে সামান্য কিছু করেছেন। অমলেন্দু বসুই 'সাহিত্যালোক' গ্রন্থে বিভিন্ন চিত্রকল্পের শ্রেণীবিভাগ করে তার মাধুর্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন, এবং কতকগুলি বিশেষ চিত্রকল্পের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাগৈশ্বর্যের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করেন, চিত্রকল্পগুলি যে সঙ্কেতের বাহন হয়েছে, 'ঝড়'-এর বর্ণনায় তা ব্যক্ত করেন। প্রথম যুগের চিত্রকল্পের চেয়ে শেষ যুগের চিত্রকল্পের মধ্যে সাংলাইম্ অনুভবের প্রকাশ দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পে ও সাহিত্যে বিষয় ও বিষয়ী একই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বলে আত্মকেন্দ্রিক রোমান্টিকতা থেকে অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিত্রকল্পের মধ্যে প্রকাশিত ইন্দ্রিয়বেদনার বিশ্লেষণ করেছেন ও বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। কিন্তু অমলেন্দু বসুর কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল একটি কবিতাকে পুরো ইমেজ ধরে সেই কবিতার বিভিন্ন পঙক্তির টুকরো ইমেজ কি ভাবে সম্পূর্ণতা দান করে তার আলোচনার। এই সামগ্রিক আলোচনা তাঁর আলোচনায় ধরা পড়ে নি। ক্লেমেনের পথ ধরে জগন্নাথ চক্রবর্তী 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চিত্রকল্পে কি করে সামগ্রিক কাব্যের ঘটনা ও ট্রাজেডির সঙ্কেত প্রকাশ পেয়েছে, তার আলোচনা করবার প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু তবু এই সার্থক পথে এগিয়েও বিভিন্ন চিত্রকল্পের উদাহরণ ও বিচ্ছিন্ন চিত্রকল্পের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বরং অঙ্গ ও অঙ্গীর সমন্বয় পুরোভাবে দেখালে বাংলায় কবিতা বিচারের একটা পূর্ণতা প্রকাশ পেতো। চিত্রকল্পের আলোচনায় সকলেই বিদেশের প্রতিধ্বনি করেছেন, আমার আলোচনায়ও সেই প্রতিধ্বনি আছে, সুতরাং আমার তরফ থেকে লজ্জার কিছু নেই। তবে পূর্ণাঙ্গ করবার চেষ্টা রয়েছে।

৮. 'চিত্রকল্প' শব্দটি সংস্কৃতে নেই। 'ইমেজে'র অনুসরণেই 'চিত্র' ও 'কল্প' শব্দ দুটি সংযুক্ত করা হয়েছে। পুরাণসর্বস্বে 'চিত্রকবিত্ব' শব্দ পাওয়া যায়, এখানে 'চিত্র' মানে কবিতা রচনারই শিল্প। মম্মট তাঁর 'কাব্যপ্রকাশে' তিন শ্রেণীর কাব্যের কথা বলেছেন : ধ্বনিকাব্য, গুণীভূত ব্যঙ্গ্য কাব্য এবং চিত্রকাব্য। মম্মট বলতে চাইছেন 'চিত্রকাব্যে' গুণালংকার যুক্ত হয়, কিন্তু ব্যঙ্গ্যের প্রকাশ ঘটে না, সুতরাং 'চিত্র এখানে অলংকরণ বা সজ্জা। বলা বাহুল্য, 'চিত্রকল্পে' চিত্রকাব্যের সংস্পর্শ নেই। 'চিত্রকল্প' শব্দের ব্যবহার বাংলায় অতি আধুনিক কালে, রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নি।

আধুনিক বাংলা কবিতার ধারা

১.

দ্বিতীয় দশকে মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রানুসারীদের বিরোধিতায় বুদ্ধি দিয়ে দেহবাদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অন্তরের গভীর কোণে রবীন্দ্রাদর্শই অন্তঃসলিলা হয়ে কাজ করেছে: 'আমার মনের গহন বনে / পা টিপে বেড়ায় কোন্ উদাসিনী / নারী অপ্সরী সঙ্গোপনে!' অথবা: 'রূপকথারই রূপের রানী পাথর পুরীর প্রাচীরতলে / সাঁঝের আলোয় আবছায়াতে বন্দী যুবার বক্ষে ঢলে।' অথবা: 'রূপের আরতি করিনু আঁধারে / আবেশে নয়ন মুদি / হেরি দেহে-মনে বাধা নাই আর— / উদ্বেল সম্বোধি।' 'বাণী বিনাইয়া বাঁধি যে ছন্দ / তারি মধু মদে পরান অন্ধ হয়তো মনের এ মকরন্দ সত্যের সুধা নয়— / তবু ভুলে আছি তাহারি পুলকে জীবনের ক্ষতিক্ষয়।' এই সমস্ত উক্তির মধ্যে মোহিতলালের প্রাণের আকৃতি যতোটা আন্তরিকতার সহজ সুরে ফুটে উঠেছে, বুদ্ধি-প্রধান দেহবাদী ও মর্ত্য-প্রীতির কবিতায় একটা দার্শনিক বলিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে, এই দার্শনিকতার মধ্যে কন্‌সেপ্ট কাজ করছে, কিন্তু কন্‌সেপ্টকে কন্‌সেপ্‌শন ও কগ্‌নিশনে নিয়ে যাবার বোধ খুবই কম। কি করবেন, কি করতে চান, তার কথা আছে, কিন্তু দেহবাদের ফলে হৃদয়ে কোন্ অনুভূতির বিচিত্রজাল রহস্যময় হয়ে ওঠে, তার কথা নাটকীয় স্বগতোক্তিতে লেখা 'স্পর্শরসিক' 'ব্যথার আরতি' শীর্ষক কিছু কবিতায় ফুটে উঠলেও তার প্রধান কবিতায় এর সুর নেই। রোমান্টিক অনুভূতির ক্ষেত্রে তিনি যুগযুগান্তরের পথিক, দেহবাদের সীমায় এলে জন্মের আগের ও মৃত্যুর পরের জগৎ সম্বন্ধে দৃপ্তভাবে অস্বীকার করেন: 'নামহীন ধামহীন পরিচয় বহিয়া পশ্চাতে / সম্মুখে সে বিসর্জন অন্তহীন তমিস্রার রাতে।' আর সোপেনহাওয়ারের বিরুদ্ধে যখন তিনি সোচ্চার, তখন বিবৃতি ছাড়া কিছুই নেই, বিবৃতিকে অলংকৃত করেছে মাত্র কয়েকটি চিত্র: 'সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি—মিথ্যা সনাতনী / সত্যেরে চাহিনা তবু সুন্দরের করি আরাধনা— / কটাক্ষ ঈক্ষণ তার হৃদয়ের বিশল্যকরণী / স্বপনের মণিহারে হেরি তার সীমন্ত রচনা।' এই উক্তির মধ্যে উপলব্ধি কি শুধু সোচ্চারে

বলার মধ্যে, উপলব্ধি কি আমাদের সোচ্চারের কোলাহল থেকে উপলব্ধির নৈঃশব্দ্যময় দ্বন্দ্বক্ষত জীবনে টেনে নেয়? মোহিতলালের কবিতার বিরুদ্ধে আমার সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ তাঁর শব্দ প্রয়োগের অসাবধানতা। আধুনিকতার বিদ্রোহ করেছেন, কিন্তু আধুনিক ভাষা ব্যবহার করতে পারেন নি, শব্দের ঔচিত্যবোধ তাঁর সমালোচক সত্তার বিশুদ্ধ রূপকে হার মানিয়েছে, সমালোচকরূপে ভাষার ওপর জোর দিয়ে, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা রীতির যে আদর্শ প্রয়োগ করেছেন বিভিন্ন আলোচনায়, তাঁর কবিতায় তা একেবারে ব্যর্থ, 'মানসলক্ষ্মী' কবিতায়, 'পা টিপে বেড়ায়' 'নদী গিরি পার হনু কোনমতে', এই 'হনু' অসহ্য, 'ঢাকা প'ল ধরণীর শ্যামশোভা—বিধবা সে যৌবন অম্বরে।' 'প'ল' তার ক্লাসিক রীতির সঙ্গে অতুল্য। মোহিতলালের বুদ্ধির মধ্যেই কোথায় একটা দ্বন্দ্ব ছিল, অথচ এই দ্বন্দ্ব যদি নিঃশেকথিত আধুনিক মানুষের অন্তরের গহন গুহা থেকে আসতো, তাহলে কবিতার ফর্মে ও বিষয়ে একটা সমন্বয়ী রূপ গড়ে উঠতে পারতো। এতো দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্যেই বোধ হয় মোহিতলাল আর শেষে কবিতা লিখতে পারলেন না। তবে তাঁর দেহবাদী প্রেমের আত্মমিলনভাবনা পরবর্তী কাব্যে প্রভাব বিস্তার করেছে।

ব্যঙ্গ কবিতা যদিও আমি খুব ভালো চোখে দেখি না, যতীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে তাঁর যে গোপন মনোভাব তির্যকে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে একদিকে যেমন বাস্তব জগতের বস্তুচিত্র উপন্যাসের মতো পাচ্ছি, অন্যদিকে তাঁর চিত্তের অন্তস্তলের গভীর ব্যথার অশ্রু পরোক্ষে ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেয়েছে। এই বক্রোক্তিই তাঁর কবিতার প্রাণ ; ঘৃণা, আনন্দ, বিতৃষ্ণা, হাস্যকর অবস্থা, নিষ্ঠুরতা এ সকলের মধ্য দিয়ে তাঁর একটা সুর ও এ্যাটিচুড প্রকাশ পাচ্ছে। ব্যঙ্গ যতীন্দ্রনাথের কাছে একটা ভান, এই ভানটাকে সরিয়ে দিলেই সমগ্র মানবসমাজ সম্বন্ধে ব্যথার অশ্রু উচ্ছল ধারায় কল্‌কলিয়ে ওঠে, হৃদয়ের জ্বালা ও অভিযোগের জন্যে ব্যঙ্গের আগুন জ্বালিয়ে প্রচলিত আস্তিক্য বোধকে নস্যাৎ করেছেন ; কারণ এই আস্তিক্যবোধের মধ্যে অনুভূতি কিছু নেই। সুতরাং প্রেম ও যৌবনতৃষ্ণা, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যবোধ, সামাজিক সুবিচার ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে ব্যঙ্গ করবার পেছনে এগুলির প্রতি তাঁর সহজ আকুল তৃষ্ণা সক্রিয়। এই দ্বন্দ্ববোধেই তাঁর কবিতার ফর্ম গড়ে উঠেছে এবং ফলে কবিতায়

নূতন স্বাদ এসেছে। ভাষা সৃষ্টির মধ্যেও একদিকে মসৃণ শব্দ অন্যদিকে রুক্ষ শব্দ ব্যবহার করে তাঁর মনোভাবের দ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছেন। 'শ্রাবণে আমন কিছু হয়েছে রোয়া / নূতন পাটের ডগা সবুজে ধোয়া / অবিরল ঝরে জল / কবিদল চঞ্চল / পাকা পথে থাক দেওয়া সাজানো খোয়া /' গ্রামবাংলার শব্দের মধ্যে সবুজ মাঠের যেমন একটা গ্রামীণ স্নিগ্ধ রূপ ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি 'সাজানো খোয়ায়' উল্টো ভাবচিত্র ও আবেগ জাগছে। দেশী শব্দের এহেন ব্যবহার সার্থকভাবে সত্যেন্দ্রনাথও করতে পারেন নি, সত্যেন্দ্রনাথের কবিসত্তা সামাজিক চৈতন্য থেকে উঠে আসতে পারে নি বলেই এমন ব্যঙ্গের মধ্যে আন্তরিকতা প্রকাশ করতে অসমর্থ : 'কেন ভাই রবি, বিরক্ত করো ? তুমি দেখি সব ওঁচা / কিরণ ঝাঁটার হিরণ কাঠিতে কেন চোখে মারো খোঁচা।' এই চিত্রকল্পে দৃশ্যরূপের প্রত্যক্ষ তীক্ষ্ণ বর্ণনার সঙ্গে স্পর্শেন্দ্রিয়ের 'খোঁচা' আমাদের গায়ে এসে বেঁধে, চৈত্র দুপুরের তাপে অনুভব এমনি জ্বালাময়ী প্রকাশ ছাড়া হতেই পারে না। অথচ যখন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন, ভাবের মধ্যে যখন গভীর উচ্চতা সক্রিয়, সেখানে এমনি পাথরকুচি কাঁকর মেশানো ভাষা ব্যবহার করেন নি : 'অসীম জড়ের মাঝে / চেতনাশক্তি ঘুমের ভিতর স্বপ্নের মতো রাজে।' ছন্দ ও চিত্রকল্পও যে কল্পনার দ্বারা হয়ে ওঠে, ফর্মের মধ্যেও যে কবিহৃদয়ের টেন্‌সন কাজ করে 'ঘুমের ঘোরে' কবিতাটি পড়লেই তা বোঝা যায়। কিন্তু এই ভান যখন কেটে গেছে বয়সের স্থিরতায়, কবি তখন প্রেমতৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে আত্মহারা হয়েছেন, কিন্তু এই আত্মহারা বেদনার মধ্যেই বিদ্রোহ ও অস্বীকারের স্মৃতির কাঁটা, তাঁর প্রেমবোধ ও তৃষ্ণাকে, দেহালিঙ্গনের আকুল পিপাসাকে আরো গভীরতর করেছে : 'কবি নহি' কবিতায় আত্মকৃত পাপের বিলাপ আমাদের চিত্তকে বেদনায় আতুর করে তোলে, 'আমার কবিতা তোমরা পড়নি কেহ / পড়িলে কখনো বলিতে না মোরে কবি।/কবি যে হবে সে হবে নিঃসন্দেহ/বাংলায় বোসে ভাবে না সাহারা গোবি / চারিদিকে মোর শ্যামল গন্ধগীতি / কত হাসি মুখ কত স্নেহ কত প্রীতি/আলোছায়া সুখ দুখ / সে সবে আমার নেশা ধরিল না চোখে / মন বসিল না প্রেমের অলকালোকে,/ভরিল না খালি বুক।' এই সব উপাদান যুদ্ধোত্তর যুগে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় দেখতে পান নি বলেই রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদ ও সৌন্দর্যবোধের পরিবর্তে পরিব্যাপ্ত সর্বব্যাপ্ত দুঃখ

প্রচার করেছেন। তাঁর ভাষাসৃষ্টি উপমাছন্দ ও চিত্রকল্পের মধ্যেও এই কবিচৈতন্যের স্বাক্ষর রয়েছে। যতীন্দ্রনাথকে পরবর্তী কবিরা ব্যঙ্গের ও দুঃখের কবি হিসাবে গ্রহণ করেছেন, গ্রহণ করেছেন বাস্তবতার দিক থেকে। কিন্তু এই দুঃখ যে ভালোবাসারই রূপান্তর, আত্মিক মিলনের আকৃতি পরবর্তী কবিতায় সেভাবে কেউ বিচার করেন নি, এই দুঃখ শূন্যতা সৃষ্টি করে না, জীবনকে জড়িয়ে ধরে।

নজরুলের কবি হিসাবে কৃতিত্ব খুবই কম, কিন্তু বাংলার সামাজিক ইতিহাসে চারণ কবির ভূমিকায় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তাঁর মূল্য আছে, তিনি যে যৌবনের জয়গান করেছেন, মুক্ত স্বাধীনতার বাণী সোচ্চারে দৃপ্ত ভাষায় অহংএর ভূমিকায় প্রকাশ করেছেন, তা আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই পাই। তবে কবিতায় অনেক রকম স্তর আছে, সেই স্তর বিষয়ে নয়, ভঙ্গিতে; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যা হয়েছে প্রশান্ত গাম্ভীর্যে সমুন্নত, নজরুলের উচ্চকিত ভাষায় তা কাইনেস্থেটিক অনুভব। কবিতা শুনলেই ভেঙে চুরমার করতে ইচ্ছে হয়। এই কারণেই তিনি জনসাধারণের কবি, বিপুল মানুষকে উত্তেজিত করবার পক্ষে তাঁর কবিতা যথেষ্ট : 'মৃত্যুগহন অন্ধকূপে মহাকালের চণ্ডরূপে / ধূম্রধূপে / বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ংকর / ওরে ঐ হাসছে ভয়ংকর / তোরা সব জয়ধ্বনি কর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর।' তাঁর কবি-সত্তা একমুখীন এবং সরল, উনিশকুড়ি বছরের যুবার কল্পনা-বিদ্রোহে আবিষ্ট, তাই তীব্র বিরোধের জটিলতা নেই, পরিণামের ব্যাপকতা নেই, নেই বলেই হাল্কা রোমান্টিক কবিতার নিটোলরূপে কখনো কখনো তার সার্থকতা উদাহরণীয়, যেমন এই কবিতাটি : 'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর / নমো নমঃ নমো নমঃ নমো নমঃ। 'এই কারণেই হয়তো রবীন্দ্রনাথের পর বাংলাদেশে তিনি সার্থক গীতিকার। পরবর্তীকালের বামপন্থী কবিবৃন্দ তাঁর কাছ থেকে বিদ্রোহের অতিতীব্র ভাষণ অনুসরণের প্রচেষ্টা পেয়েছেন। আন্তরিক ভাষণের সহজ বলদৃপ্ততা পেয়েছেন। এই আন্তরিকতার জন্যেই তাঁর বিশৃঙ্খল কবিতার আবিল উচ্ছ্বাস মাঝে মাঝে আমাদের নাড়া দেয়।

দ্বিতীয় দশকের কবিদের এই বক্তব্য তিরিশের দশকের কবিদের স্থিতধী হতে প্রেরণা দিয়েছে, প্রবল উচ্ছ্বাসের জলের আবিলতা রূপসৌন্দর্যে ঝলমলিয়ে উঠেছে, মোহিতলালের দেহবাদ বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় উপস্থিত, কিন্তু এই

দেহবাদ শুধু বলিষ্ঠ প্রত্যয় নয়, একটা আধ্যাত্মিক মননে দ্বন্দ্ব জাগিয়েছে ; ভাষার উচ্ছলতা অসংযম থাকা সত্ত্বেও দেহ ও মনের, আত্মা ও হৃদয়ের ক্ষতবিক্ষত বেদনা বুদ্ধদেবের মধ্যে ভালেরির পেণ্ডুলামের মতো কাজ করছে, এবং এই পেণ্ডুলামের জন্যেই তিনি সজীব ও সতেজ। 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের ভূমিকায় বুদ্ধদেব একটি চমৎকার কথা বলেছেন, এবং এটাই তাঁর সমগ্র সাহিত্য বোঝবার মূল উপায় : 'এখানে এইটুকু শুধু বলি যে পশ্চিমের গতিশীল তীব্রতার প্রতি আমার আকর্ষণ যেমন দুর্বার, তেমনি আমি রবীন্দ্রনাথের শান্তরসে মুগ্ধ না হয়ে পারি না। এই দ্বন্দ্ব আমার নিত্য সহচর এবং আমি মাঝে মাঝে যে সব ভাবনা বেদনা প্রকাশ করার চেষ্টা করি তারাও এই দ্বন্দ্বের দ্বারা সংক্রমিত।' তাই মোহিতলালের বলিষ্ঠ দেহবাদের প্রত্যয়, দেহ-আত্মার মিলন প্রেমের আবির্ভাবে স্থির বিশ্বাস বুদ্ধদেবকে আধ্যাত্মিকতায় আলোড়িত করেছে : 'থামে না চ্যাঁচামেচি যদি অসম্ভব/ তবে এ তৃষ্ণার কোথায় মূল' 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর'। এই আধ্যাত্মিক মানসিক দ্বন্দ্ব মোহিতলালে নেই, তাই মোহিতলালের চেয়েও বুদ্ধদেব আধুনিক, আধুনিকতার গূঢ় অর্থে। প্রথম থেকেই এটা ছিল, কিন্তু বোদ্‌লেয়ারের সংস্পর্শে এসে তাঁর কাব্যচেতনায় এই চেতনঅচেতনের আধ্যাত্মিকতা আরো সুদূর প্রসারী হয়েছে : **Et je chéris, ô bête implacable et cruelle !** নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে কালচেতনা তাঁকে জটিল করে তুলেছে। এই জটিলতা মোহিতলালে নেই। আর কবিতার প্যাটার্ন ও ভাষা প্রয়োগে, চিত্রকল্পের ব্যবহারে মোহিতলালের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। কথ্য ভাষার সঙ্গে বাক্‌ছন্দের রীতি, প্রতীক ও নির্দেশ, মধ্যমিল ব্যবহার, বিভিন্ন স্তবক চরণ ও পর্বগঠন, গদ্যছন্দ ও গদ্যরীতি অর্থাৎ সবদিক থেকেই নবীন পরীক্ষা করেছেন। একদিকে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ফরাশি জর্মান ইংরেজি যেমন তাঁর চৈতন্যকে ক্রমান্বয়ে সংবেদনশীলতার পথে নিয়ে এগিয়ে গেছে, তেমনি সংস্কৃত সাহিত্যের বাক্‌বিন্যাসও তাঁর কাব্য রচনার বাণীবিন্যাসকে প্রভাবিত করছে। ভাবের দিক থেকে জীবনের অতলান্ত গভীরতায় ও বৈচিত্র্যে তাঁর কবিতা না পৌঁছলেও প্রেমের আধ্যাত্মিকতা ও রচনা নির্মিতির জন্যে তিনি স্মরণীয়। মোহিতলাল সেখানে রচনায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচীন কাব্যপন্থী।

অমিয় চক্রবর্তী বাহ্যত আস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁর চিত্তের গহনগভীর নির্জন অতল প্রদেশের যে কান্না কোমল তরঙ্গে ভেঙে পড়েছে তা গৃহহারা

পথিকের নিরাশ্রয় বেদনা। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে ভৌগোলিক আন্তর্জাতিকতা এনেছে মাত্র। সচেতন বিশ্বাসে রবীন্দ্রনাথের ধারায়ই বলেন প্রচলিত ধারণায় অধার্মিক হলেও প্রকৃতিবোধের মধ্যে ঈশ্বর-প্রীতি নিহিত : 'যদি খোলা চোখে যোগ করো / রাঙা মন / প্রাণে গানে-রাঙা মন ; / খুশি / হ'য়ে দুঃখ সুখ জয়ী, শুধু খুশি / জীবনের মধ্যে থেকে / এই সম্পূর্ণ সবার মধ্যে থেকে।' কিন্তু বর্তমান বিশ্বের অস্থির চঞ্চলতা তাঁকে স্থির হতে দিচ্ছে না, এবং দিচ্ছে না বলেই যোজন যোজন কান্নার ঢেউ তাঁর হৃদয়ে ভেঙে পড়ে, ঘরে ফেরার জন্য আকুল বেদনায় গুমরে কেঁদে ওঠেন। আস্তিক্য বোধ একটা ব্রাহ্ম সংস্কার, কিন্তু বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংঘাতে কবিচিত্তে যেখানে রিয়্যালিটি গড়ে উঠেছে, সেখানে তিনি এ যুগেরই মানুষ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পার্থক্য দৃঢ়তম : 'আমারও নেই ঘর / আছে ঘরের দিকে যাওয়া' ; 'বসুধৈব কুটুম্বকমে'র উপলব্ধি এ নয়। কিন্তু তাঁর কাব্যকৌশলের অভিনবত্ব অপরিসীম, গোপন সুরের কোমল বেদনার চিত্ররূপ গড়ে তুলতে বোধ হয় এযুগে খুব কম লোকই পেরেছেন, তাঁর কবিতার কথার সুর নীরবে কান পেতে শুনতে হয়, তা না হলে সব নষ্ট হয়ে যায়। আধুনিক বিশ্বের কবিতায় আঙ্গিকের যে সব বৈশিষ্ট্য হপ্‌কিন্‌স কামিংস্ এলিঅট পাউণ্ড ইয়েট্‌স ও জয়েসে পাওয়া যায়, সবই ব্যবহার করেছেন অতি প্রচ্ছন্ন সুরের আলাপে, মিতব্যয়িতায় ; জীবনানন্দের ভাষায় 'অমিয় চক্রবর্তী আঙ্গিকের একটা বিচিত্র আবহ।' কবিতায়ও যে চেতনা-প্রবাহ কতখানি প্রকাশ করা যায় এই দুটি পঙক্তিতে তার প্রকাশ : 'সোনার ধান মাঠে বলিষ্ঠ হাত হৈ হৈ বলদ ক্ষিদে চাষের ফল চড়া রোদ্দুর ভরা রোদ্দুর মাটিতে জল।' যদিচ ছেদ বসালেই এর অর্থ সুস্পষ্ট হয়, কিন্তু ছেদ বসাতে বলছেন পাঠককে, পাঠকের কল্পনাই ওপরই তাঁর বিশ্বাস। মিলের জটিলতা, বিন্যাসের বিশৃঙ্খলা, উল্লম্ফনের আকস্মিকতা, গদ্যপদ্যের মিশ্রণ, পর্বের চরণের ও অক্ষরের সমতার সঙ্গে অসমতা, একই কবিতায় ফরাশি ফ্রি-ভর্সের মতো তিনছন্দের ব্যবহার, অক্ষর সাজিয়ে ছবি গড়ে তোলার ইচ্ছা—আরো কতো প্রবণতা যে অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে আছে আধুনিক কবিরা তা দেখে বিস্মিত হতবাক হবেন। আঙ্গিকের এই আধুনিকতা তিনি সারা বিশ্ব থেকে আহরণ করেছেন। এইখানেই একটা প্রশ্ন জাগে : আস্তিক্য বুদ্ধির প্রশান্ত বৈরাগ্য যদি মিলনের বেদনা জাগাবার চেষ্টা করে, তাহলে প্যাটার্নের এতো চঞ্চল

অস্থিরতা কেন, একি শুধু রূপের বৈচিত্র্যকে উপভোগ ও আস্বাদ করবার জন্যে, না কি গভীর সত্তাকে বিভিন্নভাবে দেখবার জন্যে? এই প্যাটার্নের চঞ্চলতার মধ্যেও তাঁর আধুনিক মনের অস্থিরতা কাজ করছে।

সুধীন্দ্রনাথের নশ্বরতা ও ক্ষণিকধর্মিতা এ যুগেরই দান, রবীন্দ্র ঐতিহ্য স্বীকার করেও ভাবের দিক থেকে, দার্শনিকতার দিক থেকে একান্ত আধুনিক, তাই সোচ্চারে বলে উঠেছেন 'নঙর্থক, সবই নঙর্থক'। লাসকাটা ঘরে বিপন্ন বিস্ময় যেমন ক্লান্তি এনে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়, এই নশ্বরতাও তাই। তেমনি জগতের নিয়ন্তাও সুধীন্দ্রদত্তের কাছে খোঁড়া রাখাল, মেষপালরূপী মানুষ চরাবার দায়িত্ব তার নেই। দুচোখে সোনার স্বপ্ন ফাঁকি বলে মনে হয়, আর বেলা পড়ে এলে 'অমার সরিৎ' পৃথিবী ডোবায়, এই পরিবেশে মৃত্যুই স্বাভাবিক; 'অবশ্য অপ্রতিকার্য অন্তিম কুম্ভক / অনুত্তার্য নাস্তির কিনারা; বৈকল্যের যড়যন্ত্রে তুল্য মূল্য তুঙ্গী ধ্রুবতারা / ও মগ্ন চুম্বক।' নিরাশ্রয়তা 'নষ্টনীড়' কবিতায় দুটি চরণে সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে: 'কৃষ্ণচূড়া নিষেধে মাথা নাড়ে / কুলায় খোঁজে শুক।' লোমশ মুনির প্রমাজ্ঞানও আজ মৌন, পৃথিবীর যখন এরকম অবস্থা তখন শুক পাখির নিরুদ্দেশ ঘোরার কোনো মানে হয় না। পৃথিবীর এই অনাত্মীয় অমায় বেঁচে থেকে লাভ কি? জীবনের এই অনিকেত মনোভাব সুধীন্দ্রনাথের নিজস্ব এতে সন্দেহ নেই, কিন্তু পৃথিবী যে দুঃখময়, সুখ বলে কিছু নেই, এ ধারণা যতীন্দ্রনাথই দিয়েছেন, এবং সেই ধারণাই দার্শনিক গভীরতায় শূন্যতার ভেতরে পরিণতি লাভ করেছে। এই নাস্তিবাদের নিঃসঙ্গতা আমাদের সমস্ত চৈতন্যকে হিম শীতল করে দেয়। তবে নাস্তিবাদের সঙ্গে ক্ষণবাদ সুধীন্দ্রনাথে যোগ সাধিত হয়েছে বলে মনে হয় না। 'দশমী' কাব্যেই একসঙ্গে নাস্তিত্ব এবং অন্যদিকে ক্ষণবাদের ঘোষণা রয়েছে। এর কারণ হয়তো এই নাস্তিবাদের মধ্যে অহং পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়, ক্ষণবাদের মধ্যে অহং থেকেই যায়। এই অহংকে অস্বীকার করবার শক্তি সুধীন্দ্রনাথের বুর্জোয়া আভিজাতিক মনে কিছুতেই স্থান পায় নি। হয়তো এখানেই তাঁর কবিসত্তার স্থিতি। এই ক্ষণবাদ এবং নাস্তিত্ববোধ তাঁর ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন-ধারা থেকে এসেছে কিনা এর কোনো স্পষ্ট স্বাক্ষর নেই, কিন্তু যুগের বিস্তৃত অমা যে তাঁর চৈতন্যকে প্রভাবিত করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। দর্শনের এই নিঃসঙ্গতার দিক থেকে তিনি যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি কবিতার রূপগঠনের দিক

থেকেও সুধীন্দ্রনাথের কবিতা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। প্রতিটি চরণ সুবিন্যস্ত, যতিচ্ছেদে অর্থবহ, প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সুপ্রযুক্ত, শব্দের ও অর্থের মধ্যে একটা ব্যবধান রাখতে চান বুদ্ধির সাহায্যে, ধ্বনির ঔদার্যে যে শব্দ কানে ভাসে তার অনেক পরে অর্থ বুদ্ধিকে নাড়া দেয়, যখন নাড়া দেয় তখন তার মধ্যে চিন্তা মনন ও অনুভূতির অলোক বিকিরণ হতে থাকে, প্রতিটি বাক্য পরস্পরের সঙ্গে নিখুঁতভাবে যুক্তিতে সম্পৃক্ত, তার মধ্যে কোনো উল্লম্ফন নেই, ন্যায়শাস্ত্রের মতো ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যায়, এই বিবৃতিমূলক ন্যায়নিষ্ঠ গদ্যকে মাঝে মাঝে রঞ্জিত করে ছবির বিচিত্র বর্ণ, এবং শব্দের প্রতীকধর্মিতা। অতিরিক্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে একটা ধ্বনিগাম্ভীর্য এসেছে, এই ধ্বনিগাম্ভীর্য নাস্তিত্বের পাথরের মতো বিরাট ব্যাপক, শক্ত শব্দগুলি প্রস্তরানুভূতি জাগাতে সাহায্য করে। কিন্তু ক্ষণবাদের চঞ্চলতায় এই জমাট শব্দ লিরিকের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে না। যেটা মিলিয়ে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে, তাকে সেই শব্দের অনুষঙ্গেই ফোটাতে হবে। এর ব্যর্থতার একমাত্র উদাহরণ মালার্মে ও ভালেরির কবিতার অনুবাদে। ভালেরির কবিতার ধ্বনির ইন্দ্রিয়-সংবেদনাই অর্থকে দীপিত করে, সেখানে সুধীন্দ্রনাথ শব্দগুলির বিচ্ছিন্নতায় একটা স্থবিরতা এনেছেন, এবং ফলত মূলের সঙ্গে ব্যবধান রচনা করে। শব্দের এতো সংক্ষিপ্তি ও যুক্তি শৃঙ্খলা হয়তো রবীন্দ্রপরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্যেই ঘটেছে। তবু বলবো, সুধীন্দ্রনাথ পাঠ্য দর্শনের জন্যে নয়, তাঁর শব্দের ব্যক্তিক অনুভূতির জন্যেই। যদিচ কবিতার সমগ্র অরণ্য বিচ্ছিন্ন শব্দের বৃক্ষে হারিয়ে যায়।

নজরুল সচেতনভাবে কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন হয়ে কবিতা রচনা করেন নি, কিন্তু তাঁর সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে সাম্যবাদ তাঁর কবিসত্তার সঙ্গে একসঙ্গে মিলে গেছে। এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা, সেই যুগের অত্যাচার পীড়ন শোষণ সাম্রাজ্যবাদিতা তাঁকে বিশেষভাবে মানবদরদী করে তুলেছে। এই শ্রেণীগত মানবতার দিকটা প্রকাশ পেয়েছে বিষ্ণু দে'র কবিতায়, বুদ্ধিজীবী কম্যুনিস্টের মনোভাব নিয়ে সে যুগের শ্রেণীগত চরিত্রের ও যুগের পীড়িত অবস্থাকে প্রকাশ করেছেন। মানব দরদের চেয়ে বুদ্ধিটাই কাজ করেছে বেশি, এই বুদ্ধির বশেই এলিঅটের অনুসরণে আন্তর্জাতিক হয়েছেন, মার্কস্‌বাদের প্রভাবে সমাজ ও ইতিহাস সচেতন হয়েছেন, ব্যক্তির বদলে সমষ্টির ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

বুদ্ধির সাহায্যেই তিনি গ্রামীণ সংস্কৃতিকে আহরণ করে প্রতীকের মতো কাজে লাগিয়েছেন। প্রেমের ক্ষণ নশ্বরতা জীবনের ও সংগ্রামের আবেগে নদীর স্রোত পেয়েছে। বক্তব্য খুব একটা নতুন নয়, কবির আন্তরিকতার বদলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে, সংশ্লেষণের পরিবর্তে রূপসৃষ্টিতে জাদুর বদলে সচেষ্ট ঐকতানের প্রয়াস লক্ষণীয়, খণ্ড খণ্ড চিত্রের মধ্য দিয়ে একটা সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরবার প্রবণতা রয়েছে, গীতিকাব্যের মধ্যে নাটকীয় সংলাপ, অতি পরিমিত বাক্‌মিতি, নিজের স্বরের মধ্যে পরের উক্তির নির্দেশ বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি এনেছে। এই সঙ্গে ব্যঙ্গের তর্ক, উল্লম্ফনরীতি, পদের বিশৃঙ্খলা, একই কবিতায় বিভিন্ন পাশ্চাত্যছন্দের ব্যবহার, পাশ্চাত্যের বিভিন্ন কাব্যরীতির সচেষ্ট অনুকরণের মধ্যে তিনি অবশ্য স্মর্তব্য । তাঁর সচেষ্ট কারুশিল্পের মধ্যে ইন্দ্রিয়বেদনার রঙের পরিবর্তে যেটি আমাকে প্রথমেই আকৃষ্ট করে সেটি হলো কথায় সংগীত ও সুর, কথার ছন্দের সুরে তাঁর প্রেরণার ও বক্তব্যের সব ত্রুটি ঢেকে রাখতে পারেন। যদিও শেষের দিকে এই জাতীয় উল্লেখ নির্দেশ, ইম্‌প্রেশনচিত্র, নাটকীয়তা, দুর্বোধ্যতা সহজ গীতিকবির আন্তরিকতায় রূপান্তরিত, কিন্তু পরিবর্তন তেমন কিছু নেই, এবং শিল্পচৈতন্যের গভীরে তাঁর যে অনলস প্রচেষ্টা, যে প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নতুন ফর্মের ও সুরের সৃষ্টি হয়, তা আর লক্ষণীয় নয়। সাধারণ পাঠক হয়তো 'ক্রেসিডা' 'ঘোড়সওয়ারের' চেয়ে একালের কাব্যকেই বেশি পছন্দ করবেন। কারণ বুদ্ধির বিভেদের চেয়ে আন্তরিকতায় আলিঙ্গন করতে চায়। কিন্তু বিষ্ণু দে'র পরিচয় পূর্বের কবিতার ফর্মেই, পরে পরিবর্তন লক্ষণীয়।

একথা অবিসংবাদিতভাবে সত্য, তিরিশের দশকে রবীন্দ্রোত্তরকালে জীবনানন্দই ভিশন-প্রাপ্ত একান্ত সৎকবি। ক্রোচের শিল্পই হচ্ছে প্রকাশ, অর্থাৎ বিষয়বস্তু ও রূপগঠন তাঁর কাব্যে এমন মোহময় জাদু তৈরি করে, যাতে তাঁর কবিব্যক্তিত্ব মুহূর্তে চিহ্নিত হয়ে যায়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তাঁকেও আমি 'কবির কবি' বলি, তবে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় যে তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে 'অভ্রান্ত শিল্পবোধের অভাব' দেখেছেন, আমার তা মনে হয় না। তাঁর এলিয়ে-পড়া, গলে-পড়া, মিশে-যাওয়া ধূপের ধোঁয়ার গন্ধের মতো বিলীয়মান অনির্দেশ্যতা যে ভাবে শব্দের সাধুচলিত ক্রিয়াপদে ও পূর্ববঙ্গের শব্দে প্রকাশ পেয়েছে, তা তাঁর কবি চৈতন্যের চিত্রিত

প্রকাশই। কাণ্টের উদ্দেশ্য এখানে প্রকৃতির নিয়মে একাত্ম হয়ে গেছে। বক্তব্যের দিক থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা দেশের সমগ্র মানসিকতা স্ফটিক বিন্দুর মতো তাঁর কাব্যেই প্রকাশ পেয়েছে।[১] বিচ্ছিন্নতা বোধের সঙ্গে শূন্যতাবোধের অপরিসীমা, ক্ষয়বোধের সঙ্গে অচিরতার্থ ও অপরিতৃপ্ত প্রেমের হাহাকার, তাঁকে যেন বারংবার মৃত্যু চেতনায় টেনে নিয়ে গেছে, ক্লান্তির মধ্য দিয়ে তিনি মৃত্যুর গভীরতায় এসে পৌঁছেছেন। 'পৃথিবীর গভীরতম অসুখ' থেকেই মৃত্যু, তিনি হৃদয়ের মধ্যে দেখেছেন 'নষ্ট শশা পচা চালকুমড়ার ছাঁচ', প্রেমের ক্ষেত্রে দেখেছেন 'দেহ ঝরে—ঝ'রে যায় / মন তার আগে।' তাই 'কবরের থেকে শুধু আকাঙ্ক্ষার ভূত লয়ে খেলা'। হয়তো এই বোধ থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন নিসর্গপ্রীতির মধ্যে, অতীতের প্রেম সৌন্দর্য-বিহ্বল জীবনের মগ্ন অনুভূতিতে, ইতিহাসবোধ ও সময়চেতনার দীর্ঘ প্রসারে। কিন্তু বক্তব্যে জীবনানন্দকে চেনা যায় না, আর এ বক্তব্য তিনি নজরুল মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ থেকেও পান নি, তাঁদের কয়েকটি চিত্র-কল্প ও ছন্দের ভঙ্গি হয়তো প্রথম জীবনে নিয়েছিলেন, হয়তো অতীতচারী সৌন্দর্যমুগ্ধতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু মিল আছে, কিন্তু তিনি যে ঘন ইন্দ্রিয়ের অরণ্যে করুণ বিষাদময় সুরের জাদুতে, সমষ্টিগত অবচেতন থেকে বিচিত্র বিভিন্ন চিত্রকল্পের ব্যবহারে, বিভিন্ন সংবেদনার একত্র সমাহারে তাঁর আত্মমগ্ন মনের গভীর বেদনা সঙ্কেতের কুহক আলোয় পাঠকের চিত্তকে বিস্ময়-উন্মাদনা ও বিবশ করে দিতে পারেন, এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। ভালেরি বলেছিলেন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো ধ্বনি ও অর্থের দোদুল্যমানতা কবিতার শব্দে থকে, জীবনা-নন্দের শব্দে এর প্রতিফলন অস্বাভাবিক। তাই তাঁর কবিতা একসঙ্গে দুটি তিনটির বেশি পড়া যায় না, স্তব্ধ বিষাদে মৌন হয়ে থাকতে হয়, সমগ্র বিশ্বজগৎ যেন মনের মধ্যে স্মরণের চিহ্ন বয়ে স্তূপীকৃত হতে থাকে। তিনি সার্থক শিল্পী বলেই তাঁর মধ্যে শুধু সেজান প্রবর্তিত ইম্‌প্রেশনিজম নয়, এ যুগের সমস্ত ইজম্‌ই আত্মস্বীকরণে দানা বেঁধে উঠেছে, সমস্ত শব্দ প্রতীকিত হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতা পড়ে বারবারই আমার মনে হয় হেমন্তের শাদা সকালে শিশির-পড়া স্তব্ধ কালোজলে শ্যামল গাছের ছায়ায় গন্ধের আলো ঘন রঙিন সুরের জাদু অবচেতনার গভীর অবচেতনায় আমাদের বেদনা-মাখা হৃদয়কে বিবশঅবশ করে দেয়; আমরা সেখান থেকে মুক্তি পেতে পারি না,

চাই না, তাই সকলে প্রভাবিত হতে চায়, কিন্তু প্রভাবিত হবার অক্ষমতা অপরিসীম।[২]

এঁদের কবিতার ধারাই যুগের নতুন উপাদানে মিশেছে, চল্লিশ পঞ্চাশ ষাটের দশকে তার চিহ্ন লক্ষ্য করা যাবে, কি ছন্দে, কি ভাবে।

২.

বিদেশি কবিতা এবং আমরা

এলিঅট পাউণ্ড-এর ঋণ স্বীকার করে বলেছেন যে আমি যখন নিজেকে পরিতৃপ্ত মনে করি তখন দেখতে পাই প্যাউণ্ড-এর কবিতা থেকে কিছু প্রতিধ্বনি আমি ধরেছি। আমাদের যুগের ও পরের যুগে যাঁরা কবিতা লিখছেন আমি ভাবতে পারি না তাঁদের কারু কাব্য (যদি কোনো কাব্য ভালো হয়)পাউণ্ডের কবিতার অনুশীলনের দ্বারা উন্নত হয় নি। এলিঅটের নিজের ঋণ সম্বন্ধে এই উক্তির সঙ্গে পঞ্চাশের মহিলা কবি এলিজাবেথ জেনিঙস্‌ের একটি উক্তি অবশ্য স্মরণীয় : 'এলিঅট অবশ্যই, কার্যত প্রত্যেককে প্রভাবিত করেছেন, যাঁরা আজ কবিতা লিখছেন; কিন্তু তাঁর প্রভাব স্বভাবত অপ্রত্যক্ষ ; তিনি প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতকের ইংরেজি কবিতার ঐতিহ্য ও পরিবেশের অংশ।'

সুতরাং বিশ দশকের এই দুই কবির প্রভাব কিভাবে ও ফর্মে ইংরেজি কবিতায় পড়েছে তার আলোচনা অবশ্যম্ভাবী। শুধু ইংরেজি কাব্যে নয়, সম্ভবত সমগ্র পৃথিবীর কাব্যে এবং বিশেষত বাংলা কাব্যে।

এলিঅটই একটি প্রবন্ধে বলেছেন : 'আমি স্বীকার করি তিনি কি বলেন তাতে আমি সামান্যই কৌতুহলী, কিন্তু কেবলমাত্র তিনি কি উপায়ে বলেন তাতেই কৌতুহলী।'

পাউণ্ড সম্বন্ধে কাব্যের বিচারে সম্ভবত এটাই শেষ বিচার। মবার্লি কবিতার মধ্যে তথাকথিত প্রাচীন ইংরেজি কবিতা ও সমাজের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা ব্যঙ্গ বিরক্তি রাগ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এলেও প্রকৃত বাস্তব অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতা মানুষকে যন্ত্রণার আগুনে দাহ করিয়ে উজ্জ্বল শিখা বার করে,— তা নেই। কাব্যসাহিত্য পড়ে হঠাৎ মনের মধ্যে চমকে যে বোধ জেগে ওঠে, তাকেই প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধি দিয়ে জগৎটাকে বুঝেছেন, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন নি, ফলে তাঁর কবিতা আমাদের নাড়া দেয় না, চমকে দেয়। ডাড্‌লি ফিট্‌সের ভাষায় বলা যেতে পারে : 'ইতিহাস ও সাহিত্য হচ্ছে তাঁর

কাছে চিত্রকল্পের খনি, এবং তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সব চিত্রকল্পের কিছুকে চিরস্থায়ী সুবিন্যস্তরূপে নির্দিষ্ট করে দেওয়া, যার সঙ্গে দর্শনের ও চরম উদ্দেশ্যের কোনো যোগ নেই।' ফিট্‌সের আগে পাউণ্ডশিষ্য এলিঅটই একথা আরো জোর দিয়ে বলেছেন পাউণ্ডের কবিতার ভূমিকায়: 'যাই হোক, কবিতাগুলি শিশু কবিদের আবিষ্কারের পক্ষে খনি।' 'বিচ্ছিন্ন শ্রেষ্ঠত্ব' নামে একটি প্রবন্ধে বলেছেন: 'তাঁর কবিতা পদ্যফর্মের অশেষ নির্দেশিকা পুস্তক। প্রকৃতপক্ষে অন্য কেউ নেই পড়বার।'

সুতরাং আধুনিক কবিরা পাউণ্ডের কাছ থেকে ফর্ম, শব্দে সংগীত ও স্বর, সাংগীতিক ফর্মকে কবিতায় রূপান্তর, প্রসঙ্গ উল্লেখ, নির্দেশ, সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপক ও উদার প্রয়োগ, সাহিত্যে ঐতিহাসিক চেতনা, জাতিতত্ত্ব ও অর্থনীতির দ্বারা গভীরতর বোধ-উদ্দীপনের প্রচেষ্টা, চিত্রকল্পের ব্যবহার, শব্দ ও বাক্যের প্রচণ্ড সংহতি, মুখের কথ্যভাষার ব্যবহার, বিভিন্ন দেশের কাব্যের ফর্মে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ফর্মের মাধ্যমে য়ুরোপ এশিয়া আমেরিকার মিলন—এগুলিই আমরা লক্ষ্য করি। বলা বাহুল্য, কমবেশি এলিঅট 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' পর্যন্ত এগুলি নেবার চেষ্টা করেছেন। আমরা পাউণ্ডের কাছ থেকে সরাসরি, নতুবা এলিঅটের হাত থেকে গ্রহণ করেছি। কিন্তু ফর্মের কৃতিত্ব অবিসংবাদিতভাবে পাউণ্ডেরই। পরবর্তীকালে তিরিশ দশকের ইংরেজ কবিরা প্রকাশ্যে এঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ করলেও গোপনে আত্মসাৎ করেছেন; অডেনে, বার্কারের, ও এম্পসনের কবিতা বিচার করলে তা ধরা পড়ে।

পাউণ্ড যদি না আসতেন এলিঅটের আবির্ভাব সার্থক হতো কিনা সন্দেহ, চিত্রকল্প আন্দোলনেই ভাষার দৃঢ়তা ও কর্কশতা, স্পষ্টতা, সংক্ষিপ্তি, প্রত্যক্ষ বস্তুর ওপর বিশেষ জোর, অসংলগ্ন ব্যক্তিগত ইমোশনের বিসর্জন এলিঅটকে কাব্যরচনায় প্রণোদিত করেছে। জাপানি 'হাইকু' ও 'তঙ্কা' কাব্যফর্ম নিয়েই চিত্রকল্প আন্দোলন গড়ে উঠেছে, এই চিত্রকল্প হচ্ছে রঙে নূতন ভাষা, এর সাহায্যেই একটি চিত্রকল্প কবিতা গড়ে উঠেছে, এই চিত্রকল্পটাই সবার ওপরে থাকে, এবং তার ওপরেই ফর্ম তৈরি হয়, অর্থাৎ অন্য সকলের ওপরে একটি আইডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সাহায্যে শুধু যে ক্ষুদ্র দুই পঙক্তির কবিতা নির্মাণ করা যায় তা নয়, একটি ইমেজকে কেন্দ্র করে নোহ্‌-নাটকের মতো দীর্ঘ কবিতাও রচনা করা যায়, সংগীত এবং গতিতে একটি চিত্রকল্প জোরদার ও

দীর্ঘায়ত হয়। এই চিত্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে 'পয়েট্রি' পত্রিকায় নিজেই বলেছিলেন[৩] : 'বুদ্ধিজাত ও ইমোশনগত জটিলতা সময়ের মুহূর্তের মধ্যে ধরা পড়ে। এইরকম চিত্রকল্পের উপস্থাপনা আকস্মিক মুক্তির বোধ এনে দেয়, সময় ও কালের সীমা থেকে স্বাধীনতার বোধ ঐ আকস্মিক উৎপত্তির বোধ যা শিল্পের শ্রেষ্ঠ কীর্তির উপস্থিতিতে আমরা অভিজ্ঞতায় পাই।'

এর একটি সার্থক উদাহরণ Women Before a Shop

The gew-gaws of false amber and false turquoise attract them
"Like to like nature" : there agglutinous yellows.

দুই পঙক্তির সমস্ত কবিতার মধ্যে মিথ্যে অম্বর ও মিথ্যে নীলপাথরের খেলনার আকর্ষণ, প্রকৃতির মতো এদের প্রতি আগ্রহ, অসম হলুদের মিশ্রণ সব মিলে দোকানের সামনে রমণীদের মানসিকতা প্রকাশ পাচ্ছে, হলুদ রঙের অসম মিশ্রণের সঙ্গে রমণীদের মনের রঙের হলুদরূপী বিবর্ণ-মিথ্যা নামকরণের চিত্রকল্পে বিদ্যুৎগতিতে অভিব্যক্ত। এখানে নামকরণ শুধু নামকরণ নয়, কবিতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অর্থবোধকে গাঢ়তর ও গভীরতর করছে।

এই সতেরো মাত্রার হাইকু কবিতা থেকেই তাঁর চিত্রকল্পের ধারণা গড়ে ওঠে, তাকে প্রয়োগ করেন। হাইকুর মূলগত ভাবাদর্শের সঙ্গে বিরোধ থাকলেও, ধ্বনিসুর না পেলেও ; চিত্রধর্মিতা, সংহতি, সঙ্কেত ইংরেজি কবিতা পরিবর্তনে বিশেষ সহায়তা করেছে। হাইকু কবিতার প্রভাবেই পাউণ্ডের এপিগ্রাম, লিরিক ও এলেজির নূতনরূপ নিয়েছে।

এই চিত্রকল্পের পাশেই অন্য বৃত্তি কাজ করেছে সেটি হলো সংগীত ও সুর। কবিতায় শব্দ ও সুরকে (motz et Son) মেলাবার প্রেরণা পেয়েছিলেন ইতালি ও ত্রুবাদুর কবিতা থেকে। এই সমস্ত কবিতা অধ্যয়ন ও অনুকরণকরেই একথা বুঝেছিলেন যে, যে-কবিরা সংগীত অনুশীলন করে না, তাদের ত্রুটি রয়েছে। সুতরাং সংগীতকারদের কাছ থেকে তাদের কখনোই দূরে থাকা উচিত নয়। এই কারণেই তিনি য়ুরোপীয় সংগীত, ত্রুবাদুর সংগীত, ত্রুবাদুরের সংগীতের মারফত প্রাচ্য সংগীত অধ্যয়ন করেছিলেন, কাব্যে অনুকরণ করেছিলেন। ইতালীয় কান্‌ত্‌শোনের মতো অন্ত্যমিল গ্রহণ করে কাব্যের ফর্মের জটিলতা ও ঐক্য এনেছেন এবং তার সঙ্গে মিল খুঁজেছেন য়ুরোপীয় সংগীতের কাউণ্টার-

পয়েণ্ট রীতির সঙ্গে। altaforte এই রীতিকে পুরোপুরি তিনি উজ্জীবিত করেছিলেন। Na Audiart কবিতাটি শব্দের কাউণ্টার-পয়েণ্ট

Thou wert once she
Audiart, Audiart,
For whose fairness one forgave
Audiart
Audiart
Que be-m vols mal.

পাঁচমাত্রায় আয়াম্বিক সরিয়ে চরণের মধ্যে বিকল্প ও বিপর্যয় রীতি ব্যবহার করে বৈচিত্র্য এনেছেন। এমন কি যখন তিনি ভর্স-লিব্র্ ব্যবহার করেন তখন তাঁর ছন্দস্পন্দকে নিপুণভাবে কাব্যের সংগীতে তুলে ধরেন, তাঁর পঙক্তির গঠন, ছাপাবার বিন্যাস, যতিচ্ছেদ, ফাঁক ব্যবহার ও মিল ব্যবহারের মতোই করে থাকেন নিপুণভাবে, ভাঙা পঙক্তি ও অবিন্যস্ত এলোমেলো পঙক্তি ব্যবহার করে কানে ও চোখের সমতা আনতে চান। ভর্স-লিব্র্-এ এই রীতি তিনি পেয়েছিলেন সংগীতের কাছ থেকে, ইগোর স্ত্রাভিন্স্কি তাঁকে এ পথে প্ররোচিত করেন। তাঁর কবিতার ফর্মের মধ্যে যে absolute rhythm গড়ে উঠেছে তা সোনাতা ফিউগ্, গ্রেট-বাস প্রভৃতি ফর্ম থেকেই গড়ে উঠেছে। তিনি স্পষ্টই বলেছেন : 'এটা দেখানো সম্ভবপর কবিতায় কোনো ছন্দস্পন্দ পরিপূর্ণ ফর্ম নিয়োজিত করে, এ ফর্ম ফিউগ্, সোনাতা। আমি বলতে পারি না কোন্ ফর্ম, কিন্তু নিখুঁত পরিপূর্ণ ফর্ম। সুতরাং কবিতার পঙক্তিতে ছন্দস্পন্দ এর সিম্ফনিকে দ্যোতিত করে। যদি আমাদের সামান্য নৈপুণ্য থাকে তাহলে এই সিম্ফনিকে অর্কেস্ট্রার জন্যে লাভ করতে পারি।' তাই পাউণ্ডের যে সমস্ত কবিতা আমরা প্রচলিত কবিতার ফর্মে পরিণামী ও পরিপূর্ণ ভাবতে পারি না, ত্রুটি বলে মনে করি, তাকে সাংগীতিক ফর্মে ফেলে বিচার করলে এর ছন্দস্পন্দ ভাব ও ফর্ম আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে, কাণ্টোজ এই রীতিতে গড়ে উঠেছে। যেমন ফিউগে (fugue) পরিণাম নেই, সাদৃশ্যবৈসাদৃশ্যে, একটার পর অন্যটা আসার ফলে, রূপান্তরের সাহায্যে সংগীতের ফর্ম চলতে থাকে, বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেই শেষ হয়, তাই এর ফর্ম খুব বেশি বড় হয় না। দু নম্বর কাণ্টো এর সার্থক উদাহরণ।

এলিঅট পাউণ্ডের কাছ থেকেই এই সাংগীতিক রীতি গ্রহণ করেছিলেন, 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' গড়ে উঠেছে গ্রেইল কাহিনীর মিথের আইডিয়ার ওপর, কিন্তু সাদৃশ্যবৈসাদৃশ্যে, সাধারণ থেকে গভীরতায় যাবার রীতিতে তিনি সাংগীতিক রীতিকেই গ্রহণ করেছেন। এই সাংগীতিক রীতির সার্থক রূপায়ন তাঁর 'ফোর কোয়ার্টেট্‌সে'। তিনি নিজেই একটি প্রবন্ধে বলেছেন : There are possibilities for verse which bear some analogy to the development of a theme by different groups of instruments; there are possibilities of transitions in a poem comparable to the different movements of a symphony or a quartet; there are possibilities of contrapuntal arrangement of subject matter. It is in the concert room, rather than in the opera house, that the germ of a poem may be quickened. 'The Music of Poetry'.

এলিঅটের কৃতিত্ব তিনি ফর্ম গ্রহণ করেছিলেন অনুভূতির রূপায়নের জন্যে। তাঁর অনুভূতির মধ্যে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত জীবনের দ্বন্দ্ব জড়িয়ে রয়েছে অন্যদিকে যুগের সর্বজনীন বেদনা ও হতাশা অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকাশ করেছেন, বিরক্তিবিতৃষ্ণা, ভয়ংকরতা এবং তাকে উত্তরণ করেই গৌরবকে ব্যক্ত করেছেন। নরক থেকে আত্মার পুনরুজ্জীবন হয়ে স্বর্গরাজ্যে উত্তরণ যেমন দান্তের কাব্যের মূলকথা, প্রথম জীবনের বিতৃষ্ণা ভয়ংকরতাকে উত্তরণ করেই শাশ্বতকালের আনন্দের মধ্যে প্রবেশ করেছেন এলিঅট; যেখানে আদির সঙ্গে অন্ত, অন্তের সঙ্গে আদি, বর্তমানের সঙ্গে অতীত ও ভবিষ্যৎ জড়িয়ে রয়েছে। বাতাস মাটি জল আগুনের মধ্যেই প্রাণসত্তাকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন, জীবনের শেষ ভ্রমণের স্থান থেকে যাত্রা করে জীবনের জন্মভূমির ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছেছেন। 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ডে'র কাহিনীর মধ্যে মিথের সাহায্যে বর্তমান জীবনের হতাশার ও বন্ধ্যা জীবনকে প্রকাশ করেছেন। প্রতিটি চিত্রকল্পের মধ্যে যুদ্ধোত্তর কালের বীভৎসতা ও রিক্ততাকে প্রকাশ করেছেন, নাগরিক জীবনের ব্যর্থতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন, পাঁচটি খণ্ডিত দৃশ্যের মধ্যে তৎকালীন সামগ্রিক জীবনের চিত্রকে তুলে ধরেছেন, তার সঙ্গে চিত্রকল্পের ভীষণতা ও ব্যর্থতা, স্বাদগন্ধময় ছবি, সংহত সংক্ষিপ্ত ভাষণ, প্রতিটি উক্তির মধ্যে ব্যক্তিগত ও সর্বজনীন বেদনা একই সঙ্গে প্রকাশিত। এই আইডিয়ার প্রকাশ 'ফোর

কোয়ার্টেট্‌স্‌'-এ নেই, এখানে মূল অনুভূতি ও কেন্দ্রবিন্দু বিমূর্তভাবনা, তার সঙ্গে মিলেছে কবির ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা, তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি, ফলে দুয়ের সংস্পর্শে সার্থক কবিতা তৈরি হয়েছে। পূর্বের সংহত সংক্ষিপ্ত নির্দেশাত্মক বাক্যের বদলে স্থান গ্রহণ করেছে সংগীতময় লিরিক বেদনার উচ্ছল প্রকাশ, নাগরিক জীবনের সীমা থেকে বৃহত্তর মানবিক জীবনের ও প্রাকৃতিক জীবনের অনন্ত পটভূমিকায় অনুভূতিকে মুক্তি দিয়েছেন। চিত্রকল্প-গুলির মধ্যে এই ব্যাপ্তি, শাশ্বত জীবনের সঙ্কেত ও অনুভূতি ও ভাবনা আমাদের বহুদূরে নিয়ে যায়, এবং ফর্মের দিক থেকেও একটা বস্তুগ্রাহ্য বৃত্তকে অবলম্বন করেছেন, স্থানকে পটভূমিকায় রেখে বিমূর্তভাবকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। একদিকে স্থানের বৃত্তের মধ্যে বাস্তবতা, কালের চেতনার মধ্যে বিশিষ্টতা, পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তিগত অনুভূতি বাতাস মাটি জল আগুনের চতুর্বিধ সঙ্কেতকে অবলম্বন করে সংগীত ও চিত্রকল্পে ক্রমান্বয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে, অন্যদিকে বিনয়ের মধ্য' দিয়েই করুণার জগতে, করুণাকে অতিক্রম করেই বিশ্বাসের জগতে উপস্থিত হতে হয়; এবং এই বিশ্বাসই ভবিষ্যতের আশাকে জাগ্রৎ করে, এই আশা জগৎকে পুনরুজ্জীবিত করে, জগৎ করুণাপূর্ণ বলে মনে হয়, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ মিলে শাশ্বত কালের অনুভূতি জাগ্রৎ হয়; এই শাশ্বত কালের অনুভূতির মধ্যেই অহংকারের আত্মপীড়নে অনুতাপের মোক্ষণে আশীর্বাদের পূতধারায় নশ্বর ও অনশ্বর জীবনের মিলন ঘটে স্বর্গের উদ্যানে, সেখানে আত্মার মুক্তি, গৌরব। সুতরাং বিনয় থেকে যাত্রা করে আত্মার এই মুক্তির আবিষ্কারই এই কাব্যের মূল কথা।

এলিঅটের কবিতায় ভাবের এই বিবর্তন যেমন চেতনাকে ব্যাপ্ত ও প্রসারিত করে, নাগর জীবনের সংকীর্ণ সীমা থেকে, কলঙ্ক বীভৎসতা গ্লানি বিতৃষ্ণা ভয় থেকে দেশ কালাতীত আত্মার মুক্তিতে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি 'প্রুফর্ক' থেকে আরম্ভ করে 'ফোর কোয়ার্টেট্‌স' পর্যন্ত প্রতিটি কবিতায় এ যুগের সচেতন ফর্ম-চিন্তা শিল্পরূপে প্রকাশ পেয়েছে। প্রত্যেকটি কবিতাই ফর্মের বিচারে নূতন বিচারের অপেক্ষা রাখে, 'জেরোন্‌শিয়নে' চেতনাপ্রবাহ, 'প্রুফর্কে' মেটাফিজি-ক্যাল কবিতার লাফানো ভঙ্গি, নাটকে গ্রীক কোরাস্‌, নাটকীয় সংলাপ, জাজ্‌-সংগীতের স্পন্দন, সংগীতের ফর্ম, লিরিকের উচ্ছ্বাস, ক্লাসিক ধর্মিতা, নির্দেশাত্মক ভঙ্গি—সর্বশেষে ধর্মীয় কবিতায় আদিম চেতনার প্রাণস্পন্দন—সব মিলে তাঁর

কবিতার ফর্মকে সমৃদ্ধ করেছে। এই ফর্মগুলি সম্বন্ধে ভালোভাবে আলোচনা করলেই বোঝা যায়, কেন তিনি বারংবার বক্তব্যধর্মী রোমান্টিক কবিতাকে ফর্মহীনতার জন্যে নিন্দা করেছেন। এবং এইখানেই পাউণ্ডের সঙ্গে এলিঅটের পার্থক্য, ফর্ম তাঁর কাছে শুধু ফর্ম নয়, আলোড়িত চৈতন্যের প্রকাশ।

এই দুই কবির আলোচনার সঙ্গে হপ্‌কিন্‌সের কবিকৃতিত্ব আলোচিতব্য। ভিক্টোরীয় যুগের ভাষার জড়তার মধ্যে সজীবতা এনেছিলেন তিনিই। ভাষাকে কথ্য প্রচলিত ভাষার কাছাকাছি এনেছিলেন, অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ বর্জন করেছিলেন। অন্ত্যমিল, অনুপ্রাস, মধ্যমিল, ধ্বনিসৌকর্য ও পার্থক্য, যুগ্মশব্দ, যমক, বিশেষ্যকে ক্রিয়া ও বিশেষণকে ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহার, আর্টিকেলের বর্জন, ছড়ার ছন্দের ব্যবহার এবং ভাষার অন্য যাবতীয় কারুকার্য এলিঅট ও পাউণ্ডের পূর্বসূরীরূপে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে। সম্ভবত তাঁর কবিতার মধ্যেই আধুনিক কবির দ্বন্দ্ব ও একাকিত্ব প্রথম দেখা দিয়েছে। একদিকে ধর্মীয় জীবনের প্রতি আকুতি নিষ্ঠা ভক্তি, অন্যদিকে ভগবানের কাছ থেকে সরে এসেছেন বলে নির্বাসিতের আত্মবেদনা হতাশা একাকিত্ব ও গৃহহারা মনোভাব তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যা অস্তিত্ববাদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশে এলিঅটের প্রভাব কমবেশি সকলের ওপরই পড়েছে। বিষ্ণু দে সচেতনভাবে এলিঅটকে অনুসরণ করবার পর বামপন্থী কবি গোষ্ঠীর প্রায় সকলেই এলিঅটের কাছ থেকে সরাসরি নতুবা বিষ্ণু দে'র কাছ থেকে চোলাই করে গ্রহণ করেছেন। বিষ্ণু দে এলিঅটের 'ফোর কোয়ার্টেট্‌সে'র জগতে আসতে পারেন নি, কারণ তিনি এই ধর্মীয় জগতে বিশ্বাসী নন, বামপন্থীরা কবিতার যদিচ মার্কসীয় আশাবাদে বিশ্বাসী, তথাপি এঁদের চিত্রকল্প ও ছবিগুলি এলিঅটের সমগ্র কবিতা থেকে নিয়েছেন। অতীত অথবা বর্তমান জীবনের কলঙ্ক গ্লানি যৌনতা হতাশা নির্জনতা বন্ধ্যাত্ব বোঝাতে 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের' নাগরিক জীবনের বীভৎস ভয়ংকর চিত্রকল্প গ্রহণ করেছেন, 'প্রুফর্ক' 'হলো মেন'-এর ছবি নিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কবিতার ভাবের পেছনে 'দি জার্নি অব্‌ দি ম্যাজাই' ১৯২৭, 'মারিনা' ১৯৩০ রয়েছে, পথের বর্ণনায় আছে : A cold coming we had of it, / Just the worst time of the year / For a journey and such a long journey : / The ways deep and the weather sharp ; / The very dead of winter : / And the camels

galled, sore-footed, refractory / Lying down in the melting snow......And the cities hostile and the towns unfriendly / And the villages dirty and charging high prices. এবং এই পথ অতিক্রম করবার পরেই Then at dawn we came down to a temperate valley, / Wet below the snow line, smelling of vegetation ; / With a running stream and a water-mill beating the darkness / And three trees on the low sky, / And an old white horse galloped away in the meadow. এই ভ্রমণ শেষে জন্মমৃত্যুর উপলব্ধির মধ্যেই নূতন প্রত্যয়ের অনুভূতি দৃঢ় হচ্ছে, মৃত্যু যেমন জন্মকে সূচিত করছে, এই জন্মও তেমনি মৃত্যুর মতোই আমাদের কাছে কঠিন ও তিক্ত মনোবেদনার প্রকাশ। সুতরাং নূতন অনুভূতিতে পৌঁছনো ব্যাপারটা সহজ নয় এবং দুশ্চর তপস্যার মধ্য দিয়ে আসতে হয় বলেই এই নব লব্ধ অনুভূতির তাৎপর্য আমাদের আক্রান্ত করে। তেমনি আশা ও ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা বোঝাতে এই সব চিত্রকল্পও বামপন্থী কবিতায় পাওয়া যায় : Lord, the Roman hayacinths are blooming in bowls and / The winter sun creeps by the snow hills ; / The stubborn season has made stand. / My life is light, waiting for the death wind./Like a feather on the back of my hand. এবং 'মারিনা' কবিতায় সমুদ্রযাত্রার শেষে সমুদ্রে দ্বীপ আবিষ্কার এবং সেখানে আবার প্রিয় মুখের দর্শন এলিঅটের কাছে খ্রিস্টীয় পুনরুজ্জীবনের মন্ত্র হলেও বাংলায় নূতন জীবনের প্রতীক হয়ে উঠেছে : This form, this face this life/ Living to live in a world of time beyond me, let me/ Resign my life for this life, my speech for that unspoken,/The awakened, lips parted, the hope, the new ships./What seas what shores what granite islands towards my timbers/And wood thrush calling through the fog/My daughter. 'ফোর ফোয়ার্টেট্‌স্‌' থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সময়, চেতনা অভিজ্ঞতাকে ধার করে নেয়া হয়েছে চিত্রকল্পের জন্যে। এঁদের কবিতায় 'পাথর' 'জল' 'বালি' 'মরুভূমি' 'রুগী' 'ফণিমনসা' 'সূর্য' 'নদী' 'সমুদ্র' 'চাঁদ' একটা প্যাটার্ন নিয়ে এসেছে

এলিঅটের তাৎপর্যকে বহন ক'রে। বর্তমান জীবনের যন্ত্রণা তিক্ততা ব্যর্থতা বোঝাতে বিষ্ণু দে এলিঅটের অনুসরণে ফণিমনসার চিত্রকল্পের ব্যবহার করেছিলেন, আশ্চর্যের বিষয় এই চিত্রকল্প সমর সেন রাম বসু কৃষ্ণ ধর এবং আধুনিক তরুণ কবিদের রচনায় প্রতিফলিত হচ্ছে। ফলে চিত্রের ব্যঞ্জনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 'প্রুফর্ক' 'জেরোন্‌শিয়ন' 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' 'হলো মেন'-এ ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলি অধিকতর প্রেরণা জুগিয়েছে। তুলনামূলক আলোচনা করলে তা ধরা পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে লেখক কবিরা শেক্‌স্‌পিয়র পড়ে প্রেরণা পেতেন, এ যুগের কবিরা এলিঅট পড়ে বা তাঁর ভাব চোলাই করে প্রেরণা লাভ করেন। এলিঅটের মাধ্যমে আমরা আজকাল শেক্‌সপিয়রকে বুঝতে চেষ্টা করি। এটা যেমন একটা গোষ্ঠীর প্রেরণা, অন্যদিকে উল্টো রীতিও আছে।

এলিঅটের প্রথাসিদ্ধ সর্বজনীন শাশ্বত অনুভূতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে আপনার অনুভূতি ও প্রত্যয়কে মিলিয়ে দিয়ে প্রসারিত করতে চেয়েছেন, কি 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ডে', কি 'ফোর কোয়ার্টেট্‌সে', কিন্তু বক্তিগত অনুভূতির সাহায্যে সর্বজনীন অনুভূতিকে মিলিত করবার প্রয়াস সর্বশেষ লিরিক রোমাণ্টিক কবি ইয়েট্‌সের মধ্যে। এলিঅট 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' ও 'মারিনা' কবিতায় মিথের সাহায্যে বক্তব্য বলেছেন, মিথের মধ্যে এলিঅট প্রবেশ করেছেন, কিন্তু ইয়েট্‌সের কবিতায় মিথ্‌ প্রবেশ করেছে, ইয়ট্‌সের কাব্য রচনায়, 'রাজহাঁস ও লেডা' তার সার্থক উদাহরণ। প্রথম যুগের মিথ্‌ ও কিংবদন্তীমূলক কাহিনীর মধ্যে ইয়েট্‌স শুধু আপনার মর্জির কথাই বলেছেন, তাৎপর্য ঐখানে ; পরবর্তীকালের কবিতায় মিথ্‌ ও বাস্তবজীবনের পারস্পরিক সহাবস্থান, অতীত বর্তমানের পার্থক্য, বৈসাদৃশ্য, বাস্তব ও বর্তমানকে প্রসারিত তাৎপর্য ও নিবিড় করবার জন্য মিথের ব্যবহার ইয়েট্‌সের কবিতার সাঙ্কেতিক মূল্য মারাত্মক বাড়িয়েছে। বিরোধী-ভাব চিত্রসঙ্কেতের সাহায্যে কবিতার জটিলতা বেড়েছে। এখানেই রোমাণ্টিক কবিদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। রোমাণ্টিক কবিদের কাব্য একমুখী, উচ্ছ্বাস-প্রবণ, বক্তব্যধর্মী, উচ্ছৃঙ্খল কিন্তু ইয়েট্‌সের কাব্য কঠিন, সুদৃঢ়, শৃঙ্খলাবদ্ধ, পরিণামী, গতিবান, সংহত, সংযত, সঙ্কেতময়, চিত্রকল্পবহুল, প্রতীকী কবিতার সংগীতময় আদিম জাদু ইয়েট্‌সের কবিতার অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ; অর্থ-বহুল ধ্বনিময় সংগীতের অনির্বচনীয় আদিম জাদু তাঁর কবিতাকে শিল্পের

বিচারে শ্রেষ্ঠ করে তুলেছে, তিনি বলেছেন প্রতিভার শক্তি হচ্ছে ঐক্য আনা, 'ট্যালেণ্ট' বা বুদ্ধির ক্ষমতা হচ্ছে পার্থক্য বোঝা। এই প্রাতিভ ক্ষমতায় ভাবের সঙ্গে আইডিয়া চিত্রকল্প সংগীত মিল ছন্দস্পন্দ নিপুণ বাঁধনে বেঁধেছেন। তিনি শব্দের অর্থের চেয়ে সঙ্কেতকে অধিকতর মূল্য দিয়েছেন যেমনি, তেমনি সংগীতের জাদুকে স্বীকার করেও অর্থহীনতায় পৌছন নি। সুতরাং শব্দে সঙ্কেতের প্রাধান্যে যেমন রোমান্টিকদের থেকে পৃথক, মালার্মের পথ অনুসরণ করে শব্দের ব্যায়ামে পার্থক্য রেখেছেন; তেমনি অর্থবহুল স্পষ্টতার দিক থেকেও প্রতীকী কবিতা থেকে পৃথক। অথচ দুয়ের সদ্‌গুণের সমন্বয়ের সাহায্যেই তাঁর কবিতার জটিলতর সঙ্কেত তাৎপর্য অপূর্ব সংগীতময় হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ কবিতায় তাঁর ভাষা কথ্য ভাষাকে অনুসরণ করেছে, তার ছন্দ ও রীতি অবলম্বন করেছেন, ভাষার সতেজ রূপ ধরা পড়েছে, ভাষা যুক্তিতে স্পষ্ট হয়ে কঠিন হয়েছে, এই কথ্য ভাষার দৃঢ়তা যুক্তিকে স্বীকার করার পেছনে এলিঅটের ও পাউণ্ডের প্রভাব হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু তাকে ব্যক্তিগত লিরিক কবির অভিজ্ঞতায় জারিত করে শিল্পরূপ দিয়েছেন।

তাঁর জীবনদর্শন ব্যক্তি অভিজ্ঞতারই পরিণাম। রোমান্টিকদের মতই তিনি বলেছেন, Literatue is always personal, always one man's vision of the world, one man's experience. কিন্তু যখন তিনি Mask বা মুখোশতত্ত্ব বিবৃত করেন, তখন তাঁর ব্যক্তিঅভিজ্ঞতার ও সত্তার মধ্যে দুই বিরোধী কবিসত্তার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে অহরহ। অন্তরের শান্ত নির্জনতার হৃদয়উপলব্ধির সঙ্গে বাইরের জীবনের কঠিন সংগ্রামের মিলন ঘটে, একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার একক সত্য নেই, দুটিকে একসঙ্গে মিলিয়ে নিলেই পরিপূর্ণ সত্য, তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতার অপার শান্তি তাঁর পছন্দ নয়, কারণ তা রোমান্টিকদের মতোই একমুখীন ও একপেশে, উপনিষদের বিদ্যা-অবিদ্যা তত্ত্বের মতোই তাঁর মুখোশতত্ত্ব। তাঁর মতে সব মানুষই জটিল, মানুষের ধমনির মধ্যে কাদা ও প্রচণ্ড উষ্ণতা একসঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, এই দ্বন্দ্ব থেকে মানুষের মুক্তি নেই, মুক্তি নেই বলেই তার যন্ত্রণা বেশি। এই যন্ত্রণার উপশম হয়তো প্রাচীন জগতের পাশ্চাত্য শিল্পের মধ্যে, যেখানে জটিলতা চলে যায়, থাকে শুধু : Dying into a dance/An agony of trance/And agony of flame that can not singe a sleeve. চিত্ত যতক্ষণ আদর্শ শিল্পের

জগতে পৌঁছতে পারছে না, ততক্ষণ জটিলতাকে এবং দুই বিরোধী সত্তাকে একই ভাবে অনুভব করে যন্ত্রণাবিদ্ধ হতে হয়। এই বিরোধী-সত্তাকে স্বীকার করবার ফলেই একদিকে যেমন কবিতার মধ্যে ভাবের জটিলতা তাৎপর্যবাহী হয়, অন্যদিকে কবিতার বহিরঙ্গ রূপগঠনে দৃঢ়তা, স্পষ্টতা ও নিবিড়তা আসে, কবিতার ভাবের মধ্যে যে সত্তা কাজ করছে, বহিরঙ্গরূপে তার উল্টো সত্তা, এই দুই সত্তার সমন্বয়েই কবিতা সৃষ্টি, Style, personality—deliberately adopted and therefore a mask is the only escape from the hot faced bargainers and the money changers. তাঁর ভিশন বা দৃষ্টির মধ্যেও আটাশ চক্রের পূর্ণসত্তায় চাঁদ ও সূর্যের পূর্ণ মিলন ঘটে। বক্তিগত জীবনে শুধু নয়, দেশের কালের ইতিহাসে সর্বত্র এর রূপ লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং এই মুখোশই হচ্ছে ইয়েট্‌সের কবিতার ভেতরে ও বাইরের প্রাণ। সমস্ত বিরোধকে স্থাপত্যের ঐক্যে বিধৃত করাই হচ্ছে কবিতা, সমস্ত উপাদানকে একটি সামগ্রিক শব্দে (an entire word) পরিণত করবার মধ্যেই শিল্পের সিদ্ধি। বোদ্‌লেয়ারের 'প্রতিষঙ্গ' কবিতার মতোই বলেছেন যে ধ্বনি রঙরূপ অনুষঙ্গ ও অন্যান্য শক্তির সাংগীতিক সম্পর্কের ফলে একটি নির্দিষ্ট অনুভূতিকে জাগ্রৎ করে, যার ফলে শিল্পজাত সঙ্কেত তৈরি হয়।[৪] তাঁর মতে সঙ্কেতের জন্যে কবিতা আমাদের অভিভূত করে। এই কারণেই ইয়েট্‌সের উপমা চিত্রকল্প সঙ্কেত সংগীত একই সঙ্গে নিসর্গের ফসলের মত উপস্থিত হয়। এই কারণেই তিনি লিরিক কবি হয়েও লিরিক কবি নন, রোমাণ্টিক হয়েও রোমাণ্টিক নন। 'গাছ' 'পাখি' 'মিনার' 'সমুদ্র' 'বাড়ি' 'মুখোশ' 'গোলাপ' এগুলি চিত্রকল্পের মধ্যে ব্যবহৃত হলেও সঙ্কেতের তাৎপর্যে বহুমুখীন অর্থে সুদূরতা প্রাপ্ত হয়েছে।

ইয়েট্‌স ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণতার পথে এগিয়েছেন, তাঁর কাছে কোনো নির্দিষ্ট আদর্শপ্রত্যয় ছিল না, যার মধ্যে তিনি প্রবেশ করতে পারেন, বরং তিনি অভিজ্ঞতার পথে প্রত্যয় ও আদর্শকে তৈরি করে নিয়েছিলেন। তিনি নিষ্পাপবোধ, সৌন্দর্য, ঐতিহ্য ও মহান্‌কে বারংবার কাব্যের মধ্যে তুলে ধরতে চেয়েছেন, প্রেম সৌন্দর্য আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর প্যাশনে প্রকাশ করেছেন, তিনি রিক্ত প্রেমিকের বেদনা হতাশ সুরে গেয়েছেন, তিনি গেয়েছেন শাশ্বত শিল্পের চিরন্তন গান। কিন্তু এগুলি রোমাণ্টিক লিরিক কবির মতো প্রকাশ

করেন নি, তাঁর কবিতার সার্থকতাই হলো এখানে বস্তুজীবনের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর মনের ঐ তীব্র আকাঙ্ক্ষাগুলি প্রচণ্ডতর শক্তি পেয়েছে, ফলে বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্বময় প্রকাশেই তাঁর কবিতার রূপনির্মিতি। এ যুগের হতাশা গ্লানি রিক্ততা বেদনা অনিকেত মনোভাব রাজনৈতিক পটভূমিকায় নোংরামি এলিঅটের মতো সোজাসুজি মিথের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারেন নি, করেছেন ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার সাহায্যে ও সংঘর্ষে। এলিঅট বস্তুধর্মিতার প্রতিনিধিস্থানীয় কবি, ইয়েট্স মন্ময় কবিতার প্রতিনিধিস্থানীয় সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তি-অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে জ্ঞান, এই জ্ঞান নিষ্পাপের ওপর জয়লাভ করে ভীষণতার সাহায্যে। লেডা যখন জিউসকে বুকে নিয়েছিল, তার উরু শিথিল করে দিয়েছিল, তখন জিউসের প্রেম নয়, জিউসের কাছ থেকে ভীষণতাই সে পেয়েছিল, এবং ভীষণতার অভিজ্ঞতায় তীব্র দৈহিক মিলনের মাধ্যমে হৃদয়স্পন্দন অনুভব করেছিল, এই ভীষণতা-জাত হৃদয়স্পন্দনের মধ্যেই জ্ঞানের বা অন্তর্দৃষ্টির আবির্ভাব, যার সাহায্যে ভবিষ্যৎ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায়। লেডা ও জিউসের সংগমে যার জন্ম তা ইতিহাসে ধ্বংসের বীজ সৃষ্টি করেছে, ট্রয়ের যুদ্ধ ঘটিয়েছে একদিকে, অন্যদিকে প্রেমের বিশুদ্ধ অনুভূতিকে জাগ্রৎ করেছে, এই প্রশ্নই ইয়েট্স লেডাকে জিজ্ঞেস করেছেন: Did she put on his knowledge with his power. / Before the indifferent beak could let her drop? অর্থাৎ শরীর ও মনের দ্বন্দ্বে এবং সংগমে কি দৈব জ্ঞান অর্থাৎ জিউসের জ্ঞান লাভ করা যায়? সারা জীবন ইয়েট্স এই প্রশ্ন করেছেন, কখনো বলেছেন হয়, কখনো বলেছেন হয় না। কিন্তু শরীর ও মনের দ্বন্দ্ব ও সংগম, পশুর যৌনতার সঙ্গে মানসিক শক্তির সংগ্রাম, দৈব ভাবের সঙ্গে মানবিক শক্তির মিলন ও বিরোধ ইয়েট্সের কবিসত্তার মূলে কাজ করেছে, সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর মানুষের মনের মূলে বাসা বেঁধেছে। এই সঙ্গে আর একটা জিনিস কাজ করছে, সেটা হচ্ছে ইতিহাসের বোধ, অনিবার্য পরিণাম; কোনো ঘটনা শুধুমাত্র তৎক্ষণাৎ কার্যের দ্বারা আবদ্ধ হয় না, অনিবার্য গতিতে একটা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়, এই ধ্বংসই আবার নূতন জগতের পুনরুজ্জীবনের সৃষ্টি করে। এই অসম্ভব সংগমের ফলে হেলেন ও ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা দুটি সন্তানই ধ্বংসের বীজ রোপণ করেছে, কিন্তু ট্রয়ের পর আফ্রোদিতের পুত্র ইনিসের

ওপরেই ট্রয়বাসীর ভাগ্য ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত। ইতিহাসের একটি বৃত্ত ট্রয়ধ্বংসের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তারপরও আর একটি সূত্রপাত হয়েছে। ইতিহাসের এই অনিবার্যতা এলিঅটও স্বীকার করেছেন নাটকে বেকেটের উক্তিতে।

ইয়েট্‌সের কাব্যে শুধুমাত্র প্রত্যয় এবং তাও পরিবর্তনশীল, কোনো ঐক্য নেই, বিবর্তন নেই, ইতিহাসচিন্তা নিৎশের মতো ধ্বংসমূলক, সামন্ততান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদে বিশ্বাসী মনোভাবের পরিচায়ক—ইয়েট্‌স সম্বন্ধে আলোচনা করতে এই সব প্রসঙ্গ হয়তো আসতে পারে। তাঁর কাব্য যে শুধু প্রত্যয় ও পরিবর্তন-মুখী নয়, বিবর্তনধর্মী ঐক্যে বিধৃত তাঁর শেষ কবিতাটি পড়লে বোঝা যায়, অদৃশ্য দৈব প্রেরণার সঙ্গে লোক-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের একাত্ম মিলন ঘটেছে, তাঁর সেই দৃঢ় প্রত্যয় দেখা দিয়েছে মানুষ আবার জন্ম নেবে মানবদেহ ধরে, জ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি মানুষ পাবে যার সাহায্যে নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করবে, নিজের কর্ম বুঝতে পারবে, এই কারণেই অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ চিত্রী কবিদের কথা বিবৃত করেছেন, মানবজাতির অপবিত্র বিশুদ্ধি এঁদের সাহায্যেই হয়েছে। বর্তমান চিত্রে কাব্যে ধ্বংসের চূড়ান্ত সীমায় উঠেছে ঐতিহ্যকে লোকসংস্কৃতিকে হারিয়েছে বলে ; যেখানে তিনি নিজের দেহরক্ষা করতে চাইছেন সেখানে তাঁর পরিণত জীবনের সেই জ্ঞান ও ইতিহাসবোধকেই প্রকাশ করছেন, জীবন ও মৃত্যুকে নিরুদ্বেগ দৃষ্টিতে দেখতে হবে, ভবিষ্যতের ঘোড়সওয়ারকে পৃথিবীর পথে চলবার নির্দেশাত্মক বাণী ব্যবহার করেছেন। এই সমস্ত উল্লেখের মধ্যে ইয়েট্‌সের সমগ্র জীবনের ধ্যানধারণা আশাআকাঙ্ক্ষা আদর্শই রূপ পেয়েছে, শেষ জীবনে তাকে নিটোল করে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। জীবন ও কাব্য তিনি এক করতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে-কাব্য রচনা করেছেন, সমস্ত কবিতার মধ্য দিয়ে পরিবর্তন ও বিবর্তনের সাহায্যে জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে, কালকে দেশকেই তাঁর ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় রূপায়িত করেছেন ; সুতরাং তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে, তাঁর ব্যক্তি অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমাদের বর্তমানকালের ও যুগের সমস্ত লক্ষণই পাচ্ছি, এই কারণেই প্রথম অভিজ্ঞতা পেরিয়ে, রূপদক্ষতা অতিক্রম করে এলিঅটের ভাষায় শ্রেষ্ঠ কবি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন, অভিজ্ঞতার সাহায্যে বার্ধক্যে জ্ঞান বা wisdom লাভ করেছেন, তার ফলেই একটা সামগ্রিকতা এসেছে, অন্য মানুষ হন নি।

সর্বোপরি তিনি কবি ও শিল্পী, এর চেয়ে বড়ো কথা কবির পক্ষে আর কিছুই প্রযোজ্য নয়।

এই তিনজন কবিই আমাদের দেশে প্রভাব ফেলেছেন। ইয়েট্‌সের প্রভাব জীবনানন্দে ও বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় দুর্মর। জীবনানন্দের কবিতার জটিলতা অনুষঙ্গ সঙ্কেত চিত্রকল্প উপমা সংগীত ইয়েট্‌সের লিরিকের অনুসরণেই। তবে ইয়েট্‌সের কবিতার কথ্য ভাষার দৃঢ়তা স্পষ্টতা কঠিনতা জীবনানন্দের চেষ্টাকৃত ভঙ্গিতে এলিয়ে পড়েছে, কথ্যভঙ্গির মধ্যে সাধু ক্রিয়াপদ মিলে গেছে, কিন্তু হতাশার বিষণ্ণ সুরের বিলম্বিত রাগিণী কুহকিনীর মতো আটকে রাখে, শব্দ সচেতনতাও ; এবং কবিতায় পরিশ্রম বিনিয়োগও ইয়েট্‌সের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজি কাব্যে ফরাশি প্রতীকী কবিতার মাধ্যমে শব্দের ব্যায়ামের যে জাদু সংগীত পাউণ্ড এলিঅট ইয়েট্‌স তাঁদের মর্জি অনুযায়ী তৈরি করেছিলেন, বাঙালি কবিরা নিয়েছিলেন এঁদের কাছ থেকে। পরে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সরাসরি মালার্মে ও ভালেরির কাছ থেকে নিয়েছিলেন। তবে সুধীন্দ্রনাথের শব্দের ব্যায়াম হলেও ভাবের ও ফর্মের জটিলতা খুবই কম, একেকটা শব্দের মধ্যে জমাট বাঁধা অনুভূতি নিবিড় হয়ে ওঠে, কিন্তু সংগীতের প্রবাহ বয় না, রহস্যময় অনির্দেশ্য জটিলতা সৃষ্টি করে না। বুদ্ধদেবও ইয়েট্‌স-প্রভাবিত, বিশেষ করে 'মরচে পড়া পেরেকের গানে', তবে তাঁর ভাষা অনেক উচ্ছল, জটিলতার দিক থেকেও অপেক্ষাকৃত কম, সঙ্কেতে সুদূরতাহীন, কিন্তু প্যাশনের দিক থেকে, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রকাশের দিক থেকে, দেহ ও মনের দ্বন্দ্বের দিক থেকে ইয়েট্‌সের সঙ্গে 'মরচে পড়া পেরেকের গানে'র বস্তুসাদৃশ্য প্রচুর। জীবনানন্দের পর ইয়েট্‌সকে যদি ফর্মের অনুসরণে, ভাবের দুই বিরোধী সত্তার মিলনের দিক থেকে, রোমান্টিক সৌন্দর্যের আদর্শের রূপায়নে কেউ সার্থক অনুসরণ করে থাকেন লিরিক কবিতায়, তিনি হলেন রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী। এঁর কবিতার চিত্রকল্পে ভঙ্গিতে শব্দপ্রয়োগে সংগীতের ব্যবহারে ইয়েট্‌সের রীতি বারবার স্মরণ করায় ; তাঁর ভাষা কথ্য অথচ যুক্তিনিষ্ঠ, দৃঢ়, বলিষ্ঠ। ভাবের জটিলতাও তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে। তবে তাঁর বৈচিত্র্য আশা করা যায় না। পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে অলোকরঞ্জন শঙ্খ ঘোষের মধ্যে সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায় ফর্মের। ষাটের কবিদের এদিকে কোনো বালাই নেই, কারণ তাঁরা বিদেশি কবিতার অনুশীলন পছন্দ করেন না।

ভয় হয় ঐতিহ্যের দাবিতে আমরা আবার দাশরথি রায় নিধুবাবুর রাজ্যে ফিরে যাবো কি না। তবে পঞ্চাশের কবিরা, বিশেষ করে প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন পাউণ্ডের কবিতার ফর্ম অধ্যয়ন করেছেন, তাঁদের কবিতার রূপগঠনে শব্দপ্রয়োগে সংগীতে নিবিড় সংহতির মধ্যে এর চিহ্ন পাওয়া যায়। এই তিনজন বিদেশি কবি তিনটি প্রতীকের মতো আমার কাছে মনে হয়, পাউণ্ড বহুজ্ঞানী ও টেকনিকের ওস্তাদ, অংশত বিষ্ণু দে-কে এই দলে ফেলতে পারি, এবং তাঁর চেলারা এই ধারা কিছু বয়ে নিয়ে চলেছেন। এলিঅটের মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ সমাজসচেতন কবিতা, যার মধ্যে নৈর্ব্যক্তিকতাই প্রধান ধর্ম, এই বস্তুনিষ্ঠ কঠিনতার সঙ্গে মিথ্ আইডিয়া ফর্ম এক হয়ে গেছে, এখানেও অংশত বিষ্ণু দে এবং তাঁর পরবর্তী অনুসারকেরা, তবে কবিতার সিদ্ধি হয়তো বাঙালি কবিদের এলিঅটের ধারে কাছে ঘেঁষে না। তৃতীয়ত, ইয়েট্সের ধারা, এই ধারার অনুসারীই বেশি, কারণ লিরিক রোমান্টিকতা আমাদের জাতীয় চৈতন্যে একীভূত। তবে চৈতন্যের যে সংগ্রামে, ইতিহাসের অনিবার্য পরিণামে, দৈবী ও মানব সংস্কৃতির মিলনের রূপ নিয়ে, অতীত বর্তমানের সংঘর্ষে কবিচিত্ত দ্বন্দ্বমথিত হয়েছে, শিল্পরূপে প্রকাশ পেয়েছে, তা কারু মধ্যে নেই। কিন্তু এই তিনটি ধারা তিরিশের দশক থেকে ষাট দশক পর্যন্ত চলেছে।

এছাড়া কামিঙস্ ও অন্যান্য মার্কিন কবিও রয়েছেন, যাঁদের প্রভাব অমিয় চক্রবর্তী বুদ্ধদেব বসু প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে পড়েছে, ষাটের কবিরা সরাসরি না নিয়ে এঁদের থেকে ফর্ম নিয়েছেন।

যদি প্রভাবের কথাই স্বীকার করতে হয় তাহলে তা ফরাশি কবিতা। ফরাশি প্রতীকী কবিতার প্রভাবেই ইংরেজি কবিতার নূতন রূপ জন্ম নিয়েছে, প্রতীকী কবিতার প্রভাবেই রিল্কের জন্ম। জর্মান কবিতার ফর্ম আমাদের দেশে কতখানি পড়েছে আমার জানা নেই, যদি রিল্কের প্রভাব গণ্য করা হয়, তাহলে তাকে ফরাশি কাব্যের প্রভাবই ধরতে হবে। ফরাশি কাব্যের সঙ্গে যোগ সম্ভবত তিরিশের দশকের কবিরাই আমাদের করিয়েছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এ ব্যাপারে অগ্রণী, পরে বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসুও এতে যোগদান করেছেন। তাঁদের সম্মিলিত চেষ্টার ফলেই বাংলা কাব্যের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, ফর্মে বৈচিত্র্য এসেছে। পঞ্চাশের বাঙালি কবিরা তাঁদের কাছ থেকেই সরাসরি নিয়েছেন, পরে মূলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছেন। অলোক-

রঞ্জনের জর্মান অনুশীলনও কবিতাকে নতুন রূপ দিয়েছে। বুদ্ধদেবের সংস্কৃত অনুবাদও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

এই তিনজন কবির কর্ম প্রচেষ্টা, পরিশ্রম, শব্দ সচেতনতা, সংগীতের জাদু, ভাষা ও সভ্যতার সম্পর্কস্থাপন ইংরেজি কবিতায় তিরিশের দশকে নষ্ট হয়ে যায়। ইয়েট্সের কাছে কবিতা কোনো কর্মে প্রণোদিত করে না, সমগ্র সত্তাকে আনন্দময় করে তোলে। কিন্তু তিরিশের দশকে ইংরেজি কবিতা যুগের বিশৃঙ্খলায় কবিতার সাহায্যে কর্মকে ও উদ্দেশ্যকে প্রণোদিত করতে চেয়েছে। এলিঅটের কবিতায় সর্বাঙ্গসচেতনতা মারাত্মক, কিন্তু তাই বলে উদ্দেশ্য প্রণোদনা ও প্ররোচনা নেই, বক্তব্যের কঙ্কাল নেই, অনুভূতি চরিত্রে ও ঘটনায় ব্যক্ত। স্পেণ্ডার তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন : 'আগের দশকের লেখকদের থেকে আমাদের পার্থক্যের গুণগুলি আমাদের মধ্যে নেই, রয়েছে ঘটনায় যার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। এগুলি হলো বেকারি, অর্থনৈতিক সঙ্কট, জাগ্রত ফ্যাসিবাদ, আসন্ন যুদ্ধ।' তাই তিরিশের কবিতায় শিল্পরূপের চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে সাবধানবাণী, প্রতিবাদ, সতর্কতা, মার্কসীয় নীতির প্রচার, বামপন্থী ঐক্যের বাণী, সমসাময়িক বেদনার প্রকাশ, বিশ্বমানবতার বোধ, করুণা ও সংগ্রাম, কখনো বিদ্রূপাত্মক, কখনো উন্নাসিকতায় বিতৃষ্ণ, কখনো প্রচারধর্মে উচ্চকিত। অডেনের মধ্যে মানবপ্রেম ও করুণা আশ্চর্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে, মানুষ যে ভয়ের মধ্যে সর্বদা ভুগছে, তা থেকে মুক্তি 'ওষুধ-পত্র যন্ত্রপাতি বন্দুকের সাহায্যে নয়, চাই বিশ্বপ্রেম, যার অপর নাম হলো ল', (Law). মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা বেদনা সুখদুঃখ আত্মবঞ্চনা অগ্রগতি প্রতিক্রিয়া সব কিছুকে রূপ দিয়েছেন। মানুষের এই অসুস্থতার মূলে রয়েছে মানুষের সামাজিক অসুস্থতা। মার্কস্‌ই এই মানবতার পথে তাঁকে প্রভাবিত করেছেন। একদিকে যেমন মার্কস্ তাঁকে প্রভাবিত করেছেন, অন্যদিকে ফ্রয়েড্ প্রভাবিত করেছেন। এই দুয়ের সংগ্রাম ও বিরোধের ফলে ও ব্যক্তিত্বে প্রখরতায় বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত ধর্মে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কবিতায় আন্তরিকতা, নিপুণ বিশ্লেষণধর্মিতা, প্রতিটি বস্তু সম্বন্ধে কৌতূহল তাঁর কবিসত্তাকে পূর্ণ করেছে। গভীর ও গম্ভীর বিষয়কে খেলাচ্ছলে বর্ণনা করবার মধ্যে একটা শৈল্পিক কৃতিত্ব রয়েছে। সংকীর্ণ অনুভূতির চটকদারি, মানব-প্রেমের ভণ্ডামি, ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রকাশ, জীর্ণ ব্যবহৃত শব্দ, ধারকরা

ন্যাকামি, গোপন দুষ্ক্রিয়া—এ সকলের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে তাঁর এই রীতি সার্থক হয়েছে। ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন কবিতার মাধ্যমে এই কথাটাই বলতে চাইছেন: O teach us to outgrow our madness. স্পেণ্ডারও রোমান্টিক লিরিকে সার্থক, হতাশ প্রেমের কবিতায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। তবু প্রথম জীবনে অকৃসফোর্ডে অডেন স্পেণ্ডার সেসিল ডে. লুইস্ সকলে মিলে নূতন সৌভ্রাতৃত্বে সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, নূতন বাক্যরীতি, প্রচলিত শব্দ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার করেছিলেন, তাতে ইংরেজি কবিতায় ফিউচারিস্ট কাব্যধারার স্পর্শ পাওয়া যায়। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সর্বজনীন প্রীতি এই দুয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। লুইসের মধ্যেই কম্যুনিজমের প্রচার সবচেয়ে উচ্চকিত, এবং এই কারণেই কবিতার ক্ষেত্র থেকে দূরে। অডেন ও স্পেণ্ডার যেমন নিজের ভাষা ও ছন্দ, এবং ফর্ম খুঁজে পেয়েছিলেন লুইসের মধ্যে তা নেই, এটা পূরণ করেছে তাঁর সমালোচনাবৃত্তি। এঁদের মধ্যে ম্যাক্‌নিসের কবিতায়ই সমসাময়িক চিন্তাভাবনা সাধারণ বুদ্ধিতে প্রকাশ পেয়েছে, যুগের সমাজের ঘৃণা বিতৃষ্ণা তীব্রতর হয়েছে, বিরক্তি ও ও মোহমুক্তি একই সঙ্গে ঘটেছে, বিসদৃশ চিত্রের উদ্‌ঘাটন হয়েছে, 'জন্মের পূর্বে প্রার্থনা' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপ উন্নাসিকতা মারাত্মক। শুধু ভাবে নয়, রূপনির্মিতিতেই তাঁর কৃতিত্ব রয়েছে, কথ্য ও স্ল্যাঙ ব্যবহার করেন, চিত্রকল্পের ওপর চিত্রকল্প ছড়িয়ে দেন, চিত্রে বক্তব্যে আঘাত দেবার চেষ্টা করেন। ম্যাক্‌নিসের মধ্যে এ যুগের ক্ষয় এবং হতাশা মারাত্মক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে: The excess sugar of a diabetic culture/Rotting the nerve of life and literature. এছাড়া ফ্রাই ও অন্যেরা আছেন।

সুতরাং এঁরা সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা করতে চান, এই কারণেই মার্কসের প্রতি আনুগত্য; কিন্তু ব্যক্তিধর্ম তাঁদের মধ্যে এতো উচ্চকিত যে স্পেণ্ডার অডেন কেউই পার্টিতে থাকতে পারেন নি, অডেন আবার ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। বাঙালি চরিত্রের মতো ইংরেজ চরিত্রেও ব্যক্তিপ্রাধান্য থাকার জন্যে সমষ্টিগত কর্ম সার্থক হতে পারে না। যেহেতু সাময়িক কাল ও বর্তমান যুগই হচ্ছে তাঁদের বিষয়বস্তু, তাই মাঝে মাঝে সংবাদপত্রের তথ্য দান করেছেন, বস্তুকে তুলে ধরেছেন। এলিঅটের দ্বারা এঁরা সকলেই প্রভাবিত হয়েছেন, কিন্তু এলিঅটের ফর্মের সিদ্ধি এঁদের নেই, এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে

পুরোপুরি বিচ্ছেদ ঘটাতে চান, অতীতচারিতার প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। রোমান্টিক ও আবেগপ্রধান কাব্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তাঁদের সকলেরই একই অভিজ্ঞতা, একই ভাষা চিত্রকল্প ও উপমা, একই উপায়ে অনুপ্রাস ধ্বনিসৌকুমার্য অন্ত্যমিল মধ্যমিল ব্যবহার করেছেন। ফলে এঁদের নিয়ে একটা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, পরস্পরের কাব্য আলোচনা ও আইডিয়ার অংশীদার হয়ে যুগের দাবিতে বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে শ্রেণীহীন সমাজ তৈরি করতে চেয়েছেন, অথচ ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় মার্কস্‌কেও আসতে বাধা দিয়েছে। এই দুই বিরোধ থাকা সত্ত্বেও তিরিশের দশকের কবিরা সমাজচৈতন্যের কবি বলে পরিচিত, এলিঅটের বিরোধী বলে চিহ্নিত। মাইকেল রবার্টস স্পষ্টতই 'নিউ সিগ্‌নেচারস্'-এর ভূমিকায় বলেছেন: The solution of some too insistent problems may make it possible to write 'popular' poety again. একথা সকলেই তাঁরা স্বীকার করেছেন।

ইংরেজি সাহিত্যে এক দশকের আগে যেটা ঘটে, আমাদের দেশে তার পরের দশকে আলোড়ন তোলে। আমাদের দেশের চল্লিশের কবিরা সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচার্য বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় চিত্ত ঘোষ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত রাম বসু নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রায় সকলেই সমাজসচেতন। সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় মার্ক্‌সবাদী বলে চিহ্নিত। তাঁদের এই সমাজচেতনতার পেছনে বাংলাদেশের মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অগাস্টবিপ্লব, ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রাম, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান, হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা, স্বাধীনতার পর দেশের টলটলে অবস্থা একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে, এই অস্থিরতায় তাঁরা আপন মনের গভীরে বেদনার সিন্ধুকে খুঁজে দেখতে পারেন নি, তাই কবিতায় কর্মের উদ্দীপন ঘটিয়েছেন, প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত হেনেছেন, অন্যদিকে তিরিশের দশকের কবিদের প্রবল চোখ ধাঁধানোর ফলে ভাষায় ভাবে মর্জিতে তাঁদের অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ইংরেজ কবিদের মতেই এঁরা সমাজনিষ্ঠ, সমাজের উন্নতিতে বিশ্বাসী, প্রচলিত নোংরা সমাজের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবিদ্রূপপরায়ণ, অন্তঃসারশূন্য রিক্তমূল্যবোধকে ভেঙে চুরে ফেলতে চেয়েছেন, ভণ্ডামিকে লাথি মেরেছেন, কেউ মার্ক্‌সের পথে অথবা কেউ অন্যভাবে নূতন

সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন ; এঁদের মধ্যে হৃদয়ের চেয়ে বুদ্ধি ও সচেতনতা কাজ করেছে, বুদ্ধির আর একটা প্রকাশই ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কৌতুক। সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় এঁরা বুদ্ধিসচেতন, বিদ্রূপপরায়ণ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার রূপনির্মিতিতে অতিরিক্ত বুদ্ধিবাদ একটা আনন্দ দেয় বটে, কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজের লোকের মনে জনপ্রিয় কবিতার ভূমিকা নেবে কিনা সন্দেহ। জনগণের সঙ্গে মুক্তির পথে এই বুদ্ধিই বাধা দিচ্ছে, এবং বিষ্ণু দে'র অনুসরণও লক্ষণীয়। 'পদাতিকে'র কবিতার বিষয়বস্তু নৈর্ব্যক্তিক, প্রত্যয় দৃঢ়, বুদ্ধিতে ঝক্‌ঝকে, ছন্দে ভাষায় সংগীতরণিত, আছে আশ্চর্য মিলের ও ছন্দের কারসাজি, অডেন স্পেণ্ডার ও লুইসের মতোই রোমান্টিকতা ও আবেগবিহ্বলতার প্রতি বিতৃষ্ণ, কিন্তু পরবর্তী কবিতায় ব্যক্তিঅভিজ্ঞতা মিশেছে, কবিতার রূপ-নির্মাণেও পরিবর্তন ঘটেছে, বিষয়বস্তুর মতো কবিতার অক্ষরে ছবি ফুটে উঠেছে, ধ্বনি তাকে অনুসরণ করেছে, চিত্রকল্পের আকর্ষণ রয়েছে, কিন্তু 'পদাতিকে'র কবিতার দৃঢ় প্রত্যয় নেই, সেই সঙ্গে জটিলতর সংহতিও নেই। জীবনের অভিজ্ঞতায় যৌবনের দৃঢ় প্রত্যয় হতাশা বেদনায় একাকার হয়ে গেছে, আছে শুধু অফুরন্ত নীল স্বপ্ন ও আশা। সমর সেনের বুদ্ধিপ্রধান কবিতায় সমাজের গ্লানি অন্ধকার ক্লেদ ফুটে উঠেছে তীব্রতর। ঘেয়ো কুকুরের যন্ত্রণার মতো সমাজের যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনিও আশাবাদী, নূতন সমাজের স্বপ্ন দেখেন, মার্কসবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, কিন্তু সেই বিশ্বাস রক্তের সঙ্গে মেশেনি। তাই ধ্বংসের অন্ধকারের চিত্রই প্রবল। এবং কবিতার ভাষার মধ্যে দৃঢ়তা থাকলেও কোনো রহস্যময় জটিলতা, কোনো অনির্দেশ্য সঙ্কেত, সংগীতের অপূর্ব জাদু, ভাষণের সংহতি, দ্যুতিদীপ্ত তাৎপর্য আমাদের চকিতে সত্তাকে আনন্দময় করতে পারে না। ভয়ের ভীষণতার বিরক্তির গ্লানির অন্ধকারের কামনার যৌনতার ছবিগুলির মধ্যে মনোভঙ্গি এতো নির্দিষ্ট যে অন্যান্য ইম্‌পালস্‌ সমন্বিত হতে পারে না, ফলে একপেশে হয়ে দাঁড়ায় ; তাঁর কবিতা বক্তব্যপ্রধান, রাগের সময় চিৎকার করে বলা যায়, মনের গহনে একাকী পাঠ করা যায় না, এমন কি স্বপ্নের কবিতাগুলিও নয়। তাঁর মার্ক্‌সবাদের মধ্যেও ফাটল আছে। আমাদের বাংলাদেশের মার্ক্‌সবাদের মধ্যে একটা অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে চার দেয়ালের সীমানায় বুদ্ধির কচ্‌কচি। জনজীবনের সঙ্গে কোনো যোগ নেই, জনজীবনের সঙ্গে যোগ থাকলেও মনের

ব্যক্তিপ্রাধান্যের জন্যে কাব্যরূপে তার প্রকাশ হয় না। আমাদের অবচেতন মনের সঙ্গে সচেতন মনের একটা পার্থক্য থেকে যাচ্ছে। সুকান্তের কবিতার প্রত্যয় অতি দৃঢ়, কয়েকটি চিত্রকল্পও আকর্ষণীয়, বিবৃত বিষয়ের মধ্যে আন্তরিকতা গভীর, কিন্তু কাব্যের উপাদানে একটা অভাব রয়েই গেছে। সামান্য ব্যতিক্রম দেখি শুধু রাম বসুর মধ্যে, রাম বসুর চিত্রকল্প উপমা শব্দ যদিচ একটা প্যাটার্ন স্বীকার করে নিয়েছে; তথাপি, প্রচলিত বিষয়বস্তুকে নূতন পরিবেশে সাজাবার ফলে এবং কবির স্বচ্ছন্দ আন্তরিকতায় আগের কবিতায় আমাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে একটা উন্মাদনা আনে, কখনো কখনো, এই উন্মাদনা আলোড়নের আন্দোলনের আনন্দের। মঙ্গলাচরণের সংগীত শ্রুতিকে ধরে রাখে, কিন্তু তারপর? নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী হরপ্রসাদ মিত্র বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এঁদের কবিতায় চল্লিশের দশকের লক্ষণ থাকলেও সময়ের স্রোতে ভাষাশিল্পে অনুভবে বিবর্তনমুখী, সুতরাং পৃথক বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তবে এটাও ঠিক, তিরিশের কবিদের শিল্পরূপের দাক্ষিণ্য এঁদের কারু মধ্যে নেই।

এদিকে ইংরেজি কবিতায় ওয়েল্সবাসী ডিলান টমাস, সুররেয়ালিস্ত ঐতিহ্য, রোমান্টিক কবিতার সংগীতময় জাদু ও চিত্রকল্পের বিচিত্র বাহার চল্লিশে নিয়ে এলেন। তিরিশের সমাজবাদের কবিতায় বুদ্ধিপ্রাধান্যই এর লক্ষণ, সচেতনতায় ব্যঙ্গবিদ্রূপের জ্বালা জন্মলাভ করেছিল, চল্লিশে ব্যক্তিঅভিজ্ঞতা ও রোমান্টিকতা বিশেষ করে দেখা গেল। ডিলান টমাসের মধ্যে ফ্রয়েড ও ওল্ড টেস্টামেণ্ট বিশেষভাব প্রেরণা জুগিয়েছে, এই অবচেতন মনের ক্রিয়ার মধ্যে প্রতিক্রিয়া কাজ করছিল যুদ্ধের মিলিটারিবর্বরতা, স্বৈরতন্ত্র, রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি, হিরোশিমা নাগাসিকায় মারণাস্ত্র প্রয়োগ, বামপন্থী প্রচারের মধ্যে মিথ্যা ভণ্ডামি, জীবনের হতাশা, সদ্‌গুণের পরাজয়, অসতের কৃতকার্যতা, শারীর বেদনা, মানসিক যন্ত্রণা, পাপবোধের নিবিড়তা, এগুলিই কবিদৃষ্টিকে উন্মত্ত ভীতত্রস্ত করে তুলেছিল। এর ফলেই ডিলান টমাসকে কেন্দ্র করে নিউ-রোমান্টিক কবিতা চল্লিশে জন্ম নিয়েছে। এই রোমান্টিকতার অন্ধকারে অবচেতন মনের স্বেচ্ছা লীলাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাই কবিতার ফর্মে কঠিনতা নেই, দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে, হঠকারীর মতো ক্ষিপ্রতা লাভ করেছে। অনেকের কাছে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো মনে হয়, জীবন থেকে বিচ্যুত হয়েছে অনেকে।

এই সময়ে ফরাশি দেশে অস্তিত্ববাদের অন্ধকার জটিলতা ও অ্যাবসার্ড তত্ত্ব ফুলে ফলে পল্লবিত হয়েছে। এই নিউ-রোমান্টিক কবিদের মধ্যে ভের্নন্ ওয়াট্‌কিন্‌স্‌, সিড্‌নি কিস্‌, জন্ হিথ্‌-স্টাব্‌স্ লরিলি প্রভৃতি। এই নিউ-রোমান্টিকদের সঙ্গে আর একটি আন্দোলনও গড়ে উঠেছে ডিলাস টমাসকে কেন্দ্র করে, সেটি হলো 'নিউ অ্যাপোক্যালিপ্‌স্‌' ১৯৩৯, হার্বার্ট রিডের শিল্পতত্ত্ব থেকে তাঁদের কাব্যপ্রেরণার জন্ম। অতিরিক্ত আত্মসচেতনতা ও বুদ্ধিবাদ পরিহার করে শব্দের উন্মাদনায় পাগল হওয়া ছাড়া তাঁদের আর কিছু রইল না, মিথের মধ্যে তাঁদের মুক্তি ঘটল, তাই ভবিষ্যৎবাদী কবিতায় যন্ত্রের আধিপত্য, তার সাহায্যে চিত্রকল্প পরিহার করে আত্মকেন্দ্রিকতায় নিবিষ্ট হলো। এঁদের আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তি হলেন কাফ্‌কা এপ্‌স্টাইন পিকাসো ও পরবর্তীকালের ইয়েট্‌স ও ডিলান টমাস। হেন্‌রি ট্রিস্ ও জে. এফ. হেন্‌ড্রি ইস্তাহার প্রচারের সময় বলেছেন নিবিড় ঐক্যের কোনো মানে হয় না, আদর্শ নৈরাজ্যই হলো মূল কথা।

ডিলান টমাস সমগ্র কবিতার মধ্য দিয়ে একটি ঐক্যের কথা বলতে চেয়েছেন। সেই অস্তিত্বের ঐক্য, যে অস্তিত্বের মধ্যে পাপপুণ্য ভালোমন্দ নেই, আছে মানুষের জীবন ও প্রকৃতির একাত্ম মিলন। এই নিবিড় ঐক্যের বোধের মধ্যে প্যাগান বোধই কাজ করছে, সেই আদিম জীবনের বিশ্বজনীন ঐক্যের মধ্যে বারংবার ফিরে যাওয়াই হলো তাঁর প্রেম। তাই সময়ের লুপ্তি নয়, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎকে এক সূত্রে বেঁধে নিয়ে মৃত্যুর মধ্যে মিলতে চেয়েছেন, মৃত্যুর সঙ্গে মিলিত হওয়াটাই সময়ের মুক্তি। এই ঐক্যের পেছনে যে প্রবণতা কাজ করছে তা রমণীর জঠরে অস্তিত্বের পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা, যে অস্তিত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এই ঐক্য লাভ করলেই স্বাধীনতা ও ইচ্ছার সমস্যা দূর হয়, সৃষ্টির যুক্তি ও উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়। সুতরাং ডিলান টমাস সমগ্র অস্তিত্বের ও জীবনের মৌল সমস্যা নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন বলেই তাঁর কাব্যের ব্যাপ্তি আমাদের মুগ্ধ করে। এই অস্তিত্বের ঐক্যের মধ্যে মন্ময়তা ও তন্ময়তা, স্বজ্ঞা ও জ্ঞান, প্রথাগত সভ্যতা ও নূতন উদ্দীপ্ত সভ্যতা প্রভৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও প্রজ্ঞা ও স্বজ্ঞাকে স্বীকার করেছেন, একে স্বীকার করবার পরেও তিনি দুই শক্তিকে মেলাতে চেয়েছেন। সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিদিনের মানুষের কাছে ভয় ও উদ্বিগ্নতা এই ঐক্যের

প্রতিবন্ধক, তিনি মিলতে পারছেন না বলেই তাঁর দুঃখ যন্ত্রণা। সুতরাং তাঁর এই আত্মজৈবনিক ব্যক্তিগত কবিতার মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্ববিক্ষত মানুষের জীবনের ঐক্যের আকাঙ্ক্ষাকেই রূপায়িত করেছেন। তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে দেখেছেন যে মানুষের শক্তির বাইরে একটা অনিবার্য নিয়তি রয়েছে, এই নিয়তিবোধ তাঁকে ট্রাজিকবোধে নিয়ে গেছে। সুতরাং হপ্‌কিন্‌সের মতো ভগবানের সঙ্গে মিলতে পারছেন না বলে নির্বাসিতের বেদনা জেগে উঠেছে, টমাসের মধ্যে তার আরো তীব্র রূপ দেখতে পাওয়া যায়। কারণ এঁরা দুজনেই ধর্মীয় কবি। ধর্মকে গ্রহণ না করলে, অনুভব করতে না পারলে দুজনের কবিতা অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য। শুধু ভাবের দিক থেকে নয়, শব্দরূপে ও প্রয়োগেও দুই কবির মিল প্রচুর। টমাসের কবিতার এই ভাবনা বিশ্বজনীন মানুষের অস্তিত্বের সমস্যা, যা অস্তিত্ববাদের মধ্যেও দেখা যায়, তাই তাঁর কবিতার মূল্য শুধু ইংরেজি কবিতায় নয়, সমগ্র দেশের কবিতায়।

টমাসের কবিতা পড়তে বসলে বিভ্রান্ত হতে হয়, আবার তার সংগীত ও চিত্রকল্প আমাদের টেনে রাখে। অর্থের চেয়েও সংগীত ও জাদুমন্ত্র আমাদের আটকে রাখে, সংগীতের পরে অর্থের ক্ষেত্রে এলে প্রথমেই উল্টোপাল্টা শব্দের সাহায্যে সঙ্কেতদ্যোতিত চিত্রকল্পের মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তন আমাদের সচকিত করে, কবিতার সামগ্রিকতাকে বিচ্ছিন্ন করে একদিকে যেমন, অন্যদিকে পরিবর্তনের পর পরিবর্তন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে, যে পরিবেশের মধ্যে মৃত্যুর উপলব্ধি ও আকাঙ্ক্ষা, যৌনচেতনা, যুক্তিশৃঙ্খলাহীন অবচেতনার অন্ধকার স্বয়ংক্রিয় রচনার তরল ভাষার গতিবান সংগীতপ্রবাহ আমাদের অস্তিত্বের গভীরে মর্মস্পর্শী বেদনা প্রকাশ করে, যে বেদনার মধ্যে জন্মমৃত্যু প্রকৃতিমানুষ এক হয়ে যায় : good and bad ways of moving about your death. ছন্দস্পন্দ পরিবর্তিত হয়ে যায়, অলংকারবহুল ভাষা ব্যবহৃত হয়, বাক্যগঠন ভেঙে যায়, চিত্রকল্প পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে, এই পরস্পর জড়ানো বিরোধী জটিল চিত্রকল্পের মধ্যেই তাঁর অনুভূতি ও আইডিয়া প্রকাশ পায়, কোন বিমূর্ত চিন্তার সাহায্যে নয়, একটা ইমেজ থেকে অন্য একটা ইমেজে যাবার পথে তিনি যমক, দ্বিবিধ অর্থ, মিশ্রশব্দ, নতুন শব্দ, বিশেষ্যকে ক্রিয়া, সর্বনামকে দ্বিবিধ পূর্ব-পদে ব্যবহার করেন।[৫] এছাড়া আছে শব্দের ও বাক্যের ওলোটপালট, বাক্যাংশ সামনে পেছনে চলে যায়। এবড়োখেবড়ো চিত্রকল্পগুলি[৬] ছন্দস্পন্দ মিল মন্ত্রের

মতো শব্দ ব্যবহারে, ছেদের ভারসাম্যের বিশৃঙ্খলায়, স্ল্যাঙ ও বিশেষ শ্রেণীর ভাষায়, বিমূর্ত শব্দের অতর্কিত অনুপ্রবেশে একটা আলোড়ন তোলে, যা থেকে পাঠক মুক্তি পায় না। তাঁর চিত্রকল্পগুলি কোনো কোনো কবিতায় বর্ণনাত্মক, কোনো কোনো কবিতায় সাঙ্কেতিক, আবার কোনো কবিতায় একসঙ্গে দুই রীতিই ব্যবহৃত, ফলে জটিলতা অনিবার্য। সঙ্কেতগুলি অধিকাংশ সময়ই মিথ্, ফ্রয়েড, জাদু ও মেটাফিজিক্যাল কবিতা থেকে নেওয়া। অনেকের মতে আদর্শ প্রতিরূপক (synecdoche) ব্যবহারই হলো টমাসের কবিতার জাদু। টমাসের কবিতায় জন্মমৃত্যুর বৃত্ত, স্থির বিন্দু, আকাশ, জল, চাঁদ, শিল্পিত পাখি, শিশু, শামুক চিত্রকল্প ও সঙ্কেত নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, উপস্থিত হয়েছে ফ্রয়েড এবং বাইবেলের গূঢ় গভীর তাৎপর্য। আসলে মাদকতা ও র‍্যাবোর চেতনা তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষ। বাংলা দেশে অনিবার্যত শক্তির কবিতায় এই শব্দের উন্মাদনা ও চিত্রকল্পের পরিবর্তমান গতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়, তবে যৌনচেতনা ও ধর্মীয় বোধ নেই, কিন্তু সুনীলের মধ্যে শব্দের উন্মাদনা সামান্য কম থাকলেও যৌনচেতনা ও নারী গভীরে তাঁকে আক্রান্ত করেছে। পঞ্চাশের এ দু'জন কবিকে 'নিউ রোমান্টিক' কবিবৃন্দ ও ডিলান টমাস প্রভাবিত করেছেন। পঞ্চাশের অন্য কবিদের মধ্যে টমাসের প্রভাব খুব একটা বেশি নেই, তবে রোমান্টিকতার প্রভাব মারাত্মক।

পঞ্চাশের দশকের ইংরেজি কবিরা একটা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, রবার্ট কন্‌কোয়েস্ট 'নিউ লাইন্‌স্' নাম দিয়ে একটি কাব্যসংকলন প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর ভূমিকায় যে কথা বলেছিলেন তাতেই তাঁদের কথা প্রকাশ পেয়েছে, তিরিশের দশকের সমাজ রাজনীতি চিন্তাভাবনার কবিতাকে অস্বীকার করলেন, কিন্তু ডঃ লিভিস্ ও অধ্যাপক এম্প্‌সনের কাছে নতজানু হয়েছেন। প্রশংসা করেছেন রবার্ট গ্রেভ্‌স ও অর্‌ওয়েলকে। অথচ তিরিশে এঁরা উপেক্ষিত ছিলেন। চল্লিশের ডিলান্ টমাস জর্জ বার্কারের মুক্ত অনুষঙ্গময় অনুভূতির কবিতাকে বাদ দিতে চাইলেন। অভিজ্ঞতাকেই এঁরা স্থান দিতে চাইলেন বেশি করে, বলতে চাইলেন কবিতায় 'প্রকৃত সততা' থাকতে হবে। অর্‌ওয়েলের প্রভাবেই. অতি-সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত করতে চাইলেন, সহজ ও কথ্যভাষা ব্যবহার করলেন। ১৯৫৪ সালের এই আন্দোলন জোর দিয়ে বলতে চাইলো তাত্ত্বিক গঠন বা অবচেতনের স্তূপাকার নয়,

মিষ্টিক অথবা যৌক্তিক চাপ নয়, সমস্ত কিছুর প্রতি এর এ্যাটিচুড হবে অভিজ্ঞতাময়।[৭] অথচ এঁদের অধিকাংশই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিক। তাই অধ্যাপনা, কবিতা রচনার সঙ্গে সমালোচনাও তাঁদের অবশ্য কর্তব্য ছিল। ডেভি, এন্‌রাইট, লারকিন, হোলোওয়ে, এলিজাবেথ জেনিঙস, ওয়েন, আমিস্‌, টম্‌ গান এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এঁদের কবিতায় কি এলিঅট অডেন ডিলান টমাসের মতো সৃষ্টিশীল কবিতা পেয়েছি, হয়তো তাঁদের দু'একটি কবিতায় অভিজ্ঞতার সঙ্গে হৃদয় উত্তাপ আছে, ব্যঙ্গবিদ্রূপ জ্বালা আছে, কিন্তু সামগ্রিক সংশ্লেষণ কোথায়? ডেভি'র কবিতার বাক্যে ও শব্দে ঘনসংহতি ও বুদ্ধিদীপ্তি অপূর্ব। লারকিনের কবিতার ক্ষুদ্র বিষয়বস্তু একটা মূর্ত কাল্পনিক পরিবেশ ও গল্প সৃষ্টিতে দক্ষতা অর্জন করেছে, কিন্তু এই গল্পের মধ্য দিয়ে এক রহস্যময় নিয়তির গভীরতা আমাদের মাঝে মাঝে চকিত করে। তখন তিনি মূর্ত ও অমূর্তকে এক করে দেন : Only one ship is seeking us, a black-/Sailed unfamiliar, towing at her back/A huge and birdless silence. In her wake/No waters breed and break. গানে'র কবিতার সংগ্রাম, সিনিক্যাল ব্যঙ্গরীতির মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা একটা চমক আনে, যে অভিজ্ঞতার কথা কন্‌কোয়েস্ট-ভূমিকায় বলেছেন, তাঁর এই চরণের মধ্যেই প্রকাশ : I, born to fog, to waste, / Walk through hypotheses, / An individual. ডেভি, গান, লারকিন এন্‌রাইট্‌ই এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই 'নিউ লাইন্‌স্‌'-এর বিরুদ্ধে অন্য একটি দল গড়ে ওঠে এই দশকেই, তার নাম 'মভেরিক্‌স্‌' (mavericks), এঁদের মধ্যে হল্‌ ও সিল্‌কিন খ্যাতিবান। ষাটের ইংরেজি কবিতা এই ধারারই, ডোম্‌ মোরেস্‌ প্রভৃতির কথা বলা যায়।

ইংরেজি পঞ্চাশ দশকের 'নূতন পথ' বাংলায় ষাটের দশকের নূতন পথ বলে মনে হয়েছে, সম্প্রতি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের ঘোষণা পত্রে তা সোচ্চার : 'প্রতি-পক্ষ ভেবেছি ত্রিশের কবিদেরই আর মনে মনে যুদ্ধ ঘোষণাও ত্রিশের বিরুদ্ধে।' ষাটের দশকের সাধারণ ধর্মের একটা তালিকা দিয়েছেন : 'ঐতিহ্যের অনুসন্ধান ও তার সময়োচিত সংস্কার ও পুনর্ব্যবহার' ২. পরিচিত ছন্দ ভেঙে নতুন চেহারা গড়ে তোলা। ৩. 'রাজনৈতিক উচ্চরোল ও সমসাময়িকতাকে যথা-সম্ভব পরিত্যাগ।' ৪. 'মূল্যবোধের অবক্ষয় চিত্রণের উদ্দেশ্যে সমসাময়িক

ঘটনার উল্লেখ' ৫. 'গদ্যরীতির অবাধমুক্তি', ৬. চিত্রকল্প ও প্রতীকের অবাধ প্রয়োগ ৭. 'বোধের রূপনির্মাণ' ৮. 'বস্তু থেকে বেদনা ছেঁকে নিয়ে অমূর্ত প্রকাশ কলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব।' ৯. 'বিষয় থেকে বিষয়ীর মুক্তি' ১০. 'কখনো বিষয়ীর গুরুভার বর্জনের মাধ্যমে বিষয়কে বড়ো করে তোলা', ১১. 'দীর্ঘ কবিতার মাধ্যমের পুনর্ব্যবহার, তার মাধ্যমে ব্যক্তি ও বিশ্বের গভীর ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার রূপনির্মাণ' ১২. 'শব্দ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ বর্জন' ১৩. 'নির্বিচারে প্রাচীন ও প্রচলিত শব্দ ব্যবহার', ১৪. দেশী বিদেশি মিথ্ ব্যবহারের মাধ্যমে কবিতার গভীরতা সম্পাদনের প্রয়াস।' ওঁর সব কথাই তুলে ধরলুম, কিন্তু এতে কি কোনো নতুন কথা আছে, যা তিরিশের ও পঞ্চাশের কবিরা করেন নি? আর পবিত্র কি এ সব নির্দেশ মানেন তাঁর কবিতায়? চল্লিশের অনেক কবিই রাজনৈতিক কোলাহলে নিজেদের বিস্মৃত হয়ে চিৎকার করেছেন এবং ষাটের কবিদের মধ্যে কি এখনো এই রাজনৈতিক উচ্চরোল ও সমসাময়িকতাকে গ্রহণ করে চিৎকার করেন না? তা না হলে লেনিন ও 'বাংলা দেশ' নিয়ে এতো বদরক্তের ক্ষরণ হয় কবিতায়! দশকের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণে এই জাতীয় বক্তব্যের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ এই বক্তব্য চিরকালের, আর একথা স্মরণীয় প্রত্যেক যুগের কবির চেয়ে অকবির সংখ্যা বেশি থাকে। সুতরাং কবিতাকে কবি-ব্যক্তিত্বের স্বরূপ হিসাবে গণ্য করাই বাঞ্ছনীয়।

আমরা ইংরেজি কবিতার ধারার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ ও অধিক পরিচিত, ভাষা-জ্ঞানের অভাবে ইতালি ফরাশি জর্মান স্পেন-এর কবিতার কথা জানি না। ইতালীয় কবিতায় পাগ্লিআরানি একটি বিশেষ নাম, লিরিক কবিতার মধ্যেও ভাষাকে তিনি চুরমার করে দিয়েছেন, কবিতার নাম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে কন্‌সেপ্ট তা ভেঙে দিয়েছেন। এবং সাধারণভাবে এঁরা কবিতাকে ভাষায় রূপগঠনে পরীক্ষার স্তরে না রেখে যুদ্ধগ্রাসী করতে চেয়েছেন। সংবাদজীবীর বুদ্ধিবাদ প্রকাশ করতে চেয়েছেন, কবিতার সঙ্গে গদ্যকে মেলাতে চেয়েছেন। পেদিও এই পরীক্ষান্তরের কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য, অদ্ভুত অসংলগ্নতা, স্মৃতি, সংকেতচিহ্ন, বাস্তবতা, কোগ্রাদ্রো টেলিভিসনের ছায়াময়তা মিলেছে, কবিতাকে তির্যকভাবে লম্বালম্বিভাবে এবং দৈগন্তিক রেখায় পড়তে বলেছেন : **l'universo e cittadino** কবিতাটি দ্রষ্টব্য। এছাড়া দার্শনিক কবিতায় দুর্বোধ্যতা ও

সঙ্কেত একই সঙ্গে কাজ করছে। একালের ফরাশি পত্রিকা খুললেই দেখতে পাই প্রায়ই এই ক'টি শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে, 'refer', 'contestation', 'revolution' 'crise', 'protestation' 'violence', 'alienation'। বিবিক্ততাই এ যুগের অসন্তুষ্টির মূল কারণ,এই বিবিক্ততা আধ্যাত্মিক, সমাজের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বিবিক্ততা। এ সত্য ভালেরি প্রায় চল্লিশ বছর আগে উপলব্ধি করেছিলেন : Le jour est venu que le homme, se rendant moins dependant de la nature. আধুনিক ফরাশি কবিতায় ভাষা ও জটিলতা বাড়ছে, সাহিত্যের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তাত্ত্বিক আলোচনা চলছে, ভাষা মানবিক শক্তির উপাদান বলেই প্রয়োজনের বোধ ও আবশ্যিক শক্তি বাড়াতে হবে এবং এটাই ভাষার বৈপ্লবিক নীতি। আধুনিক ফরাশি কবিতার বিষয়বস্তু ও রীতি এতই বিচিত্র ও বিভিন্নমুখী যে এখান থেকেই প্রকৃত প্রেরণা বাঙালি কবি লাভ করতে পারেন। চিরকালীন রোমান্টিসিজম্, মহান্ প্রতিষ্ঠাতা ও দ্রষ্টা, অবিনশ্বর প্রিয় কণ্ঠস্বর, সঙ্কেতের শীর্ষশিখর, সঙ্কেতের শীর্ষতা, বিশ্বাস ও কল্পনা, নতুন পরিপ্রেক্ষিত, ঐতিহ্য থেকে বিপ্লব, স্যুররেয়ালিস্তদের অভিযান, বিপ্লব ও প্রেম, ফরাশি কবিতার নতুন বিষয়বস্তু (যেমন সাঁ জঁা পের্সের রাজধানীর রাজা, পিয়ের জঁা জুভের নির্জনতা ও আগ্রহের প্রগাঢ়তা, আঁরি মিশ'র আবিষ্কার, রেনে শার্-এর অতল গভীরতা), আধুনিক ফরাশি কবিতায় সজীবন্ত ঐতিহ্য : জুলে স্যুপের্ভিয়ের মধ্যে প্রকাশিত, মারি লোয়েলের মধ্যে গৌরব ও পশ্চাদ্ অপসরণ, রেনে মেনারের নির্জনতা, রোরের্ ব্রাসিলাসের নির্দেশ, রেনে গি কাড্'র স্মৃতি। নূতন সংজ্ঞা অনুসন্ধানে কাব্যিক আন্দোলন : জাক্, পোঁ, পিশেৎ স্মরণীয়। নূতন কাব্যক্ষেত্রে নতুন ভাষা : জঁা ফোলেঁই, রোরের্ গোফ্যাঁ, আঁদ্রে ফ্রেন্য, জঁা তার্দিয়্যু, আলেই বোস্কোয়ে, আঁদ্রে দ্যু বুশে, মার্ আলিন। খ্রিস্টীয় কবিতা : জঁা ক্লদ্ রেনার্, জঁা গ্রোস্জঁা। সমগ্রজাতির সমাহৃত কণ্ঠস্বর : গার্নিঅ, আনেহেবের, সেজেইর্, গ্লিসাঁ, জঁা আম্রুশ, শেহাদে। সহস্রের মধ্যে তিনটি কণ্ঠস্বর : পাত্রিস্ দ্য লা তুর্ দ্যু প্যাঁ'র স্তব্ধতা, পিয়ের্ এমানুয়েলের শব্দের মুক্তি, ইভ্ বোন্নেফোয়্-এর নিয়তি—এমনি আরো কতো শ্রেণীভাগ করা যায়, বোধ হয় তার শেষ হবে না। আধুনিক জর্মান পত্র-পত্রিকায় দুটো ভাগ সহজেই চোখে পড়ে, সমাজ সচেতনতা ও গ্রাফিক রূপ ; হোচিমিনের কবিতার অনুবাদে প্রকাশ ; অন্যদিকে দাদাবাদ ও তার ওপর

কবিতা এবং প্রবন্ধ, গ্রাফিক মূর্তিগুলি প্রলয়নৃত্যের মতো, অথবা কামনার উদ্দীপক, (thum-to-nose), এর বিরুদ্ধদলও আছে, তার মধ্যে আছেন এন্‌ৎস্‌এন্‌স্তেন্‌বের্গের্। এছাড়া বিট্ হিপি প্রোভোস্ প্রভৃতির ওপর কবিতা প্রবন্ধ ও জীবনী প্রকাশিত হয়। ফরাশি আধুনিক কবিতায় যতো বৈচিত্র্য অন্যত্র সম্ভবত তা নেই[৮], আর অন্যদিকে পূর্ব য়ুরোপের মাটি থেকে উঠে-আসা সহজ সরল আন্তরিকতায় ভরা জীবন্ত কবিতা বিস্ময়ের বিস্ফার আনে। মার্কিনি কবিতা ইংরেজি কবিতার সঙ্গেই তুলিত, তাই স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন নেই।

১. সমস্ত অতি আধুনিক যুগের মনে যে লক্ষ্যহীন উদ্‌ভ্রান্তি, যে অনির্দেশ্য হৃদয়বিক্ষোভ নানা রূপে ও বিচিত্র সুরে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই জীবনানন্দের আত্মমগ্ন অনুভূতিতে একটি জ্বালাহীন, বস্তুভারমুক্ত, মননের মুন্সিয়ানা বর্জিত, করুণসুন্দর রূপতন্ময়তার শিশির বিন্দুতে ঝরিয়া পড়িয়াছে।……অনন্তকাল, অসীম বিশ্বব্যাপ্তি, গ্রহনক্ষত্রের কল্পনাতীত দূর প্রসার সমস্তই যেন তাঁহার অনুভূতিতে একবিন্দু স্নিগ্ধসজল শিশির স্পর্শের মত ঘনীভূত হইয়াছে, তাঁহার মোহাবেশকে নিবিড় ও নিশ্ছিদ্র তন্ময়তায় আচ্ছন্ন করিয়াছে।…সমস্ত রূপগন্ধশব্দস্পর্শময় জগৎ তাঁহার জ্যোতির্ময় কল্পলোকনির্মাণে প্রতীকধর্মী ইঙ্গিতরশ্মি প্রেরণ করিয়াছে; সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি উহাদের পারস্পরিক সীমারেখা হারাইয়া এক দ্রবীভূত ভাবরূপকের সাগরসংগমে মিলিত হইয়াছে।' ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা পৃ : ২১২-১৩

২. কোনো কবিকে পাশ্চাত্ত্য কোনো কবির সঙ্গে হুবহু তুলনা করা সমালোচনার এক প্রকার ত্রুটি, রসাস্বাদনই তার মুখ্য কথা। জীবনানন্দের সঙ্গে ইয়েট্‌সের, বিষ্ণু দে'র সঙ্গে এলিঅট ও লর্‌কার, বুদ্ধদেবের সঙ্গে ডি. এইচ্. লরেন্স ও সুইনবার্নের, সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে মালার্মে ও ভালেরির, অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে হপ্‌কিন্‌স্ কামিংস স্টিভেন্স ও রিল্‌কের মিল থাকতেও পারে, কিন্তু কবিতা রচনার সময় কবিচিত্তে যে কত বেদনা একসঙ্গে সক্রিয় তা কবিও স্বয়ং জানেন না, সুতরাং সমালোচকের পক্ষে তো কথাই ওঠে না, তাই তুলনামূলক আলোচনা থেকে বিরত হলুম। পরবর্তী অংশে বিদেশি কবিতার ফর্মের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলা কবিতার ফর্মের তুলনা সমান্তরালভাবে করা হয়েছে, আন্দোলনের আলোড়ন দেখাতে।

৩. An intellectual and emotional complex in an instant of time……It is the presentation of such an image which gives that sense of sudden liberation : that sense of freedom from time and space limits, that sense of sudden growth, which we experience in the presence of the greatest works of art. Poetry, March 1913.

৪. All sounds, all colours, all forms, either because of their pre-ordained energies, or because of long association, evoke indefinable and yet precise emotions......and when sound, and colour, and form are in a musical relation, a beautiful relation to one another, they become as it were one sound, one colour, one form, and evoke an emotion that is made of their distinct evocations and yet is one emotion......The Symbolism of Poetry

Deliver me, my masters, head and heart,
Heart of cadaver's candle waxes thin,
When blood, spade-handed, and the logic time
Drive children up like bruises to the thumb,
From maid and head.

৬. 'ইমেজে'র পুরো অনুষঙ্গ 'চিত্রকল্প' শব্দেও আসে না। তবে বাক্-প্রতিমার থেকে অনেক কাছাকাছি। আবু সয়ীদ আইয়ুব আমাকে জানিয়েছেন ১৯৩৫ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় 'সৌন্দর্য ও বাস্তব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'রূপকল্প' শব্দের অনুকরণে ইমেজের বাংলা 'চিত্রকল্প' তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নয়। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু ১৩৫৫ (১৯৪৮) আশ্বিন সংখ্যায় 'কবিতা' পত্রিকায় পারিভাষিক শব্দের একটি তালিকা দিয়েছেন, চতুর্দশ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় এই তালিকায় ৫৩ পৃষ্ঠায় 'চিত্রকল্প' ও 'চিত্রকল্পী' শব্দ দু'টি সুধীন্দ্রনাথের 'স্বগত' গ্রন্থে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে এবং সুধীন্দ্রনাথকেই শব্দদু'টির প্রবর্তকরূপে গণ্য করেছেন বুদ্ধদেব।

৭. If one had briefly to distinguish the poetry of the fifties from its predecessors, I believe the most important general point would be that it submits to no great systems of theoretical constructs nor agglomerations of unconscious demands. It is free from both mystical and logical compulsions and—like modern philosophy—is emprical in its attitude to all that comes. This reverence for the real person or event is, indeed, a part of the general intellectual ambience (in so far as that is not blind or retrogressive) of our time. One might, without stretching matters too far, say that George Orwell with his principle of real, rather than ideological, honesty, exerted, even though indirectly, one of the major influences on modern poetry. New Lines.

৮. আমার 'আধুনিক ফরাশি কবিতা' গ্রন্থ এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

তিরিশের দু'জন উপেক্ষিত কবি

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা এখনো অনালোচিত। অথচ তাঁর পত্রিকায় প্রায় সকলেই লিখেছেন। আলোচিত না হবার কারণ আমার মনে হয় দু'টি। প্রথমটি সম্পাদক হিসাবে হয়তো অনেককে আশাহত করেছেন, কারণ আপোশহীন একগুঁয়েমি তাঁর জীবনে অব্যাহত ছিল। দ্বিতীয়টি তাঁর শিল্পের প্রকরণ ও তথ্যঘটিত ব্যাপার। তাঁর কবিতার পাঠকমাত্রই দেখতে পাবেন তাঁর কবিতায় একটি মাত্র স্বর জলের মত ঘুরে ফিরে এসেছে। কাঙ্ক্ষিত স্বর্গের ব্যর্থতা এবং হৃত নারীর প্রতি আকুল কান্না তাঁর জীবন ও শিল্পকে বিষণ্ণ অন্ধকারের জটিলতায় নিয়ে গেছে। এখান থেকে তাঁর মুক্তি নেই, জীবনের আয়ু যতো পরিণতির দিকে এগিয়েছে এই ব্যর্থতা বেদনা কান্না, অন্ধকারের ভীষণতা, একাকিত্ব বোধ, জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে এই স্বপ্নে সান্ত্বনা পাবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাব্যকে একতম বৈশিষ্ট্য দান করেছে। 'পঞ্চাশোত্তর' কবিতায় তিনি নিজেই বলেছেন: 'আমি এক পোড়া জমি শুষ্ক, অবান্তর/ অতীতের স্বপ্ন নিয়ে বাঁচি/' এবং অন্তিম পঙক্তিতে বেদনায় একেবারে ভেঙে পড়েছেন: 'সেই স্বপ্ন এ মরুকে আজ কেউ চিনবে না হায়।' বস্তুশূন্য জগতে 'তুমিময়' স্বপ্নের অতীত অন্ধকারে সঞ্জয় নিরন্তর মাথা খুঁটে মরেছেন। আধুনিক জীবনের জটিলতায় এই লিরিক রোমান্টিক ব্যর্থস্বপ্নের ও নস্টালজিয়ায় কান্নায়-ভেজা শব্দশরীর হয়তো সকলকে তুষ্ট করতে পারে নি, এবং স্পষ্ট নিরাভরণ শব্দের শিল্পপ্রকরণও জটিল যুগের কবিদের অভিপ্রেত বলে মনে হয় নি। হয়তো এদিক থেকে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রসমস্যা ও বুদ্ধিবাদ অনেক বৃত্ত তৈরি করে।

বুদ্ধদেব তাঁর প্রথম 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের চারটি কবিতা সংকলিত করেছেন। আমার মনে হয় প্রথম যুগের কাব্য ধারায় ঐ চারটি কবিতার বিশেষ মানসতাই তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। অন্ধকারের গহন গভীরে নীলিমাকে স্নান করতে নির্দেশ দিচ্ছেন, তাতেই নীলিমার চোখ

আরো নীল হয়ে উঠবে, 'চুল হোক ধূসর ফুলের মঞ্জরীর মতো।' এবং রাত্রিকে বিদীর্ণ করে চাঁদের জ্যোৎস্না নীল পাখির পালকের মতো হয়ে উঠবে, তাতেই মেঘের গায়ে স্বপ্নেরা নেমে আসবে, আর তাতেই কবির চোখ ঘুমে নরম হয়ে আসে, নীলিমার স্বপ্নকে তিনি পান। এই বস্তুশূন্য রোমান্টিক স্বপ্নকামনার মাতাল বাসনা প্রথম যুগের কবিতায় তাঁকে মাতিয়ে তুলেছে। অন্ধকার নীল এখানে সঙ্কেতবহ। কিন্তু এই অন্ধকারের নীলিমা বার্ধক্যে স্বপ্নের মহিমা পরিত্যাগ করে যেন হয়ে উঠেছে ভীষণ অন্ধকার। তবু এই অন্ধকার রাত্রিই স্বয়ংবর। বলেছেন : 'আর সেই অন্ধকার নেই, তবু যেন দুহাত বাড়িয়ে মন সেই অন্ধকার ছুঁতে চায় আর হয়ে যায় নিজে অন্ধকার।' জীবনের আয়ু যতো পরিণতির দিকে এগোচ্ছে, ততো তিনি স্বপ্নময় নীল অন্ধকারকে পেতে চাইছেন রোদন রতির স্মৃতি নিয়ে, কিন্তু পাচ্ছেন না বলে পরাজয়ের গ্লানি তীব্র হচ্ছে, নিঃসঙ্গ একাকিত্ব জাগছে, নির্বাসিতের প্রলাপ বাড়ছে, উর্বর পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে রাঙা শিমুলের শোভা দেখে তাঁর হতাশা আরো তীব্রতর হচ্ছে। প্রথম জীবনের ব্যর্থতার মধ্যেও আশা ছিল, 'মনে থাকবে না' কবিতায় নিজেকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়েছেন : 'দেখবে পারো না একা হৃদয়ে তাকাতে তুমি আর যতোবার তাকাবে দেখবে কেউ আছে তাকাবার।' কিন্তু 'উত্তর পঞ্চাশের' কবিতায় হৃত নারীর এই ছবি আর নেই, কান্নায় শুধু ভেঙে পড়ে বলেছেন ; 'কোনো কথা বলতে পারিনে তোমার কথার স্মৃতি বিনে।' অতীত স্বপ্ন ও ব্যর্থতাক্লান্তি তাঁর পরিণত জীবনকে ঘিরে ধরেছে। আসলে সঞ্জয় একান্ত ব্যর্থ প্রেমস্বপ্নের নীল অন্ধকারের কবি। তাই নারীকে তাঁর মনে হয়েছে : 'তুমি এক অপরাহ্ণে বিষণ্ন রোদের কান্না, নারী!' পরিণতিতে ব্যর্থতার মৃত্যু ও প্রেম একাত্ম। মৃত্যুর প্রতীক্ষা প্রেমেরই প্রতীক্ষা।

কবি প্রথম জীবনে অতীত পৃথিবীকে স্মরণ করে বলে উঠেছিলেন : 'হে আকাশ, স্বপ্ন চাই / চাই আর একবার নূতন বিস্ময় / আবার এ কুমারী কামনা / মাটির গহন অবয়বে।' শুষ্ক মরুভূমির জীবনে এই স্বপ্ন আর নেই, কিন্তু মনের পরপারে সত্তার ভেতরে প্রবেশ করতে চাইছেন, নষ্ট পৃথিবীর মধ্যে আত্মার মহিমা খুঁজছেন, এই আত্মাই বহুদূর নক্ষত্র থেকে আগুন নিয়ে আসে, বিনষ্টির মধ্যে নূতন আশার জন্ম দেয়, এবং এখন তাঁর স্ফূর্ত বিস্ময় : 'নচিকেতা —আত্মা মৃত্যুঞ্জয় / আমাকে করেছে বিশ্বে অপার বিস্ময়।' বৃদ্ধের দম্ভ নিয়ে

প্রজ্ঞার দাবি করেছেন, কারণ প্রজ্ঞাই বৃদ্ধের হৃদয়ের দ্বার জানে এবং যৌবনের স্মৃতি ব্যথা মুছিয়ে দিতে পারে। অপার বিস্ময় ও স্বপ্নের পরিবর্তে এই আত্মা ও প্রজ্ঞাই তাঁকে তাঁর ব্যর্থ প্রেমজীবনের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। কারণ প্রেম সম্বন্ধেও এ বয়সে সমস্যাহীন জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছে : 'সব যদি দু'দণ্ডের হয় এত ফুল কেন ফোটে চারপাশে তার ?······শরীরের অবশ আবেশ মুহূর্তে উধাও, কী পাও, কী পাও প্রেম যন্ত্রণায়, শুধু জিজ্ঞাসাই থেকে যায়।'

তবু, তিনি প্রেম ছাড়া সময় ও দেশকে নিয়ে, আদর্শ ব্যক্তিদের মহিমা কীর্তনে, বিভিন্ন কবির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু কাব্য রচনা করলেও, এবং জার্নাল জাতীয় কবিতায় বারো মাসের প্রকৃতির টুকরো ছবি ফুটিয়ে তুললেও এগুলির মধ্যে তাঁর কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। ঝরা-প্রেমের হলুদ গানেই তাঁর বিপ্রলব্ধ ভালো মানায়, যেখানে স্মৃতির রঙে আকাশ ও আলোকে রাঙিয়েছেন, তাঁর নারীর রঙে গন্ধে প্রকৃতি রঞ্জিত সুরভিত হয়ে উঠেছে : 'তোমার স্নানের গায়ে দুপুরের একটি পুকুর / বুকে যার শাদা হাঁস ভাসে / সাপলার গন্ধ পাই তোমার নিঃশ্বাসে।'

গীতিকবিতার লক্ষণ যদি একটি মাত্র মৌহূর্তিক বেদনার একটি সরল প্রকাশ হয়, তাহলে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সেই ধরনের গীতিকবি। কারণ তাঁর কবিতায় ভাবের ও ভাবনার কোনো জটিলতা নেই, মানসিকতা নেই, দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই, নাটকীয় পরিণতি বা চমক নেই, ব্যঙ্গবিদ্রূপ নেই, কবিতার রূপগঠনেও প্রায় একই ধরনের ছন্দভাষা চিত্র অবিরল আসছে। কয়েকটি ছবি আমাদের কয়েক মুহূর্তের জন্য আটকে ধরে রাখে বটে, কিন্তু মজিয়ে দিতে পারে না। 'রাত্রি হতে চেয়েছিলে, তাই রাত্রিময় তোমার চুলের গন্ধ যেন ফুল ফোটার সময়।' প্রথম যুগের উদ্বেলতা যদিও পরিণত বয়সে কমেছে, কবিতা অনেক সময় কবিতাকণিকায় পরিণত হয়েছে। এই কবিতাকণিকার সূত্রপাত হয়তো জার্নাল জাতীয় টুকরো রচনা থেকেই। এই জাতীয় কবিতা পাঠকের মনে দানা বাঁধে না, যাকে রসের ভাষায় চর্বণ করা যায়। একই ভাবের পৌনঃপুনিকতা ক্লান্তিকর, ভাবনার ও চিত্রের অনূতনত্ব স্পষ্ট, তবে আন্তরিকতার গুণেই তাঁর কবিতা হৃদ্য। ভাষাছন্দে বাক্‌রীতিতে শব্দে মাঝে মাঝে জীবনানন্দকে স্মরণ করায়, জীবনানন্দও সুদূর অতীতে স্বপ্নলোকে বাস করতে চেয়েছেন ; কিন্তু তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যুগের ক্লান্তি, হতাশা

ব্যর্থতা জড়িয়ে রয়েছে। থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে চোখ পাল্টিয়ে যেভাবে বুড়ি চাঁদকে বেনো জলে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছে, আনন্দে দু' একটা ইঁদুর ধরতে চেয়েছে, তাতো সাম্প্রতিক যুগের শূন্যতার প্রতীক। কিন্তু সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতায় এই সর্বজনীন অনুভূতি নেই, ব্যক্তিগত ব্যর্থ স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষাই প্রবল। জীবনানন্দ এই জীবনের গ্লানি থেকে স্বপ্নে মুক্তি চেয়েছিলেন, কবিতার প্রতি পঙক্তিতে এই বিরোধ সোচ্চার, সঞ্জয়ের মধ্যে পৃথিবীর সঙ্গে ব্যক্তিহৃদয়ের এই বিরোধ এমন মথিত হতে পারে নি। জীবনানন্দের ভাষার এলায়িত ভঙ্গিও একটা চেষ্টিত শিল্পরূপ ও অলস ক্লান্তির প্রকাশ। কিন্তু সঞ্জয়ের কবিতায় অবলদৃপ্ত ভাষা মুষড়ে-পড়া হৃদয়ের ক্লান্ত রাগিণীর প্রলম্বিত বিষাদের মতো। জীবনানন্দের বাক্‌রীতি ও শব্দপ্রয়োগ কিছুতেই সঞ্জয়ের হতে পারে না। তবু, জীবনানন্দ তাঁকে প্রভাবিত করেছেন। এতো নঞর্থক কথার পরেও বাংলাদেশে সঞ্জয় করুণস্বপ্নের কবিরূপে স্মরণীয় হবেন। কারণ তাঁর নিঃসঙ্গ ব্যক্তিজীবন সাহিত্যেই উৎসর্গীকৃত। নিজেই তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন :

> জ্যোৎস্না, তারা, মেঘ-আঁকা আমার আকাশে
> ছিল ছিল গভীর, নিবিড়,
> হৃদয়ের স্থির
> কেন্দ্রে ছিল প্রেম যা সুরভি
> তাই নিয়ে আজও বাঁচি, আজও আমি কবি ॥

১৯৬৯ মার্চ

মণীশ ঘটক

আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি না লেখকের শরীরের বৈশিষ্ট্য তাঁর লেখায় পড়ে কিনা। কিন্তু মণীশ ঘটকের লেখায় তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্য মুদ্রাঙ্কিত। তাঁর ভাষার দৃঢ়তা, শব্দের দৃপ্ত ঝঙ্কার, বক্তব্যের সাবলীলতা, প্রকাশের অকুণ্ঠ ভঙ্গি, ব্যঙ্গবিদ্রূপের শাণিত দীপ্তি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বীরের জেহাদ, আত্মবিশ্লেষণের উদার স্বীকারোক্তি, এ সবই তাঁর আর্য শরীরের বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করায়। বহুদিন আগে অচিন্ত্য সেনগুপ্তও 'কল্লোল যুগ' বইয়ে এই দিকটার কথা ইঙ্গিতে বলেছেন: 'বিজয় শান্ত, নিরীহ, মণীশ দুর্ধর্ষ উদ্দাম। বিজয় একটু বা কুনো, মণীশ নির্বারিত। ছ'ফুটের বেশি লম্বা,

প্রস্থে কিছুটা দুঃস্থ হলেও বলশালিতার দীপ্তি আছে তার চেহারায়। অতখানি দৈর্ঘ্যই তো একটা শক্তি।' তাঁর কাব্য ও অন্য লেখা সম্পর্কেও এই বিশেষণগুলি আমরা ব্যবহার করতে পারি।

'যদিও সন্ধ্যা' নামকরণে মণীশ ঘটক আধুনিক কালের দু'টি অর্থকে একই সঙ্গে ইঙ্গিতবহ করে তুলেছেন। একদিকে ব্যক্তিগত জীবনের 'দুঃসময়', অন্যদিকে স্বাধীনতা-উত্তর যুগের 'দুঃসময়'। সংগীতবিহীন অন্ধকার সন্ধ্যায় সঙ্গীহীন কবির শরীরে ক্লান্তি যেমন নেমে এসেছে, তেমনি অজগর গর্জনের সঙ্গে সাগর কল্লোলও এ যুগের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। তবু দুঃসময়কে অতিক্রম করতে হবে, রবীন্দ্রনাথের মতো মণীশ ঘটকও বলতে চাইছেন, 'এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।' মণীশ ঘটকের ভাষায়, 'বুক বাঁধো, মৎ ডরো, এগোও।' কিন্তু সাম্প্রতিককালের এই বোধ তাঁর সমগ্র বইয়ে নেই। কারণ বইটি মণীশ ঘটকের সমগ্রজীবনের কবিতার নির্বাচিত সংকলন মাত্র। পরিণত বয়সের মানসিকতা ও নূতন জীবনবোধের মূল্যায়ন নেই। মণীশ ঘটক নিজেও বইটির এই ত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত।

মণীশ ঘটকের বিশেষত্ব এই যে তিনি কল্লোলের অন্যান্য লেখকের মতো টেক্কা দিয়ে বিদ্রোহী সাজেন নি, কোমর বেঁধে পাল্লা দেন নি। জীবনকে যে-ভাবে দেখেছেন সেইভাবেই তাঁর বাস্তবতা সরল ও নির্ভীকভাবে প্রকাশ করেছেন। ফলে জীবন ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও সহানুভূতিতে তাঁর কোনো খাদ ছিল না। কারণ বক্তব্যকে ফলাও করে সাজিয়ে সাহিত্যসাধনা করেন নি, ওই যুগে মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব যতোটা করেছেন। হয়তো তিরিশ দশকের অনেকে প্রেম ছাড়া অন্য ভাবনা অতি প্রচীনতার দোষে দুষ্ট ভাবতেন। মণীশ ঘটকের অতি দৃঢ়তা শুধু মাঝে মাঝে আমার মনে করুণ বেদনার গন্ধের অভাব এনে দেয়, কারণ তাঁর স্বর বড়ো দৃপ্ত, দীপ্ত, বলিষ্ঠ, সোচ্চার, উচ্চ কণ্ঠ, গম্ভীর। এ ভাষার প্রধানগুণ স্পষ্ট সমারোহ, ব্যাপ্ত গাম্ভীর্য। কিন্তু কবিকল্পনার চকিত ব্যাপ্তি অনস্বীকার্য।

প্রথম জীবনের কাব্যে প্রেমই ছিল তাঁর কবিতার মূল উপজীব্য। তাঁর 'পটল ডাঙার পাঁচালি'র মধ্যে কামরিরংসাপ্রেম যেমন চিত্রিত হয়েছে দুঃস্থ অবহেলিত জীবনকে কেন্দ্র করে, তেমনি কবিতার ক্ষেত্রেও এই প্রেম বিভিন্ন রূপ নিয়ে এসেছে, তবে পরিবেশ ও ব্যক্তি বিভিন্ন বলে তার

অনুভূতিরও প্রকাশ হয়েছে উন্নত, সংস্কৃত, সংযত, সূক্ষ্ম, রোমান্টিকভাব বিভোরতায় বিহ্বল। পূর্বের প্রেমের বিরহ কবিকে নিয়তই ব্যথাতুর করেছে, কবির পরিত্যক্ত নারীর কাছে তিনি প্রথমতম প্রেমিক, প্রেমের পাত্র পরিবর্তনে নারীর জীবনে প্রেমের অভাব ঘটে না, নূতন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নূতন প্রেম জন্ম লাভ করে, কিন্তু নারীর পক্ষে কবিকে কেন্দ্র করে তার প্রথম প্রেম ভোলা উচিত নয়। কবি অন্তত সেই প্রেম ভোলেন নি, বরং তার জলন্ত আগুনে স্মৃতি তাঁর বর্তমান জীবনকে রিক্ত করে তুলেছে। তীব্র ঝড়ের রাত্রে প্রচণ্ড ঝড়ের মতোই কবি তাঁর প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন : 'সিক্ত কেশে, ওষ্ঠে বক্ষে চুম্বনের উপলক্ষে উন্মোচিল প্রলয় মাতন / রহি' রহি' বহে গেল ঝড় / উন্মাদিনী নিশীথিনী বিপ্লব বিক্ষোভ জিনি সহসা কাঁপিল থরথর।' কিন্তু কবিপ্রিয়া আজকে অন্যের বক্ষোলগ্ন। কবির মনের মধ্যে শুধু প্রশ্ন : 'আজি কি তাহারে পড়ে মনে / সতীদেহ স্কন্ধ 'পর বুকে অনির্বাণ ঝড়, জন্ম যাযাবর সেই জনে ?' তিরিশের দশকে এই প্রেমভাবনা বাংলাদেশের পক্ষে নূতন। কিন্তু কবি তাঁর অনুভূতির ঋজুতা দিয়ে তীব্র প্যাশনে ঝঙ্কৃত সংগীতে এমনিভাবে উপস্থাপিত করেছেন যে বিস্ময়ের চমক লাগে না। বরং পূর্বস্মৃতির সঙ্গে বর্তমান জীবনের কল্পনা কবির রিক্ততাকে আরো ধূসর করে তুলেছে। নরনারীর প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ব্যক্তির এই বেদনা প্রকাশে চিরন্তন হয়ে উঠেছে। প্রেমের পথেই দেহ ধরা দেয়, কিন্তু দেহ-মিলনের মধ্যেই প্রেম আবির্ভূত হয়। কিরাত দুষ্মন্ত যখন আজন্ম আশ্রম তাপসী কণ্বসুতাকে দেহকামনায় আলিঙ্গন করেছিল, তখনই দুকূল প্লাবিত করে বন্যার মতো প্রেম এসেছে। সেই প্রেমই উন্মত্ত কোলাহলে অনাদ্যন্ত বয়ে চলেছে। দেহমিলনের মধ্যে প্রেমের আবির্ভাবই কবির কাছে পরমা। এই কারণেই 'আমার নিখিল তারি উল্লাসে আজিও উতরোল!' এই বক্তব্য মোহিতলালও বলেছেন, কিন্তু তাতে বক্তব্যের শুকনো পাথরের মতো শব্দিত হয়েছে, হৃদয়ে বেদনাবিদ্ধ ততোটা হয় নি। কাহিনীর বৃত্তে, অতীত বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে, চরিত্রের মধ্যে আত্ম-অনুপ্রবেশের সাহায্যে, নাটকীয় ঘটনায় ও যমকে একটি নাটক হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি চিত্রের উপস্থাপনা, পরিবেশ সৃষ্টি, আবহসংগীত রচনা এই প্রেম প্যাশনের তীব্রতাকে ব্যক্তিহৃদয়ের সামগ্রী করে তুলেছে। কবির কাছে প্রেমের দেহমিলন শুধু মাত্র পূর্বের স্মৃতি,

আজ যেটা রয়েছে সেটা শুধু করুণ বেদনা। কিন্তু এই করুণ বেদনায় সঞ্চয়ের ভেঙে-পড়া ধূসর অন্ধকারের ক্লান্তি নেই। 'আমারে বুঝিতে দিও' এই বক্তব্যের মধ্যে নিজেকে সামলে নেবার পৌরুষ কাজ করছে, চরিত্রের সেই দৃপ্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গিই দেখা দিচ্ছে। আবার যেখানে বহু নারী ভোগ করেছেন, সেখানে বহু নারীর মধ্য দিয়ে পরমাকেই খুঁজছেন, বহু নারী তাঁর কাছে একমাত্র নারী, যে নারী কবির জগতে তমোনাশিনী উষার মতো অভ্যুদিত হয়, নয়নোন্মীলনে প্রাণ সঞ্চার ঘটে, এবং এই নারীই জীবনসত্তার পরম সত্য। বলা বাহুল্য, নারীর এই স্তব থেকেই দেবী সূক্তের সাহায্যে সাম্প্রতিক কালে মণীশ ঘটক 'বিদুষী বাকে'র মতো কবিতা লিখেছেন, যার প্রধান কথা হলো : 'অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্ মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে। ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি। অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা। পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-তাবতী মহিনা সংবভূব।'

যে প্যাশন প্রেমে, সেই প্যাশনই নব জাতীয়তা ও মনুষ্যত্ববোধে, অন্যায়ের ধিক্কারে। এ ভাষার জ্বালা নজরুলের থেকেও অত্যধিক। ভাষা থেকে অলংকারচিত্রধ্বনিঝঙ্কার ঝরে যাচ্ছে। রাবীন্দ্রিক ভাষা, কুমুদ-রঞ্জনীয় পেলবতা ('দামিনীর অট্টহাসে, চরাচর কাঁপে ত্রাসে নিশীথিনী সভয়ে শিহরে') আর নেই, মুখের কথ্য ভাষা বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে কাব্যে স্থান পেয়েছে। যে সমাজবাস্তবতা ছিল না, সেই সমাজবাস্তবতার চেতনাই বিদ্রূপের কশাঘাতে জেগেছে। এখানে তিনি ব্যাপ্ত, প্রসারিত, জীবন সম্বন্ধে মণীশ ঘটক উন্মুখ। ভাষা যেমন উনিশ শ' একত্রিশ সালের গোড়া থেকেই সাবলীল হয়েছে, গদ্যের কাছাকাছি এসেছে, তেমনি যুদ্ধের পূর্বে উনিশ শ' সাঁইত্রিশ সাল থেকেই এই বাস্তবচেতনা সক্রিয়। একদিকে ব্যক্তিগত প্রেমের কামনা, অন্যদিকে সমষ্টিগতভাবে দেশের ও সমাজের ভাবনা। 'বাঙালির ছেলে' কবিতায় যুদ্ধপূর্ব যুগের বাঙালি যুবসমাজের অন্তঃসারশূন্যতা যেমন ব্যক্ত করেছেন, তেমনি 'সে লোহুর স্বাদ এখনো লোনা' কবিতায় স্বাধীনতা-উত্তর যুগের কাম, নির্বাচন-ভাঁওতা, খেলো সাহিত্য, ধর্মের বুজরুকি, উচ্ছল কামুক জীবনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, এবং এর মধ্যেই দেশপ্রাণদের কথা মনে করে. রবীন্দ্রনাথেরই মতো প্রশ্ন করেছেন : 'উনিশ শ' বিশ তারও আগেকার জাতক যারা / মায়ের দুঃখে ঢেলেছে তপ্ত রক্তধারা / বৃথা কি তাদের

আত্মাহুতি ও স্বপ্ন বোনা ?' যুদ্ধপূর্ব যুগের কবিতায় দেশের আদর্শ ছিল, স্বাধীনতা-উত্তর কবিতায় দেশের আদর্শ শুধু স্মৃতি। 'ভেড়িয়া সাধন' কবিতায় তীব্রভাবে বলেছেন : 'আত্মস্তুতি কড়া মাল, আকণ্ঠ সে চিজ করে পান / জি হুজুর গা ঢালেন / নান্য পন্থা ভেড়িয়া সাধন।' 'পরমার্থ' 'উনিশ বছর ধরে', 'কি করেছো যাও বলে' 'আত্ম প্রবঞ্চক' 'এদের চিনে রেখো', প্রভৃতি কবিতায় কবির জ্বালা যেমন তীব্র, তেমনি তার প্রকাশ অগ্নিবর্ষী। অন্যায়ের প্রতি, কুৎসিতের প্রতি তাঁর ধিক্কার মারাত্মক, এই ধিক্কারের ভাষাও তেমনি বলশালী। এখানে ভাষার কোনো পেলবতা গন্ধ ঝঙ্কার রহস্য নেই, এ ভাষা রাগের ক্রোধের জ্বালার এবং জ্বালিয়ে দেবার। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মর্জির সঙ্গে মেলে। মণীশ ঘটকের নারী-প্রেম এখন বিশ্বমানবপ্রেমে স্থান পেয়েছে, তাই বিশ্বমানবতার বিরুদ্ধে কুৎসিতের অধিকারকে তীব্র রাগে আক্রোশে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছেন। এরি জন্যে তিনি যুদ্ধ চাইছেন। যারা রোমান্টিক ভাবনায় মশ্‌গুল, তাদের কবিতার মানচিত্রে রসের মাত্র শৃঙ্গারকরুণঅদ্ভুতশান্ত-হৃদ রয়েছে, রৌদ্রবীরভয়ানকবীভৎস যে আছে দুর্ভাগ্যবশত রোমান্টিক কাব্যের দুর্মর প্রভাবে আমরা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করি ; 'ধীর বাতাস' লিখতে গিয়ে 'মন্দানিল' ব্যবহার করলে খুশি হই। 'লাফ দেবার প্রাক্কালে হিংস্র চিতার মতো পতনোন্মুখ না-পড়া বাজের মতো, কী দেখতে পাচ্ছ হে প্রবঞ্চক, ওহে আত্মপ্রবঞ্চক, কী সব দেখতে পাচ্ছ ?' উক্তির মধ্যে ক্রোধজাত রৌদ্র রসই তীব্রতর হচ্ছে। এবং এই ক্রোধ ব্যক্তিগত নয় বলেই শিল্পের এক্তিয়ারে পড়ে। যদিও স্বীকার করতে বাধা নেই, করুণের প্রগাঢ় গভীরতা এতে আসে না। কিন্তু আসে না বলেই শিল্প হবে না কেন ?

'যুবনাশ্ব না ?' কবিতার আত্ম-স্বীকারোক্তিতে, আপন সত্তার সঙ্গে কথোপকথনে মণীশ ঘটকের সেই পরিচিত অকুণ্ঠ নির্ভীকচিত্ততা, যা সত্য তাকে প্রকাশ করবার নির্ভার কামনা, প্রকাশ পাচ্ছে। আমার নিজের জানা নেই, স্ল্যাঙ ভাষা ব্যবহার করে বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় সার্থক কবিতা রচিত হয়েছে কিনা। কবিতা ভাষাশিল্প বটে, কিন্তু ভাষা অনুভূতিরই বাহন। অনুভূতি যদি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ তীব্র তীক্ষ্ণ হয়, শব্দও সেইভাবে আসে। মণীশ ঘটকের সেই বলিষ্ঠ অনুভূতিই তাঁকে আত্মবিশ্লেষণে প্রণোদিত করেছে, এই ভাষার সাহায্যেই তাঁর অনুভূতির রাজ্য, জীবনের পরিবেশ, অভিজ্ঞতা জানতে

পারি, জানতে পারি মৃত্যু ও ধ্বংস সত্ত্বেও এগিয়ে যাবার দৃঢ় প্রত্যয়। 'আরে কে ও যুবনাশ্ব না? / এসো এসো স্ত্যাঙাৎ ঢেদ্দিন পর! তোমার আমলের / কোনো শালা আর বেঁচে নেই এই অধম ছাড়া / নরক গুলজার করে একা আমিই থেকে গেছি। / কি করে যে আজো টিঁকে আছি, / দেবা ন জানন্তি। / তবে হয়ে এসেছে বাপ্, আমারো হয়ে এসেছে। / চারদিকে চোখ মারছ, দেখছ কি বাপধন? / কুম্ভীপাক, পুন্নাম, রৌরব / সব আহামরি জায়গা।'

পরিণত বয়সে মণীশ ঘটক প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনায় স্নান করে উঠেছেন। দেবীসূক্তের 'অহমেব বাত ইব প্রবামি'র মতোই এ জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অদৃশ্য শক্তির লীলা দেখেছেন, তেমনি 'সন্ততি' কবিতায় উপনিষদের 'বহুস্যাম্'কে উপলব্ধি করেছেন। বিবিক্ত এক আপনার আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দের ফলেই স্বপ্নের অনেককে সন্তানের মধ্যে পেয়ে পূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন, তারা সবাই চলে গেছে, কিন্তু সেই এক 'যেন কোনো ঢেউ না-ওঠা মহাসমুদ্রের / গোপন অতল মণিকোঠায় / আমার অনেক ঘরের / অনেক ছড়ানো নির্জনতায় / আবার আমি পূর্ণ হয়ে উঠি।' এমনি করেই এক থেকে বহুর, বহু থেকে একের যাওয়া-আসা। এমনিভাবেই পরমাত্মার সন্ততিরূপে এরা গণ্য। এই কারণেই প্রাচীন ঋষির মতো ঋতদৃক্ হয়ে উঠতে চাইছেন।

তাঁর কবিকল্পনা সমুন্নতভাবে এখানে উন্নীত। ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন মিথ্ মুহূর্তে পাঠকের মনে সার্বভৌমিক অনুভূতির ব্যাপকতা এনে দেয়। কেননা আমাদের সকলের মধ্যেই এই সমষ্টিগত অচেতন চিরকাল ধরে কাজ করছে, ইনস্টিংক্ট ও আর্কিটাইপ জড়িয়ে আছে, কর্মভাবনায়। চণ্ডীশ্লোকের মধ্যে যুগের কথা নেই, আছে সৃষ্টিরহস্যের আদি প্রশ্ন, এবং এই আদি প্রশ্ন সমগ্র জাতির বাসনাসংস্কারে লুকিয়ে আছে, তাকেই দৃপ্ত ভাষায় সঞ্জীবিত করতে চাইছেন। চণ্ডীর শ্লোকগুলি আক্ষরিক অনুবাদ নয়, কবিকল্পনায় ভাষায় ছন্দে সংহতিতে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন ভাবমূর্তি লাভ করেছে। চণ্ডীশ্লোকের সৃষ্টিরহস্যের আদি প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কবির গভীর প্রত্যয়, বেদমন্ত্রের প্রত্যয়ের সঙ্গে কবির অনুভূতি মিশে একটা বলিষ্ঠ আশাবাদ গড়ে উঠেছে।

আত্মজ্ঞান এবং আত্মপরিচয়ের মধ্যে মানবজীবনেরই জয়গান করেছেন : 'আত্মপরিচয়েই পারে হদিশ সোনার খনির।' 'তৃতীয় নয়ন মেলো, দেখ নিজ চিত্তে অবগাহি' / আনন্দের মধ্যমণি স্থিরদ্যুতি সেথা আছে চাহি।' সূর্যপুত্র

সাবর্ণির জিজ্ঞাসার মতো কবিরও একই উদ্বেল জিজ্ঞাসা : 'উৎস সন্ধানীর চিত্ত উদ্বেলিত, বলো বলো তারে / হে পূষন্, জন্ম দিল কে আমারে, মাতা সবর্ণারে ?' 'সত্যের দুয়ারে আসি সত্যকাম হও আমিময় / অমৃত সেখানে আছে, জিনে নাও জীবন অব্যয়।' শরীরে নিহিত আমিকেই জানবার আকুল আকাঙ্ক্ষা, যে আমি সর্বময় ব্যাপ্ত, যে পুরুষের কথা 'মৃত্যু ও নচিকেতা' কবিতায় মোহিতলাল বলেছেন। যেহেতু চণ্ডীর মধ্যে শুধু সৃষ্টিরহস্য নয়, দার্শনিক তত্ত্বও আছে, সেইহেতু এঁর কবিতায় তাত্ত্বিকতা মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়েছে ; যেমন 'পঙ্কজাঞ্চাতিশোভনম্' কবিতাটির মধ্যে, কিন্তু চিত্রটির শেষে সমুন্নত চিত্রে এই 'সংস্কার' 'প্রকৃতি' 'মায়া' 'অদৃষ্ট' 'অপূর্ব' ঢেকে গেছে।

'দেবীসূক্তে' দেবীই যেমন সর্বাধার, সেই দেবীকেই নারীরূপে বিচিত্র লীলা ও রূপের মধ্যে কবি স্তব করেছেন এ যুগের সমৃদ্ধ ভাষায়। এ যুগের পটভূমিকায় এ বইয়ের কবিতাগুলি যেন বীভৎস নারকীয় প্রেক্ষাপটে প্রত্যয়-যুক্ত জ্যোতির আলোক। এ যুগকে হনন করবার জন্যই যেন তিনি বলেন : 'কোথা দুর্গা মহাভীমা ? দেবগণ করে আবাহন / শস্ত্রাস্ত্র বর্ষণ করি' রক্ষকুলে-করিতে হনন।'

'বিদুষী বাকে'র কবিতাগুলি আমাকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছে সমুন্নত চিত্রকল্পের জ্যোতিরুদ্ভাসে। চণ্ডীর বিভিন্ন শ্লোকেও অসংখ্য ক্লাসিক রূপ ছড়িয়ে আছে, যার মূর্তিপ্রতিমা মুহূর্তে চোখের সামনে ভাসে : 'সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যং চৈন্দ্রেন চাভবৎ / বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ।' অথবা ; 'বালরবিদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাম্/স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশ-পাশাভীতিকরাং প্রভজে ভুবনেশীম্।' মণীশ ঘটক বর্ণনা করেছেন : শাম্ভব-তেজে গঠিত আনন পঞ্চজ্ঞানের দ্বার / মুক্তকেশীর বিম্ব ওষ্ঠ ; শিরে তাঁর বিধৃত / এলায়িত ঘন চিকুরের ভার আগুল্‌ফলম্বিত / দেখেছি সেখানে সেই দেবতার নিকষকৃষ্ণাকার।' 'প্রাতঃসন্ধ্যা সায়ংসন্ধ্যা দুই সন্ধ্যা অনির্বচনীয় / সৌন্দর্য আধার, তাই ভ্রূযুগল এত রমণীয়, / বিশ্বপ্রকৃতির যত সুষমার মিলন সেখানে, / ভ্রুবৌ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ। মিলিয়াছে কি স্নেহের টানে।' কিন্তু এতো সুন্দর প্রত্যক্ষ রূপ থাকা সত্ত্বেও 'অজ্ঞেয় অব্যক্ত তবুও পরমা মায়া।' তাই অন্তরস্থিত আমার আমিতেই 'পরমা' খুঁজেছেন। প্রাচীন শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থও কাব্যে যে কতখানি মহত্তর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে কল্লোলের যুবনাশ্বই

ঐতিহ্যের টানে তাকে শেষ বয়সে প্রমাণ করলেন। কবিজীবনের এই পরিবর্তন ও বিবর্তন লক্ষণীয়। প্রথম জীবনের 'পরমা'ই এখানে বিবর্তিত।

যে-কবি অনুভূতিকেই একমাত্র অবলম্বন করেন, ভাষা তাঁর কাছে বশংবদ নগণ্য ভৃত্য মাত্র। সুতরাং ভাষাশিল্পের কারুকাজ তাঁর কাম্য নয়। এদিক থেকে হয়তো অনেকে তাঁর কবিতায় ত্রুটি দেখতে পাবেন। কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় বিয়াল্লিশ বছরের কবিতা লক্ষ্য করলে মণীশ ঘটকের ভাষার ছন্দের শব্দের বাক্‌রীতির পঙক্তিবিন্যাসের বৈচিত্র্য ও গল্পধর্মী কবিতা দেখতে পাবেন। 'জাপানি কবিতার' পঙক্তিবিন্যাস জাপানি ছবির মতো। ভাব অনুযায়ী ভাষাও বিচিত্র হয়েছে। 'যুবনাশ্ব-না ?' ও 'সন্ততি' কবিতা দুটি পাশাপাশি পড়লেই পার্থক্য বোঝা যায়। একেবারে সাম্প্রতিক কবিতাগুলিতে শুধুমাত্র হার্দ্য অনুভূতিরই প্রকাশ ঘটছে। এতে ভাষাছন্দঅলংকারধ্বনি-সংগীতের কোনো মায়াবরণই নেই। দু'টি কবিতা ছাড়া 'বিদুষী বাকে' বিচিত্র সনেট, চতুর্দশীর রূপ অপূর্ব ফুটেছে, ভাষার গাম্ভীর্য ভাবের সঙ্গে মিলেছে :

> সংযত করি ক্রিয়াশীলতার উচ্ছৃঙ্খল গতি
> অখণ্ড মহাকাল সমুদ্রে কে করে নিমজ্জন,
> ছিন্ন ছিন্ন খণ্ড প্রকাশ কে করে সংযমন
> সর্ববর্ণ সর্বভাবের কোথা শেষ পরিণতি ?
> শাম্ভব তেজে গঠিত আনন পঞ্চজ্ঞানের দ্বার
> মুক্তকেশীর বিম্ব ওষ্ঠ ; শিরে তাঁর বিধৃত
> এলায়িত ঘন চিকুরের ভার আগুল্‌ফলম্বিত
> দেখেছি সেখানে সেই দেবতার নিকষকৃষ্ণাকার !
>
> সর্বভাবের বিলয় সেখানে, নীরন্ধ্র ঘন ঘোর,
> সর্ববর্ণ বিলীন সেখানে, সে অতল সুনিবিড়,
> অন্তরালে কি আছে রহস্য, অবাঙ্‌ মনোগোচর
> প্রজ্ঞার পরে কি মহাশক্তি চির অবলুপ্তির !
>
> দিব্যজ্ঞানের পশ্চাতে কোন বিস্মরণের বাস ?
> জেনেছি তাঁহারে। যম তার নাম। আর সব অধ্যাস॥

১৯৬৯ মার্চ

চল্লিশের কবিতা

একথা সর্ববাদিসম্মত যে চল্লিশের কবিরা সমাজচৈতন্যের দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন। এঁরা যে-সময় জন্মেছিলেন, তখন উনিশ শ' কুড়ি-একুশে একদিকে খিলাফত আন্দোলন, অন্যদিকে গান্ধিজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। বাংলার স্বরাজ্যদল মাথা চাড়িয়ে উঠেছে, সমাজের নিম্নশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসছে, শ্রমিকদের আত্মমর্যাদা ও দাবি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে; আবার ইংরেজ, সাইমন কমিশনের মতো কর্মে, বেড়ালের মতো লোভ দেখাচ্ছে! তিরিশের গোড়ায়ই আইন-অমান্য আন্দোলন এবং গান্ধিজির রাউণ্ডটেবল্ কন্ফারেন্সের হিড়িক, বিহারের সর্বনাশা ভূমিকম্প, পঞ্চম জর্জের মৃত্যুর পর প্রদেশেপ্রদেশে কংগ্রেসের রাজ্যশাসন, এই অবস্থা চলতে চলতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। সুতরাং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে আর্থিক এবং রাজনৈতিক জীবনের অনিশ্চয়তা ও ধ্বংসের মধ্যে এঁদের শৈশব ও যৌবনকাল কেটেছে, এবং যখন যৌবনে কবিতা লিখতে বসেছেন, তখন পৃথিবীর, ভারতবর্ষের এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনের চিত্র ও সমাজজীবনের ক্ষতকেই চিহ্নিত করেছেন। চল্লিশের দশকের প্রথমদিকে নাৎসি জর্মানির কাছে ব্রিটিশের অবস্থা খারাপ হয়ে উঠেছে, জর্মানির বিরুদ্ধ শক্তিগুলি ধ্বসে পড়ছে, ফ্যাসিবাদী ইতালি জর্মানির সঙ্গে যোগ দিয়েছে, ভারতবর্ষের ওপর জর্মানির আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী বলে বোধ হচ্ছে। জাতীয়তাবাদী ভারতীয়েরা প্রথমে বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে যুদ্ধ করতে চায় নি, যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস রাজনৈতিক চাপ দিয়েছ, পরে বাধ্য হয়েছে ভারতীয় সৈন্য পাঠাতে। ভারতীয়েরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে যতো স্তোকবাক্যই লাভ করুক, ভারতীয় জীবনে যুদ্ধের ফলে ধ্বংস নেমে এসেছে। যুদ্ধের সরঞ্জামের জন্যে ভিন্ন শিল্প বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু যে শিল্পে মানুষের উন্নতি হয়, তা একটুও লক্ষ্য করা হয় নি; অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চলেছে বটে, কিন্তু কোনো কাজ হয় নি; শ্রমিকদের অসন্তোষ মারাত্মকভাবে দেখা দিয়েছে, সরকার বাধ্য হয়েছে মহার্ঘ্যভাতা বাড়াতে, বোনাস দিতে, পেন্সন ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড-এর ব্যবস্থা করতে। তাদের কাজের সময় কমে গেছে। যুদ্ধের ফলে শ্রমিকদেরই উন্নতি

হয়েছে, ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপ বেড়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের দুঃখ চরমে উঠেছে। জিনিসের দাম বেড়ে গেছে, কাপড় ও শস্য বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে, তখনকার ন্যাশানাল প্ল্যানিঙ কমিটির শ্রমবিভাগের সাব কমিটির রিপোর্টে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে খাদ্য কেরোসিন চিনি কাপড় প্রভৃতি বিষয়ে সরকারের কঠোর ব্যবস্থা সত্ত্বেও দাম চড়ে গেছে, কালোবাজারির উন্নতি হয়েছে, যৌনতায় ও সৈন্যদলে কলুষপঙ্কের সীমা নেই। এই সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে পঞ্চাশের মন্বন্তর, যে-মন্বন্তরে এক ফোঁটা ফ্যানের জন্য রাস্তায় লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, সামান্য ক'টি টাকার জন্যে মা ও বোনেরা রাত্রির অন্ধকারে নগ্নদেহ বিকিয়ে দুরারোগ্য রোগে ভুগে মরেছে। ইংরেজ সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে দুর্ভিক্ষে পনেরো লক্ষ লোকের মৃত্যুর জন্যে সরকারই দায়ী এবং সমাজের সঙ্গে সরকারও তখন ভেঙে পড়েছে। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে কৃষির; ব্যাবসা-বাণিজ্য দুর্দশার চরমে উঠেছে, য়ুরোপ জাপান সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। শিক্ষাদীক্ষার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। সাধারণ মানুষের এই দুঃখদুর্দশার সঙ্গে রাজনৈতিক জীবনের অরাজকতা, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি ও বিভেদবুদ্ধি শূন্যতাবোধকে আরও তীব্র করেছে। নবগঠিত কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ দেশের জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের মনে সন্দেহ জাগিয়েছে, জর্মান ও জাপানের সঙ্গে নেতাজির সহযোগিতা নেতাজির মানবতাবাদ সম্পর্কে কম্যুনিস্টদের মনে ঘৃণা সঞ্চার করেছে। ১৯৪২-এর ৯ই অগাস্টের কংগ্রেস পরিচালিত 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন যেমন জাতীয়তাবাদীদের মনে আশার সঞ্চার করেছে, তেমনি ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির ফলে অত্যাচার নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে বিভীষিকা জাগিয়েছে। জাপান ও জর্মানের সহযোগিতায় সিঙ্গাপুরে নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং স্বাধীন ভারতের সরকার গঠন, ১৯৪৩ সালে জাপানি সৈন্যসহ ভারত সীমান্তে নেতাজির অভিযান বাঙালি ও ভারতীয়দের মনের স্বাধীনতার উদার আকাশ এনে দিয়েছে, কিন্তু জাপানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মসমর্পণ ব্যর্থতাবোধ ছড়িয়েছে। অন্যদিকে ১৯৪৬ এর ১৯শে ফেব্রুয়ারি নৌবিদ্রোহ ইংরেজে বিরুদ্ধে ভারতীয় মানুষের জয় ঘোষিত হয়েছে। এদিকে কংগ্রেস ও মুস্লিমলিগের মধ্যে রাজ্য ভাগাগড়া ও শাসন নিয়ে নিরন্তর বিবাদ চলছিল, মুস্লিমলিগ যখন দেখলো ক্যাবিনেট

মিশনের পরিকল্পনায় কংগ্রেসের জয় হচ্ছে তখন ১৯৪৬ সালে ১৬ই আগস্ট কলকাতায় দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিলো। নোয়াখালিতে আগুন জ্বলে উঠলো, তার প্রতিক্রিয়া জাগলো বিহারে, এমনিভাবে অগণিত মানুষ মারা যেতে লাগলো, গঙ্গার গৈরিক জল রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো, মানুষকে ইঁদুরের মতো থেঁতলে মারতে লাগলো, মরা দেহের ওপর শকুন ঝাঁপিয়ে পড়লো, রাস্তাঘাট গলিত দূষিত গন্ধে ভারী হয়ে উঠলো, দুই প্রান্তের হিন্দু-মুসলমান আশ্রয়চ্যুত হয়ে নির্বাসন বেছে নিল, রাস্তাঘাটে কুকুরের সঙ্গে খাবার খুঁটতে লাগলো, অতঃপর মাউন্ট-ব্যাটেনের প্রচেষ্টায় র‍্যাড্‌ক্লিফের সাহায্যে ভারতের বুক দ্বিধাবিভক্ত হলো, হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে গেল। চল্লিশের কবিদের কবিতায় সময়চেতনার জন্যই এর ছাপ অনিবার্যভাবে পড়েছে, আর পঞ্চাশের কবিরা এই অবস্থার মধ্য দিয়ে শৈশব ও যৌবন কাটিয়েছেন বলে তাঁদের স্মৃতিতে অবচেতন মনে এই ধ্বংসলীলা কখনো বেদনা জাগিয়েছে, কখনো মৃত্যুর দিকে নিয়ে গেছে। এই ধ্বংসাত্মক পরিবেশের মধ্যে ১৯১৭ সালের রাশিয়ার বিপ্লবের কৃতকার্যতা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো আশাবাদী মনে প্রেরণার সঞ্চার করেছে। এবং এই কবিরা তিরিশের ইংরেজি কবিদের সমাজচৈতন্যে বিশ্বাসী। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শেষের যুগের কাব্যের ইতিহাসচেতনা, ব্যষ্টিবোধ, মানবতার আদর্শ, বিজ্ঞানভিত্তিক চিত্রকল্প তাঁদের চেতনাকে প্রসারিত করেছে। কিন্তু অনেকেই শিল্পরূপে আত্মনিয়োগ করতে পারেন নি।

গোপাল ভৌমিক

গোপাল ভৌমিক নিজেই কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যৌবনের প্রথম দিকে ট্রট্‌স্কির ভাবাদর্শে কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর 'সাহিত্যসমীক্ষা' বইয়ে একদিকে কবিতাকে কবিতা হবার জন্য যেমন এলিঅটের উক্তির শরণাপন্ন হয়েছেন, তেমনি জীবনের সঙ্গে সাহিত্যকে মেলাবার কঠোর সাধনার কথা উল্লেখ করেছেন। আলেক্‌জাণ্ডার ব্লকের একটি উদ্ধৃতি তুলে বলেছেন যে শিল্প, জীবন ও রাজনীতি অবিভাজ্য এবং অবিচ্ছেদ্য। অন্যত্র সেসিল ডে. লুইসের একটি উদ্ধৃতি টেনে বলেছেন যে সত্যই হচ্ছে কবিতার একমাত্র সমর্থন, এবং প্রকৃত কবিতা কেবলমাত্র নিজেকেই সমর্থন করতে পারে। সুতরাং, কবিতার মধ্যে গোপাল ভৌমিক সত্য এবং ব্যাপ্ত জীবনকেই ধরতে চাইছেন।

কবিতা : চিত্রিত ছায়া

'সমাজ ও সাহিত্য' প্রবন্ধে স্পষ্টত এক জায়গায় বলেছেন : 'কিন্তু আমাদের মনে হয় যে সাহিত্যিক কর্তব্য সামাজিক কর্তব্যেরই অংশীভূত—কেননা সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিদ্যমান রয়েছে।' এবং এই মতবাদের স্বাক্ষর ১৩৫২ অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত তাঁর 'স্বাক্ষর' বইয়ে আছে। 'প্রশ্ন' কবিতায় নিজেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র একাকী না ভেবে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে নিজেকে. মিলিয়ে দিয়ে ব্যাপ্ত হতে চাইছেন। শত ধ্বংস ও অবক্ষয়ের মধ্যেও কম্যুনিস্টদের মতো বলেছেন : 'ভারী-দিন এলো ! কাস্তে হাতুড় মজুরের জয়গানে, / এলো লাল দিন।' বলেছেন ; 'ব্যষ্টির মাঝে দেখি আজ তারা/দেখেছি সমষ্টিরে' ; আশাবাদের প্রত্যন্ত সীমায় উন্নীত হয়ে ঘোষণা করেছেন : 'প্রদীপ্ত দিনের ডাকে সাড়া / দেই আনন্দিত মনে—/ দেখি লাল সূর্য জ্বলে / প্রতি পর্ণ কুটিরের কোণে'। এমনিভাবেই মানুষের জীবনে আসতে চেয়েছেন, যে জীবন যুগের প্রভাবে সূর্যের হাপরে অনুক্ষণ পুড়ে ছাই হচ্ছে। যুগ এবং যুগের প্রভাবে তাঁর ব্যক্তিমনের নৈরাজ্য ও অন্ধকারের কথা কয়েকটি কবিতায় বারংবার প্রকাশ করেছেন। এঁরা উজ্জ্বল প্রভাত দেখেন নি, পাতার ফুলে অজস্র প্রভাত অদৃশ্য, চোখে এঁদের বিস্ময় ও সুদৃঢ় প্রত্যয় ছিল না, পুষ্পরথ ও ফানুস-প্রেমের অস্তিত্ব ছিল না ; 'আমরা আঁধার শিশু / অবিশ্বাস জীবনের মূলে'। 'জরতী-ধরার বুকে-/মূর্তিমান আমরা সন্দেহ : / দিল না তো সুধারস-/হতভাগ্য আমাদের কেহ।' এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও কবির আকাঙ্ক্ষা 'তবু জানি একদিন জাগবে ধূসর বহ্নিকণা।' 'আমরা' কবিতায় চল্লিশের কবিদের কথাই বলেছেন ; 'আমরা' 'হে মহানগরী' 'বিপর্যয়' 'উজ্জীবন' 'ঋণশোধ' প্রভৃতি কবিতায় একই মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে : 'যে মাটি ফসল দিল সে আজ করে প্রবঞ্চনা / তবু আছে জীবনের অজস্র সান্ত্বনা।' এই সমাজসচেতন কবিতার পাশেই কয়েকটি কবিতায় প্রেমের অনুভূতি ব্যক্ত, ভালোবাসার স্মৃতিবেদনার চিত্রলিপিমালায় ভঙ্গি ভাষা ও অনুভূতিতে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সাদৃশ্য চোখে পড়ে : 'হাজার বছর আগে ফেলে-দেয়া মনের ছায়ায়— / আবার কি ফিরে পাওয়া যায় ?' জটিলরচনার বিরোধী এগুলি, হাল্‌কা তুলির ছোঁয়ায় কয়েকটি স্পষ্ট ছবি ও ইমেজ ফুটিয়ে তুলতেই তাঁর প্রবণতা। 'স্মরণী' কবিতাটি ইমেজিস্ট কবিতা স্মরণ করিয়ে দেয়, গোধূলির তারার সঙ্গে লজ্জাবনতমুখী প্রিয়তমার সাদৃশ্য শুধুমাত্র চিত্রগততন্ময়তার ফল।

নতুবা স্পষ্ট ছবির উদাহরণ : 'পাখি-ডাকা ভোর এসে নিঃশব্দে মিলালো / চক্রবালে কেঁপে-ওঠা তলোয়ার দিন।'

১৩৬২ সালে প্রকাশিত 'বসন্ত-বাহার' কাব্যগ্রন্থে প্রেমভাবনাকে কেন্দ্র করে বিচ্ছেদজনিতবিরহবেদনার ছবি ফুটে উঠেছে। প্রেমের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু তাকে না পেয়ে ব্যর্থতার হতাশ্বাস, প্রাত্যহিক জীবনে রমণীর স্পর্শে নীল স্বপ্ন, হঠাৎ বিস্ময়াপ্লুত মনোভাব, একদিকে কপিশ চক্ষের স্বপ্ন, অন্যদিকে দারিদ্র্য ও যান্ত্রিক জীবনে সরীসৃপ দিনের ব্যর্থতা তাঁর প্রেমভাবনার মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে, আবার মাঝে মাঝে বুদ্ধির প্রখর সূর্যে তেজিয়ান হতে চেয়েছেন। প্রাত্যহিক জীবনের হাল্‌কা ছবি কয়েকটি বেদনায় চমৎকার ফুটে উঠেছে : 'নরম ভিজে সকাল / কাঁচা সোনার রোদে গলা / আকাশখানি ফ্রেমে বাঁধা / এক টুকরো ছবি।' 'যান্ত্রিক দিন শান্ত্রীর মতো সঙিন খাড়া করে।' 'আমার মনের জরা / প্রতি অক্ষরে স্রোতের মতন / জ্বল জ্বল করে চায়।' সমস্ত কবিতার মধ্যে মহান ব্যাপ্ত ভাব নেই, জগৎ ও জীবন কবিকে যেমনভাবে ভাবিয়েছে তারি কথা সামান্য তুলির টানে প্রকাশ করেছেন। তবু আশাবাদে তাঁর চিত্ত সমুজ্জ্বল।

কিন্তু সাম্প্রতিককালের কবিতায় গোপাল ভৌমিক অনেকাংশে সমাজ বাস্তবতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। এ কবিতাগুলির বেশির মধ্যেই ইমেজ বা সুর নেই, ব্যক্তিমনের গোপন বেদনার ঝরনা উৎসারিত হয় নি ; প্রকাশ পেয়েছে ব্যঙ্গ, ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজের মিথ্যা ও হিংস্ররূপ, আদর্শের ব্যর্থতাবোধ থেকে জ্বালা। পূর্বের কবিতায় বিভিন্ন ছন্দেই সমান নিপুণতা দেখিয়েছেন, এখানকার কবিতায় ছড়ার ছন্দ তাঁর প্রিয় ছন্দ। বর্তমান রাজনৈতিক ও সমাজজীবনই তাঁর কবিতায় ছন্দোরূপ পেয়েছে। হত্যাকারীই ইতিহাসে আজ বীর, রাজনৈতিক আবর্তনে ব্যক্তিসত্তা অবদমিত, ক্ষেতের ফসলে চাষী যে সোনা জন্মায় হিংস্র রাজনৈতিক গুণ্ডারা তাকে পুড়িয়ে মনের জ্বালা মেটাচ্ছে, অথচ এরাই ভিড়ের মধ্যে অত্যাচারিতের ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকে, বিভিন্ন পার্টিতে যোগদান করে পাশবতার খবরদারি করে, এখানে বাঁচা মানে প্রভুর তোশামোদ করা। চাষীর চাষের কষ্টের চেয়ে পাকা ফসল তোলাটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা ; খরা ঝরা পোকা ও সেচের বাধার চেয়ে রাজনৈতিক জীবনের নরবানরের সংগ্রামই চাষীর চাষকে নষ্ট করে দিচ্ছে। অন্যদিকে

'বীট্নীক' কবিতায় দারিদ্র্য হতাশার সঙ্গে প্রেমের বেদনায় সংশয়িত, 'সময়-সম্পৃক্ত' কবিতায় পূর্বের মতোই সমাজচৈতন্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন : 'আমার একান্ত চিন্তা, নিজস্ব সম্পদ / কি তার গৌরব যদি কাজেই না লাগে ?' আবার 'রঙের তুরুপ' কবিতায় সমস্ত কিছু ভুলে প্রেমের চেতনায় গোটা মানুষ হতে চেয়েছেন, কিন্তু 'ক্রীড়নক' কবিতায় বিজ্ঞানের অভিযান যে মর্ত্য পৃথিবীকে মৃত্যুর শীতলতায় নিয়ে যাচ্ছে একটি চিত্রকল্পের মধ্যে অপূর্বভাবে প্রকাশ করেছেন। 'ক্রীড়নক' কবিতাটি সাম্প্রতিক কালের একটি সার্থক কবিতা। এ যুগে তাঁর মনের তীব্র ঘৃণা জ্বলে উঠেছে 'তেন ত্যক্তেন' কবিতায় ; মনুষ্যেতর প্রাণীর চেয়েও মানুষ নীচে নেমে গেছে। অবরোহী যুক্তিশাস্ত্রের মতো প্রতিটি পঙক্তিতে প্রেমিস বা প্রস্তাব তুলে ধরে সিদ্ধান্ত টেনেছেন, 'কাকের মাংস খায় না কাকেও'। এই সামান্য প্রস্তাবের পর আর একটি সামান্য বাক্য, 'মানুষ নয় তো কাক' এবং এর পরেই সিদ্ধান্ত: 'হাজারে হাজারে মানুষ খেয়েও হয় না সে দায়ভাক্'। ইমেজ বা সুর নেই, তর্কশাস্ত্রকে গ্রহণ করে কবিতায় নূতন টেকনিক এসেছে, মনের তীব্র জ্বালা তীব্রতর হয়েছে। পূর্বযুগের প্রবহমানতা থাকলেও এ যুগে সমাজচৈতন্যই কবিকে প্রভাবিত করেছে। হয়তো রিচার্ডসের মতো তাত্ত্বিক, এলিঅটের মতো কবি আরো ধৈর্য পরিশ্রম জটিলতা ও শিল্প-নৈপুণ্য দাবি করবেন তাঁর কাছে।

১৯৭০ মার্চ

সুশীল রায়

সুশীল রায় চল্লিশের বয়স্ক প্রবীণ কবি, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তিনি সজাগ, গল্পকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি সম্ভবত সমধিক। এ যাবৎ তাঁর চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, 'সুচরিতাসু', 'পাঞ্চালী', 'প্রণয়ীপঞ্চক' ও 'শতদ্রু'! তাঁর গদ্য লেখায় এবং কবিতায় পরিচ্ছন্ন যুক্তিসিদ্ধ মন নিয়ত কাজ করে, অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা এগুলি তাঁর লেখায় তিনি জোর করে প্রবেশ করতে দেন না এবং তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে প্রমথ চৌধুরীর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। যদিও তাঁর কণ্ঠস্বর খুবই মৃদু, প্রায় অনুচ্চারিত, তবু নিম্নকণ্ঠে যুক্তির ধার, ব্যঙ্গের জ্বালা ধরিয়ে দিতে তিনি চান! তাঁর কবিতার উপমা বা চিত্রকল্পের ব্যবহার তেমন নেই, এবং অনেক কম, বরং সাধারণ বর্ণনার ভেতর দিয়ে একটি স্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তুলতে চান ; কিন্তু গল্পের ভঙ্গিতে কবিতাতেও তিনি কথা বলেন,

গল্পের কাহিনী কবিতাতেও তিনি প্রকাশ করতে চান, কবিতাতে অঙ্কুরিত ও সঞ্চারিত করতে চান গল্পের কাহিনী, অনেক কবিতাই কাহিনীকাব্য এবং গল্পের মোড়কে কবিতা, হয়তো অনেক গল্পের বীজ তাঁর কবিতার মধ্যে পাওয়া যাবে। 'লোকে লোকারণ্য বেলা বাড়ছে যত বাড়ছে তত ভিড় / তেতলায় ছোট ঘরে তখনো রয়েছে পড়ে দুইটি শরীর / কে কাকে মেরেছে তার মিলছে না হদিশ / হতভম্ব পল্লীবাসী কিংকর্তব্যবিমূঢ় পুলিশ।' মিল বাদ দিলে একে যুক্তিস্বচ্ছ গদ্য বলতে কোন বাধা থাকে না। প্রকৃতি বর্ণনায়ও সেই এক রীতি : 'যে দিকেই চাই / মাঠে বাটে চারদিকে রোদের জ্যোৎস্নাই। / মসৃণ পিছল পিঠে ছায়া তারই দেখি ধলো ধলো, / এমন মধ্যাহ্নে কথা বলা যায় ?—বলো!' কিন্তু এই গদ্য উক্তির ভেতর দিয়েই মাঝে মাঝে তিনি বেদনা জাগাতে ভালোবাসেন, যেমন ; 'ছিল আশা, ছিল ভাষা, বুকভরা ছিল প্রাণবায়ু / তবু যেন কি ছিল না, ছিল না কী যেন।' এই যুক্তিস্বচ্ছতার সঙ্গে মিলেছে বাংলা ও ভারতের ঐতিহ্য। তিনি প্রাচীন ভারতের নৈতিক ও আত্মিক আদর্শকে বারংবার তাঁর কাব্যে আহ্বান জানিয়েছেন। কবিতাগ্রন্থের নামকরণে তা সুস্পষ্ট। মহাভারত ও মধুসূদনের প্রভাবেই তাঁর 'প্রণয়ীপঞ্চক' রচিত, এই কাহিনীকাব্যের মধ্যেই তাঁর প্রতিভার প্রকাশ সবচেয়ে বেশি। অমরুশতকের অনুবাদের মধ্য দিয়ে প্রাচীন সংস্কৃত ধারাকে বাংলায় আনতে চাইছেন। সম্ভবত কাহিনীকে তাঁর কাব্যে নিয়েছেন বলেই তাঁর কবিতা দীর্ঘ। 'পাঞ্চালী'র মধ্যেও অনেক দীর্ঘ কবিতা রয়েছে, যা একালে কেউ প্রায় লেখেন না, লিখতে চান না। যে যুক্তিস্বচ্ছতা তাঁর কাব্যের দৃঢ় গদ্যভঙ্গি টেনে এনেছে, সেই যুক্তিতেই তিনি স্বীকার করেছেন, কবিতার ছন্দমিল ধ্বনিমাধুর্য আনতে হবে। তিনি নিজের 'কবিতা-ভাবনা' নামে একটি গদ্য প্রবন্ধে বলেছেন : 'কবিতাকেও যদি সহৃদয় পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করতে হয় তবে কবিকে প্রস্তুত হতে হবে। ছন্দে দখল আনতে হবে, ভাষার মাধুর্য আনতে হবে, ভাবের গাম্ভীর্য আনতে হবে।' বলা বাহুল্য, এই সব উক্তির মধ্য দিয়ে কবিতার প্রথাসিদ্ধ ধারার কথাই বলেছেন, এবং তাঁর কবিতা সেই প্রবহমান ধারাকেই স্বীকার করেছে, সুতরাং অভিনবত্বের তীব্র বেদনা এখানে নেই, বরং তিনি ঘৃণা করেন।

সুশীল রায় 'মাইকেল মধুসূদন' সনেটে নিজের কবিতার স্বরূপ সম্বন্ধে

নিজেই বলেছেন : 'ছোট শাখা নদী হয়ে আছি তাই নম্রস্রোতা / কল্লোল বাজে না গানে, তরঙ্গেও বাজে না গর্জন।' সুতরাং তাঁর কবিতায় হৃদয়ের কল্লোল ও গর্জন শোনা যাবে না, বরং শান্ত হৃদয়ের হঠাৎ খুশি, নতুবা খুব অন্তরালে বেদনার ক্ষীণ হাওয়া কবিতার ধ্বনির মধ্য দিয়ে বয়ে যায়। 'জলছবি' কবিতায় যে চিত্র তুলে ধরেছেন, সেই চিত্রের প্রতিক্রিয়ায়ই তাঁর কাব্যপাঠের আস্বাদন বলে আমার মনে হয় : 'মুছে তো যায় না তাতে ঘষা কাঁচে আঁকা জলছবি / সান্ত্বনার মত সে যে আল্পনার মসৃণ প্রলেপ ; / দুধ শাদা সেই রঙে মনোহর হয়ে ওঠে সবাই।' এই জলছবি রঙের মতো মৃদু রঙই তাঁর কাব্যের ফলশ্রুতি, অন্তত সাম্প্রতিক কালের কবিতায়।

'পাঞ্চালী' (১৯৫০) কাব্যে যদিও প্রেমেন্দ্র মিত্রের ধরনে সমাজবাদের কবিরূপে নিজেকে ঘোষণা করতে চেয়েছেন, তবু সুশীল রায়ের মনোভঙ্গি তাতে প্রকাশ পায়নি, আমার মনে হয়, মূলত তিনি ব্যক্তিহৃদয়ের কবি, এবং এই হৃদয় প্রেমে আবর্তিত, প্রেম বা ভালোবাসার রিক্ত বেদনা তাঁর কাব্যকে মাঝে মাঝে বিষণ্ণ ও মদির করেছে, ব্যাবহারিক জগতের পরপারে নিয়ে গেছে। এ প্রেমের এক নির্মম কঠোর ইতিহাস রয়েছে, যা বর্ণিত হয়েছে 'নাটক' কবিতাটির মধ্যে এবং এই কবিতাটি তাঁর প্রেমের প্রতীকরূপে গণ্য হবার যোগ্য। প্রেমিকা আমাদের কথা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে, তার কথা চুরি করেই কাব্য গান নাটক, এইভাবে প্রেমিকা আমাদের কাছে নিঃশেষিত, তারপর শরীর আলিঙ্গনে তীব্র কামনায় তাকে হত্যা করি, কিন্তু হত্যার পর মৃত প্রেমের কান্না সারা জীবন দুঃখের বোঝার মতন বয়ে চলি। 'পাঞ্চালী' কাব্যে এই 'নাটক' কবিতাটি তাঁর কাব্যজীবনের মর্মস্থলে রয়েছে, এবং এটিকেই পরবর্তীকালে 'শতদ্রু' কাব্যগ্রন্থে কাব্যনাট্যে রূপদান করেছেন। দ্রৌপদীর মধ্যে তিনি দেখেছেন চিরন্তন প্রেমের সর্বজনীন রূপ, তাই বিভিন্ন পুরুষের দাবি মেটানো তার পক্ষে ও অন্যপুরুষের কাছে গর্হিত নয়। খণ্ড কবিতাগুলির মধ্যে, এবং সাম্প্রতিককালের কবিতায় এই মৃত প্রেমের কান্না তাঁর ক্ষীণ শব্দের বায়ুতরঙ্গে ভেসে যায়। 'শতদ্রু' (১৯৬৬) কাব্যগ্রন্থের ভাষা 'পাঞ্চালী' কাব্য থেকে অনেক স্বচ্ছন্দ, ছন্দমাধুর্যে পরিপূর্ণ, কাব্যিয়ানা পরিত্যক্ত এবং জীবনের উপলব্ধিতে তিনি বুঝেছেন সমাজবাদ নয়, একা একা জীবনের স্বাদ অন্বেষণ করতে হবে। 'স্বাদ চাই জীবনের, অন্বেষণ করি সেই স্বাদ/একা-

একা শুধু একা। অন্ধকার মুড়ি দিয়ে তাই/চোখের তারার মত দেখি তারা অনেক অনেক / জ্বলে অন্ধকারে।' স্মৃতি তাঁকে পীড়িত করছে, সেই নিপীড়িত বেদনার কান্নায় জলে এবং দূরে বনপ্রান্তরে মেঘবর্ষণে প্রেমিকার স্মৃতি আজ মুছে যাচ্ছে। আশাবাদের কথার পরিবর্তে আজ শীতার্ত সংগীত শিখতে চাইছেন : 'যদি শিখে থাক কোন শীতার্ত সংগীত / তার দুটি কলি বলো, তার সামান্য ইঙ্গিত।'

এরও পরের কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশিত বেদনা খুবই নম্র, কোমল, বেদনায় আর্ত। ভাষা একেবারে নিরাভরণ, চিত্র উপমা চিত্রকল্প বলতে গেলে নেই, মাঝে মাঝে একটা ছবির ফ্রেম গড়ে ওঠে। ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে ঢেকেছেন গদ্যের সাধারণ বাক্যের আলংকারিক প্রশ্নে, এই নিক্ষিপ্ত প্রশ্নের মধ্যেই তাঁর কবিতাকে চেনা যায়! 'বৃন্তে করাঘাত করলে ত্বরান্বিত হয় কি কুসুম', 'সমুদ্রের তলদেশে নেমে যাওয়া কি এতো কঠিন?' 'দিঘির নিটোল জলের ধারে শ্যাওলা জমা বিচিত্র কি?' এই কবিতাগুলির মধ্যে একটা লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, প্রথমে নিজের অ্যাক্‌সন বা কাজের কথা বলেন, পরে প্রশ্নের আকারে সাধারণ প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, এরপর আবার নিজের ব্যক্তিগত অ্যাক্‌সনে আসেন, ফলে এমনি করে দুয়ের মধ্যে একটা বিরোধ ঘটে, এর সাহায্যেই নিজের বক্তব্য প্রকাশিত হয়। একথা অনস্বীকার্য, রবীন্দ্রনাথের ভাব ও কল্পনা এ কবিতাগুলির মর্মে মর্মে, তবে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গি থেকে একেবারে পৃথক। 'তুফান' একদিকে যেমন বাইরের তুফান, অন্যদিকে রমণী-রূপেও এই তুফান আমাদের আকর্ষণ করছে। বিপদের সঙ্কেতের সঙ্গে রমণীয় মাধুর্য আমাদের মুগ্ধ করছে। বুকের ভেতর শব্দের মধ্যে এই দুটিই নিবিড় ভাবে আঘাত করছে। 'ওরা' কবিতাটির মধ্যে কোনো স্পষ্ট উক্তি নেই এ বিষয়ে যে কবি কাদের জন্যে প্রতীক্ষা করছেন, তবে 'চারাগাছ' 'কুঁড়ি' 'ফুলের সম্ভার' 'পাপড়ি' শুনে মনে হয় এগুলি যৌবন এবং শেষে আশান্বিত হয়েছেন। অনাড়ম্বর আটপৌরে ভাবে প্রেমের দৃষ্টিতে নারীকে একরঙে নিশ্চিত করে পেতে চেয়েছেন, কোথায় একটা অতৃপ্তি, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা রয়ে গেছে। আবার তিনি বিস্ময়ের জাদুতে ও মোহে নারীকে দেখেছেন, নারীরহস্য ভেদ করা সমুদ্রের তলদেশে নেমে যাওয়ার চেয়ে কঠিন, মহাশূন্য ভেদ করবার চেয়ে আরো দুরূহ। তাই যৌবন চলে গেলে রমণীর স্পর্ধার কোনো মানে হয় না।

'চোখ' কবিতাটির মধ্যে বোঝা যায় কবির বয়স হয়েছে, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর প্রতি একটা মায়া মমতা বেদনা ও করুণা জাগছে, কারণ চোখে আজ সব অস্পষ্ট লাগছে। কিন্তু তবু কবির প্রার্থনা যে পরমের সঙ্গে তাঁর একদিন দেখা হবে, তারি প্রতীক্ষায় তিনি বসে আছেন।

১৯৭০ সেপ্টেম্বর

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আমরা ইচ্ছাকে অনেক সময় অনুভব করি না, কিন্তু ব্যর্থতাকে বুক দিয়ে পেতে চাই, সে আমাদের নাড়ায়, চালায়। ইচ্ছাটা দুরধিগম্য, ভবিষ্যতের, কিন্তু যেটা বর্তমান ও কাছের, তাকে অনুভব করা ছাড়া উপায় নেই। এই কারণেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় অবক্ষয়ের, ধ্বংসের, পতনের চিত্রে যতো উজ্জ্বলতা দেখা যায়, ভবিষ্যতের স্বপ্নের ও আকাঙ্ক্ষার চিত্রে সেই হৃদয়-রাঙানো বেদনা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে না। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতার মধ্যে ইচ্ছার আকাঙ্ক্ষা ও অন্ধকারের বেদনা তীব্র টেন্‌সন নিয়ে তাঁর চিত্তকে দুই প্রান্তিকে দুলিয়েছে। 'দিনে সূর্য দুর্বিষহ, রাত্রে অন্ধকার, / দিনে ভিড় রাত্রে নিঃসঙ্গতা ; / কোথায় ঠিকানাহীন খোঁজা-খুঁজি আরম্ভ, আবার, / নৈকট্যে কোথায় গভীরতা।' একদিকে এই অনুভূতির তীব্রতা এবং অন্যদিকে 'অবশ্য বনের শেষে প্রসারিত কল্লোলিত নদী ; যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় অব্যাহত সেইদিকে গতি।' এই দুটি চিত্রের কথাগুলির মধ্যেই পার্থক্য রয়েছে, 'দিনযাপন' কবিতার মধ্যে এ যুগের ক্লীবত্ব ও অসার অসাড়তা দেখিয়েছেন, এবং তার মধ্যে কবি শুধু বারংবার নিজেকে প্রশ্ন করেছেন ; 'কি তবে আমার কাজ', এখানে কবির প্রশ্নই, কাজে নিজেকে যুক্ত করতে পারেন নি। শ্রমে দীপ্ত মানবযাত্রার নিরন্তর অগ্রগতির উত্তাপ শুধু নিয়েছেন, তিনি জেনেছেন 'কর্মেই আনন্দ শুধু', কিন্তু কর্মের মধ্যে তাঁর আত্মসমর্পণ কোথায়, এই প্রশ্ন যখন তাঁর মনে ওঠে, তখনি কবির অনুশোচনা বিলাপ, হতাশ্বাস রিক্তবেদনা সত্য হয়ে ওঠে, সেখানেই কিরণশঙ্কর সত্য ও আন্তরিকভাবে নিজেকে ধরা দিতে পারেন। অন্ততঃ তাঁর সাম্প্রতিক ব্যক্তিগত কবিতা তার প্রমাণ দিচ্ছে। বুদ্ধিজীবীর মতো তাঁরও একই অবস্থা : 'যতোই চায় না তবু ক্রুদ্ধ রাত্রি অর্গলিত দ্বারে / আত্মরতি ছিন্ন করে দুঃস্বপ্ন মন্থিত অন্ধকার।'

কবিতা : চিত্রিত ছায়া

'দিনযাপন' কাব্যগ্রন্থে প্রাত্যহিক জীবনের দিনযাপনের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে কখনো প্রকৃতির উদার বিশালতায় বৃক্ষের আদি শরীরে মিশতে চেয়েছেন, কখনো তাঁর বুকে দিনগুলি রাতগুলি গুনগুন করে, 'ঢেউ তোলে দুরাশা জয়ের অন্ধকার দিগন্ত রাঙিয়ে / আসবে সে অভয়ের উত্তরাধিকার নিয়ে / সোনা হবে জলন্ত অঙ্গার।' এবং জীবনের প্রাজ্ঞতায় অন্ধকার ও আলোকে একসঙ্গে আবার মেলাতে চেয়েছেন, তাই বাইরের দিকে তাঁর চিত্ত যেমন প্রসারিত, অন্যদিকে অন্তরের গভীরতায় তাঁর হৃদয়মন আকাঙ্ক্ষায় আকুলিবিকুলি করে। প্রেমের বিরহমিলনবেদনায় আর্ত হয়ে ওঠেন।

বাংলাদেশে চল্লিশের কবিদের বৈশিষ্ট্য যদি সমাজ-সচেতনতার সঙ্গে বাস্তবতা ও বুদ্ধি তীক্ষ্ণতা হয়ে থাকে, তাহলে 'দিনযাপনের' কবিতাগুলি সেই বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। প্রত্যক্ষতা ও বাস্তবতা, স্পষ্টতা ও ঋজুতা, স্বচ্ছন্দতা ও উজ্জ্বলতা এই কবিতাগুলির অন্তরে জাজ্বল্যমান, গভীর সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় বিপজ্জনক রহস্যময় নিত্য পরিবর্তমান লীলাচঞ্চল অনুষঙ্গময় অনুভূতি এগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে না। শব্দগুচ্ছে কয়েক জায়গায় জীবনানন্দের ছাপ থাকলেও সেই অনুভূতি নেই, বরং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাদৃশ্য বেশি, 'গ্রীষ্ম' কবিতাটি তার নজির। অধিকাংশ স্থলেই তাঁর চিত্রকল্পের ভাষা প্রচলিত ও প্রথাবদ্ধ বেদনা থেকে এসেছে, সম্ভবত সহৃদয়ে সঞ্চরমাণতার দাবিতেই। কিন্তু কিরণশঙ্করের এই কবিতাগুলির আকর্ষণ অন্য বহুবিধ কারণে, ছন্দের স্বচ্ছন্দতা, সংগীতের ঝঙ্কার, ছন্দের বিভিন্ন প্যাটার্ন, সুরের বিচিত্র দোলা তাঁর কবিতাগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তিনি যেমন একটা মুহূর্ত বা তুচ্ছ বিষয়কে নিয়ে ('এই চাঁদ') প্রসারিত হতে পারেন, তেমনি সনেটের নিটোলতায় তাঁর বুদ্ধিসচেতন মন অনেক স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, এই কাব্যগ্রন্থে ষোলটি সনেটই রচনারীতির পরিপাট্যে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রায় প্রত্যেক কবিতায়ই পয়ারে লিখেছেন, কিন্তু পয়ারের পর্ববিভাগের হ্রস্বদীর্ঘ বিভিন্নতার জন্যে কবিতাগুলি একঘেয়ে হয়ে ওঠেনি, প্রায় প্রত্যেক কবিতার প্যাটার্নকেই সাজিয়েছেন। এলিঅটের 'পড়ো জমির' দ্বিতীয় অংশের প্রভাব 'স্বর' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট। 'সারা রাত কান্নারত ক্লান্তঝরা পাতা' 'মৌলিক বন্ধনে বাঁধে সবাইকে বন্ধু অন্ধকার' প্রভৃতি বাক্যের মধ্যে ধ্বনিময় সুরের স্বচ্ছন্দগতি লক্ষ্য করা যায়। তিনি সংক্ষিপ্ত কবিতার পাশেই দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন, দীর্ঘ কবিতাগুলিও এই সব

উপাদানের জন্যে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে নি। তাঁর পূর্বের কবিতার ভাষায় শক্তকঠিনতা থাকলেও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না, পরবর্তী কবিতায় সেটা আনতে পেরেছেন, পূর্ববর্তী কবিতায় প্রেমের জৈব প্রেরণায় মানুষের মনকে ধরতে গিয়ে মোহিতলালের শরীর কামনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন, কিন্তু এখানকার কবিতায় জীবনের অনাড়ম্বর স্নিগ্ধ প্রশান্তির মধ্যে আসতে চেয়েছেন এবং পেরেছেন। তিনি আজ যুগসন্ধিক্ষণে বিপ্লবের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছেন, কিন্তু অন্যদিকে তাঁর হৃদয় ব্যক্তিগত সুখদুঃখে মৌমাছির মতন গুঞ্জনপরায়ণ, মৌমাছির প্রতীকেই তিনি জীবনকে দেখেছেন, এখানেই তাঁর সত্য পরিচয় ফুটে উঠেছে : 'কেবল ইচ্ছা মৃত্যু, পতনের ভয় মৌমাছি অদৃশ্য হলে ভরে থাকে বিষণ্ন সময়।'

১৯৭০ জুন

জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী

'এই মাটির অরণ্যে সাবিত্রী-সত্যবান রাত কি কখনো পোহাবে না?' 'আমার এই নৈনং-ছিদন্তি শস্ত্রাণি পিঞ্জর, নৈনং-দহতি-পাবকঃ করোটি,' 'দূর-ছাই সব কাজ ওয়ারেণ্ট নিয়ে আমার পিছন পিছন ঘুরছে,' 'শাদা পোশাক-পরা চাতুরি আমার চেনা,' 'কেউ-কেটা কাজগুলির চোখে বেশ ধুলো দিয়ে যাচ্ছি।' 'থেঁতলে-যাওয়া শরীরে উদ্ধত জুতোর অগুনতি পেরেক।' 'আগুনের হলকার মতো মাঠ-তাপানো রক্তফুলকে বলেছে কৃষ্ণচূড়া / ময়ূর-পাখা আকাশকে নতুন বিশেষণে নীলাবো তার উপায় রাখে নি।' 'রূপবতী আমাদের পুষ্করিণী আমাদের পূর্ণিমা এর সর্পগন্ধা রাত্রি।' 'কচি আমে সবুজিত বাগান,' 'বি. ডি. ও.র জিপে গীতিকবিতার মতো লক্লকে মেয়ে' 'চিঠির বাক্সে গোপনে-টুপ দুষ্টু মেয়ের মনটা,' 'আঙুর টক ইচ্ছাগুলি হয়তো পরিপক্কই,' 'কিছু রাত উষানোর রোদ,' 'অয়শ্চক্রনিভ দিগন্তে সূর্য-অস্তানোর আরক্ত কলরব'—এমনি বিভিন্ন ছবি ও চমক-লাগা বিশেষণ জগন্নাথ চক্রবর্তীর কবিতায় ছড়িয়ে আছে এবং এই ছবি ও বিশেষণগুলির সাহায্যেই কবির মনোগত অভিপ্রায়, তাঁর ঝোঁক, আকাঙ্ক্ষা, প্রবণতা বোঝা যায়। তাঁর তরতরিয়ে বিস্তৃত বলার ফাঁকে ফাঁকে এই ছবিগুলি আটকে ধরে বলেই পাঠকের মনকে অন্যদিকে মোড় ঘুরিয়ে দেন। একদিকে যেমন চমকলাগা বিশেষণ, অন্যদিকে নামধাতুর প্রয়োগ

শব্দগুচ্ছের মতো অভিনবত্ব আনছে। 'নীলাবো' শব্দটি সমস্ত অনুভূতিকে আকাশের সঙ্গে একাত্ম করে দিয়েছে। এই নামধাতুর প্রয়োগ বাংলা সাহিত্যের প্রথাগত ঐতিহ্য থেকেই এসেছে, কিন্তু আধুনিক মানসিকতার সঙ্গে জগন্নাথ চক্রবর্তী এখানে যোগসাধন করেছেন। বাক্যের সুরময় ঝঙ্কারে অনুষঙ্গ সৃষ্টি করছে।

এ যুগের প্রচলিত যন্ত্রণা, তার দীর্ণ ব্যথার কাতরানি, ক্ষয়িষ্ণু জীবনোপলব্ধির তীব্রতা, পাতাল ও নিঃসঙ্গতা সবই আছে। যেহেতু তাঁর মধ্যে অতীত স্মৃতির গন্ধ, সহজ ও সরল জীবনের আকাঙ্ক্ষা, বিস্ময়ের আবেশ লুকিয়ে রয়েছে, সেই হেতু এই যন্ত্রণার তীব্রতা মারাত্মক, সোচ্চার। গান্ধিজির স্ট্যাচু তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা ও বিবেক। এই আত্মজিজ্ঞাসা ও বিবেকের সাহায্যে তাঁর জগৎকে খুঁজতে গিয়ে এখানে কবি লখিন্দরের ভূমিকায় নিজেকে স্থাপিত করেছেন, তাতে তাঁর মনে হয়েছে : 'যে বিষ আমার শরীরে ঢেলেছে কাল-/ নাগিনী জীবনে সেই তো অমৃত জল,' 'কি হবে স্বর্গে নর্তকী নাম কিনে ? / জীবনমৃত্যু ভগ্ন ভেলায় ভাসে / তোমার কোলের উঠোনে আমার শব ফুটবে চৈত্র মাসে।' পেরেকের যন্ত্রণায় কবির মনে হচ্ছে : 'দুঃখের বিষয় গলায় এখন আর স্বর নেই যে তোমাদের ডাকে সাড়া দিই ; / তোমাদের নিয়ে কাব্য করা গান বাঁধা, না এখন আর কিছুই সম্ভব নয়।' মাটির সমুদ্রে আজ তাই নিমজ্জিত, 'মৃত্যুর প্রবাহ আমার চতুর্দিকে লাভা স্রোতের মতো প্রবাহিত, আমি অন্ধকার বালির নীচে মাথা গুঁজে ভয়ংকরকে দেখেছি, চিনে রেখেছি'। একে চিনলেও তার উর্ধ্বে অগাধ স্বর্ণশিষ ধান দেখেছেন, এবং তার স্মৃতি তাঁকে বিভোর করে রেখেছে, 'যার অফুরন্ত বাসমতী ঘ্রাণে বিভোর হতে চেয়েছি কতোদিন।' এ তাঁর অতীত স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু বর্তমানে স্থান ও কালের বিরোধ দেখা দিয়েছে, কখনো স্থান ও ব্যক্তির বিরোধ দেখা দিয়েছে, সমস্ত পৃথিবী বিস্ময়হীন পুরাতন ও একঘেয়ে : 'অন্য কোন প্রেমিকার প্রতিলিপির প্রতিলিপি আমাদের ভালোবাসিকা।' তাই হয়তো মৃত্যুবাসনা জাগে এবং এই মৃত্যুর জন্য মৌমাছি করবী ট্রেন বন্দর জাহাজ সন্ধ্যা তারা চম্পক বা নদী কাউকেই দায়ী করছেন না নিজেকে ছাড়া, কিন্তু মৃত্যুর পরের দিনের যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তাতেই তাঁর আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ, তাতেই মনে হয়েছে জীবনে বেঁচে থাকার অনেক মূল্য আছে : 'মরে

ভুল করেছি, এখন বেঁচে আরেকবার ভুল করতে চাই।' স্বচ্ছন্দে সরল সাবলীল-গতিতে তরতরিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছবি ও সুরের ঝঙ্কারে ও বিস্তারে বলতে জগন্নাথ চক্রবর্তী ভালোবাসেন। মাঝে মাঝে কৌতুক চমৎকার জমে, এবং কৌতুকের মধ্য দিয়ে লঘুচ্ছন্দে গভীর বেদনার কথা ও ট্রাজিক নিরাশ্রয়তা প্রকাশ করেন। তবে কিছু কবিতায় লঘুচ্ছন্দ বেমানান, 'দীপ্তি ও বিআত্রিচে' তার উদাহরণ। অনেক কবিতাই মৌহূর্তিক বেদনার বিন্দু নিয়ে বিস্তারিত, এবং এই ক্ষণিক বেদনার কাব্যপ্রকাশে জগন্নাথ চক্রবর্তীর একটা আনন্দ রয়েছে, 'সরল রেখার জন্য' 'মংপু' 'একটি মুহূর্ত শুধু' 'ছবি : বারাণসী', 'সাত মাইলের বাঁকে' কবিতাগুলি তার প্রমাণ। এ সকলের মধ্যে তাঁর রোমান্টিক আকূতিই প্রকাশ পায় : 'অদৃশ্য নদীর জলে গভীর শ্রাবণ / অর্ধরাতে যে গান বাজায়, / বিদ্যুৎবিদীর্ণ মেঘ ঝড়ে এলোমেলো কাঁপে যে ব্যথায়, / সূঁচের ডগায় এই হৃদয়কে দেখ, / সেই গান সেই ব্যথা যেন।' 'আমি ও যন্ত্রণাকে' কবিতায় শিল্পসৃষ্টির কারণকে তিনি অঙ্গুলিসঙ্কেত করেছেন, বলেছেন যন্ত্রণা যখন হৃদয় ছাপিয়ে যায় তখন কবি বিক্ষত ও পরাহত, কিন্তু তিনি যখন যন্ত্রণাকে মোচড়ান, তখনই আগুনের ফুলকিতে ফুল ফোটে, মনোহর দুরত্বে কবি বড়ো হয়ে ওঠেন : 'আমার যন্ত্রণার কালশিটের ওপর অনারকলি ছোঁয়া টুংটাং বাজে।' জগন্নাথ চক্রবর্তী যে কবিতায় এত বিস্তৃত ও বারংবার একই কথা বলেন সেকি পাঠকের মনে অনুভূতিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে, না এটা নিজের স্বভাব? আমার মনে হয় কবিতায় এই দুটো কারণই বর্জন করা যায়।

১৯৭০ জুন

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

রমেন্দ্রকুমার আধুনিক অনেকের কবিতায় উল্লেখ করে আমাকে আক্ষেপের সুরে প্রায়ই বলেন যে তাঁর কবিতা অনাদৃত, কারণ তাঁর কবিতা অর্থের শাসনে বাঁধা। এই আক্ষেপের মধ্যেই তাঁর কাব্যশিল্পের উপাদান ও কৌশল নিহিত। অর্থের শাসন; যুক্তিশৃঙ্খলা, ক্রমপারম্পর্য, ছন্দের ও সুরের বিস্ময়প্রত্যাশিত দোলা, সংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত গঠন, পরিণামী স্থির সিদ্ধান্ত, ঈষদ্ ব্যঙ্গের আমেজ—এগুলি তাঁর 'আরশি নগর' কাব্যগ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়, এগুলি লক্ষ্য করেই অনেকে রমেন্দ্রকুমারকে দশকের ছকে ফেলে চল্লিশের কঠিন কোঠায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবেন। যদি স্বীকার করেই নিই রমেন্দ্রকুমার চল্লিশের

এই লক্ষণে আক্রান্ত, তবু তাঁর সাম্প্রতিক কবিতায় এখনকার তথাকথিত প্রতীকধর্মিতা ও সংগীতময়তা এবং স্পষ্টভাষণও লক্ষ্য করা যাচ্ছে, দু'একটি কবিতায় উল্লম্ফনের ইঙ্গিত রয়েছে, কিন্তু রমেন্দ্রকুমার উল্লম্ফনে, শব্দের বিসদৃশ বিন্যাসে, অর্থহীন সংগীতে একান্ত আস্থাহীন। সুতরাং তাঁর কবিতার অর্থ প্রথমে হয়তো চিত্রের নিজস্ব প্রত্যক্ষতায় এবং স্বাদিষ্ট মধুর ধ্বনিতে ধরতে চাই না, কিন্তু তাঁর কবিতার মূল চাবি লুকিয়ে রয়েছে শব্দের অর্থে। শব্দগুলির যথাযথ সংহত যুক্তিশৃঙ্খলিত সুবিন্যাসের ফলে অর্থের বিস্ফার ঘটান, ক্রমান্বয়ে টেনে নিয়ে যেতে থাকেন। অন্তস্তলে এই অর্থের বিস্ফারের সঙ্গে ছন্দিত সংগীত এবং নাগরিকতায় চিহ্নিত প্রতীক ও ছবি একটা সমন্বয় সৃষ্টি করে। এই অর্থের সচেতনতা শুধু কবিতা রূপগঠনে নেই, এমন কি নামকরণের মধ্যেও এই অতিচেতনতা রয়েছে। 'ঈর্ষা' কবিতার নামকরণ বাদ দিলে কবিতার একরকম মানে দাঁড়ায়। নামকরণকে গ্রহণ করলে কবির প্রকৃত মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক নগরজীবী নারীকে প্রাণময় ভাবে, কিন্তু তাদের কাছে নারী অচেতন, রমেন্দ্রকুমার রোমান্টিক চেতনার ঐতিহ্য স্বীকার করে নিয়েই প্রাণময় ও চেতনাময় এই দুই রূপে দেখেছেন নারীকে। তাই চেতনাময়ী ও প্রাণময়ী নারী—যে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম, আধুনিকদের তাই ঈর্ষা। অথচ এই ঈর্ষা শব্দটি বাদ দিলে কবিতাটির মানে দাঁড়ায় প্রকৃতিরূপিণী চেতনাময়ী যৌবন দীপ্ত নারীর বুকের মধ্যে রাঙা বিষফল গুঁজে দিয়ে অচেতনায় বিষাক্ত করে তুলেছেন কবি, এই অচেতনা থেকে মুক্ত করবার জন্যে মন্ত্র বলছেন, 'কাল ভোরে ভেঙে যাও চেতনার তীব্র উদ্‌ভাসনে।' এই সচেতনতা পাঠককে মাতায়, ভাবায়, শব্দের সংগীত ও অর্থের সংগীত একাত্ম হয়ে ওঠে। ভালেরির আদর্শের প্রতিধ্বনি করে তিনিও বলেন রচনা সমাপ্ত হয় না, পরিত্যক্ত হয়, শিল্পকর্ম কখনো শেষ হয় না। এবং এখানেই সম্ভবত একটি প্রশ্ন ওঠে কল্পনা ও বিশ্লেষণের স্বরূপসম্পর্ক বিষয়ে। এবং এই প্রশ্ন আরও একটু টেনে নিয়ে ক্রোচের প্রকাশতত্ত্বের সমস্যায় ফেলা যেতে পারে।

হিউম্ কল্পনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে স্মৃতি, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষতা ও বুদ্ধিকল্পনার মধ্যে এটি ভিত্তি স্থাপন করেছে অথবা আইডিয়ার প্রাণতন্ময়তা। এখানে হিউম্ তিনটি গুণের সমাহার দেখেছেন। কিন্তু সৃষ্টির মুক্তি নেই। কাণ্টই কল্পনা প্রসঙ্গে তুরীয় সংশ্লেষণে চিন্তা করবার মধ্য দিয়ে বুদ্ধি ও কল্পনার মধ্যে

স্বচ্ছন্দলীলা অনুমান করেছেন, কল্পনাকে জ্ঞানের সঙ্গে সমপর্যায়ে নিয়ে গেছেন। এই তুরীয় সংশ্লেষণ বুদ্ধিপূর্ব ব্যাপার, এবং সক্রিয় বলে আবার বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত এবং তাই স্বতঃস্ফূর্ত। এই সংশ্লেষণের সাহায্যে কল্পনা বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় এই ত্রয়ীরূপের একাত্মতা ঘটেছে। এই সংশ্লেষণতত্ত্বই কোল্‌রিজের দ্বিতীয় স্তরের কল্পনার মধ্যে লক্ষ্য করি। প্রথম স্তরের কল্পনার রূপপ্রত্যক্ষতা দ্রবীভূত হয়ে যায়, ছড়িয়ে যায়, বিলীন হয়ে যায় অথবা আদর্শায়িত হয়ে ওঠে ও সমন্বিত হয়। পার্‌সেপ্‌শন্ বা রূপপ্রত্যক্ষতা এই সমন্বয় সাধন করতে পারে কিনা দার্শনিকের বিচার্য, কিন্তু কাণ্টের সমন্বয়কারী প্রক্রিয়া এখানে লক্ষণীয়। কিন্তু যেহেতু কাণ্ট দার্শনিক, তাই সাহিত্যে রূপপ্রকাশের কথা বলেন নি, এবং যেহেতু কোল্‌রিজ রোমাণ্টিকতায়ই মনের এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার কথা বলেছেন, নঞর্থক ও সদর্থক শক্তির সমন্বয়কারী প্রচেষ্টার কথা বলেছেন, ক্রোচের ভাষায় রূপপ্রকাশের কথা বলেন নি। ক্রোচেই যখন ইন্‌ট্যুইশনের তত্ত্ব দিয়ে সাহিত্যের কথা বলেন তখন এই প্রকাশের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে প্রকাশ তৈরি হয় না, স্বপ্ন দেখতে হয়। একটি শব্দও যদি পরিবর্তন সাপেক্ষ হয়, তাহলে তাতে কবিদৃষ্টিরই অপূর্ণতা ও অনচ্ছতা প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকাশের এই অদ্বৈততত্ত্ব রোমাণ্টিকদের কবিতায় কিছু আছে, যদিও কিট্‌স্-এর ব্যতিক্রম। কিন্তু শব্দের ব্যায়ামের রীতি মালার্মে চালানোর পর ভালেরি থেকে পাউণ্ড এলিঅট সকলেই এই ব্যায়াম করেছেন, এমন কি ইয়েট্‌স পর্যন্ত। যদিচ আমার ধারণা ইয়েট্‌সের কবিতায় এই প্রকাশবিষয় ভাবনার সঙ্গে একাত্ম। ইয়েট্‌স্ ও এলিঅট সম্বন্ধে আমার নিজের বিশ্বাস এই যে এঁদের কল্পনাজাত বিষয়বস্তু কাণ্টের বুদ্ধিপূর্ব আদি নিয়মের মতো (schemata) প্রকাশকে সঙ্গে করেই দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হতো, সম্পূর্ণ রূপমূর্তিটিই কবি-দৃষ্টির সম্মুখে প্রত্যুদ্‌ভাসিত, তাকেই শব্দ চুনে চুনে মূর্তিকারের মতো নতুবা কামারের মতো হাতুড়ি পিটিয়ে স্পষ্ট রূপমূর্তি দান করতেন। কিন্তু ভালেরি বা পাউণ্ডের বেলায় তা বলা যায় না। ভালেরির কাছে কোনো সুর, চকিতে কোনো অতীন্দ্রিয় ছবি, বিশেষ একটি ইমেজ ধরা পড়তো ; তাকে কেন্দ্র করে খণ্ড খণ্ড অংশ সাজিয়ে সুর বা ছবিকে পূর্ণ করে তুলতে চাইতেন, কিন্তু কল্পিত আদর্শে কখনো পৌঁছুতে পারতেন না ; সম্ভবত, ক্রোচের ভাষায় ইন্‌ট্যুইশনে ধরা পড়তো না, তাই রচনা সমাপ্ত হয় না, পরিত্যক্ত হয়। তবু সুরের জাদু

ভালেরির কবিতায় মারাত্মক। আর মালার্মে যে ব্যায়াম করতেন তার কারণ তাঁর সেই অনির্দেশ্য সুর, যাকে তিনি কোনো দিনই পান নি, শুধু আকাঙ্ক্ষা করেছেন, কিন্তু পরিণামে ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং ব্যর্থতার পরিমাপে তাঁর ব্যায়াম আমরা স্বীকার করে নিই। কিন্তু খণ্ড অংশ জোড়া লাগানোর ব্যাপারটা বিশেষভাবে চোখে পড়ে পাউণ্ডের 'মবার্লি' ও 'কাণ্টোজ' ভালোভাবে পড়লে।

কাণ্টের বুদ্ধিপূর্ব আদি নিয়ম (schemata) দিয়েই একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, যার মধ্যে বুদ্ধি ও কল্পনার ক্লাসিক সামঞ্জস্য রয়েছে এবং রোমাণ্টিকদের মতো যে শুধু বলে, non, la passion, pleine d'elle-même, s'exprime avec plue d'abondance que de force, তারা সকলেই শেলির মতো এই অভিজ্ঞতায় অংশীদার হতে বাধ্য : 'সৃষ্টিতে নিযুক্ত মন হচ্ছে ম্রিয়মাণ তপ্ত কয়লার মতো, চঞ্চল বাতাসের মতো এর অনির্দেশ্য প্রভাব ক্ষণিক উজ্জ্বলতায় জেগে ওঠে, যখন রচনা আরম্ভ হয়, প্রেরণা ইতিমধ্যেই বিলীয়মান, পৃথিবীতে এযাবৎ সবচেয়ে গৌরবময় যে কবিত্ব রচিত হয়েছে, তা সম্ভবত কবির আদি ধারণার দুর্বল ছায়া।' সুতরাং ছায়া বলেই পাথর ক্ষুদে ভাস্কর্যের মতো রূপমূর্তি দিতে হয়। কিন্তু ছায়ার মধ্যে কবির নির্মিতব্য রূপটা সামগ্রিকভাবে নিহিত থাকে। তা না হলে রচনা পরিত্যক্ত হবে, সমাপ্ত হবে না।

এতো কথা বলার উদ্দেশ্য রমেন্দ্রকুমারের কবিতায় শব্দের ও অর্থের জোড়া লাগানোর ব্যাপারটা আমার চোখে ধরা পড়েছে, তবু এগুলি কবিতা। রমেন্দ্রকুমার শব্দ সম্বন্ধে এতো সচেতন, সচেতন ব্যবহৃত শব্দে অর্থের আরোপে এতো উৎসাহী, কল্পনার সেই স্বচ্ছন্দ সৃষ্টির লীলা রচনায় খুব কম। রমেন্দ্রকুমারকে হঠাৎ একটি সুর, একটি বিস্ময়-বিস্ফার ছবি, উদ্দীপিত চকিত প্যাশন, অনুভূতিতে ঝলসানো আইডিয়া তাঁর ইন্দ্রিয়কে রোমাণ্টিকদের মতোই চেতিয়ে দেয়, তিনি এই খণ্ডিত চিত্রছবিসুর আইডিয়াকেই শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে পল্লবিত করে তোলেন, একটি পূর্ণাঙ্গ রূপমূর্তি দান করেন। কিন্তু রমেন্দ্রকুমারের কৃতিত্ব অতিরিক্ত শব্দ সচেতনতার ফলে নূতন অর্থ আরোপের সাহায্যে শব্দে-শব্দে এবং শব্দে-অর্থে বক্রতা সৃষ্টি করেন, এই বক্রতারূপী বৈচিত্র্যের ফলেই নূতন বোধ আমাদের আনন্দ দিতে থাকে,

ভামহের ভাষায় যাকে বলা চলে : 'অনম্বার্থঃ বিভাব্যতে'। অন্য অর্থ এখানে বিভাবিত হয়ে ওঠে। এমনি করেই তিনি শব্দচিত্রকে অর্থের মানদণ্ডে পঙক্তির মধ্যে পরস্পর সাজাবার চেষ্টা করেন, পঙক্তির পর পঙক্তি সাজিয়ে পরিণামে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন, এবং ক্রমান্বয়ে জটিলতা সৃষ্টির দ্বারা সমস্ত অংশ মিলে একটা সামগ্রিকতা লাভ করে। যদিও 'চিত্রকল্প' কবিতায় আমার বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছেন : 'বায়ু অর্থাৎ বাতাস, অগ্নি অর্থাৎ আগুন, এইভাবে নয় ; / শুধু শব্দ, ধ্বনি, শব্দছবি, ঠারে-ঠোরে বলতে চাই।' বলতে চান ঠিকই, কিন্তু সচেতনতার সাহায্যে ; আর বোবার সঙ্গে কবির নিজেকে তুলনা করবার মধ্যে একটা বিরোধ থেকে যাচ্ছে না কি? কবিতার শব্দের অর্থ কি বোবার ধ্বনির মতো? সুতরাং কাণ্টের বুদ্ধিপূর্ব আদি নিয়মের বিপরীত কোটিতে রমেন্দ্রকুমারের কাব্যরূপ প্রতিষ্ঠিত বলে আমার বিশ্বাস। একালের ভাষা-দর্শনে যেমন চার প্রকার দার্শনিক ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনি রমেন্দ্রকুমারও কাব্যের শব্দের মধ্যে চিকিৎসীয় ও নিয়মবদ্ধ বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যাযোগ্য ও আবিষ্করণীয় কল্পনা একযোগে ব্যবহার করতে উৎসুক। তাঁর কবিতার মধ্যে প্রাচীনপন্থীরা যে দুর্বোধ্যতা দেখেন, আমার নিজের বিশ্বাস তা তাঁর কন্সেপ্টের জন্যে নয়, বরং এই শব্দের ক্রিয়ার জন্যে ; যার সাহায্যে তিনি মধ্যবর্তী অনেক সাদৃশ্য লুপ্ত করে দেন, বিশেষণকে বিশেষ্য রূপে ব্যবহার করেন, খণ্ডকে পূর্ণ বলে চালান। এক পঙক্তির বা বাক্যের পর অন্য বাক্য যুক্তিতে অনেক দূরের, ঘটনায় বহু দূরবর্তী, এমন কি ড্যাশ কমা সেমিকোলোন দাড়ি কোলোনও অর্থের শাসনে আরোপিত। কিন্তু এর সাহায্যেই কুন্তকের বক্রতার জন্ম। রমেন্দ্রকুমারেরই ভাষায় : 'অলংকৃত শব্দগুলি পালকের সাজে উড়ে যায়।' (ঈশ্বরের নয়)। তাই তাঁর শিল্পকার্য 'অলংকৃত তীর'। 'ঈর্ষা' 'হরিণ-বাদামী রঙ', 'বালার্ক গাছ ও মৌমাছি', 'জনসাধারণ প্রকৃতিও মানুষ-ঘুড়ি' 'বন্ধুরা' প্রভৃতি কবিতায় এর নজির রয়েছে। যেমন ;

> হরিণবাদামী রঙ, বিদ্যুৎবিকীর্ণ অশ্ব : আত্মা আগুনাভ ;
> পাখি কলকণ্ঠ আকাশের মাছ : অন্তঃসার হালকা সবুজ ;
> দেবদারুর উৎক্ষিপ্ত আকাঙ্ক্ষা দ্যাখো ; দীর্ঘগ্রীব হাউই নীলাভ ;
> নরম্বের গাঢ়বর্ণ ; স্মরণে আক্রান্ত এক কঠিন গম্বুজ।

কবিতা: চিত্রিত ছায়া

ইন্দ্রিয়সংবেদনশীল পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছবিগুলির একত্র সমাবেশেই একটি সামগ্রিক ছবি, ছবি থেকে অনুভূতি, এবং অনুভূতির সাহায্যে অর্থ বেরিয়ে আসছে। ইমেজের সতেজ নবীনতা, নিবিড়তা ও আবেগ-উদ্দীপন লুইসের এই তিনটি উপাদানই বিশিষ্টরূপে এখানে উপস্থিত। এবং ইন্‌স্টিংক্টজাত অনুভূতি জাগাতে সক্ষম।

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় কখনো একটা কন্‌সেপ্ট চকিতে প্রতীকের ভাবনা ও ইমোশন জাগায় এবং পরে কাব্যের ভাষাছন্দোধ্বনিস্থরে রূপায়িত হয়ে ওঠে। অনুভূতির চেয়েও কন্‌সেপ্টসম্বলিত প্রতীকই তাঁকে মাঝে মাঝে আন্দোলিত করে তোলে। কিন্তু রমেন্দ্রকুমারের কবিতায় শব্দগুলি এসেছে পৃথিবীর সম্পর্কে সংবেদনাময় হয়ে, প্রতিটি শব্দ যেমন সচেতনভাবে ব্যবহৃত, তেমনি ইন্দ্রিয়ের সংবেদনায় বিদ্ধ। এই সংবেদনার সাহায্যেই কবির আইডিয়ার সঙ্গে একটি সিদ্ধান্ত তৈরি হয়। এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত কন্‌সেপ্টের ফলে আসে নি, এসেছে হৃদয়ের ক্ষত-বিক্ষত সংগ্রামের ও দ্বন্দ্বের পরিণামে, এই সিদ্ধান্ত কবির পক্ষে সত্য, সর্বজনীন সত্য নয়। শব্দের প্রতি যুক্তিনিষ্ঠ সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর আবেগ যে কত বিহ্বল হতে পারে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলিই তার প্রমাণ:

> হে হিল্লোল, হে আকাশ পর্যটক, মেঘের ফানুসে
> খুব যে বেড়াস্—যদি তীর ছুঁড়ে করি বুক এখনই বিক্ষত?
> দেশ দেশান্তরে যাস চিকনের কারুকাজ পাখায় দুলিয়ে,
> উদ্‌ভাসন, উদ্‌ভাসন! কখনো ভাঙিস আয়না উন্মাদের মতো?

রমেন্দ্রকুমারের কবিতায় এই দ্বন্দ্বই তাঁর মূল। বর্তমানের ক্ষয়িত মূল্যবোধের সঙ্গে কবির আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব তাঁর প্রায় কবিতাতেই প্রতীকিত হয়ে উঠেছে। 'বর্মের ভেতরে: তবু শব্দ' কবিতায় পাখি তাঁর আকাঙ্ক্ষা, এরি সঙ্গে বাস্তব জীবনের ট্রাউজার পরা ঢোস্‌কা মানুষের হাঁটা, পাটকল এঞ্জিন ফ্যাক্টরির তেল-কালি প্রভৃতি বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে। প্রেম প্রকৃতি সকলের মধ্যেই তাঁর প্রশ্ন, কিন্তু শান্তি নেই: 'কত প্রেম নশ্বরীর বুকে? কত ছায়া বনরাজি নীলে? / কত জল সহস্র পুকুরে? কোথাও আমার শান্তি নেই।' 'জনসাধারণ প্রকৃতি ও মানুষ ঘুড়ি' কবিতাতেও বাস্তব এবং আদর্শ-আকাঙ্ক্ষার দ্বৈত চিত্র। এ যুগের জনসাধারণকে মনে হয়েছে আকাশ-ঘুড়ি, 'শূন্যের পাগল কেশরে আঙুল পেঁচিয়ে নিয়ে বেঁকেচুরে খেলাচ্ছে ঘোড়াকে, ডোরা পেণ্টুলন প'রে কুস্তিগির

সিঁড়ি দিয়ে ওঠে'—কবির কাছে এ সবই হচ্ছে অপদস্থ কল্পনার চেহারা। তাই নির্দেশাত্মক বাক্যে আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে; 'শান্ত বাউলের একতারা / যেমন সহজ নম্র—তেমনি সহজ হয়ে যান; / মাটি, জল, শস্য থেকে ফুটে উঠে প্রথম বিশ্বাসে / প্রসন্ন বা সৌম্য হন—আপনার এ-অবস্থা প্রোজ্জ্বল-করুণ।' সংহত রূপের মধ্যে ইয়েট্‌স্ কবিতায় যেমন নিষ্পাপ, সুন্দর, ঐতিহ্য ও মহান্‌কে বারংবার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, রমেন্দ্রকুমারের কবিতায়ও আশ্চর্য-ভাবে সেই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। 'আরশি নগরে' ক্ষয়িত মূল্যবোধ ও সচল মেঘের মতো পরিবর্তমান মূল্যকে লক্ষ্য করেছেন এলিঅটীয় ভঙ্গিতে। এই জাতীয় কবিতায় সমাজবাস্তবতা বা জীবনসমালোচনাই তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। এই সমালোচনার পরপারে তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা: 'তার চেয়ে চির প্রার্থনীয় সংসারের পেয়ালায় শান্ত সুখদুঃখের অমিয়, একটি নির্মল স্বচ্ছ শুভ্র স্বর।' নতুবা, 'যাতে ফিরে যেতে পারি পিপুলের গভীর কোটরে / বুঝে নিতে আর্য দুই সম্বলিত পাখির প্রতীক।' 'আরশি নগরে'র পরবর্তী কবিতায় যেমন জীবন-সমালোচনার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার দ্বৈত চিত্র আছে, তেমনি সমাজসচেতনতা প্রকাশ পাচ্ছে, পরিবর্তমান মূল্যবোধ থাকা সত্ত্বেও সমাজের মধ্যেই তিনি আশ্রয় নিতে চাইছেন, অস্তিত্বের কঠিন আশ্রয় আজ ভঙ্গুর, ঝড়ে ভেঙে যাচ্ছে, তবু কবি বলছেন: 'জঙলে নয়, লোকালয়ে চলে যাই / ঈশ্বর যদি কুণ্ডল ছুঁড়ে মারে / বন্ধুরা থাকে—ঝোড়ো হাহাকারে দেবে: / এক রাত্রির আশ্রয় অন্তত।' এই সমাজবোধ পূর্বের কবিতায় বিরল। কিন্তু রমেন্দ্রকুমার এই সমাজ-মূল্যবোধের সঙ্গে নীল নিরন্ন আঁধারে যুযুধমান। সচেতন সত্তায় তিনি সমাজ-জীব, ক্ষয়িত মূলবোধকে ব্যঙ্গে বিদ্রূপে কশাঘাত করেছেন, সচেতনভাবে পিপুলের গভীর কোটরে প্রবেশ করতে চাইছেন, সংসারের পেয়ালায় শান্ত সুখদুঃখের অমিয় পান করতে চাইছেন, কিন্তু তাঁর ইন্‌স্টিংক্ট তাঁকে নীরন্ধ্র আঁধারে বারবার টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে কবির প্রার্থনা: 'আমি একটু ঘুমোবার মতো জায়গা চাই / চতুর্দিকে বড় বেশি কোলাহল, আলো', এখানেই তিনি রোমান্টিক সত্তায় একাত্ম হয়েছেন। এবং এই সমস্ত মূল্যবোধ রমেন্দ্রকুমারের কাছে বহিরাবরণ, আসলে রমেন্দ্রকুমার রোমান্টিক চেতনার প্রেমের কবি, নারীর সৌন্দর্যের উপাসক। শব্দ চেতনায় আধুনিক হয়েও ভাবে অনাধুনিক। এই বিশিষ্ট স্থায়ী মনোভাবই প্রায় সব কবিতায় ফুটে

উঠেছে। রমেন্দ্রকুমারের কবিতা পড়লে নারী সম্বন্ধে একটি মোহনীয় আসক্তি জন্মায়, পৃথিবী ও নারীকে ভালোবাসায় আলিঙ্গন করতে ইচ্ছে হয়। বের্গস্ঁ সাহিত্যতত্ত্বে বলেছেন যে কর্মের বা ক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট সীমাবদ্ধ পার্‌সেপ্‌শন্ রিয়্যালিটি ও আমাদের মধ্যে একটা পর্দা সৃষ্টি করেছে, যার জন্যে বস্তুকে তার স্বরূপে দেখতে পাই না; আর্টের কাজ হচ্ছে এই পর্দাকে সরিয়ে দেওয়া। রমেন্দ্রকুমারের কবিতাও নারী সম্বন্ধে বোদ্‌লেয়ারের বিতৃষ্ণাময় জড় পর্দাকে সরিয়ে দেয়। প্রকৃতি প্রেম ও নারী—একাত্ম হয়ে ওঠে, সৌন্দর্যময় বিভা দান করে, এই কারণেই তাঁর কবিতায় আকর্ষণ মারাত্মক। বহুদিন আগে তিনি ঘোষণা করেছিলেন : 'ঈশ্বর, মোটর, কিংবা পদোন্নতি কিছুই পারে না দিতে / যদি না সমস্ত চেষ্টা শান্ত হয় একটি নারীতে।' এই নারী নেই বলেই তাঁর জীবনের রিক্ত হাহাকার হা হা করে উঠেছে। আউশের লাল অন্ন দু'হাত পুড়িয়ে খাচ্ছেন, কাতর প্রার্থনায় বলে উঠেছেন : 'আর কত শাপ দেবে হে সুন্দরি, ধর্মহীন ধম্মিল্ল তোমার!' অথচ ধম্মিল্লসজ্জিত রমণীকে পাখির প্রতীকে সাজিয়ে মুগ্ধ হয়ে তার রূপ দেখেছেন : 'যুবক বয়স যেন ধনুকে টঙ্কার। / হিমালয়ে চলে যায় ওষধি আনতে, / সমুদ্রের নীচে খোঁজে নীলারুণ মোতির পল্লব।' প্রতিটি শব্দের ও বস্তুর মধ্যেই ভালোবাসার আসক্তি জড়িয়ে রয়েছে। 'ঈর্ষা' কবিতায় নারী ও প্রকৃতি একাত্ম হয়ে গেছে :

> দু'হাতে মশাল তু'লে মেয়েটির মুখ
> দেখলুম। অমল সরস্বতী নয়,
> সোনার মুকুট নেই, কোন রাজদুহিতাও নয়,
> উঠোনের বিচুলি গাদায় শু'য়ে আছে
> চতুর্দিক দ্যুতি ক'রে, গোল স্তন কোমরের কষি
> খু'লে প'ড়ে আছে। এত স্বাভাবিক রূপ
> পৃথিবীর নয় যেন......

এই সৌন্দর্যময়ী রমণীর জন্যেই আগুনের অলংকৃত তীর বীরেরা ছুঁড়ে দেয়। এই যুবতী নারীকে একমাত্র কবিই ছন্দে দুলিয়ে দিতে পারেন, কবির ছন্দের দোলায় নারীর যে নান্দনিক দ্যুতি বিকিরণ, তা সম্পূর্ণ স্বাধীন, এমন কি ঈশ্বরের পরবশও নয়। কবিসৃষ্ট শব্দের আশ্চর্য ক্ষমতাই এখানে প্রকাশ পাচ্ছে। তবু নারীর ছবিটি তাঁর আসক্তিরই প্রকাশ।

'আরশি নগরে' বিবৃত বিষয়বস্তু থেকে রমেন্দ্রকুমার সামান্যই এগিয়েছেন, কিন্তু শিল্পরূপে এগিয়েছেন অনেক দূর। কবিতায় ব্যঙ্গকুশলতা স্থায়ী মনোভাব ও গভীরতার জন্যে ঝরে গেছে, ভাষা আরো সংহত ও সংযত হয়েছে, কবিতার রূপগঠন নিটোল হয়েছে। রমেন্দ্রকুমার যেমন বিষয়ের ভাবনায় ক্ষতবিক্ষত, তাঁর এই ক্ষতবিক্ষত রূপ নাটকের অন্তর্দ্বন্দ্বের মতো এ কালের তাঁর প্রায় প্রতি কবিতায় রয়েছে। আসলে কবিসত্তার মূলেই এই অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে, 'পূর্ব পুরুষের বুকে আড়াআড়ি দুই ছোরা জ্বলে, / স্বপ্ন আর হতাশায় : কী করুণ, প্রাণবন্ত তেলরঙাগুলি।' কবি যেন বর্তমান জগতে সচেতনতার অকল্যাণ জ্ঞান ফল খেয়েই যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছেন, অথচ মনের অবচেতনে লুকিয়ে আছে রোমান্টিক সৌন্দর্য : 'আমার বাগান ভরে আছে গোলাপ জামরুল নয়, জ্ঞান অকল্যাণ।' এই দ্বন্দ্ব কবিতার অবয়বে একটি স্থায়ী রূপ নিয়েছে। রমেন্দ্রকুমারের সমস্ত কাব্যজীবন এই নাটকীয় দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। তিনি রোমান্টিক, বাড়িতে থাকবেন না বলেই বাড়ি তৈরি করেন, বালিশে ভিনগাঁ'র ছবি আঁকেন, 'সার্জেনের হাত ফশ্‌কে পাখি-পাখি-পাখি উড়ে যায়,' চম্পকের উদ্ভাসনে দীপ্ত হয়ে ওঠেন, প্রকৃতি ও নারীকে এক করে দেখেন, তবু শব্দের মারপ্যাচে সিদ্ধহস্ত, নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে বিশ্বাসী, মূল্যবোধ ও আদর্শে ক্ষতবিক্ষত, নারীর সৌন্দর্যের উপাসক অথচ নারী নেই : 'কিছুতে সান্ত্বনা নেই—শুধু এই অন্তঃকরণ।' প্রকৃতিকে তিনি ভালোবাসেন, কিন্তু প্রকৃতির সেই উদ্দাম বিস্তার নেই, নগরীর বুকে সজ্জিত ভিলায় প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখেন। শেক্সপিয়র ও ডানের কবিতার মতো, ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের সরল লিরিক এগুলি নয়, চেতনায় জটিল। এতো জটিল ও দ্বন্দ্বক্ষত চল্লিশের কোনো কবি নয়।

রমেন্দ্রকুমারের কবিতায় ছন্দের পরিণতি একটি উদাহরণে বোঝানো যায়। যদিও তিনি ভাঙা পয়ারে সিদ্ধহস্ত, তথাপি মাত্রাবৃত্ত ও ছড়াও রচনা করেছেন। 'ধম্মিল্ল' এই সুন্দর কবিতায় তিনি পঙক্তির স্তবকের মধ্যে ইংরেজি কবিতার মিলবিন্যাস করেছেন, প্রথম স্তবকের শেষ ও পরের স্তবকের প্রথম পঙক্তির অন্ত্যমিল রচনা করেছেন। আর কথ্য চলিত ভাষার সঙ্গে কোল্‌রিজকথিত আদর্শ ভাষার সমন্বয়ে যাণ্মাত্রিক ছন্দে স্বচ্ছন্দে নীচের কবিতাটি রচনা করেছেন, প্রথমে মনেই হয় না এটি যাণ্মাত্রিক ছন্দ : 'বাড়িটা কাঁপছে—ভেঙে পড়তেও পারে / কী করে রুখবো ভাবি / তুফান, তুফান পাখি হয়ে উড়ে

যাও'। অথচ আগেকার ষাণ্মাত্রিক ছন্দ কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিত, উচ্চকিত ও প্রকট হয়ে উঠতো : 'ওই যে ঘাসের সবুজ সাটিনে রুপোয়-কালোয় সাপ'।

রমেন্দ্রকুমারের সমস্ত কবিতা একসঙ্গে পড়লে তাঁর ভাষার ছক্ ও প্যাটার্ন, বিশিষ্ট ইমেজ প্রায়ই আঘাত দেয়। 'কুস্তিগির', 'অঝোর বৃষ্টি', 'পিপুল', 'পাখি', 'আগুনের তীর', 'তীব্র কোলাহল', ঘুরে ফিরে আসে। এবং ইমেজগুলি সচেতন বলেই বিদেশি ইংরেজি কবিদের অনুকৃতি নয়, অনুষঙ্গ মনে পড়িয়ে দেয়, চ্যাপমানের 'the struggling contemplation of their end' কুস্তিগিরকে যেন নিয়ে আসে, এমনি 'বিদ্যুৎবিকীর্ণ অশ্ব', 'আগুনের অলংকৃত তীর', 'উজ্জ্বল আসবাব'। বিষয়ের অবৈচিত্র্য, ভাষার ছক্, ভাষার অস্বচ্ছন্দ কিন্তু চমকপ্রদ প্রয়াস তাঁর কবিকৃতিত্বের সঙ্গে স্মরণীয়। ইয়েট্স্‌প্রভাবিত কবি ব্যক্তিজীবনকে যুগপরিবর্তনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে সংঘর্ষে এগিয়ে যাচ্ছেন না কেন—এটাই আমার জিজ্ঞাসা।

১৯৬৮ ডিসেম্বর

লোকনাথ ভট্টাচার্য

লোকনাথ ভট্টাচার্যের এটি প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলেও অতি-মানসিকতার বাক্‌প্রৌঢ়ি সর্বত্র ছড়ানো। প্রথম পর্বের হতাশা অন্ধকার বিষণ্ণ ধূসরতা লক্ষ্য-না জেনে চলার অস্থিরতা প্রায় নেই বললেই চলে। কবির মানসজগৎ ঘিরে রয়েছে দুটি প্রান্তিক চেতনা : আত্মবোধের একদিকে প্রশান্তি, যা ধ্যানগোপন নিবিড়তায় স্তব্ধ; অন্য দিকে সকল হৃদয়ে প্রবেশের জন্যে ব্যাকুলতা, সমস্ত জগতের জন্যে আশীর্বাদের প্রার্থনা। দ্বিতীয়টি প্রথমটিতে পৌঁছবার সোপান। ('ব্যর্থ বানরের কবর') এই অনুভূতি লাভে যেখানে বাধা, সেখানেই সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষ বাইরে, পরিবারে, লোকের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে, ফলে কবিচিত্ত হয়তো দ্বন্দ্বমুখর। কিন্তু এ সকল ছাপিয়ে তাঁর প্রায় কবিতাতেই অলৌকিক আনন্দের বিস্ফার আকাঙ্ক্ষা সকালের দোলন চাঁপার মতো বাতাসে কাঁপতে থাকে। এই জগতের পরপারে অনির্দেশ্য অপার রহস্য কবির অনুভূতিতে চকিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠতে চাইছে, তাকেই তিনি ধরতে চাইছেন, বিরোধ বাঁধছে সীমিত পৃথিবীর সঙ্গে। ('মই') দুটি পঙক্তির মধ্যে এটি অতি চমৎকার ফুটে উঠেছে : 'তবু আনন্দ ভীষণ, বিভাসিত যন্ত্রণা। কাকে ডাকবো ভাই বলে? ডাকতে চাই।'

এই অলৌকিক রহস্যের সন্ধানই তাঁর কবিতাকে মাঝে মাঝে মিষ্টিক অনুভূতির প্রান্তে নিয়ে যায়। যুক্তিবিহীন বিশ্বাস অন্তরাত্মাকে আলোড়িত করে। যদিও প্রকৃত মিষ্টিক পুরুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান, আকাঙ্ক্ষা ও ইমোশন মিলে যায়, বিশুদ্ধ প্রেমের বোধ বিশ্বসত্তায় প্রসারিত হয়, মন্ময়তা ও তন্ময়তার বিরোধের অবসান ঘটে, সেখানে কথা ও প্রাপ্তির মধ্যে কোনো ভেদ থাকে না। কিন্তু কবিকে শব্দের সাহায্যেই প্রকাশ করতে হয় তাঁর মিলনের ও প্রেমের কথা। সঙ্কেতচিত্রকল্পের রঙিন অবগুণ্ঠনে সাজিয়ে সযত্নে তুলে ধরতে হয় পাঠকের কাছে, কবি যেন তটস্থ শক্তির মতো দুই প্রান্ত ছুঁয়ে আছেন। লোকনাথও সেই অজানা আনন্দের রহস্য ইঙ্গিতে আংশিক প্রকাশ করেছেন: 'তার কথা নীরবতার, মুছে যাওয়ার, মুছে ফেলার অস্বীকারের। মিলনের, সে বলে, নাম নেই।' 'আমি শুনলাম গানের মধ্যে নীরবতা, নীরবতার অন্তরে গান, দেখলাম স্থবিরতায় গতি আর সকল গতি যে-নিশ্চলকে ঘিরে ঘোরে, আরতি করে।' ব্লেকের মতো তিনিও নিষ্পাপ সংগীতের সঙ্গে অভিজ্ঞতার সংগীতের বিরোধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। ব্লেকের মতো তিনিও যেন বলতে চাইছেন যে কল্পনার সাহায্যে সমগ্র জীবন এক হয়, মানুষে মানুষে প্রেমের সম্পর্ক সেখানে ধরা পড়ে। এবং পাপ হচ্ছে ব্যক্তির স্বতন্ত্র চিন্তা ও স্বার্থ বোধ। রবীন্দ্রনাথের মতোই জড়জগৎ থেকে মুক্তি চাইছেন তিনি। 'তার নিদ্রায় মৃত্যু ঘটবে যে মুহূর্তে, তখনই ফুল ফুটবে।'

এই মিষ্টিক জগতের সঙ্গেই রয়েছে রোমান্টিক মানসিকতার অপ্রাপ্তির অন্বেষণের ব্যাকুলতা। প্রাপ্তিই প্রধান কথা নয়, চাওয়াটাই প্রধান কথা: 'পথের শেষে মন্দির নয়, চেয়েছি পথের শেষে পথ।' এমনি করেই জীবনের দুঃখের মধ্যে তাকে জানতে হবে। কয়েকটি কবিতায় কাব্য সম্পর্কে এবং কবিতাকে কেন্দ্র করে জীবনের চিন্তা ফুটে উঠেছে। বের্গসঁর মতোই কবিতার মর্মমূলে দেখেছেন; 'দুটি হৃদয় এক হ'তে পারে শুধু জড়তাকে প্রাণপণ থাপ্পড় মেরে, মাত্র পারস্পরিক একটি আজীবন দুঃখের সংগ্রামের সাধনায় কাব্য সাধনার জীবন্ত জলন্ত অক্ষর।' তাই কখনো মনে হয়েছে জীবন অনেক বড়। ভালোবাসতে গিয়ে শুধু ব্যর্থতা পেয়েছেন কবি। এই সূত্রেই কবি অনুভব করেছেন, জীবনের সঙ্গে কবিতাকে যুক্ত হতে হবে,

তা না হলে কথার ভূতকে শ্মশানের লেলিহান আগুন গ্রাস করে। আবার কবিতাই তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে অনুভব, যার মধ্যে স্বীকার-অস্বীকার, মনের ভেতর ও বার মিলিত হয়ে গেছে। এই দুঃসহ আকাঙ্ক্ষার এই স্পর্ধার নামই—কবিতা। এই অনুভবের মাধ্যমেই জেনেছেন কবিতার কথা দুঃসাধ্য শেষ তিন গজে পৌঁছে দিলেও 'তার শেষে কি আছে কবিতা জানে না, জানে না ছবি, গান প্রেম।' তাই তিনি বলেছেন ; 'আমার কবিতায় স্বীকার আমার সীমার ও প্রার্থনা প্রণামের।'

হোয়াইট্‌হেডের মতে শব্দজনিত সঙ্কেতের অর্থ গড়ে উঠেছে ইমোশন আইডিয়া ও চিত্রকল্পের সাহায্যে। অনুপ্রাসজনিত তিন 'ম'-এর ব্যবহারে ধ্বনির গন্ধ ও অনুভবের বিস্তার আনতে চাইছেন, প্রতীক ব্যবহার করতে চাইছেন। মই হচ্ছে আরোহণের উত্তরণের, ময়ূর হচ্ছে কল্পনা ও অপ্রাপণীয় সুন্দরের রঙ বেরঙের পালক, ('মই' দ্রঃ) আর মন হচ্ছে সেই বস্তু যা জড়তাকে প্রাণপণ থাপ্পড় মারতে পারে। প্রচ্ছদের চিত্রে যাকে চোখ বলা হয়েছে। মনই হচ্ছে মই ও ময়ূরের ভিত্তি।

লোকনাথের ভাষা সমতল গদ্যে লেখা হলেও স্বাদেগন্ধেচিত্রেস্পন্দে সংহত-ভাষণে রঞ্জিত ও ধ্বনিত। গদ্যকে পদ্যে উন্নীত করবার জন্যে অনুপ্রাসধ্বনির সমারোহ, সংক্ষিপ্ত ও কাটা ছন্দের রেশ, কখনো ক্রিয়াপদ বর্জন, প্রায়শ ক্রিয়ার স্থান বদল, বাক্যরীতির পরিবর্তন, চিত্র ও সঙ্কেতের ব্যবহার, চিত্রকল্প, সমাসোক্তি, উদ্দীপ্ত উচ্ছ্বাসআবেগ, নাটকীয় ভঙ্গি, উল্লম্ফনরীতি প্রভৃতি ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। কোনো কোনো কবিতায় কাহিনীও এনেছেন। মিষ্টিকতা রোমান্টিকতা প্রতীকধর্মিতার পাশেই বাস্তবজগতের সংঘর্ষে প্রকৃতিবাদের কুৎসিত শব্দের ব্যবহারও লক্ষণীয়। এতে বস্তুজগতের প্রতি তাঁর একধরনের প্রবণতা প্রকাশ পাচ্ছে : 'স্বামী নেই ? কিন্তু ঋতুস্নানে স্নাতা এখনো তো তুমি নারী, ডাক্তার বললেন।' 'পায়খানার নিত্য নৈমিত্তিক কোঁৎ পেড়ে চালান দেওয়া বিশ্বাস অবিশ্বাসের যত তর্ক।' কবিতাহীন জীবনের প্রতি ধিক্কার দিয়ে বলেছেন ; 'পাল পাল গাধার বড় বড় কান হাওয়ায় নড়ছে। মিথ্যুক দাম্ভিক বাচাল গাধা নপুংসক। পুরুষাঙ্গ ওদের প্রকাণ্ড কাঁচি দিয়ে কাটো।' সে জঁ। পের্স অবলম্বনে 'ইতিবৃত্ত : এক' অনবদ্য রচনা।

রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'ই (১৯২২) বাংলা সাহিত্যে প্রথম গদ্য কবিতা।

সম্প্রতি অরুণ মিত্রের 'ঘনিষ্ঠ তাপে'র (১৯৬৩) প্রথম দিকে কিছু গদ্য কবিতা সম্বলিত হয়েছে, এর পরেই সম্ভবত লোকনাথের 'মই ময়ূর মন' (১৯৬৮)। বুদ্ধদেব বসু ছন্দের পাশে বৈচিত্র্যের জন্যে কয়েকটি গদ্য কবিতা রচনা করেছেন। সাম্প্রতিক কবিদের সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। ফরাশিতেও আঁরি মিশ্-অ ছাড়া অন্য কোনো কবি নিরন্তর গদ্যে কাব্য রচনা করেছেন কিনা জানি না। শাতব্রিআঁ, তারও আগে রুশোর রচনায় গদ্য কবিতার ধ্বনি শোনা যায়, বোদ্‌লেয়ারের 'পেতি পয়েম্ অ্যাঁ প্রজ্', লত্রআ মঁ'র 'শাঁত্ দ্য মালদরর অ্যাঁ অ্যাফের' ও র‍্যাঁবো'র 'ইলুমিনাশিওঁ' ও 'সেজঁ অ্যাঁ অ্যাঁফের'—এই সমস্ত রচনার মধ্যেই ফরাশি কাব্যের চার শতকের চিরায়ত ছন্দ মাত্রা ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়, এর পর থেকে প্রায় সকলেই কল্পনাকে ভিত্তি করে, উদ্দীপ্ত আবেগ ও বক্তৃতার বাক্‌ছন্দে, চিত্রে ধ্বনিতে গদ্যকবিতা রচনা করেছেন ফরাশি দেশে। অনেকের কাছে ফ্রিভর্স ও গদ্যকবিতা একাত্ম। হুইট্‌ম্যানই ইংরেজিতে প্রথম ফ্রিভর্স রচনা করেছিলেন। ভেরলেন্ ফ্রিভর্স বলতে বুঝতেন অন্ত্যমিল সমন্বিত বিভিন্ন মাত্রার ছন্দের পরস্পর সমাবেশ। বাংলা দেশে বুদ্ধদেব বসু একেই এখনো একমাত্র ফ্রিভর্স বলে আঁকড়ে ধরে আছেন। ফরাশি কবিতা অতিরিক্ত ছন্দের মাত্রাশাসনে বাঁধা ছিল বলেই প্রতীকী কবিতায় অসম্ভবভাবে তা অস্বীকৃত হয়েছে। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও এই কথা বলা চলে। র‍্যাঁবোর অনুবাদক হিসেবে লোকনাথ সম্ভবত গদ্যকবিতার দুর্মর প্রভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

এখন প্রশ্ন হলো গদ্যে কবিতা রচনা করা যায় কিনা। এলিঅট কাব্যে গদ্যের দৃঢ়তা ও বাক্‌ছন্দ আনতে চেয়েও 'জর্নি অব্ দি ম্যাজাই' ছাড়া অন্য কোনো কবিতায় গদ্যছন্দ (vers libre) ব্যবহার করেন নি, এবং এই গদ্যছন্দও পঙক্তি বিন্যাসে একটা ছন্দস্পন্দ এনেছে। কারণ এলিঅট মনে করতেন যে, ভালো কাজ করতে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তির কাছে কাব্য কোনো প্রকারেই মুক্ত নয়। লোকনাথের বিষয়বস্তু যদি পাউণ্ডের এলিঅটের লাফর্গের আঁরি মিশ্-অ'র জাক্ প্রেভের-এর মতো বিশৃঙ্খলময় গদ্যের হতো, তাহলে প্রাত্যহিকের ভাঙাচোরা গদ্যের আকস্মিকতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা যেতো। কিন্তু তাঁর কবিতা যে মিলনের, নীরবতার, ধ্যানের, সম্মোহনের, সামগ্রিক ঐক্যের, মন্ত্রের, প্রার্থনার ; সঙ্কেতের ধ্বনি রয়েছে। তাকে মাত্রাছন্দের উদ্দীপ্ত উত্তেজনায়

উদ্‌ভাসিত আরো গভীরতর নিবিড়তর ঐক্যে নিয়ে যাওয়া যায়। হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ছন্দের সংকীর্ণ সীমারূপী কৃত্রিমতার সামঞ্জস্য বিধানই মাত্রাছন্দ। ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা বিচারও তীব্র উত্তাল হৃদয়ের সঙ্গে সমতা নিয়ে আসে, দুই বিরোধী শক্তি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সংশ্লেষিত হয়। অতিরিক্ত উত্তেজনার মধ্যেই মাত্রাছন্দের প্রাণ নিহিত। ফলে ইমোশনের সঙ্গে আনন্দ একীভূত হয়ে যায়। ছন্দের কৃত্রিমতায় বিচারবুদ্ধির প্রাধান্যে পাঠকের কাছে সঞ্চরমাণতা স্পষ্ট হয়। মাত্রাছন্দের সহায়তায় পাঠকের চিত্তে অনুভূতির তীক্ষ্ণ সংবেদনশীলতা, উৎফুল্লতা ও মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। বিস্ময়ের অবিচ্ছিন্ন উত্তেজনায় কৌতূহলের দ্রুত পারস্পরিক বন্ধনে, ছন্দস্পন্দের বিস্ময়-হতাশা-উত্তেজনা-তৃপ্তির আবর্তনে পাঠকের চিত্তে সুপ্ত কৌতূহল পুনরায় উত্তেজিত হয়, সামান্যতম ধ্বনিও সামগ্রিকভাবে আবশ্যকীয় হয়ে ওঠে, তাৎপর্যমণ্ডিত হয়। মাত্রাছন্দে শব্দ শব্দকে পরস্পরভাবে যতোটা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করতে পারে, গদ্যে তা পারে না। প্রত্যাশাজনিত সুনির্দিষ্টতা ও সংকীর্ণতা বৃদ্ধি পায়, অন্ত্যমিলের সাহায্যে শব্দের বৈচিত্র্যে কাব্যের নিটোল ঐক্য একটা স্বজ্ঞাজনিত আর্টফর্ম হয়ে ওঠে। পাঠকের হৃদয়ে সহানুভূতি বিস্তৃত হয়, আন্দোলন চক্রাকারে আসতে থাকে। এমনিভাবেই শব্দের পারস্পরিক অতি সংযোগে, প্রত্যাশার সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণে, ছন্দস্পন্দের উত্থানপতনে, বিস্ময়-কৌতূহলের স্রোতে সংবেদনশীলতা ও আনন্দের মধ্যে একটা অতিতীক্ষ্ণ চেতনা কাজ করে, যার নাম সম্মোহন। একথাগুলি ডানিয়েল থেকে কোল্‌রিজের মধ্য দিয়ে রিচার্ডস্‌ পর্যন্ত আমরা জেনেছি। রিচার্ডস্‌ সম্মোহনের মধ্যে বিস্ময় নেই বলতে চেয়েছেন, কারণ বিস্ময়ের সঙ্গে সচেতন বুদ্ধি জড়িত। কিন্তু গোপন বিস্ময়ের উত্তেজনা-আনন্দ থাকেই, যেহেতু ব্যঞ্জনাময় অর্থের সচেতনতা লুপ্ত হয় না। তাই গোপন বিস্ময়জাত উত্তেজনা ও আনন্দ কাব্যের নিবিড় নিটোল ব্যঞ্জনাময় ঐক্যে নিহিত থাকে, এর ফলেই ইয়েট্‌সের ভাষায় মন প্রশান্ত হয়ে জাগ্রৎ সম্মোহন সৃষ্টি করে। অনুভূতির বিস্তার ঘটে। লোকনাথের 'পান করলাম নিশ্চিন্তে মহানের অব্যক্তিক অভিনিবেশে,' 'আমার মনের মন্দিরে শঙ্খ বাজে' 'সেখানে উচ্চারণ যায় না, দীর্ঘশ্বাস যায়' ; 'বলার, না বলার উর্ধ্বে মুহূর্ত আজ যে মুহূর্ত চিরকালের ও যা কালকেও আসবে। আমাদের খেলাঘর।'—এই সমস্ত আইডিয়ার জটিল অনুষঙ্গে জড়িত ব্যক্তিগত অনুভব লোকনাথের গদ্যে বিস্তৃত

স্ফীত হয়ে গেছে। ইংরেজিতে যাকে 'ইন্‌ট্যুইটিভ্ ফর্ম' বা স্বজ্ঞাজাত রূপ বলে—তা হতে বাধা দিচ্ছে। ছন্দস্পন্দে ধ্বনিতে কাটা মাত্রিক পর্বে গদ্যেও যে ছন্দ আনতে চেয়েছেন কয়েকটি পঙক্তি সাজালেই তা ধরা পড়ে : 'জানি কথা সব নয়, / সব নয় গান, রেখা রঙ, তারা / পৌছায় না মন্দিরের প্রথম সোপান।' অথবা ; 'স্বর্ণধৌত শৃঙ্গে শৃঙ্গে / সেই তো আয়োজন / দম্পতির রাত্রি যাপনের।' লোকনাথের বৃত্তগন্ধী কাব্যের ভাষা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো গদ্যপদ্য সমান স্বীকার করতে নারাজ তিনি। বের্গসঁ বলেছিলেন প্রত্যেক শব্দই জীবন্ত উপমারূপে সৃষ্ট হয়েছিল, কালের পরিবর্তনে গদ্য আজ জাদুঘরে পর্যবসিত হয়েছে, এই জাদুঘরে কবিদের উপমাগুলি রক্ষিত রয়েছে। তাই ছন্দস্পন্দে বিন্যস্ত শব্দ প্রাণদীপ্ত হলেই ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে ওঠে, একটা সম্মোহন আনে। ছন্দ ও মাত্রা আমাদের সেন্সিবিলিটি বাড়ায়। লোকনাথ যদি গদ্যপদ্যের পার্থক্য স্বীকারই করেন, সীমা বহির্ভূত প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করতে চান, তাহলে গদ্যের বিচ্ছিন্ন আকস্মিক বিশৃঙ্খল উচ্ছ্বসিত স্ফীত পঙক্তিকে ছন্দের শাসনে নিটোল রূপে বাঁধতে তাঁর অনীহা কেন? ছন্দ স্বীকার করেও তো ছন্দের মুক্তি আনা যায়। আর প্রথম জীবনে তিনি তো ছন্দেই কাব্য রচনা করেছেন। ফরাশি আদর্শও সব সময় গ্রহণীয় তা বলা যায় না।

লোকনাথের কবিতা সম্বন্ধে এতো কথা বলা সত্ত্বেও তাঁর কবিখ্যাতির পক্ষে অন্তরায় হচ্ছে ফরাশি প্রতীকী কবিতার পরিচিত শব্দগুচ্ছের বহুল প্রয়োগ, বিদেশি ধরনের শব্দ ও বাক্যবিন্যাস, রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার প্রায় হুবহু পঙক্তি প্রয়োগ এবং সর্বোপরি ছন্দের প্রতি অনীহা, যা স্মরণে রাখতে বাধা দেয়। যতোদিন জীবন থাকবে, ততোদিন কাব্য থাকবে; জীবনের তাগিদেই কাব্যে ছন্দের উত্তেজনা স্মৃতিকে আলোড়িত করবে। বরং আরো দুঃখের কথা পরবর্তী রচনায়ও এই অসদ্‌গুণ দূরীভূত হয় নি। 'হাঁটুতে হাঁটুতে নহবৎ' কোনো বাংলা অনুষঙ্গ জাগায় না। তাই সন্দেহ জাগে কবিতায় প্রকাশিত অনুভূতির সঙ্গে তাঁর বাস্তব আন্তরিকতা কতখানি? না, কবিতার জন্যেই কবিতা, সাহিত্যের জন্যে লেখা?

১৯৬৮ ডিসেম্বর

কৃষ্ণ ধর

কৃষ্ণ ধরের কাব্যগ্রন্থ শেষ করবার পরই মনের মধ্যে সমানে 'ফোর কোয়ার্টেট্স্'এর সময় নদী ও সমুদ্রের চিত্রকল্প চোখের ওপর ভাসতে লাগল। সময় ও সময়হীন এই দুই বোধ যখন একই সঙ্গে অনুভূত হতে থাকে, তখনি ঐতিহাসিক বোধের জন্ম, আমাদের কালচেতনা পূর্ণতা পায়। সময়ের দ্বারা ইতিহাসের সৃষ্টি, অর্থের দ্বারা সময় সৃষ্টি। এলিঅট বলেছেন, অর্থ ছাড়া সময় নেই এবং সময়ের মুহূর্ত অর্থ দিচ্ছে। এই সময়ের মুহূর্তকে নির্দিষ্ট স্থানের সীমায় অর্থ পূর্ণ করে পেতে হবে। এই দুটিকে নদী ও সমুদ্রের উপমায় বলেছেন : 'আমাদের ভেতরে নদী, সমুদ্র আমাদের চতুর্দিকে।' মানুষের সময় হচ্ছে নদী, আর পৃথিবীর সময় হচ্ছে সমুদ্র, শাশ্বতের বিশ্বছন্দ স্পন্দিত হচ্ছে এই সমুদ্রে। এই সমুদ্র প্রথম যুগের সৃষ্টির সাক্ষী, এর শরীরে দেবতা-মানুষপ্রাণীর বহু কণ্ঠস্বর মিশে আছে। সুতরাং শাশ্বতের অর্থ ও বোধ এই সমুদ্রের মধ্যে নিহিত রয়েছে। 'দি ড্রাই শ্যাল্ভাজেস্'-এর প্রথম পর্বেই নদী ও সমুদ্রের তুলনায় তাৎক্ষণিক কাল ও শাশ্বত কালকে বুঝিয়েছেন এলিঅট। কৃষ্ণ ধরও কাল ও নিসর্গদৃশ্য এই দুটিকে পরস্পর সংযোগ করে মহাকালের বুকে তাৎক্ষণিক মানব ও জাগতিক দৃশ্যের সমাহারে একটি ঐক্যসূত্র আনবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের শেষে সমুদ্রের ব্যঞ্জনাগর্ভ রূপ ফুটে উঠেছে। নিত্যকালের ইঙ্গিতে মানবমানবী জগৎসংসার সুখদুঃখ শেষ হয়ে যাচ্ছে; নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে; তখন নিসর্গে ঘুমন্ত দুঃখ : 'ঢেকে দেবে নীরবতা আমাদের ঐকতান দলছুট সময়ের ডানা / সমুদ্র তখনও থাকবে চিরন্তন অন্ধকার পূর্ণিমার মাতাল জ্যোৎস্নার / তখন ঘুমোব আমরা বিশ্বাসী বন্ধুর মতো মুখোমুখি শুয়ে'। 'দলছুট সময়ের ডানা' তাৎক্ষণিক সময়, 'চিরন্তন অন্ধকার' নিত্যকাল। এবং এই নিত্যকালেই শাশ্বত মিলন সম্ভব, যেখানে অবিশ্বাস-বিরহবিচ্ছেদ কিছুই নেই। এই মিস্টিক মিলনই কাঙ্ক্ষিত।

সুতরাং কালই হচ্ছে কৃষ্ণ ধরের কবিতায় প্রাণকেন্দ্র। এই কালের কেন্দ্রে বিভিন্ন স্ফুলিঙ্গদৃশ্য বিচ্ছিন্নভাবে বলে গেছেন, বিচ্ছিন্ন টুকরো চিত্রের সমাহারে এ কালের মানুষের রিক্ততা, ব্যর্থতা, লোভ, হতাশা, ভণ্ডামি, লালসা নারীভোগ, জ্বালাযন্ত্রণা, অনিকেত মনোভাব যেমন ব্যক্ত করেছেন, তেমনি অন্যদিকে প্রেমের সৌন্দর্যবাসনা এবং জীবনের গ্লানিকে মেনে নিয়ে ও তাকে

অতিক্রম করে আলোকিত জীবনের দিকে প্রত্যয় মেলে দিয়েছেন : 'সীমিত সত্যের আয়নায় মুখ দেখি পলাতক কালে / গ্রন্থিগুলি ছিঁড়ে গেছে, শতজীর্ণ পলাশের ডালে / তবুও ফুটেছে ফুল, সবুজে ও লালে / অরণ্যের সমারোহে প্রাণের সংরাগে জলে স্মৃতির শিকড় / উজ্জীবনে স্বপ্ন জাগে / স্মৃতি এক অথৈ সাগর।' কিন্তু এ সকলকে আচ্ছন্ন করে আছে মহাকাল, সমুদ্র। কারণ, 'এই সমুদ্রের জলে মন্দিরা নিয়ত বাজে।' এমনি মহাকাব্যিক ব্যাপকতা কৃষ্ণ ধর এই দীর্ঘ কাব্যে আনতে চেয়েছেন।

'আমাকে জড়ায়েছিল ঈর্ষাতুর স্মৃতি, দীর্ঘশ্বাস', এই স্মৃতিই কৃষ্ণ ধরকে অতীতের প্রেমজীবনের স্মৃতির পথে নিয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতের কামনা জুগিয়েছে। এই স্মৃতির দ্বারাই তিনটি কালকে সংযুক্ত করতে চেয়েছেন, বর্তমান কালের মধ্যে ঘটনাক্রিয়ার প্রত্যক্ষতা তাকে নূতন পথে নিয়ে গেছে, 'ভুলে যেতে চাই আমি মানুষের আদিম অসুখ।' কারণ 'আগ্নেয়গিরির মুখে বসে/আকাশের স্থির চিত্র টেলিলেন্সে ধরা যায় নাকো/ক্রাকাতুয়া মরে গেছে, ফুজিয়ামা শুধু শৈলাবাস।' বর্তমানে মানুষের জীবন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, 'দ্বীপগুলি, দূরে আরো দূরে সরে যাচ্ছে / সামনে পিছনে সব চেকপোস্ট, কাঁটাতারের বেড়া / টহল দেয় সব সতর্ক সিপাই।' বর্তমান জীবনের শূন্যতা সম্বন্ধে বলছেন : 'আমাদের ঘর নেই, ছিন্নমূল পরদেশী ঠাঁই / ঘোচে না সংবৎসরে, পোড়া জমি ফণিমনসার / কাঁটা ঝোপে হা হা করে ফেরারী বাতাস / নিঃসঙ্গ উঠোনে ধুলো এক হাঁটু ফুটো ছাদ, তবু / প্রাণের পল্বলে জমে অনাগত আশা।' এই অনাগত আশার সৌন্দর্যময়ী প্রণয়িনীর রূপ 'তুমি'র মধ্যে মূর্তিময়ী হয়ে উঠেছে। এই 'তুমি' কালের রাখাল, কখনো প্রেয়সী, কখনো অন্ধকারে তরণী, আবার 'তুমি'ই ঈশ্বর, না হয় লৌকিক ঈশ্বরী। এবং ঈশ্বরীও স্মৃতিস্নাত। কিন্তু সব ছাড়িয়ে 'কালের নিসর্গ দৃশ্যের' বিচিত্র রঙ এবং তাকে ছাপিয়ে মহাকালের অনুভূতিকে সঞ্চার করতে চাইছেন। কালের মধ্যে বিভিন্ন দেশের জীবন ঘটনাকে পূর্ণব্যাপ্তি দিতে চেয়েছেন।

কিন্তু কোনো কাহিনীবৃন্তের নিগূঢ় ঐক্য না থাকার জন্যে একটি পরিণামী-বোধ গড়ে ওঠে নি। বিচ্ছিন্ন চিত্রের মধ্যে সংহতি ফুটে ওঠে নি। বিভিন্ন প্রকার ভাবান্তর প্রথম থেকে শেষ অবধি থাকলেও নিজস্ব কোনো ভাষা ও

ছন্দ তৈরি হয় নি। চিত্রকল্প ও ভাবনার চিত্রের মধ্যে এলিঅট বিষ্ণু দে'র মাধ্যমে চোলাই হয়ে এসেছে। নির্দেশাত্মক শব্দ, টুকরো বিচ্ছিন্ন বাক্য, স্থান কাল পাত্রের উল্লেখ গভীরতর কল্পনার অপেক্ষা করে। পড়ে পড়ে মনে হয়, কোথায় যেন একটা নিবিড় অনুভূতির অভাব রয়েছে, তাই মাঝে মাঝে খণ্ড চিত্র ভালো ফুটলেও সামগ্রিকতায় ধরা দেয় না। সর্বোপরি, রোমান্টিক সুদূরতার ব্যঞ্জনা আনবার জন্যে 'তরে' 'তাঁরে' 'তাহাকে' 'খুঁজিয়াছি' 'পুরুষেরা' ব্যবহার এই ধরনের কাব্যের পুরুষালিকে নষ্ট করে দেয়। 'তুমি তারে দেখ নাই, তুমি শুধু নিজেকেই নিয়ে' এ রকম ব্যবহার না করলেও চলতো। অথচ মুখের ভাষার ব্যবহার যে জানেন না তা নয়, কারণ ইনিই ব্যবহার করেছেন : 'ছলনায় মজে / বহু নারী এক স্রোতে ঝাঁঝি আর শ্যাওলায় কবে গেছে হেজে।' যতোদূর মনে হয় কৃষ্ণ ধর এই কাব্যে ভাঙা পয়ার দিয়ে বাক্‌স্পন্দ ব্যবহার করতে চাইছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে অনেক পঙক্তিরই ধ্বনির কাল-পরিমাণ পয়ারকে স্বীকার করে না, 'সৈকত মেলার দৃশ্য দেখতে গিয়েছি বহুবার' পয়ারেরই ঢঙ, কিন্তু 'অবাধ্য ঢেউএর চূড়ায় দোল খায় স্বপ্নের তরণী মাঝে মাঝে' 'ঢেউএর' শব্দটিকে যদি তিনও ধরি, তাহলেও মেশানো যাচ্ছে না, পর্ব থাকছে না, হয়তো পুরো পঙক্তিটায় থাকছে। বিকল্প মিল ও পরস্পর পঙক্তির অন্ত্যমিল মাঝে মাঝে সুর আনছে, কিন্তু তাকে আরো সচেতনভাবে ব্যবহার করা যেতো। শব্দবাক্যছন্দবিন্যাসে ও চিত্রকল্প ব্যবহারে কৃষ্ণ ধরের কাছে আরো নৈপুণ্য আশা করি। ভাবনা একই কালের মানুষের এক রকম হয়, হয়তো তাই ছককাটা, কিন্তু এর ঐক্য নূতনত্ব ও স্বাতন্ত্র্য আনে ধ্বনিচিত্রকল্পভাষার ব্যবহারে। অনেক সময় তিনি শুধু বক্তব্য বলেছেন, বক্তব্যকে কাব্যে উন্নীত করতে চাইছেন না, সাংবাদিকতার তথ্য মাত্র প্রকাশ পাচ্ছে। দীর্ঘ কবিতায় এই ত্রুটি অনস্বীকার্য, তবু সচেতন হবেন কবি প্রত্যাশা করতে পারি। হয়তো, এটাও হতে পারে বহমান কালের চলতিরূপ ফুটিয়ে তোলাই কবির প্রার্থিত, তাই নবীন আবিষ্কার, নূতন ভাবনা, অভিনব সৃষ্টিপ্রয়াসের মাধ্যমে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাতে চান নি। তবে বাংলাদেশের খণ্ড কবিতার ও লিরিক বেদনার স্ফুলিঙ্গের পাশে ব্যাপ্তবোধের উদ্দীপ্ত ভাবকে প্রকাশ করবার চেষ্টা প্রশংসনীয়। মণীন্দ্র রায় ও কৃষ্ণ ধর বাঙালি পাঠককে এদিক থেকে কিছুটা অন্যদিকে বাঁক ফেরাতে চেষ্টা করেছেন।

তবে দু'জনেরই কাব্যে একই বিষয়বস্তু ও ভাব, বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমাহার প্রায় দেখা যায়, রূপের প্রকাশ ভিন্ন।

১৯৬৯ সেপ্টেম্বর

মণীন্দ্র রায়

একদিকে মানুষের কৃত্রিম বাইরের সাজ, লোভ, বাধা, নিঃসাড়তা, অন্যদিকে ঝরে-যাওয়া সময়ের বেদনা কবিচিত্তকে দ্বন্দ্ব মথিত করছে, কবিচিত্ত পাপ অন্ধকার পাতালে মজ্জমান, অথচ ভবিষ্যতের আশা রয়েছে, এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই কবিচিত্ত মানবতার ধ্যান করে, মানবপ্রীতির আনন্দ পেতে চায়, ভবিষ্যতের আশাকে প্রেমের আগুনে দীপ্ত করতে চায়, তাতেই হিরণ্ময় পাত্র অপাবৃত হবে, 'মোহিনী আড়াল' হচ্ছে সেই হিরণ্ময় পাত্র :

…এক / বহু হতে চায়, সে তো মমতারই গূঢ় জাগরণে / হৃদয়ে প্রবেশ কর প্রীত হও, হে প্রেম আমার / সব কপাটের বাধা, ভাঙা কড়িকাঠ, / হোক অগ্নির স্তূপে তোমারই শিখায় / আয়ু, জ্যোতি ওজসের জনসমাগমে/ ঊর্ধ্বশির স্বাহা'। তাই নিসর্গপ্রকৃতি ও মানববুদ্ধির দ্বারা সৃষ্ট যান্ত্রিক জীবনের মধ্যে সামগ্রিক বিশ্বানুভূতির ব্যাপকতাই কবির কাঙ্ক্ষিত। এই বিশ্ববোধকে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড চিত্রের অনুভূতির সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। প্রেম ও কামের জীবন, প্রেম দুর্লভ বলেই কামের সহজ পথে জীবন ঢলে পড়ে ; পুরাতন স্মৃতির আমোদিত গন্ধ, পাতাল জীবনের মর্মান্তিক গ্লানি ও অবসাদ ; কবিতাই শাশ্বত আনন্দ দিতে পারে, কারণ প্রেমের মধ্যে ক্ষণিক আনন্দের পর দুঃসহ দুঃখযন্ত্রণা ; যামিনী রায়ের ঐতিহ্যগত স্নিগ্ধ রঙের ছবির শ্যামল মমতায় ও মেলার বিচিত্র হৃদয়ের উন্মীলনে মানবপ্রীতি ; একদিকে মগ্ন চৈতন্য ও অন্যদিকে বিচিত্র সংসারের চিত্র প্রভৃতির সাহায্যে ব্যাপকতা আনতে চেয়েছেন। কিছু কিছু চিত্র, বিশেষ করে সময়ের চিত্রকল্প খুবই ভালো। জীবনের ও অনুভূতির বিচিত্রতা ছন্দের বৈচিত্র্যে ধরতে চেয়েছেন, মিল ও অমিলের একঘেয়েমি কাটিয়েছেন। দু'এক জায়গায় ভাষার স্বচ্ছন্দতা কিছুটা ব্যাহত হলেও আধুনিক ইডিয়মের দিকে তাঁর দৃষ্টি রয়েছে। কিন্তু মণীন্দ্র রায়ের কবিতা বক্তব্যপ্রধান, আইডিয়ার প্রকাশ, কবিতায় আমরা চিত্রকল্পে কথা বলতে চাই, চিত্রকল্পের মধ্যেই উপলব্ধির জগৎ প্রত্যুদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে ; কিন্তু 'মোহিনী আড়ালে'র

ইমেজ ও ছবি তৈরি হয়েছে আইডিয়ার বিস্তার ও ব্যাখ্যার জন্যে। হয়তো অতিরিক্ত রাজনৈতিক চেতনাই এখানে সক্রিয়, এবং একথা তিনি নিজেও স্বীকার করেন। কবিতায় আমরা কি প্রচলিত অনুভূতি ও চিত্রকেই লাভ করতে চাই, না সময়ের স্রোতে সেন্সেবিলিটির গূঢ় গভীর রহস্যময় নূতন দিগন্তচিত্র পেতে চাই, এই দ্বিধা থেকেই যাচ্ছে। তাই মনে হয় ক্ষুদ্র লিরিক কবিতাতেই মণীন্দ্র রায়ের যা কিছু সফলতা। অথচ এব্যাপারে তাঁর উৎসাহ এখন কম।

১৯৬৯ সেপ্টেম্বর

হরপ্রসাদ মিত্র

হরপ্রসাদ মিত্রের সাম্প্রতিক কবিতার মধ্যেই তাঁর কবিসত্তার আন্তরিক স্পন্দন গভীরভাবে অনুভব করা যায়। এর আগে তাঁর কাছে কবিতার জগৎ ছিল অনেকটা সুখী মানুষের বিলাসদ্রব্যের মতো, কিন্তু জীবনের মুখোমুখি হয়ে, বাস্তবের সংঘর্ষে এসে তাঁর মনের মধ্যে বাস্তবজগতের যে ইমেজ ফুটে উঠেছে, তাঁর একালের মানসিকতার জন্যে আস্বাদ্য নয়, কবির মনের আন্তরিক স্পর্শে স্পন্দমান বলেই স্বীকার্য, তাঁর নিজের ভাষায় বলা চলে; 'নেপথ্য সংবিৎই লেখে সময়ের যথার্থ সংবাদ।' 'পরিণত হওয়া মানে চুল্লিতে হাঁপরে লাল লোহা / চেহারা বদলিয়ে শুধু কোদাল কুড়ুল হয়ে যায়।' এই নেপথ্য সংবিদের কথা বলতে গিয়ে তাঁর প্রত্যয়ের দৃঢ়তা ভেঙে গেছে, মূল্যবোধে সংশয় দেখা দিয়েছে, জীবনের মধ্যে পচনধরা কীট ঢুকে সব কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে, হৃদয়ের মধ্যে বেড়াল থাবা পেতে বসে আছে, এই সংশয়-হতাশা, জীবনের ব্যর্থতাবোধ তাঁকে এমন এক অনুভূতির অন্তিকে নিয়ে গেছে, যেখানে তিনি হারানো হৃদয়ের বাড়ির বদলে সামান্য আশ্রয়ের জন্যে গভীর পাতালে যেতেও রাজি। 'সিঁড়ি' কবিতায় সিঁড়ি ও জল দুই বিপরীত প্রতীকের কাজ করছে, একদিকে তৃষ্ণা এবং অন্যদিকে বাস্তব জীবনের চক্রান্তময় সিঁড়ি, এই দুই বিরোধীশক্তি কবির মনোভাব ও অনুভূতির চিত্রকল্প ধরে অতি সরল ও স্বচ্ছন্দভাবে ব্যক্ত হয়েছে, এখানে কোনো বিবৃতি নেই, অনভূত শব্দের ও বস্তুর বিন্যাস নেই, জোর করে বুদ্ধির প্রহরায় প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা নেই, লেনিনের ভাষা চুরি করে বলতে পারি, এখানে কবির চৈতন্যই

ইমেজ বা চিত্রকল্প হয়েছে। অথচ নিপুণ তানপ্রধান ছন্দের স্বচ্ছন্দতা ও কথ্যভঙ্গি—এর গতিবেগকে বাড়িয়ে দিয়েছে, কোথাও থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে না। প্রথম চারটি পঙক্তির স্তবকে কোনো অন্ত্যমিল নেই, কিন্তু শেষের স্তবকের অন্ত্যমিল ভাবের নিবিড়তাকে ত্বরান্বিত করছে, আমাদের অস্তিত্বের গভীরে পৌঁছে দিচ্ছে। এই জাতীয় কবিতায় ধ্বনির সংগীত আমাদের মুগ্ধ করে না, চিত্রকল্পের মাধ্যমে চৈতন্যের নেপথ্যসংবাদই এর মূল প্রতিপাদ্য। যদিও জল ও সিঁড়ি ইমেজ দুটি এলিঅটের কবিতায় পরিচিত চিত্রকল্প; ('Under the vapour in the fetid air / Struggling with the devil of the stairs who wears/The decietful face of hope and despair'. 'But sound of water over a rock where the hermit thrush sings in the pine trees.') তবু কবির অনুভূতিতে একান্ত মিশে গেছে এখানে। 'কোথায় জলের শব্দ? এ কেবল সিঁড়ির ধাঁধায় / সবাই হাঁটছি যেন ·· সিঁড়ির চক্রান্তে আছি বিনা মদে সবাই মাতাল, / এ সিঁড়ি ছাড়লে যদি পাওয়া যায় গভীর পাতাল, / তাহলে তাতেই আমি আজো সত্যি খুশি হতে পারি—/ কারণ হারিয়ে গেছে আমাদের হৃদয়ের বাড়ি।' 'বোগনভিলা', 'ইমেজ', 'সিঁড়ি' ও 'পরিণত হওয়া মানে' এই সব কবিতা এখনকার হরপ্রসাদ মিত্রের কবিতা আলোচনায় বিশেষ জরুরি।

হরপ্রসাদ মিত্রের একান্ত ঘনিষ্ঠ যাঁরা তাঁরা ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলেন; 'ওঁর কবিতায় কি আছে? সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ ও অমিয় চক্রবর্তীর বিশ্বানুভূতি।' বলা বাহুল্য, সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ তাঁর কবিতায় নিপুণতা সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সাম্প্রতিক কবিতায় এই নিপুণতা যে তাঁর বক্তব্যের বাহন কতখানি হয়েছে, 'সাঁকো থেকে দেখা' বইটি পড়লে বোঝা যায়। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার ভাব তাঁর ছন্দের কাছে পরাজয় স্বীকার করে, পড়তে বসে তাঁর ছন্দের ভঙ্গিটাই আমাদের কানে বাজে বিশেষ করে, কিন্তু 'তিমিরাভিসার' পার হয়ে তিনি যে কবিতায় জন্ম দিয়েছেন একালে, তাতে তাঁর বক্তব্যই প্রকাশ পাচ্ছে: 'ইচ্ছে মতন বেড়িয়ে বেড়িয়ে শিউলি কুড়িয়ে শুধু দুটো দিন' ষাণ্মাত্রিক ছন্দের বড়ো তালকে এড়িয়েও তাঁর বক্তব্য এখানে স্বচ্ছন্দ, এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে 'আমরা বাঙালি বাস করি সেই', অথবা 'সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ'-এর সঙ্গে। সূক্ষ্মছন্দের নিপুণতা কোনো কবি আয়ত্ত করলে শব্দের যে জাদু পাঠক-

চিত্তে সঞ্চারিত করতে পারা যায়, তা কখনোই দূষ্য নয়। আর একথা স্বীকার্য, অমিয় চক্রবর্তীর ঢঙ, চলতি ছবির মধ্যে একপ্রকার নিপুণতা, চিত্রকল্প, কথ্য-ভাষা, সময়চেতনা, ব্যক্তিগত হৃদয়ের দ্বন্দ্ব বা প্যাশনের তীব্র প্রকাশের পরিবর্তে একটা দার্শনিকসুলভ নির্লিপ্তি ও আসক্তি, অনুজ্ঞাবাচক শব্দের ব্যবহার, 'মনন' ও 'প্রাণন' শব্দের আতিশয্য, বিশ্বানুভূতি প্রায় মিলে যায়। তিনি নিজেও অমিয় চক্রবর্তী সম্বন্ধে বলেছেন : 'তাঁর কবিতায় চলতি ছবির নৈপুণ্য, তাঁর হাতে গদ্যপদ্যের মসৃণ সমাবেশ, হঠাৎ মিলের মাধুর্য, তাঁর সমন্বয়ে বিশ্বাস, শান্ত অন্তর্মুখিতা বা আত্মসচেতন ভাব ; সব থেকে বেশি তাঁর আন্তর্জাতিক মনের বিশেষত্বই বাংলার কবিতানুরাগী পাঠক মহলে সাড়া তুলেছিল তখন।...তাঁর মন চিত্রময় শব্দে শব্দে আশ্চর্য সমাবেশ ঘটিয়ে কবিতায় দৃষ্টি, শ্রুতি, স্পর্শসুখ পর্যন্ত বাজিয়ে তুলতে সিদ্ধহস্ত।' আন্তর্জাতিকতা বাদ দিলে অন্য গুণগুলি কম বেশি হরপ্রসাদ মিত্রের কবিতায় লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে পার্থক্যও প্রচুর। 'পারাপার' 'পালাবদল' কাব্যে প্রতিটি শব্দে অনুভূতি ছবি ও সুরে জমাট বেঁধে আছে, বেদনার কান্না হাওয়ায় রঙিন হয়ে উড়ছে, 'বাসনার ধেয়ান' মেশাতে চাইলেও অস্থির জীবনের চঞ্চলতা তাঁর চিত্তকে অনিকেত মনোভাবের প্রান্তিক সীমানায় নিয়ে গেছে, বুকের মধ্যে শান্তরহস্যের প্রসন্নতা পাবার বেদনা চিত্তকে মুচড়ে মুচড়ে দিচ্ছে, এবং তাঁর কণ্ঠ এতো মৃদু, কিন্তু এতো ঘন, তরতরিয়ে পড়বার উপায় নেই, প্রতিটি শব্দ নূতন বিস্ময় উদ্‌বারিত করে, তিনি যেখানে ইম্‌প্রেশনিস্ট ছবি আঁকেন বিচ্ছিন্ন শব্দ দিয়ে, সেখানেও প্রতিটি শব্দ ওজন করে বসানো, রবীন্দ্রনাথের বিরহসংগীতের মতোই তাঁর সুর করুণ বিলম্বিত, খাদে সূক্ষ্ম কাজে শ্রুতিময়। তাঁর কাব্যে এই বেদনার কান্নায় আমরা চমকে যাই, ভাবতে বাধ্য হই, মিলন বা শান্তি একটা আকাঙ্ক্ষা, যেটা সত্য সেটা এই চিত্তবিদীর্ণকারী বেদনা : 'রুক্ষ বুকে ছুঁই জীবনের হারানো / ফিরে পাবো মৃত্যুর পারানো। শুধু আছে, কথা ধরা গানে নেই, / তাকে পেলে বাড়ি যাবো।' নতুবা : 'এই দূরত্বের সাঁকো, পাথরে বাঁধানো কল্পদেশে / কতদিন পেরিয়েছ মনে ; / একান্ত পৌছনো সেই নিবিড় গোপনে ; / মধ্যে নীল যোজন যোজন কান্না ঢেউ।' 'পারাপার' কবিতায় যাঁকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন, তিনি জীবনমৃত্যুর পারাপারে মিলন ঘটাবেন বলেই প্রত্যাশা করেছেন : 'আনন্দের তরঙ্গের দুঃখঘাত তটে তটে লাগে / বুকে বুকে সংসারের

এই ছোঁওয়া এই দূরে কাঁদা / মিলনের প্রান্তে ঢাকো, নীলের কান্তার তুমি এসো।' এই ঘনিষ্ঠ বেদনার কান্নার জন্যেই অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা আস্বাদ্য এবং পাঠকচিত্তে নিবিড়তা আনে। বলা বাহুল্য, হরপ্রসাদ মিত্রের কবিতায় এই জাতীয় ঘন নিবিড় অনুভূতি, চিত্র, সুর, ছন্দ ও মিল নেই, আঁকড়ে ধরার এমন বেদনা নেই।

হরপ্রসাদ মিত্রের কবিতায় একটা হাল্‌কা হাওয়ার সুর সর্বত্র, এই হাল্‌কা হাওয়ার সুর হাল্‌কা মনোভাবের জন্যে নয়, দার্শনিকসুলভ মনোভাবের জন্যে, অর্থাৎ সঙ্গে সবাই আছে, কিন্তু কোনো কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে নেই, সব কিছু ছাড়িয়ে সুদূরে ভেসে যাচ্ছি। চৈতন্য ও পৃথিবীর সংঘর্ষে তাঁর মনের মধ্যে মৃত্যু অতিক্রান্ত প্রাণের আহ্বান জাগছে : 'ভারতীয় মনে উড়ো হাওয়া লাগে রাতদিনই—' ; নিসর্গপ্রকৃতির মধ্যে আপনার অদ্বৈত অনুভূতি পেয়ে তৃপ্ত হতে চেয়েছেন : 'রাঙা মাটির সবুজ লতায় হলুদ এ ফুল জুড়ে / সময় আমার ঘুমুতে চায় বৈকালী রোদ্দুরে।' 'রাত্রি' তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের মতো বীভৎস ও আদিমরহস্যজাত শুভাশুভবিলুপ্তকারী নয়, ঈশ্বরের সৃষ্ট রাত্রিতে ইচ্ছের ঘুম আসে, তাই দূর দূরান্তের সাধনায় নিজেকে না ভুলিয়ে নিজের মধ্যে নিজেকে রাখতে চেয়েছেন, তাতেই মুক্তির গান লেখা হবে। এঁর কবিতায় প্রকাশিত মনোভাব রবীন্দ্রনাথের 'সৃষ্টি' প্রবন্ধে ও 'সানাই' কবিতায় পাওয়া যায় : 'যে সত্য প্রতিদিন ট্রামের ঘর্ঘরধ্বনি ও দরদামের হট্টগোলের মধ্যে চাপা পড়ে থাকে, খাম্বাজের করুণ রাগিণী আমাদের গলির মোড়ে সেই সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে সুরের অমৃত বর্ষণ করছে।' ছন্দভাঙা অসঙ্গতির মধ্যে সানাই যে ঐক্যমন্ত্র দান করেছে তাতেই রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে : 'নিকটের দুঃখ দ্বন্দ্ব নিকটের অপূর্ণতা তাই / সব ভুলে যাই, / মন যেন ফিরে / সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে / যেথাকার রাত্রিদিন দিনহারা রাতে / পদ্মের কোরকসম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে।' তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'সাঁকো থেকে দেখা' কাব্যে এই সত্যকেই ধরতে চেয়েছেন, একদিকে মৃত্যু, অন্যদিকে লাল নীল গেরুয়া বাদামি রঙের জীবন, এই দুয়ের মাঝখানে ইহলোক-পরলোক-ভেদাভেদ-অনুভবের অনিশ্চিত সাঁকো। এই সাঁকো যোগসূত্রের, এবং এই চিত্রকল্পটির জন্যে হরপ্রসাদ মিত্র সম্ভবত অমিয় চক্রবর্তীর কাছে ঋণী, 'পরিচয়' কবিতার শেষে বলছেন : 'দুই জন্ম দুই থাক, মধ্যে সাঁকো পারাপার কার্মেলতা, দেখ

এক প্রেম পারাবার।' শুধু এখানেই নয়, অন্যত্র চলতি ছবির রূপায়নে, দৃষ্টির প্রত্যয় আনবার ধারণায়, প্রেমপারাবার গড়বার চেষ্টায় ও ইচ্ছায়, রবীন্দ্রনাথ থেকে অমিয় চক্রবর্তী হয়ে হরপ্রসাদ মিত্রের কবিতায় একটি মনোভাব জেগেছে। কিন্তু শব্দনির্বাচন ও রূপনির্মাণে, সুরসৃষ্টিতে, বিচিত্র রঙের' ছবি ফুটিয়ে তোলবার ব্যাপারে অমিয় চক্রবর্তী তাঁতির মতোই শব্দের সুতো অতি যত্নে ধীরে ধীরে বয়ন করেছেন, সেখানে হরপ্রসাদ মিত্র তাঁর কবিতায় শুধু মাত্র একটা চকিত আভাসের সহজ সরল ছবি কথ্য ভাষায় মুহূর্তে তুলে ধরেছেন। হরপ্রসাদের কবিতায় জটিলতা বা কবিচিত্তে দ্বন্দ্বমথিত আত্মিক টেন্‌সন ও তীব্রতা সৃষ্টি-ক্রিয়ার সঙ্গে মেলে নি। হার্বার্ট রিড্‌ হপ্‌কিন্‌সের কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন: 'বিশ্বাস ও সেন্সেবিলিটির মধ্যে দ্বন্দ্ব থেকেই প্রকৃত মৌলিকত্ব ঘটে। দুটোই ব্যক্তিত্বের মধ্যে থাকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়।' এবং এ থেকেই হয়তো তাঁর অর্গানিক ফর্ম তৈরি হয়। সে ক্ষেত্রে হরপ্রসাদের কবিতায় শব্দ, ভাষা, চিত্র ও সামগ্রিক গঠন লিরিকের মতো মৌহূর্তিক ও সরল। সুরের চেয়ে ইমেজ বা স্পষ্ট ছবি তোলাতেই তাঁর প্রবণতা, কথ্যভাষায় চলতি ছবিতে খুশির হাল্‌কা হাওয়া ফোটাতেই তাঁর চেষ্টা, হৃদয়ের গহনগভীর দ্বন্দ্বমথিত অন্ধকার আলোয় মিশ্রবেদনার ছবি নয়। সর্বোপরি, তাঁর অধিকাংশ কবিতায় বেদনার চিত্রের চেয়ে বক্তব্যের চিত্র তুলে ধরেন, সম্ভবত এই কারণেই অনেক পাঠক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও কবিতায় বিরক্ত। বক্তব্যের দিক থেকে তিনি যথার্থই বলেন যে মালিক-অমালিক এবং মধ্যস্বত্ব উপজীবিদল এগুলি যেমন বহিরঙ্গ জীবনের উপাদান, তাকে কাব্যে প্রকাশ করা উচিত, সঙ্গে এই কেনোপনিষদ্‌-এর মধ্যে মানুষের চিরন্তন রহস্য, সত্য ও বেদনাকেও প্রকাশ করা দরকার: 'আমি কেন? তুমি কেন? কেন মৃত্যু আসঙ্গের পাশে? / অশেষ রোদসী কেন? কেন এই রৌদ্র রসাভাসে / দিন যায় দিন যায়, তারপর সন্ধ্যার বাতাসে / ধোঁয়ার নিয়নবিভা ফাল্গুনের মানসিকতায় / ভার, আর চাপ, যার অন্ধকার অন্তর্লীণতাই? / ভাষায় ভাবের মুক্তি,—কোন মুক্তি গতি-হীনতাই? / চেতনার নানাতলে স্রোত চলে বিচিত্ররীতিতে', কিন্তু চেতনার এই বিচিত্র স্রোত কি তাঁর কাব্যের সেন্সিবিলিটিতে ধরা পড়েছে? এবং ভাষাছন্দেরছবির রূপান্তর ও উদ্বর্তন ঘটলেও 'তিমিরাভিসার' থেকে 'আশ্বিনের ফেরিওয়ালা' হয়ে 'সাঁকো থেকে দেখা'য় একটি অভিজ্ঞতার বক্তব্যই অধিকাংশ

স্থানে প্রকাশ করেছেন। তবু, এ কথা স্বীকার করতে হবে, তিরিশ দশক থেকেই আমরা প্যাশনের অন্ধকারে বড়ো জড়িয়ে আছি, বোদ্‌লেয়ার-র‍্যাঁবো-জীবনানন্দে আমাদের চিত্ত হেমন্ত সন্ধ্যার মতো ধূসর অবশ ও ম্লান, রিল্‌কের রূপান্তরে আমাদের জগৎ রূপান্তরিত, সেখানে বস্তুচিত্রের খুশির হাল্‌কা হাওয়া এক প্রকার মুক্তির হাওয়া জাগায়।

'তিমিরাভিসার' কাব্যগ্রন্থে যুগের অন্ধকারের ভেতর দিয়ে মানবতার আলোকে কবি পৌছুতে চাইছেন। মনের প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাঁর যুগের বিরোধ কয়েকটি কবিতায় স্পষ্ট, 'এস্‌প্লানেড' কবিতাটিএর উদাহরণ। 'তিমিরাভিসার' কাব্যগ্রন্থের শেষের দিকে 'চন্দ্রমল্লিকা' 'পৌত্তলিক' 'ভ্রমণ' ও 'চুনিপান্নার কান্না' থেকে সংকলিত কবিতাগুচ্ছকে 'প্রাক্তনী' নাম দিয়েছেন। 'প্রাক্তনী' কবিতাগুলির মধ্যে তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যানুভূতি কখনো রোমান্টিকতায়, কখনো চিত্রবহুলতায় প্রকাশ পেয়েছে, এই চিত্রধর্মী বর্ণনার মধ্যে সহজ খুশির হাল্‌কা আনন্দ ছন্দে ছড়িয়ে পড়েছে। এখানে কবি স্পষ্টতই বলেছেন যে পৃথিবীতে কোনো সর্বশেষ সত্য নেই, দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ, তাই কবি কোনো 'সুষুপ্ত নীল বিরাম' খোঁজেন না, অঞ্জলিভরে কিছু মন আর দেহ নিতে চেয়েছেন, আজকে কবির জীবনের 'সবুজ লতায় ফোটে অসংখ্য রাঙা কুসুম'। কবি নিজেই বলেছেন : 'অপরূপ এই বিশ্বকে দেখি কিছু রূপে, কিছু চিত্রে।' মৌমাছির গুঞ্জনে ও সরোবরের পদ্মের মধ্যে অখণ্ড মিলন প্রত্যাশা করেছেন। বলা চলে, মোটামুটি এই হচ্ছে হরপ্রসাদ মিত্রের কবিতায় জীবনবোধ। এই অনুভূতির সঙ্গে মাঝে মাঝে কদাচিৎ সমর সেনের মতো 'পিশাচী হাসির ধ্বনি বাতাসের স্বরে' শুনতে পেয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দে 'ঘাসের শাড়িতে শালুক ফুলের চুমকি' দেখতে পেয়েছেন, অমিয় চক্রবর্তীর মতো 'জল থইথই মাঠের কিনারে স্বপ্নের মিনার' দেখেছেন। প্রত্যাশা করেছেন : 'দূর বনগন্ধের মতো প্রেম নিভৃত হ্রদের মতো দাম্পত্য, নতুন কিশলয়ের মতো যৌবন।' আবার মানুষের রক্তে চুনির মতো লালরূপ দেখেছেন। এমনি বিচিত্র ছবি দৃশ্যময়।

'তিমিরাভিসার' (১৯৫৪) কবিতার ধ্বংসাত্মক অন্ধকারের মধ্যেও সর্বধারিণী চিন্ময়ীর অপরূপ রূপ দেখেছেন, এই রূপের দর্শনে যখন বাধা এসেছে, তখনি নগরজীবনের প্রতি বিরূপ হয়েছেন, ব্যর্থতা ও হতাশায় মুষড়ে পড়ছেন,

স্বপ্ন ও হতাশার মধ্যে দুলছেন, কিন্তু কবি অন্ধকার ভেদ করে প্রত্যয়ে মনকে বেঁধেছেন, 'নির্বাসন হবে শেষ। তারপর নিত্য হিরণ্ময়!' কিন্তু সর্বোপরি তাঁর বাউল মনের পরিচয়ই প্রকাশ পেয়েছে :

> হে মন! বাউল মন! সেই স্মৃতি রেখেছ কোথায়?
> এ বড়ো অবাক—এই বিপরীত মেলাবার খেলা!
> গড়ায় রঙিন নুড়ি, এই জলে ঠাণ্ডা আরাম।
> জীবনে অঢেল বালু বিছানায় বৃথাই বিলীন।
> কিছুই যায় না বাঁধা কোনোদিন কোনো গিঁঠ দিয়ে
> এমনি হঠাৎ ফেনা মাঝে মাঝে পড়ে উপচিয়ে।

এখানেই হরপ্রসাদ মিত্রের সমগ্র জীবনদর্শন, বিপরীত মেলাবার খেলায় অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে একাত্ম, কোনো কিছুর মধ্যে বন্ধন অস্বীকারে বাউল মনে উধাও, ফেনা উপচিয়ে পড়ার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের 'সানাই' এর সুরে নিবিষ্ট। এখানে সংস্কৃতময় শব্দে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছাকাছি, যতীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গে আকৃষ্ট, ('নটরাজ, শঠরাজ হেই ভগবান, তোমাতে সমর্পণ। সে যে কী আরাম?') সত্যেন্দ্রনাথের মতো জোনাকি চাঁচরের হাল্‌কা ছন্দে ভাসমান; ('ওগো ছোটো প্রাণ একি অগণন ক্ষণরঞ্জন আলো বাতাসে')। সব ছন্দেই তাঁর নিপুণত্ব, কিন্তু ছন্দ উচ্চকিত এবং জড়েজীবে সঞ্জীবমন্ত্রের ও চির সত্যের যাত্রী।

'আশ্বিনের ফেরিওলা' (১৯৬৩) কাব্যগ্রন্থে নূতন ছন্দে ভাষায় ও রূপে ওপরের বক্তব্যই প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতির নিত্য খুশির মধ্যে তাঁর চিত্ত উধাও, দুস্তর চিন্তা ও অবসাদ বর্জন করে 'স্বপ্নে সত্যে মিশিয়ে মনের বিনা ভাষার ভাব'-এর মধ্যে ডুবে থাকতে চেয়েছেন, চলতি ছবির মধ্যে চোখের তৃপ্তি খুঁজেছেন, রবীন্দ্রনাথের মতোই অদৃশ্য সুরের হাতছানিতে দিগন্তে মিশিয়ে যেতে চাইছেন : 'অঢেল নীলের কোলে শাদা মেঘের আঁশতোলা এই উজ্জ্বল শূন্যতায় পৌঁছে, শিকারের নেশা কাটলো বুঝি।' মাঝে মাঝে সময়ের চিন্তা তাঁকে বিব্রত করছে, সত্যেন্দ্রনাথের মতো সাময়িক কবিতা রচনার প্রেরণা দিয়েছে। চল্‌তি ছবির চলমান দৃশ্যগুলিই এ কাব্যের আস্বাদ্য বস্তু, চলতি ছবির মধ্যেই তাঁর জীবনদর্শন ফুটিয়ে তুলেছেন : 'আমরা আছি এইখানে এই নন্দ

ঘোষের গলিতে / গ্যাসের খুঁটি, শ্যাওলা, কুকুর, আধমরাদের কলকাতায় / শিউলি শিশির, সানাই এবং কুমোরটুলির জয়ঢাকে/ চোখে-চোখে-চোখে-চোখে সর্বজনীন প্রতিমা !' 'জেটিতে জলন্ত লাল, আকাশেতে তারা, এ নৌকায় আমি আছি, ও নৌকায় কারা ? ভাঙা ঘাটে অন্যকাল, আচ্ছন্ন অতীত। পাশেই হাজার আলো, আলোকিত আলমবাজার।' এমনিভাবেই দেশকাল সমগ্র মানুষ ও বিশ্বকে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে এই কথাটাই বাজছে : 'এ শাদা গল্পের কিছুই মানে নেই, হাল্‌কা ঢেউটাই গ্রাহ্য'— ।

বলা বাহুল্য, এই হাল্‌কা ঢেউ 'সাঁকো থেকে দেখা' (১৯৬৮) বইয়ে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছেন কিছু কিছু কবিতায়, জীবনের মুখোমুখি হয়েছেন, সেখানে সিঁড়ি ও জল তাঁকে ধাঁধায় ঘুরিয়ে মেরেছে ; জীবনের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার বিরোধ দেখা দিয়েছে, সংশয় দেখা দিয়েছে, 'নিজের মধ্যেই নিজেই ভারী সংশয়ী আজকাল' ; জীবনবোধের মানে হারিয়ে যাচ্ছে, যৌবন হারিয়ে কবি আজ অতীতযৌবনের জন্য আর্ত, 'আমিও উত্তাপ চাই, ছেঁড়া কথা উড়েছে অনেক।' তাই মৃত্তিকার কাছেই ফিরে এসেছেন। এই অনুভূতিগুলি হরপ্রসাদ মিত্রের কবিতায় নতুন, এবং এর সঙ্গে পূর্বের চকিত আভাসের মধ্যে দিগন্ত উদ্‌ভাস, দুই বিপরীতের মধ্যে মিলনের প্রত্যাশা, সময়চেতনা, হাল্‌কা খুশির রূপময় জগতে ও চলতি ছবির মধ্যে চোখ ও মনের আরাম অব্যাহত আছে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো এখানে হরপ্রসাদ মিত্রের ভাষা ও ছন্দ সহজগতিতে এগিয়েছে, প্রত্যেকটি কবিতাই এখানে মিথের মতো পরিণামী ; কথ্যভাষা, চলতি ছবি, বক্তব্য ছন্দের কারসাজিকে লুকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে, এবং কিছু কিছু চিত্রকল্প মনের মধ্যে মারাত্মকভাবে দাগ কাটে : 'স্রোতের নখের দাগে বিচিত্র খচিত চরে আলো' ; 'সবুজ কাঁকুড়, কুমড়ো, ঠাণ্ডা শশা, ঘন লাল শাক রূপের সম্ভারময় পরিপূর্ণ গন্ধের বৈশাখ' ; 'আকাশ যেন ওল্টানো ডিশ আনন্দসম্মত।' কিন্তু নিজের মনের কাছে অমিয় চক্রবর্তীর মতোই তাঁর সেই একাত্ম গাঢ় প্রার্থনা :

> ঢেউ লাগুক, ঢেউ লাগুক, সময় জলে-জলে
> দূরে টানুক, তীর ধনুক ইচ্ছে আর কাজ ?
> দুয়ে মিলুক তীর ধনুক হোক দুয়ের প্রেম।

এই দুই জীবনের মাঝখানে দ্বন্দ্বের সাঁকোতে দাঁড়িয়ে জীবনকে দেখেছেন বলেই

এখানকার কিছু কিছু কবিতায় ব্যক্তিত্বের টেন্‌সন চোখে পড়ে, তাতেই অনেক কবিতা স্বাদিষ্ট। কারণ কবির অন্তর্লোকের দ্বন্দ্ব ও আন্তরিক অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে।

১৯৭০ মার্চ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

'সঙ্কেত' 'সঙ্কেত' বলে আমরা চেঁচাই কেন? সঙ্কেতের মধ্যে প্রকৃত 'সেন্স্-পারসেপ্‌শন্' রয়েছে এবং আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে আদিম উপাদান হিসেবে এই 'সেন্স্-পারসেপ্‌শন্' সক্রিয়। সুতরাং চিত্রকল্প, আইডিয়া ও ইমোশনের সাহায্যে আমাদের সত্তার সামগ্রিকতা এই সঙ্কেতের মধ্যে পাই, 'সেন্সের' চঞ্চলতা ও 'পারসেপ্‌শনের' আপাতস্থিরতা দুটোই এর মধ্যে রয়েছে। কবিদের ক্ষেত্রে এই সঙ্কেত হোয়াইট্‌হেডের ভাষায় অভিজ্ঞতার আদিম উপাদান, তাই এর মধ্যে অসংখ্য অর্থ জড়িয়ে থাকে এবং বাস্তব থেকে মনের প্রক্রিয়ায় কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে যায়। প্রথম স্তরে বাস্তব পরিবেশের ভেতরে শুধু একটা সম্পর্ক খোঁজে কবিমন, বুদ্ধির সাহায্যে তুলনাউপমা সম্পর্ক-স্থাপিত হচ্ছে, ভাষার মধ্যেও এই বুদ্ধি বিদ্যমান। দ্বিতীয় স্তরে এই বাস্তবতা অনেকটা বর্জিত, আমাদের সামগ্রিকতাকে ধরবার চেষ্টা করে, কোল্‌রিজের কল্পনার মতো সমন্বয়কারী শক্তির আবির্ভাব ঘটে, কর্তা ও কর্ম এক হয়ে যেতে চায়, ভাষার মধ্যে জটিল উপমাত্মক চিত্রকল্পের উদয় হয়, নারীর মতো 'মিথ্' আসে এবং সর্বশেষ স্তরে জটিল উপমাত্মক চিত্রকল্পেরও বিলয় ঘটে, সংস্কৃতে যাকে কবিদৃষ্টি বলে সেই কবিদৃষ্টির অরুণোদয় ঘটে, কিছুই বর্জিত হয় না, সমস্ত কিছু মিলে মনের মধ্যে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়, এই অবস্থাতেই সঙ্কেতের উদ্ভাসন, একাত্মতার উপলব্ধি গভীরতর হয়ে ওঠে, এই একাত্মতা কবির ব্যক্তিগত সম্পত্তি হলেও সর্বজনীন বলে নির্বিশেষ, কবিব্যক্তিত্বহীন। সুতরাং এই সঙ্কেত চিত্রকল্প বটে, কিন্তু চিত্রকল্পের চেয়েও এর অনুষঙ্গ আরো গভীর ও ব্যাপক বলেই এর মধ্যে 'হ্যাঁ' ও 'না' ও বহুবিধ অর্থ ফুলের সতেজ পরাগের মতো মিশে থাকে, এই অর্থ কোনো সম্পর্কে, তুলনায়, আইডিয়ায় ও ভাবনায় নির্ভরশীল নয়, কবিতার মধ্যে ব্যক্তিসত্তার মতো স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। সুতরাং চিত্রকল্প যখন আরো একক গভীরতর স্তরে গিয়ে পৌঁছয় তখন সে সঙ্কেতের

উদ্যানে স্বতন্ত্র, কিন্তু সর্বজনীন সত্তায় একাত্ম অনুভূতিতে বিকশিত হয়ে ওঠে।

এলিঅট রোমান্টিকদের কাঁচা উচ্ছ্বাসকে সহ্য করতে পারেন নি বলে প্রেরণা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, কিন্তু প্রেরণাকে অস্বীকার করেন নি, ভালেরিও করেন নি, করলে ভালেরি 'সমুদ্রতীরে সমাধি' রচনা করতে পারতেন না। প্রেরণা কবিতা রচনার এক অপরিহার্য উপাদান, প্রেরণার বশে কবি এক মুহূর্তে বিশ্বজগৎকে ধরে ফেলেন, কালের সীমা হারিয়ে সর্বকালে গিয়ে পৌঁছন, অতীতভবিষ্যৎ এক হয়ে যায় এবং এই অবস্থাতেই কবিসত্তা ব্যাপ্ত হয়, অভূতপূর্ব সামগ্রিকতা তাঁর চৈতন্য ও সত্তাকে অধিকার করে, তখন যে অনুভূতি হয়, তা এলিঅটের ভাষায় বলা চলে : And all is always now. রোমান্টিকদের সার্থক কবিতায় এবং রবীন্দ্রনাথের গানে ও কিছু কবিতায় অসীমকালের সর্বব্যাপী চিত্তস্পন্দন ধরা পড়েছে, একালের প্রতীকী কবিতায় তারই গাঢ় অনুসরণ।

নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতায় জটিলতা আপাত চোখে পড়ে না, তিনি গদ্যের কথ্য ভাষায়, স্পষ্ট ছবিতে, গোপন সুরে, তবুতরিয়ে পরিণামমুখী একটি বক্তব্য বা অনুভূতি প্রকাশ করেন বলে মনে হয়, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় মৌহূর্তিক প্রেরণায় তিনি এমন একস্তরে গিয়ে পৌঁছন যেখানে শব্দ তার অভিধা হারিয়ে বহু অর্থে পর্যবসিত হয়ে ওঠে, বেদনায় রঙিন ছবির মতো দুলতে থাকে, সঙ্কেতের ব্যঞ্জনায় রহস্যময় হয়ে ওঠে। আপাত অজটিলতা পূরণ করেছে এই সঙ্কেত, তাই তাঁর কবিতা পড়বার পরও হৃদয়ের সেতারে ঝন্‌ঝনানির রেশ লেগে থাকে। ভাষা-ছন্দ-চিত্রকল্প-বক্তব্য-বিষয়নির্বাচনের দিক থেকে তাঁর কবিতায় অভিনবত্বের চমক নেই, কিন্তু বেদনার আন্তরিকতায় পাঠককে তিনি আটকে রাখেন ; এটা যে পারেন, তার প্রধান কারণই হলো শব্দকে তিনি সঙ্কেতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন। তিনি কবিতা রচনার প্রথম থেকেই সাম্প্রতিক ঘটনায় সংবেদনশীল, কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনা যখন সঙ্কেতে বিভাসিত হয়, তখন তা নিত্যকালের হয়ে ওঠে, 'গ্রন্থিমোচন' তার নজির। এবং প্রেরণার বশেই নীরেন্দ্র চক্রবর্তী বলতে পারেন : 'একগলা রোদ্দুরে আমি গা ডুবিয়ে কোথাও চলেছি / মাঝে মাঝে এই রকম মনে হয়।' নতুবা, রবীন্দ্রনাথের সদর স্ট্রিটের রাস্তার জনস্রোত দেখে যে অনুভূতিতে আবদ্ধ

হয়েছিলেন, সেই অনুভূতিতেই বলেন তিনি : 'একেকটা দিন সকাল থেকেই/আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন সব ওলটপালট হয়ে যায়/নিজেকে একটু অন্য রকম লাগে।'

নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর কৃতিত্ব তিনি পরিবর্তনশীল এবং সংবেদনশীল, এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন : 'বুকের মধ্যে ভীষণ কৌতূহল যে আমার।' এই কৌতূহলের জন্যেই তাঁর আকাঙ্ক্ষা : 'নিজেকে চব্বিশ ঘণ্টা জাগিয়ে রাখতে চাই যন্ত্রণায় / অপমানে, অস্বীকারে জ্বলতে জ্বলতে জেগে থাকতে চাই ; / জেগে থাকি।' এই যন্ত্রণাবিদ্ধ কবি তাই দ্বন্দ্বমথিত, তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে গতি ও টেন্‌সন নিত্য বর্তমান, তাই তিনি প্রত্যাশিত বাড়ি খুঁজতে গিয়ে বার-বার এগিয়ে-পিছিয়ে আসেন, ভালোবাসার লোহার বেড়ি এবং দিগ্বিদিকে ছড়াবার আকুলতা দুই-ই তাঁকে জড়িয়ে আছে, স্বপ্নস্মৃতিরাত্রির সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত, এই সংগ্রামশীলতার মধ্যেই তাঁর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠছে। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও এই বিরোধ থেকে এসেছে, একদিকে স্মৃতি এবং অন্যদিকে বাস্তব জীবনের অগ্নির বলয়, দুই মিলে কিংবা দুই থেকেই গল্পগানচিত্রমালা, কবি আগুন ও জল দুয়ের মধ্যেই জীবনকে দেখছেন শব্দের খেলায়। তার ফলেই তাঁর সীমা অনবরত বাড়ছে।

বহির্জীবনের নানান দৃশ্য চিত্তলোকে বিভিন্ন চিত্র ফুটিয়ে তুলছে : 'আকাশে আলোর বন্যা ছড়িয়ে যায়, / বাতাসে বটের পাতা কেঁপে ওঠে, / ছায়াকে রৌদ্র এসে জড়াতে চায়, / নারিকেল দারুণ দুঃখে মাথা কোটে / কখনো আগুন জ্বলে রাজপথে, আর / কখনো রাত্রি ঢাকে যন্ত্রণা তার /' এমনি হাজার দৃশ্য কবির মন কুড়িয়ে নেয়, এই হাজার দৃশ্যের সঙ্গে জনান্তিকে 'চিত্রা' কবিতার মতোই নিজের মুখোমুখি বা অন্তরের গভীরে অচঞ্চল ধ্রুবের দিকে তাঁর লক্ষ্য স্থির রাখতে চেয়েছেন। বাইরের জগতে তিনি নিজেকে মেলাতে চাইছেন, পারছেন না, যাকে ডাকছেন, তাকে পাচ্ছেন না ; বরং অন্যদের ব্যস্ত ও বিরক্ত করে রাত্রির অন্ধকারে একাকী ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছেন, অন্যদের মিলনে বাধা সৃষ্টি করেছেন, বাড়ির আকাঙ্ক্ষা ও দৃশ্য চোখে ভাসছে, কিন্তু বাড়ি যেতে পারছেন না, সর্বদুঃখহর ঈশ্বরও স্বেচ্ছায় তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন, সমস্ত কিছু কাচের বাসনের মতো ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙে যাচ্ছে, পুরনো মূল্যবোধগুলিকে রক্ষা করতে পারছেন না বলে তাঁর তীব্র দুঃখ :

'আমার চোখের সামনেই বাগানগুলি / কাঁটালতায় ছেয়ে গেল / বিষের ধোঁয়ায় অদৃশ্য হল পাহাড়। / ক্লান্তি অপনোদনের জন্য বারবার যে স্রোতস্বিনীর কোলে আমি ঝাঁপ দিয়েছি, / আমার চোখের সামনেই বিষ্ঠা নিক্ষিপ্ত হল তার তরঙ্গে।'...'কুকুপুত্রেরা যখন উরু দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তখনও তোমাদের রক্ষা করবার মত সামর্থ্য আমি পাই না।' আধুনিক যুগটা কবির কাছে মুষলপর্ব, তাই এর চারদিকে ধ্বংস এবং বিসদৃশ নতুন রঙ্গ : 'একটি কুকুর-ছানা সিংহের গর্জনে দশদিগন্ত ফাটাতে সহসা উৎসুক।' আমাদের এ সভ্যতার সন্তানকে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবার পরিকল্পনার স্লোগান অনুযায়ী 'অবাঞ্ছিত ফল' ভেবেছি বলেই অবজ্ঞাত, কিন্তু লালসাজাত চতুর্থ সন্তান প্রতিশোধে সমস্ত ধ্বংস আনছে : 'যে পৃথিবী তোমাকে চায় নি তুমিও অক্লেশে তাকে জাহান্নমে ঠেলে দিতে পারো।' তাই এই সভ্যতার মধ্যে কবি অস্বস্তি-বোধ করছেন, মনে করছেন ভুল পথে ও ভুল ঠিকানায় এসেছেন, এই কারণে সভ্যতার জন্মলগ্নের নদীর ধারে যেতে পারছেন না, বিশ্বপৃথিবী যে প্রার্থনায় উৎকর্ণ, সেই প্রার্থনায় কণ্ঠ মেলাতে পারছেন না, পৃথিবীর সব চাইতে মৌলিক ও বিশুদ্ধ সংগীতের জন্মদাতা সেই স্তব্ধতার জঠরে যেতে, ফিরতে চাইলেও সমগ্র পৃথিবী আজ হো হো করে হেসে উঠবে। এখান থেকেই কবির কাঙ্ক্ষিত জগতের দৃশ্য ও চিত্র ভেসে ওঠে, অন্তরের গভীরে ধ্রুবলক্ষ্য উদ্‌ভাসিত হয়, যেখানে তিনি শৈশবের কাছে ফিরে যেতে চান, দেশকে পান চোখে ও হৃদয়ে, 'মাথার মধ্যে দৃশ্য, নানা স্মৃতির মধ্যে অজস্র ফুল, তার সুবাসেই দেশকে পাচ্ছি বুকের কাছে।' প্রচলিত ঈশ্বর সাধনায় নয়, ভিখিরি মায়ের সম্পূর্ণ উলঙ্গ শিশুর মধ্যেই কবি কলকাতার যিশুকে দেখতে পেয়েছেন, যে শিশু টালমাটাল পায়ে জনতার আর্তনাদ, অসহিষ্ণু ড্রাইভারের দাঁতের ঘস্‌টানির ভ্রূক্ষেপ অগ্রাহ্য করে মূর্ত মানবতার মতো বিশ্বকে দু'হাতে পাবার জন্যে মুহূর্তে চলমান জীবন থামিয়ে দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। এই শিশুর সরলতা ও মানবতাই কবির আকাঙ্ক্ষা। 'উলঙ্গ রাজা' কবিতায়ও এই শিশু এসেছে। এই সব জাগতিক প্রশ্নের সঙ্গে প্রেমের তীব্র বেদনা ও গভীর প্রত্যাশা কয়েকটি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।

জল ('পাথর ফাটিয়ে নামে জল'), 'রাস্তার দুধারে ছিটকে সরে যাচ্ছে আলিঙ্গনে বদ্ধ নরনারী' বাড়ি ('রাস্তা পেরোলেই বাড়ি, কিন্তু বাড়ি তখনো

অনেক দূর') 'নদীটির অন্য পার', (হয়তো মৃত্যু), 'উঠোনে কাকের ছায়া, দূরে দীর্ঘ স্থপুরির সারি', 'ছাতের আলসে', 'জল ও অনল' নীরেন্দ্র চক্রচবর্তীর কবিতায় প্রতীকের মতো অনবরত কাজ করছে। 'এস্‌পার ওস্‌পার' কবিতাটি রূপক, ট্রেনটা মনুষ্য জীবনের যাত্রা, হঠাৎ-নামা অকাল মৃত্যু, 'জায়গা যখন পেয়ে গেছি' অর্থাৎ বেঁচে যখন গেছি, তখন সব দেখে ছাড়বো। সংক্ষিপ্ত কবিতা তাই সঙ্কেতের গুণে হৃদয়বিদারী, 'ঈশ্বর ঈশ্বর' দ্রষ্টব্য। তাঁর আকাঙ্ক্ষার জগৎ হয়তো গাঢ় রোমান্টিকতার জগৎ, যে-জগতের সঙ্গে কিছু কিছু সাদৃশ্য স্থনীল ও শক্তির মধ্যে আছে। 'কলকাতার যীশু' নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিখ্যাতিকে স্বকীয়তার সত্য মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

অব্যবহিত পূর্বের রচনা 'নক্ষত্রজয়ের জন্যে' কাব্যগ্রন্থে রক্তের বিপরীত-গতিতে মজবুত শব্দে হুশ করে তিনি নক্ষত্রলোকে উঠতে চেয়েছেন, শ্মশানে ফুল ফোটাতে চেয়েছেন, রোমান্টিকদের মতো বলেছেন : 'যে শরীর কোথাও দেখি নি তার নতজানু অর্পিত ভঙ্গিমা, যে ওষ্ঠ কোথাও নেই তার নিমন্ত্রণ, যে কঙ্কণ কোথাও ছিল না তার রিনিঠিনি, যে আতর কোথাও রাখি নি তার মাতাল স্থবাস সব দেখা যায়।' এর জন্যেই প্রার্থনা করেছেন, 'বলো হে যাত্রা করি অন্য দেশে।' এখানেও আশ্রয়হীনতা ('যেখানে পা ফেলবি তোর মনে হবে বিদেশে আছিস'), একগলা শূন্যতা, ব্যর্থতাবোধ আছে। জীবন সম্বন্ধে একটা জ্ঞান কাজ করছে, যাকে wisdom বলা চলে, 'ধ্রুব জ্ঞানে কোনো কিছুকে বুকের মধ্যে না-নেওয়া আর রোজ কিছুকে বাইরে এনে পুড়িয়ে দেওয়া তাকেও বলে ভাল থাকা' ; পারস্পরিক নেওয়া-দেওয়ার মধ্যেই জীবন পূর্ণ হয়ে উঠছে, প্রথম কবিতায় বলেছিলেন, 'কিছুই দেব না', শেষ কবিতায় বলেছেন 'কিছুটা দেব যেমন বাকিটা তেমনি আবার ছিনিয়ে নেব।' এমনি করে বৃহত্তর জীবনের দিকে এগিয়েছেন, এখানেও সঙ্কেত আমাদের চিত্তের গভীরে বিদ্ধ হয় : 'বসন্তযামিনীতে ভোমরারা ডাকাত তাদের মুখে রক্ত, কারণ সন্ন্যাসী অর্থাৎ পবিত্রতাকে হত্যা করেছে।' ভবিষ্যতের প্রতি আশা সক্রিয়। ('ধ্বংসস্তূপ' দ্রঃ) অর্থাৎ বক্তব্যের দিক থেকে এই দুই কাব্যের মধ্যে হয়তো নতুনত্ব কিছু নেই ; কিন্তু শব্দনির্মাণে এই দুই কাব্যের পার্থক্য প্রচুর, তাতে 'কলকাতার যীশু' 'নক্ষত্র জয়ের জন্যে' কাব্য থেকে অনেক সংহত,

পরিণত, গভীর, উচ্ছ্বাসবিহীন। 'নক্ষত্রজয়ের জন্যে' কাব্যে ভাষা উচ্ছল, উচ্ছ্বাসময়, ব্যঙ্গকৌতুকে মেশা, বড়ো তুচ্ছ শব্দে প্রাত্যহিক, কিন্তু 'কলকাতার যীশু' কাব্যে ভাষার উচ্ছ্বাসও বাহুল্যবর্জিত, নিটোল, সঙ্কেতে গভীর। ব্যঙ্গের কোনো ঝাঁজ নেই, 'মহাশয়' ও 'হা রে' বলার মুদ্রাদোষ নেই। 'নক্ষত্র জয়ের জন্যে' কাব্য পড়ে মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন বারবার জাগে, ভাষা চিত্র অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রভাবিত করেছেন, না সুনীলের ছাপ পড়েছে নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর ওপর? সুনীলের 'আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি' ও 'বন্দী, জেগে আছো' কাব্যের বহু পঙক্তির সঙ্গে 'নক্ষত্র জয়ের জন্যে'র পঙক্তি মিলে যায়: 'আচমনের তুল্য কোনো সুলক্ষণ শব্দ আমি এখনো পাই নি' 'একদা দুর্দান্ত কিন্তু রকবাজের হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে-যাওয়া সমুন্নত সুন্দর ললাট বহু শব্দ ইদানীং হাড্ডিসার রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিড়ি ফোঁকে', 'প্রশংসা তুমি সংযত হও, নিন্দা তুমি মুখ সামলে কথা বলো, এখন ঘরে ফেরার সময়, গাভীর গলায় ঘণ্টা বাজছে অদূরে।' এসব ভঙ্গির সঙ্গে সুনীলের পার্থক্য সামান্যই। কিন্তু 'কলকাতার যীশু' কাব্যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর স্বকীয়তা অবিসংবাদিত। তাহলে সুনীলের সঙ্গে মিলটা কি তাঁর পরিবর্তনশীলতার লক্ষণ, যা তাঁর 'অন্ধকার বারান্দা'য় 'দৃশ্যের বাহিরে' কবিতার মধ্যেও আছে? 'সিতাংশু আমাকে তুই যতো কিছু বলতে চাস্ বল।' 'নীল নির্জনের' সঞ্চয়ের রোমান্টিকতা 'অন্ধকার বারন্দার' নৈরাশ্যময় জীবন উপলব্ধি পেরিয়ে বৃহত্তর জীবনের সংবেদনার জন্যেই নীরেন্দ্র চক্রবর্তী স্মরণীয় হবেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত 'উলঙ্গ রাজা' কাব্যগ্রন্থে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কাব্য-ধারণায় 'কলকাতার যীশু' কবিতার ধারাকেই বয়ে নিয়ে চলেছেন। তবে সাম্প্রতিক ঘটনার প্রতি এই বইয়ে তাঁর ঝোঁক অত্যধিক বলে কবিতাগুলির অনেকাংশ গভীরে পৌঁছুতে পারছে না। বিষয়বস্তুর দিক থেকে নতুন ভাবনা হচ্ছে বয়সের চিন্তা, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দিনগুলি নতমুখে রাত্রির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বেদনা বিষাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আগের মতো মুক্ত হতে পারছেন না। আগের মতোই জগৎজীবন সম্পর্কে কবির তীব্র বেদনাবোধ:

কবিতা : চিত্রিত ছায়া

এই বিষণ্ণ বিকেলে হৃদ্‌পিণ্ডে আমার
বিপন্নতা ঝন্‌কে ওঠে।
সকল পথে ছড়িয়ে আছে কাচের গুঁড়ো,
ভেঙে পড়ছে সমস্ত মন্দিরের চুড়ো,
রক্ত ঝরছে সমস্ত মৌমাছির ঠোঁটে।
চিত্তে আমার অনিচ্ছা, হৃদ্‌পিণ্ডে আমার
বিপন্নতা ঝন্‌কে ওঠে।

কবিতাগুলি এতো দ্রুত লেখা বলেই এবং তর্‌তরিয়ে বলার ফলেই আগের গভীরতর সঙ্কেতে আমরা স্থির হতে পারি না। তবে রচনা সৌকর্যের জন্যে সুখপাঠ্য, এতে সন্দেহ নেই।

দক্ষিণারঞ্জন বসু

কবির পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'জনবাণী' পত্রিকায় দিনেশ দাস এঁর সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেছিলেন, কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু হলো দক্ষিণারঞ্জন বসুর জীবন ও সাহিত্য একাত্ম, দুইয়ে মিলেই একটি ঝর্না ধারা এবং দক্ষিণাবাবু ব্যক্তিগতভাবে কথা প্রসঙ্গে প্রায়ই বলেন যে কবিতা হচ্ছে হৃদয়ে সঞ্চারিত হবার একমাত্র উপায়, এবং সেই উপায় যতদূর সম্ভব সহজতম হওয়া উচিত। এই দুটি বক্তব্যকে একত্র করলে দক্ষিণাবাবুর কবিতার মূল বিষয়, তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভালোমন্দ সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারা যাবে। অনেকের কাছেই তাঁর কবিতা নিটোল নয়, বক্তব্য ও মতবাদে ভরপুর, হঠাৎ আবেগে-স্ফূর্ত, ছন্দস্পন্দের ধার ধারে না, কথা বলার প্রসঙ্গে দু' একটা ছবি শুধু আসে। একদিক থেকে একথা সত্য, সত্য এই কারণে যে তিনি সাংবাদিক, কর্মী, দেশপ্রেমিক। সাংবাদিকরূপে যে তথ্য সংবাদে প্রকাশ করেন, আবেগমুহূর্তে তাকেই স্পন্দনে দুলিয়ে দিতে চান, মূল তথ্য ও বক্তব্য একই থেকে যায়, কারণ যে ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন জীবনের ক্ষেত্রে, সেই জীবনের ঘটনাকেই সোজাসুজি কাব্যে প্রকাশ করেন। সোজাসুজি প্রকাশ করবার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত মতবাদ ও বিশ্বাস কাজ করছে। কর্মী দেশপ্রেমিক যেমন আপনার কর্মকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান সহজ সরলভাবে, তেমনি দক্ষিণাবাবু ও তাঁর বক্তব্যকে সহজতম উপায়ে পাঠকের হৃদয়ের দুয়ারে পৌঁছে দিতে চান।

তাই তাঁর কাব্যে দৃঢ়তম ও সূক্ষ্মতম সঙ্কেত, অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনা, শব্দের নিহিত সংগীতের বেদনা, ছন্দের গান, নানা দেশ বিদেশের উল্লেখ ও নির্দেশ নেই। কবিতা তাঁর কাছে বক্তব্য বা অনুভূতির বাহন, স্বতন্ত্র সৃষ্টিক্রিয়া নয়। মনে হয়, কবিতাকে যাঁরা কোনো কিছুর হাতিয়ার করতে চান, তাঁদের কবিতা সহজ সরল স্পষ্ট বক্তব্যপ্রধান উচ্চতম স্বরমূলক হবেই। বিদেশেও এলিঅটের প্রতিক্রিয়ায় এই জাতীয় বক্তব্যপ্রধান কাব্যের প্রবক্তা ও স্রষ্টা দেখা দিয়েছে, এঁদের মূল কথা হলো এই যে কবিতায় কবির সঙ্গে বৃহত্তর পাঠকের সংযোগ ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত, তা না হলে সাহিত্যও বাঁচবে না, সমাজও বাঁচবে না। এঁদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলা যায়, তবে এঁদের বক্তব্য এই ; দক্ষিণাবাবুও তাঁদের দলভুক্ত। এই ধারা কবিতাকে অনেক বিনষ্ট করেছে।

কলকাতার দুর্দান্ত ভিড় ও নোংরায় প্রাইভেট বাসে উঠলে হঠাৎ জানলার ওপরে নীল কাচের মধ্য দিয়ে কলকাতা শহরের রাস্তাঘাট হঠাৎ চোখে অদ্ভুত লাগে। সব ঠিকই আছে, শুধু একটা আবরণ, তাতেই একটা রূপান্তর। দক্ষিণারঞ্জনের কবিতাও সেই রকম সংবাদের বক্তব্য ও বাস্তব তথ্য একই আছে, উষ্ণতার তাপে বক্তব্যে সামান্য আবরণ পড়েছে, 'এখনো তাই' কবিতাটি তারই প্রমাণ দিচ্ছে। তাঁর কবিতার মূল সুর সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন : 'আমার কবিতা সূর্যবন্দনারই মন্ত্র,/সূর্যই যখন জীবনের জীবন্ত প্রতীক/আমার কবিতা জীবনবন্দনারও মন্ত্র।' এই কারণেই দক্ষিণারঞ্জনবাবুর কবিতায় সূর্য ও রোদের ছবি এবং এই দুটি শব্দের পুনরাবৃত্তি বারংবার দেখা যায়। 'আরও সূর্যের কাছে' (১৯৬১) কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত লেখা। এই কবিতাগুলির মধ্যে ভাবে ও ভাষায় রাবীন্দ্রিকতা লক্ষণীয়, কিন্তু এই রাবীন্দ্রিকতা প্রেমবোধে নয়, অসীম মুক্তির আনন্দবোধে। অথচ এখানেই তিনি ঘোষণা করেছেন ; 'এখন বিদায় দাও,/তোমার চোখের মায়াজাল মোরে বাঁধিয়াছে এতকাল,/কিন্তু তারও চেয়ে প্রচণ্ডতর জনতার আহ্বান।' 'প্রেয়সীর বাহুমুক্ত জাগরূক আত্মশক্তিবোধ।' তাই কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়, এই পরিচয়কে সোজাসুজি গদ্যের অনাবৃত ভাষায় ব্যক্ত করতে চেয়েছেন : 'সংকীর্ণ গলিতে বাস, উপবাসে কাটে বহু রাতি :/দুঃসহ দারিদ্র্য তবু জীবনের প্রাচুর্য প্রখর।' শত লাঞ্ছনা নিপীড়ন গ্লানি হতাশার মধ্যেও সজোরে আত্মবোধের দীপ্ত আশাবাদ প্রচার করতে চাইছেন

কবিতায়, এই আশাবাদের তাঁর কবিতাকে মানবমূল্যে বারংবার ভূষিত করেছে। আশাবাদের পাশেই রয়েছে তাঁর সময়চেতনা, স্বদেশপ্রেম, বঙ্গ-বিচ্ছেদজনিত বেদনা, বিচিত্র দেশভ্রমণের ফলে বিভিন্ন রূপদৃশ্য, ঐতিহ্যচিন্তা, গতিচঞ্চলতা। ঐতিহ্যের প্রেরণায়ই তিনি লিখেছেন : 'রূপ ধন মান/সম্রাট সাম্রাজ্য তুচ্ছ/ঋষিবাক্য অমোঘ নির্দেশ।' গতিচঞ্চলতা ও আশার আকুলতাই তাঁকে এই চিত্রকল্প রচনায় প্ররোচিত করেছে : 'আলোর নৌকায় চড়ে রাত্রি পারাপার।' গদ্যভঙ্গির মধ্যে মাঝে মাঝে দুয়েকটি এই ব্যাপক চিত্রকল্প গদ্যের জগৎকে ধাক্কা দেয়। এই বইয়ে সাধুচলিত ভাষার মিশ্রণ রয়েছে, ভাষা বলিষ্ঠ বেগ পায়নি, এবং বিভিন্ন প্যাটার্ন আনতে ব্যস্ত। কিন্তু বিভিন্ন সনেটে তাঁর প্রবণতা প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যের কবিতাগুলির সংগঠনজাত ত্রুটি ঢেকে রাখে মানবতার তীব্র প্যাশন : 'কিছুই মানে না বাধা, অবিশ্রাম যাত্রা জীবনের/শুরু নাই শেষ নাই নিরন্তর চাওয়া পাওয়ার/জীবন অব্যয়, তাই পরিক্রমা অনন্তকালের।'

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অলক্ষ্যে বিকেল' (১৯৬৫) প্রথমেই তাঁর সময়চেতনার কথা বলেছেন. কি করে দীপ্ত সূর্যের যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্য এসেছে কবি পারেন নি, যখন জেনেছেন, তখন একটা করুণবেদনার রেশ তাঁর চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে, অতীতের সমস্ত বেদনা ও স্মৃতি যেন তাঁকে আজ আলোড়িত করছে, অতীতের বর্তমানের সুখদুঃখ অভিমান লজ্জার অসম্মানের ভেতর দিয়ে জীবনপূজাই সারা জীবনে চলেছে। এখানে বিস্তৃত সময় ইমেজের ছদ্মবেশে তাঁকে ঘিরে ধরেছে : 'পুবের বারান্দা জুড়ে রোদের জটলা/দৃষ্টিপথে অগ্রগামী মুহূর্ত মিছিল।' দক্ষিণারঞ্জন কোন মতবাদে নিজেকে আটকে রাখতে চান না, বিচিত্র ছবি নিয়েই এই জগৎ, তাকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করাই প্রকৃত 'উইস্‌ডম' বা জ্ঞান। তবু এ সকল ছাপিয়ে তাঁর প্রত্যয় ও মানবপ্রেমই ঘোষিত হয়েছে : 'আমার অস্তিত্ব আর প্রত্যয় অমর।' 'মানুষ যেখানে আছে, সেখানেই মন, আফ্রিকার আঁধারেও কবিতার নন্দনকানন।' এই নন্দনকাননে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবেশাধিকার নেই, তাই তীব্র ধিক্কার দেন। এদিক থেকে এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'কালের পুতুল' কবিতাটি স্মরণীয়; হৃদয়ের তীব্র কামনা, অন্ধকার রাত্রি, কাল অন্তর্হিত, মনে আরণ্য-প্রকৃতি এসব নিয়েই সাধারণ মানুষ কালের পুতুলের মতো জীবন চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কবি জানেন : 'সেই সত্য

অতিক্রম, উদ্ভট প্রয়াস/চিতাগ্নি সম্মুখে বসি সংগীতে তন্ময়—অকৃত্রিম প্রশান্তির দিব্য প্রলক্ষণ রচনা। রীতি ও ভাষা অনেকটা সংযত, এখানে বিভিন্ন প্যাটার্নের প্রতি ঝোঁক, 'তন্‌কা' 'হাইকু' কবিতার অনুবাদ, ব্যঙ্গছড়ার তীব্র ঝাঁঝ, ছন্দের ঝঙ্কার অনেক কবিতায় একটা অন্য স্বাদ আনছে। নতুন কথ্যরীতি ও প্যাটার্নের দিক থেকে 'বেহালার একটি শাশ্বত সুর' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আশা যখন বৃষ্টি' (১৯৬৮) তাঁর বিভিন্ন ব্যঙ্গপ্রবণতাকে প্রকাশ করেছে। বিশেষ সময়ই এই ছড়ার জন্ম দিয়েছে, তাই বিশিষ্টকালের সমাজচিত্র ও তাঁর জ্বালা হাসির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে, এতে সমাজসচেতনতাই তীব্র হয়েছে। অক্ষয় সামন্ত কবির কাছে শোষণকামী পুঁজিবাদীর প্রতিনিধি। যদিও এই কবিতাগুলির মধ্যে সমাজসচেতনতা, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রাণের লীলা, সামন্ততান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে, মনের আশা বৃষ্টির রূপ ধরেছে; তবুও কবিচিত্তের গোপনে একটা নিঃসঙ্গতা কাজ করছে, মহাকোলাহলময় জীবন থেকে নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতার দিকে এগিয়েছেন, যে-কবি দুঃখের ও অন্ধকারের মধ্যেও প্রাণের দীপ্ত প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন, সেই কবিই আজ বলছেন, 'অন্ধকার সরাতে এখন ক্লান্তি লাগে।' এই করুণ ব্যর্থ হতাশ্বাস দীপ্ত জীবনবোধের অন্তরালে সূর্যের ছায়ার মত কবিকে আবৃত করতে চাইছে। মণীশ ঘটকের পর সম্ভবত দক্ষিণারঞ্জনই পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। মণীশ ঘটকের 'কুড়ানি', 'খাট্টাইস, বান্দর, তোরে করুমনা বিয়া' এবং দক্ষিণারঞ্জনের 'ত্থাশের মানুষ', 'এই ত্থাশ ছাইরা গেছে তারা আবার আইব নি' কবিতা দুটি স্মর্তব্য। তবে দুজনের কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ আলাদা।

চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'রাত্রিকে দিনকে' (১৯৭০) কবির বেদনার রূপান্তর ও পরিবর্তনের দিক থেকে থেকে উল্লেখযোগ্য। প্রেমের বেদনা এখানে বড়ো তীব্র, যন্ত্রণাও জ্বালাময়: 'আমাকে কাঁদাতে পারো বলেই তো বারবার তোমাকেই চাই।' অস্থির চিত্তের বেদনায় কাতর হয়ে উঠতে চাইছেন, 'সব আয়োজন দেয় ভাসিয়ে বন্যা এসে।' এখানে সেই আগের দৃঢ় নিশ্চয়তা নেই, তাই নিজেকে অনভিজ্ঞ প্রবাল পথিকের সঙ্গে তুলনা করেছেন, বিক্ষত প্রাণ রিক্ত হৃদয় নিয়ে ভগবানের কাছে যেতে চাইছেন, বিগত দিনের বিষণ্ণতা তাঁর মনের ওপর ভাসছে, ক্রম অগ্রসরমান বয়সের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে

দিতে তাঁর সমস্ত বেদনা উথলে উঠছে, মনে হচ্ছে জীবনের কাছ থেকে সময় চলে গেছে বলেই আজ ফকির, তাই কালের নৌকায় অনিশ্চয়ের পথে ভাসছেন, আর বলছেন : 'এখন আমি এক অস্তগামী সূর্যকে দেখছি, অন্ধকারের সমুদ্রে আকাশটা ক্রমেই ডুবে যাচ্ছে।' সূর্যকে নিজের সঙ্গে তুলনা করে এই ডুবে যাওয়ার চিত্র বেদনাদায়ক। মাঝেমাঝেই তাঁর মনে হয়েছে, তিনি কোথায় হারিয়ে যাচ্ছেন। যদিচ জোর করে বলেছেন ; 'হিংসুটে পাখির মতন জোর করে চলে যাওয়া' ঠিক কথা নয়, তবু ঝোঁক দেখে বোঝা যায়, এটা কবির অনুভবলব্ধ কথা নয়, একটা বিশ্বাস যে বিশ্বাসে সমগ্র ব্যক্তিত্ব কাজ করছে না। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হলো এই কাব্যের ভাষাভঙ্গি, মনে হয়, এই কাব্যের মধ্যেই দক্ষিণারঞ্জনের ভাষা চিত্রগীতিময় হয়ে উঠতে চাইছে। নিবিড়তার বন্ধনে নিটোল হতে চাইছে, চিত্রকল্পগুলি বেদনার রঙে রঞ্জিত হচ্ছে। প্রকৃতি আপন অন্তর ও জীবনের প্রতীক হয়ে উঠতে চাইছে। 'দিনগুলি পরমায়ু' কবিতাটি এ গ্রন্থের সবচেয়ে স্মরণীয় কবিতা : 'হৃদয়ের মানচিত্রে গন্ধরাজ ফুল ফুটে আছে।'

তিনি এক আত্মজৈবনিক লেখায় বলেছেন : 'আমি মনে করি, কবিতা শুধু শব্দের ঝঙ্কার নয়, কিংবা শব্দপ্রয়োগের কারুকলাও নয়, কবিতা আসলে মহৎভাবের বিদ্যুৎস্ফুরণ, যাতে মনের মুক্তিতে অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ ঘটে।' এসব উক্তি তিরিশের দশকের ইংরেজ কবিদেরই স্মরণ করায়। জুলিয়ন সাইমনস্ বলেছিলেন, 'প্রত্যেক কবিই অচেতন গণদ্রষ্টা' ; অডেন কবিদের 'সাংবাদিক'ই বলেছিলেন। মূলত এ সকল ভাবের বশেই শব্দই যে কবিতার প্রাণ এ তথ্য এঁরা ভুলে গিয়েছিলেন। ভাবের বিদ্যুৎস্ফুরণ কবিতা না লিখেও হয়, কিন্তু কবিতায় হতে গেলে শব্দপ্রয়োগের কারুকলা অতি প্রয়োজনীয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' যখন বেরোয়, তখন তিনি একুশবাইশ বছরের যুবক, দর্শনের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র। সময়টা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্ব। এ সব মিলিয়ে তাঁর কাব্য বিচার করলে 'পদাতিকে'র মধ্যে প্রাচীন জীবন ও ধারণাকে নস্যাৎ করবার উদগ্র বাসনা, বুদ্ধি ও ব্যঙ্গের ঝাঁজ, গান্ধিনীতির বিরুদ্ধে জেহাদ, মার্কসীয় নীতির প্রতি আদর্শ—খুব একটা চমক

লাগায় না। কারণ যুবা বয়সের ধর্মই হচ্ছে বুদ্ধি, যদিও এই বুদ্ধি আবেগেরই উল্টো পিঠ, এবং বুদ্ধি থেকেই শ্লেষ ব্যঙ্গ। বিদ্রূপের মূলেই রয়েছে নিজের আদর্শ ছাড়া অন্য সব কিছু নস্যাৎ ও ধ্বংস করবার প্রবণতা। সুতরাং 'পদাতিকে'র মধ্যে বুদ্ধির অবারিজাত ধ্বংসাত্মক মনোভাব একান্ত স্বাভাবিক।

'পদাতিকে'র বৈশিষ্ট্যের মধ্যে চোখে পড়ে মার্কসীয় দর্শনকে কাব্যের ভাষায় প্রকাশের অদম্য চেষ্টা।[১] শ্লেষ ও বিদ্রূপমেশানো কঠোর বাস্তবতার প্রতি ঝোঁক, রোমান্টিক স্বপ্নের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক মনোভাব, বিপ্লবের জন্যে আহ্বান ও অনুজ্ঞা, মিলিত জয়যাত্রার প্রতি উদার আহ্বান : 'আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি ; একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে' : সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার গ্লানি থেকে নিপীড়িতমানবের জন্যে সহানুভূতি, যুদ্ধ, কখনো খণ্ড টুকরো চিত্র; এইগুলিই তাঁর 'পদাতিক' কাব্যের বৈশিষ্ট্য। যুগসচেতনতা এবং ঈপ্সিত আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, ঈশ্বরহীন নিবিড় মানবপ্রত্যয়, যন্ত্র ও নাগরিকতার প্রতি আকর্ষণ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যের প্রধান লক্ষণ। 'ঘরে বাইরে' কবিতায় সে যুগের চিত্র তুলে ধরেছেন : 'আমরা বেকার, ঘর নেই, এই দুর্যোগে/মন বিষণ্ণ, শরীর টলছে উপবাসে/নিরন্ত্র হাত, অসহায় মূর্তি তুলি ক্ষোভে/নিরুপায়ে চাই আকাশে দৈবে নেই আশা।''পদাতিকে'র কবিতা বয়সের ধর্মেই একান্ত বক্তব্যপ্রধান, কিন্তু এই বক্তব্য যখন ব্যঙ্গকৌতুকের ঝাঁজে করুণ হয়ে ওঠে তির্যকভাবে, সেখানেই তাঁর কাব্যের সার্থকতা, যেমন 'ধাঁধা' কবিতাটি : 'মাঠ ভরে যেই পাকা ফসলে সুখে ধরি গান ছেলে বুড়োতে/একদা কাস্তে নিই সকলে লাঠির/আগায় পাড়া জুড়োতে/তারপর পালে আসে পেয়াদা/খালি পেটে তাই লাগছে ধাঁধা।' যতীন্দ্র সেনগুপ্তকে স্মরণ করায়।

তৎকালীন সমাজ ও তিরিশের কবিদের প্রভাব সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নির্মাণে সহায়তা করেছে। সমাজের দাবিতেই তিনি প্রেম ও প্রকৃতিকে দেখতে পারেন নি, এই না-দেখা তাঁর চিত্তের একটা প্রবণতা, তাঁর শেষের কবিতার মধ্যেও এই প্রেম আসে নি, প্রকৃতি এসেছে নতুনরূপ নিয়ে বিপ্লবের প্রতীক হয়ে। তাঁর কাব্য খুললেই চোখে পড়ে তাঁর কথ্যভাষার দৃঢ় সংক্ষিপ্তি ও মারপ্যাচ যুক্তিনিষ্ঠ স্পষ্টতা, নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত ছন্দের ওঠা-নামা, শাণিত ব্যঙ্গবিদ্রূপ, আচমকা শব্দের যুগল মিলন, পরস্পর পঙক্তির মধ্যে বিরোধী ভাবের আকস্মিক চমক, প্রকৃতিকে সমাসোক্তির ন্যায় ব্যবহার,

উদাসীন ও বস্তুধর্মী বর্ণনার শেষে হঠাৎ নীতি ও আদর্শের অভিব্যক্তি : 'হাজরা পার্কে সভা কাল, নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে নেই সুখ।' ব্যঙ্গের ও স্নবারির সঙ্গে যেন হঠাৎ বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের বিলাপ, গ্রামীণ জীবনের প্রতি অনীহা অথচ শহরের গ্লানিও তাঁকে বিরূপ করে তোলে, এই দুই মিশ্র অনুভূতি তাঁর চিত্তকে মুচড়ে দেয়। সমস্ত বিরোধীভাবকে একই সঙ্গে কঠোর হাতে সংঘর্ষের সঙ্গে ধরবার চেষ্টা করেছেন বলেই 'পদাতিকে'র কবিতাগুলি আস্বাদ্য, অর্থাৎ দীপ্তি কাব্যের সমস্ত গুণই এখানে প্রকাশমান। যা নেই, তাহলো প্রেম ও প্রকৃতির নিবিড়তা, ব্যক্তির উপলব্ধির গহন গভীর ছায়াময় ও অনির্দেশ্যময় ব্যঞ্জনা।

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'চিরকুটে' ভাষার এই বস্তুধর্মী সংক্ষিপ্ত জমাটভাব স্বচ্ছন্দ হয়েছে, ব্যঙ্গের অতিরিক্ত মাদকতা ও বৈষম্যের প্রীতি কমেছে, সমর সেন বিষ্ণু দে'র প্রভাবের চেয়ে নজরুলের প্রভাব দেখা দিচ্ছে। দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশে, স্নিগ্ধবেদনার করুণ অশ্রু চোখে চিকমিক করছে : 'পথে পথে শব্দ ওঠে/ আকাশে নক্ষত্র ফোটে, নদী করে সম্ভাষণ, পাখি করে গান / মাঠের সম্রাট দেখে মুগ্ধ নেত্রে ধান আর ধান।' সমাজের অবস্থা প্রকৃতির বর্ণনায় শুদ্ধরূপ পেয়েছে : 'এমন কুরুক্ষেত্র ইতিহাস দেখে নি কখনো। বসন্ত গলিত পত্র; /বাতাস বারুদগন্ধ, অন্ধকার বিদ্যুৎখচিত; / রৌদ্রালোকে লেগেছে গ্রহণ।' এখানেও তাঁর উন্নত আদর্শ দ্বিধাহীন, স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা প্রজ্বলিত, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধে ঘৃণা সুতীব্র, বক্তব্য সরল স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ :

> রুখবে কে আজ? চলে বেপরোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার
> ছুটে আসে যারা বঞ্চিত, কাঁধে কাঁধ মেলায়
> হতাশ জীবনে ধরে হাতিয়ার, কেয়ার কার?
> ওঠে আগুনের হলকা ক্ষিপ্র ছুটে চলায়।

'পদাতিকে'র কবিতা জনগণের উদ্দেশ্যে লেখা হলেও তার আবেদন বুদ্ধিবাদী মনের কাছে, সাধারণ লোক এ কবিতার মর্ম-উপলব্ধি করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস নয়, সম্ভবত এই কারণেই বুদ্ধির মার্গ থেকে হৃদয়ের আবেগে ধরা দিতে চাইছেন। কিন্তু শব্দব্যবহারের চমৎকারিত্ব লক্ষণীয়। আর আমার মনের একটা খট্‌কা আছে, বারংবার হেল্‌ডেরলিন-এর একটি কথা মনে পড়ে, যে গভীরভাবে চিন্তা করেছে, সেই সবচেয়ে জীবন্ত

বস্তুকে ভালোবাসে। অর্থাৎ 'পদাতিকে'র সুভাষ মুখোপাধ্যায় কি তেমনিভাবে জীবনের সমস্ত কিছু গভীরভাবে চিন্তা করেছেন, যদি চিন্তা করতেন তাহলে জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় বস্তুকে সবারির দাবিতে নস্যাৎ করতে পারতেন না। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ আস্তিক্যবুদ্ধিতে স্থির থেকেও 'নবজাতক' গ্রন্থে ব্যাপকতর মানবজগৎকে সাম্যের ভূমিকায়ই গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

'অগ্নিকোণ' ক্ষুদ্র বই, অগ্নিকোণ অর্থাৎ দক্ষিণপূর্ব কোণে কাকদ্বীপে যে বিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়েছিল তারই প্রকাশ ঘটেছে। 'অগ্নিকোণে'র ভাষায় ছন্দে রূপে উত্তাল উদ্দামতা, সুন্দরবনের প্রান্তদেশে নদীর মতো প্রবহমান, ঝড়ের মতো বনের স্রোত, সমুদ্রের মতো গর্জমান। ঝড় ও নদীর প্রতিরূপে কবিতার প্যাটার্ন এখানে তৈরি হয়েছে। ভাষায় অনুপ্রাসের ঝন্‌ঝনানি ঝঞ্ঝাকে এখানে জাগিয়ে তোলে: 'অগ্নিকোণের তল্লাট জুড়ে দুরন্ত ঝড়ে তোলপাড় কালাপানি / খুন হয়ে যায় শাদা ফেনা / ঘুমভাঙা দলবদ্ধ ঢেউয়ের ক্ষুরধার তলোয়ারে।' প্রকৃতিই এখানে ব্যাপকতা সৃষ্টি করেছে: 'একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে / আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ / রাগে রী রী ক'রে সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে / দুরন্ত ঝড়, মেঘের ধূম্রজটা / খুলে খুলে পড়ে বজ্রের হাঁক ডাকে/ অরণ্যে সাড়া, শিকড়ে শিকড়ে/পতনের ভয় মাথা খুঁড়ে মরে। বিদ্যুৎ ফিরে তাকায়/যে আলোয় মাঝ তল্লাট জুড়ে/রক্তের লাল দর্পণের মুখ দেখে ভস্মলোচন।' এ কবিতা পড়ে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বাঙালি কবির পক্ষে ক্ষুরধার বুদ্ধিবৃত্তি ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ যুবা বয়সের উদ্‌ভাস মাত্র, বেদনায় রক্ত যেন কোথায় জমাট বেঁধে আছে।

'ফুল ফুটুক' অনেকের মতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণীয় কাব্য। বলা বাহুল্য, এই স্মরণীয়তা বেদনা ও করুণায় এবং জীবনের ব্যথায়, নিজেই বলেছেন: 'এই পৃথিবীতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে/দেখ। আমি জটায় বাঁধছি/ বেদনার আকাশগঙ্গা'। সেই বেদনার আকাশগঙ্গাতেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজেকে ধরা দিলেন। ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও বুদ্ধির প্রখরতার বদলে তাঁর কাব্যের বিষয় ও বস্তু আজ উচ্ছ্বাসে ভরপুর: 'মা তোমার কোলে মরা ছেলে/তুমি কাঁদো, মর্মন্তুদ। চিৎকারে, মাগো, আকাশ মাথায় করো। শোকের সাগর উথলিয়ে তুমি কাঁদো।' তাই বলে একথা বলছি না ব্যঙ্গ এখানে পরিবর্জিত, 'রাস্তার গল্প' কবিতায় সেই ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা রয়েছে, তবে এই জাতীয় কবিতা

এখানে বেছে নিতে হয়। এবং ব্যঙ্গের বদলে কৌতুক দানা বেঁধেছে। দ্বিতীয়ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ফর্মে এখানেই প্রথম সুস্পষ্ট পরিবর্তন চোখে পড়ে ; নিবিড় সুবিন্যস্ত শব্দের পরিবর্তে পঙক্তি ও বাক্য ছড়ানো ছিটোনো, একটা ছবি গড়ে তোলবার চেষ্টা, একটা ইম্প্রেশন গড়ে তুলবার ইচ্ছা, বক্তব্য অনেক কবিতায়ই এক, শুধু বলবার কায়দায় ও শব্দ সাজাবার কৌশলে নতুন লাগে। অমূর্তভাবনা মূর্তরূপে সাজাবার চেষ্টা করেন। তৃতীয়ত, এখানেই দেখতে পাচ্ছি আদর্শ প্রেম আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে 'তুমি' নামিক প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক আলোকদ্যুতিময় হয়েছে এবং মার্কসীয় সৌন্দর্যলক্ষ্মী কবিকে উদ্দীপিত করেছে নতুন রূপে : 'যখন ভোঁ বাজতেই। মাথার চটের ফেঁশো জড়ানো এক সমুদ্র/একটি করে ইস্তাহারের জন্যে উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিলো/যখন তোমাকে আর দেখা গেল না/তখনই/আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে।' জনতাই এখানে 'তুমি' হয়ে গেছে। একদিকে আদর্শ উজ্জ্বল দিন ও গণসৌন্দর্য, অন্যদিকে ব্যর্থ ম্লান দিন, এই দুয়ের টেন্‌সন সমানুপাতিক ভাবে প্রকাশিত।

পূর্বেই বলেছি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রকৃতির কবিতায় চমক আনেন মানুষী-ভাবনা ও রূপ আরোপিত করে, এখানে তার প্রকাশ বিশেষভাবে দর্শনীয়। তবে প্রকৃতির বর্ণনায় তাঁর নাগরিক মনই প্রকাশিত, গ্রামের যে চিত্র বা ছবি আছে তা নাগরিকের বিস্ময় ও অপরিচয়ে ক্ষণিক উদ্‌ভাসিত, ঘন নিবিড় নয়। এই বইতেই কতকগুলি ছড়া পেলুম, যে ছড়াগুলি ছন্দের ও মিলের অভিনব সজ্জায় মনকে চমকে দেয়, এগুলির মধ্যে শুধু ব্যঙ্গ নেই, কৌতুকের সঙ্গে উজ্জ্বল বিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে, ফলে অন্নদাশঙ্করের লঘুতা হ্রসিত ; তাই এর মূল্য আরো গভীরে, 'পারাপার' কবিতাটি তার নজির : 'আমরা যেন বাংলাদেশের চোখের দুটি তারা/মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে—থাকুকগে পাহারা/দুয়োরে খিল। টান দিয়ে তাই/খুলে দিলাম জানলা। ও পারেও যে বাংলাদেশ/এপারেও সেই বাংলা।' 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতার মধ্যে প্রকৃতির বসন্তের উজ্জ্বল পটভূমিকায় নোংরা গলির এক কালো কুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ের যৌবনের বসন্ত অভিলাষকেই দুই বিপরীত চিত্রে এক সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন, ফলে একটা নাটকীয়তা গড়ে উঠেছে, 'অন্ধকারে মুখচাপা দিয়ে দড়ি পাকানো সেই' গাছের হাসি কুচ্ছিত মেয়ের যৌবনের মতোই সঙ্কেতিত। সময় পড়ে

থাকে না, সুতরাং সময়কে কেন্দ্র করেই মানবিক অভিজ্ঞতার উত্থান ও পতন, এবং তাকে উপেক্ষা করাও উচিত নয়। এই কবিতাটি যদি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় হয়, তাহলে স্পষ্টত একথা প্রমাণ করা যায় যে ব্যঙ্গ বা বুদ্ধি নয়, হৃদয়ের উত্তাপেই নিপীড়িত ও হতভাগ্য মানবজীবনের আশা আকাঙ্ক্ষাকে বিচ্ছিন্ন চিত্রে ও নাটকীয়তায় প্রকাশ করেছেন, ছবি ও চিত্রগুলি বিচ্ছিন্ন ও উল্লম্ফিত, তথাপি একটা সামগ্রিতা রয়েছে, একটা রেশ বাজিয়ে যায়। এই সব কারণেই এটি তাঁর স্মরণীয় কাব্য।

'যতো দূরেই যাই' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বহুল প্রচারিত বই, কিন্তু পূর্বের কাব্যগ্রন্থ থেকে এখানে যে কোনো মহৎ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, আমি তা মনে করি না। বরং কাব্যের জগৎ সরল বক্তব্যে অতিশয় সহজ ও সরলীকৃত হয়েছে, যদিও বলেছেন 'জীবন থেকে রস নিংড়ে নিয়ে বুকের ঘটে ঘটে আমি ঢেলে রেখেছিলাম আজ তা উথলে উঠলো।' কিন্তু এই উথলে-ওঠা ভাবটা তাঁর কাব্যের কোথায়ও চিত্রে ধ্বনিতে বক্রোক্তিতে প্রকাশ পায় নি। বরং এ্যালিগরির প্রবণতা একটা তত্ত্বের শুষ্কতায় নিয়ে যায় এবং কাহিনীর স্বাদ গল্পের ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যায়, ছোটগল্পের মতো চমক লাগে কোনো কোনো কবিতার শেষে। তবু সাজাবার কৌশলে, উদ্দীপ্ত আশার আবেগে, চলতি কথ্যভাষা ও ভঙ্গিতে, সাবলীল ও বলিষ্ঠ গদ্যে, নিপুণ ছন্দের গোপনীয়তায়, প্রকৃতির মানুষীসত্তার রূপে একটা আবেগ ও অনুরণন জাগায়, এ সব কবিতা হৃদয়ের গভীরে নিয়ে না গেলেও এই সব কারণে একটা আবেদন আনে। জনগণের জন্যে লেখা এটা একটা উদ্দেশ্য, কিন্তু যে ভাষায় ও রূপে তা সংস্কৃতিবান বুদ্ধিমার্জিত মানুষের মতো। অর্থাৎ 'সফিস্টিকেশন' প্রতিপদে ধরা পড়ে। প্রকৃতিকে মানুষী-সত্তায় রূপান্তরের মধ্যে আদিম জগতের জাদুর ক্রিয়া ও অনুভূতির কথা অনেকের মনে আসবে, অর্থাৎ এই সব প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রকৃতিকে মানুষী অনুভূতির সগোত্রীয় করতে চাইছেন এ দাবি আসবে। কিন্তু এটা শুধু উদ্দেশ্য মাত্র, প্রকাশভঙ্গিতে এর চিহ্নমাত্র নেই, যেমন ; 'ভাজা ইলিশের গন্ধ গলি ছেড়ে কিছুতেই নড়তে চায় না হাওয়া', 'পশ্চিমের আকাশে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিয়ে যেন দুর্ধর্ষ ডাকাতের মত রাস্তার মানুষদের চোখ রাঙাতে রাঙাতে নিজের ডেরায় ফিরে গেল সূর্য।' 'কয়েদির ডোরাকাটা পোশাকে এক টুকরো রোদ মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে হাঁটু মুড়ে যেন মগরেবের নামাজ পড়ছে।'

এগুলি এ যুগের কবির বিশিষ্ট ভাবনাজাত চিত্র হিসেবে আস্বাদ্য, কিন্তু আদিম জাদু বা গভীর 'মিথ্' কিছু নেই। বরং এখানে জটিলতা বৈষম্য সব হারিয়ে গেছে। তবে চিত্রগুলির মধ্যে সহজ বাস্তব প্রত্যক্ষতা রয়েছে।

সময়ের ভাবনা তাঁর কবিতায় প্রথম থেকেই ছিল, এই কাব্যে প্রথমেই তাঁর উপস্থাপনা। চলার পথের নেশায় তিনি অধীর, সময় সেখানে চলেছে নদীর মতো, তাই কিছুতেই তাকে ধরতে পারছেন না, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা সুন্দরী রাজকন্যার রূপে তাঁকে ডাকছে। একই বক্তব্যকে দুই রীতিতে প্রকাশ করেছেন; একটা বিমূর্তরূপে, অন্যটা কাহিনীর স্থূল রূপে। এখানে আর একটি নূতন বিষয়বস্তু দেখা দিয়েছে, বিষাদের মধ্যে অপূর্ণ বাসনা খেলা করছে, এবং কাজের মধ্যে মানবপ্রেম কাজ করছে, এই বিষাদ ও মানবপ্রেম দুটোকেই ধরতে চাইছেন। বিষাদের অপূর্ণবাসনা তাঁর কাব্যে নতুন : আশঙ্কা হয়, এই অনুভূতি বা অবচেতনাকে বুদ্ধির দ্বারা জোর করে দমিত করে আদর্শ ইচ্ছা নীতির কথাচিত্রকেই তিনি কাব্যে প্রকাশ করেছেন কিনা, তাই নিরবিচ্ছিন্ন ভবিষ্যতের দীপ্ত আশার পরিবর্তে পুরনো ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতি তাঁর সত্তাকে আজ মথিত করছে : 'সামনে পা ফেলতেই লোকটা হঠাৎ শিউরে পিছিয়ে এলো।' তাই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতায় জীবনকে আজ তিনি করুণায় ও জ্ঞানে দেখছেন। এ ছাড়া পূর্বের আদর্শনীতি সংগ্রাম ও আশা, বাংলা দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের জীবনের চিত্র, মার্কসীয় জীবনদর্শনের ইঙ্গিত, কিছু ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবসব বিভিন্নভাবে এই কাব্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। 'যত দূরেই যাই' কবিতায় 'ঢেউয়ের মালা গাঁথা একটি নদীর নাম'-এ চিরন্তন জীবন ও নদীর গতিকে প্রতীকিত করেছেন, এবং 'আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে নিকানো উঠোন সারি সারি লক্ষ্মীর পা'—এই চিত্রের মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের ঐশ্বর্য ও সুস্থ কল্যাণবোধ আকাঙ্ক্ষার বলয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। এই ছোট্ট কবিতাটির তাৎপর্য লুকিয়ে রয়েছে নদী ও লক্ষ্মীর পা শব্দগুলির ভেতরে, মিথ্, সঙ্কেত ও চিত্রের গভীর অনুষঙ্গে। বাঙালির বাসনাজাত চিরকালের স্বপ্নসংস্কার এখানে প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু এই জাতীয় কবিতা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের খুবই কম। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'কাল ও মধুমাস'-এ কবিতার রূপ প্রকাশ আরো সরলীকৃত এবং ফ্যাকাশে, 'কাল মধুমাস' কবিতাটির মধ্যে বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত জীবনের সামগ্রিক ছবি গল্পের বহুল বিস্তারে বলেছেন বটে, কিন্তু কবিতার সেই নিবিড়তা ও নিটোলতা

বিন্দুমাত্র নেই। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এখনো লিখছেন, সুতরাং চলমান পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেওয়া ভালো, এই পরিবর্তন যে 'পদাতিক' কাব্য থেকে পরবর্তী কবিতার মধ্যে ঘটেছে, জীবনকে সহজভাবে বুদ্ধি সত্ত্বেও হৃদয়ের আবেগে গ্রহণ করতে পেরেছেন, তাতেই তাঁর কবিসত্তার স্বীকৃতি। বৃহত্তর ব্যাপকতর সামগ্রিক উপলব্ধি ও প্রকাশ তাঁর কাব্যে নেই, একই কথা বার বার বলেছেন বিচ্ছিন্নভাবে, তবু স্ববারি বিসর্জন দিয়ে জীবনকে যে তিনি জ্ঞান বা উইস্‌ডমের সাহায্যে দেখতে চাইছেন, সেখানেই তাঁর কবিচিত্তের সংবেদনশীল সজীবতা লক্ষ্য করা যায়।[২]

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত একই বিষয়ে কবিতা লিখেছেন, কিন্তু মেজাজে দুজন ভিন্নধর্মী, সুকান্ত আবেগে আকুল, তাঁর চিত্রকল্পের জন্ম আবেগ থেকে, তাঁর জ্বালা, বোধ, অভিমান, সঙ্কল্প সব কিছুর মধ্যেই আবেগের দুর্দান্ত গতি প্রকাশ পাচ্ছে। এবং তাঁর কবিতার ভাব ও আবেদন এই কারণেই সরল এবং সহজেই সকলের মন আকৃষ্ট করে। তুচ্ছ পরিচিত নগণ্য বস্তুকে সহজ মানুষের স্বাভাবিক আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছেন বলেই আমরা মুগ্ধ হই, বুদ্ধি অপাপবিদ্ধ অস্নাবির হলেও একটা সীমা থেকেই যায়, তখন বলতেই হয় 'রূপে তোমায় ভোলাব না ভালোবাসায় ভোলাবো।' হয়তো কবিতার বিচারে সুকান্তের কাছে আরো সংহতি, ধ্বনি, চিত্রকল্প দাবি করতে পারি, কিন্তু হৃদয়ের উষ্ণ উত্তাপে তাঁর বক্তব্য-আদর্শ-প্রেম আলোর স্রোত তৈরি করে, এদিক থেকে সুভাষের চেয়ে সুকান্তের কবিতা গ্রহণীয় হয়েছে: 'আদিম হিংস্র মানবিকতার আমি যদি কেউ হই/স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই।' 'প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা ভেঙেছিস ঘর বাড়ি/সে কথা কি আমি জীবনে মরণে কখনো ভুলতে পারি?' হৃদয়ের এই উষ্ণ উত্তাপের পাশেই সরল বিশ্বাসের দৃপ্ত ভঙ্গি: 'এ বন্ধ্যা মাটির বুক চিরে এইবার ফলাব ফসল/আমার এ বলিষ্ঠ বাহুতে আজ তার নির্জন বোধন।' এবং তিনি সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় আন্তরিক ধর্মে তাঁর যুগের কথা বলেছেন:

আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়
আমার বিনিদ্র রাতে সাইরেন ডেকে যায়

কবিতা : চিত্রিত ছায়া

আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

এখানে কাব্যের দিক থেকে যদি কোন ত্রুটি ঘটে থাকে, তাহলে তা সংগঠনের ও সংহতির, আর্টফর্মের এবং কিছুটা বয়সের। হয়তো সুকান্ত ও সুভাষ দুয়ে মিলে দুজনের পরিপূরক। এই সঙ্গে সমর সেনের সঙ্গেও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পার্থক্য চোখে পড়ে। সমর সেনের প্রথম যুগের কবিতায় তাঁর ব্যক্তিগত হৃদয়ের অভিজ্ঞতা হতাশা ক্লান্তি ধূসরতা ব্যর্থতা নিয়ে বারবার এসেছে, চিত্রকল্পগুলিই এখানকার মানসিক অভিজ্ঞতার পরিচায়ক: 'হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এলো', 'বিষাক্ত সাপের মতো আমার রক্তে তোমাকে পাবার বাসনা', 'সে ক্লান্ত, স্তিমিত হাসিতে, রাত্রির অবিশ্রাম, অশান্ত বিষণ্ণতা', 'স্পন্দমান দিনগুলি আমার দুঃস্বপ্ন', 'ডাস্টবিনের সামনে মরা কুকুরের মুখের যন্ত্রণায় সময় এখানে কাটে', 'শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে শুয়রের চামড়ার মতো' 'মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি'। যদিও তিনি ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন এনে পৃথিবী, নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে চাইছেন, তবু তাঁর মনের গভীরে মধ্যবিত্ত জীবনের গ্লানি, 'বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি', উজ্জ্বল দিনের পরিবর্তে এই বীভৎস ক্লান্ত দুঃস্বপ্নকেই কবিতার ভাষায় জাগাতে চেয়েছেন। আশা বা আদর্শ অনেক সময় মনের গোপনে রয়ে গেছে, দুই একটি পঙক্তিতে হঠাৎ চমকে ওঠে, কিন্তু তাঁর কবিতায় বন্ধ্যা নারীর অন্ধকারই পৃথিবীকে ঢাকছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বুদ্ধির সতর্ক প্রহরায় এই বন্ধ্যা দিকটাকে বাদ দিয়ে গেছেন, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জোর করে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন, এই হতাশাকে হৃদয়ের অনুভূতিতে একাত্ম না করে বুদ্ধির দূরত্বে বিদ্যুতের মতো ব্যঙ্গের তীব্র আলো জ্বালিয়েছেন। সমর সেন যেমন নিজের হতাশা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি, তেমনি পারেন নি একই রকম শব্দ ও চিত্রের পুনরাবৃত্তি ও একঘেয়েমি থেকে। যেহেতু তিনি গদ্য-ছন্দে অথবা মিশ্রভাঙা পয়ার ছন্দে কবিতার শব্দকে দ্রুত বিন্যস্ত করতে ভালোবাসেন, সেইহেতু শব্দবিন্যাসের সংহতি, সংগঠনের গূঢ় নিবিড়তা, রহস্যময় রূপগঠনের দিগন্ত উদ্ভাসিত করতে পারেন না, আবেগপূর্ণ গদ্যময় উক্তির মধ্যে চিত্রকল্পের হঠাৎ আবির্ভাবে আমরা বিস্ময়াপন্ন হই, যদিও এই চিত্রকল্পগুলি একই ধরনের। অনেক জায়গায়ই তাঁর কবিতা সংবাদপত্রের বিবৃতিধর্মী এবং

সেই পথেই তাঁর সার্থকতা। এবং এই কবিকেও ব্যঙ্গের দিক থেকে এবং শ্রেণীবোধের দিক থেকে বিষ্ণু দে প্রভাবিত করেছেন। তবে একথাও স্বীকার্য, সমর সেনের প্রভাব পরবর্তী বাংলা কাব্যে যত সুদূরপ্রসারী, সুকান্তের ঝোঁক বামপন্থীদের যতোটা আগ্রহের কারণ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ততোটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তৎসত্ত্বেও এই তিন কবিই প্রগতিবাদী ও বামপন্থী কবিগোষ্ঠীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছেন। বিশেষ করে পঞ্চাশের কবিদের যুগের হতাশার চিত্রপ্রকাশের ব্যাপারে সমর সেনের শব্দের' ও ভাষার ব্যাপক প্রভাব মারাত্মক : 'অতীতের শব সম্ভোগী মন কালের স্থবির যাত্রায় অশান্তি আনে।'

কবিতার বিচারে তিনজনের মধ্যেই অভাব পরিলক্ষিত হয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বুদ্ধিবাদের কাছে জীবনের সামগ্রিকবোধের অন্য অংশ পরিত্যক্ত হয়েছে, সুকান্তের কবিতায় আবেগের একমুখীন সরলতায় বিচিত্র জটিল জীবনের স্বাদ অনুপস্থিত, সমর সেনের বিবৃতিধর্মী গদ্য উক্তির মধ্যে বক্রোক্তি-জাত চিত্তচমৎকারিত্বের কোনো বালাই নেই। এর কারণ হচ্ছে অহং-এর নির্দিষ্ট সীমা পরিহার করে অবচেতনের সাহায্যে মানসিক অভিজ্ঞতায় জটিল ও বিস্তৃত সীমায় এঁদের হৃদয় আসতে পারে নি। ফলে শিল্পের ভাষা সঙ্কেতময় হয়নি। বিশুদ্ধ চৈতন্য অথবা সমষ্টিগত অবচেতনে চিত্ত অধিষ্ঠিত হলে বিশ্বের সামগ্রিক সংবেদনা পরিপূর্ণ চিত্রকল্প হয়ে ফুটে ওঠে।

অরুণ সরকার

আমার খুবই অবাক লাগছে, এক বাড়িতে দুই ভাই কেমন বিপরীত ও দুই মানসিকতার অধিকারী, অরুণ সরকার 'পরম চরমের' ধার ধারেন না, 'অস্তিত্বই চেতনা যেহেতু আর এই বেঁচে থাকা দেশে কালে পরিপার্শ্বে তাই রুদ্ধ দ্বার।' 'আমি অবিশ্বাসী নিরীশ্বর শোকেতাপে অর্ধমৃত।' আর আলোক সেখানে একেবারে উল্টো। অরুণ সরকার অবচেতনায় যেতে চান না, কারণ সেখানে অন্ধকার, আলো স্পষ্টতা প্রত্যক্ষতা তার মধ্য দিয়েই ব্যাকুলতা দূরের আকাশের প্রার্থনা, এই স্পষ্ট প্রত্যক্ষতা তাঁর ভাষায় ছন্দে ধ্বনিচিত্রে শব্দে, কতো অপূর্ব চিত্রকল্প যে সাধারণ কথায় তিনি তুলতে পারেন নিপুণ ছন্দের সহজ

কারিগরিতে তাঁর কাব্য না পড়লে বোঝা যায় না। 'প্রতীক্ষা' কবিতায় নিজের জীবনদর্শন সম্বন্ধে বলেছেন : 'আমার ঈশ্বর শুদ্ধ শিল্প / গড়নে অপরূপ, ভাবনে মুগ্ধ, / গৌরীহর সমভঙ্গ ভঙ্গি জৈব জীবনের নৃত্য, ছন্দ / রক্তে ঢেউ যেন।' 'যেন' শব্দটার মধ্যে কবির যেমন দ্বিধা, তেমনি আমাদেরও, কিন্তু শুদ্ধ শিল্প সম্বন্ধে আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই এবং তা প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য-কলার মতোই হরগৌরীর মূর্তিতে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। এই কারণেই গদ্যে ও সুন্দর ভাষায় কাব্য সম্বন্ধে মূলকথা তিনি বলতে পেরেছেন; এবং এই গদ্য লেখা পড়েই মনে হয় তাঁর কবিসত্তার চেয়ে সহৃদয় পাঠক সত্তা অধিকতর সজাগ : ...'কবিতা লিখে সামাজিক বিপ্লব আনা সম্ভব এমন ভণ্ডামিতে আমি বিশ্বাস করি না। কবির পথ ও রাজনীতিকের পথ ভিন্নমুখী।... কিন্তু কবিতায় আগুন ছড়ানো? সেটা হবে নপুংসক ন্যাকামি, ফুলগাছকে জ্বালানি হিশেবে ব্যবহার করা। মনে রাখা দরকার কবিও বৃহত্তর অর্থে একটি সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন। কবিতা পাঠের ফল চিত্তশুদ্ধি। ভালো কবিতা পাঠকের মনকে উন্নীত করে, ভালোবাসতে শেখায়, আপ্লুত করে সহানুভূতিতে।'

দু'চারটি কবিতা বাদে প্রায় সব কবিতাতেই একটা তাৎক্ষণিক আনন্দ, হাল্‌কা মেজাজ, প্রেমের উষ্ণতা, একটু ব্যঙ্গবিদ্রূপের আলো প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মূল কবিতায় প্রেমের স্মৃতিই প্রকাশিত, এই হাল্‌কা মেজাজ লঘু চালের মধ্যে মনের কোণে কোথায় যেন একটা বেদনা লুকিয়ে রয়েছে। অরুণ সরকারের কবিতা পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ জাগে একি কান্না ঢাকার জন্যে হাল্‌কা হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে চাইছেন, রবীন্দ্রবিরোধিতা করছেন, 'তোমার প্রেম হোক্ না শুধু ছলা'। শুধু 'ভয়' কবিতাটির ভয়ংকরতাই আমাদের চমকে দেয়, এটাই বোধহয় 'দূরের আকাশ' কাব্যগ্রন্থের ব্যতিক্রমী কবিতা। তিনি যতোই যুগের প্রভাব অস্বীকার করতে চান হাল্‌কা মেজাজের লঘু চালে, প্রেমের উষ্ণতায় তবু সমাজের দাবি এড়াতে পারেন নি, এবং সমাজকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন : 'সমর অস্থিরচিত্ত শ্লেষাশ্রয়ী তরুণ স্বভাব / সুধীন্দ্রনাথেও নেই অগ্রজের অটল বিশ্বাস।' তিরিশের দশকের কবিদের অনুসরণেই লিখেছেন : 'ওরে উদ্‌ভ্রান্ত মন / এ যে ফণিমনসার বন; / ব্যর্থ উটপাখির চাতুরি /...নিঃশেষিত অন্তরমাধুরী যা ছিল সর্বস্ব গেছে

চুরি।' যতীন্দ্রনাথের মতোই বলেন : 'সবুজ ঢেকেছে বিরস মরুর বালি।' কিন্তু অরুণ সরকার আমাকে মুগ্ধ করেছেন অন্য কারণে, চিত্রকল্পের সংবেদনা এঁর কবিতাগুলিকে নাড়িয়ে দেয় : 'সাগরের আকাশী ইচ্ছার নীলবর্ণ পাখি।' 'হস্তিনী মেয়ের মতো কদাকার এই পৃথিবীতে' 'সুদূর রজনীর গোপন জুঁই ফুলে / যে আশা-দিয়েছিলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।' 'দ্বিধা বিজড়িত লজ্জা পীড়িত এ হৃদয় ঝাউবৃক্ষের পাতা।' চল্লিশ দশকে প্রায় সব কবিই গদ্যের ঋজুতা কাব্যে এনেছেন, কিন্তু অরুণ সরকারের মতো এতো স্বচ্ছন্দভাবে নয়। গদ্যের অপরূপ দৃঢ়তা, ছন্দভাষা ধ্বনি মিলের অপূর্বতা, ধ্বনির মাধ্যমে অর্থ : 'মালবিকা হালদারের ঢাক-ঢোল ড্রিমিকি ড্রিমিকি / টুংটাং টাংটুং ত্রিংত্রিং ঝিমিকি ঝিমিকি।' স্তবক চরণ পর্বের সুবিন্যাস তাঁর সচেতন মানসতাকেই ফুটিয়ে তোলে। যদিও প্রচ্ছন্ন ছন্দের গোপন অন্তর্লীন মাধুর্য নেই। কিন্তু এই গুণগুলির জন্যেই তিনি স্মরণীয়।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'যাও, উত্তরের হাওয়া'তে ওপরে বর্ণিত গুণগুলি আরো সুদৃঢ় হয়েছে, খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। পরিবর্তনের মধ্যে যেটা চোখে পড়ে সেটি হলো যৌবনের স্মৃতিবেদনা : 'যৌবন যায় / যৌবন বেদনা যে / যায় না' এবং অতীতের আক্ষেপ : 'মিছিলে সন্ধ্যায় আকুল সন্ধ্যাগুলি / যুদ্ধে, আত্মহননে গিয়েছে ভুলি / স্বাভাবিকতার কথিত সহজ সরলে।' 'ভাখো যৌবন প্রৌঢ় এখন / শেষ হয়ে এলো খেলা,' বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নিঃসাড় হয়ে যাবার বেদনা বড়ো তীব্রতর। তাই মাঝে মাঝে আশাবাদে উল্লসিত হতে চান, প্রজ্ঞাদৃষ্টি লাভ করতে ইচ্ছুক : 'সকল ভালোর ভালো সচকিত পুনর্দৃষ্টি লাভ / আবাদে ও মরুদেশে শুধুমাত্র রঙের তফাত।' তিনি যন্ত্রণা চাইছেন, 'আমাকে যন্ত্রণা দাও মাটি খোঁড়ো, লোহার আঁচড়ে।' কিন্তু এটা তাঁর প্রার্থনাই, কোনো প্রকাশ নেই। এবং এ জাতীয় কবিতা খুবই কম, বরং প্রেমই তাঁর সুর। 'প্রেম জাগে দু'নয়নে, প্রেম জাগে ঘ্রাণে/প্রেম জাগে তৃষাতুর হৃদয়ে আমার।' তবে ইদানীং দু' একটি কবিতায় জীবনের গভীর সঙ্কেত ধরা পড়ছে, যেমন 'ঘোড়া' কবিতাটি। কিন্তু বহিরঙ্গের সুর চিত্র কারুকলার জন্যে তাঁর কবিতা আস্বাদ্য।

নরেশ গুহ

নরেশ গুহের 'দুরন্ত দুপুর' কাব্যগ্রন্থে একটা শান্ত কোমল সুরের প্রচ্ছন্ন ভালোবাসার বিস্ময় ছন্দের সংগীতে ধরা দেয়; অনুচ্চকিত স্নিগ্ধ চিত্রকল্প সুরের আবেশে জড়িয়ে ধরে। যদিও গভীর কোনো ট্রাজিক দ্বন্দ্ব ও জীবনবোধ এই কবিতায় নেই, কিন্তু নরম সুর ও কোমল ছবি স্বচ্ছন্দ গতিতে আসে : 'কাহিনীর কালো চুলে শৈশবের আচ্ছন্ন হৃদয় পার হলো আঙিনার জ্যোছনা আঁকা স্বপ্নের সময়।' 'কাহার খোঁপার গন্ধে খুলে গেল সায়াহ্ন তিমির।' এ যেন বুদ্ধদেবের মর্জি, অমিয় চক্রবর্তীর সুর। জীবনের ভালোবাসায় তিনি গভীর : 'করেছি শপথ দুঃসহ হোক যতো / প্রাণধরনের কঠিন চাবুক, গ্রহ তারকার মতো / মানুষের মনে হাসিকান্নায় তবু যেন আমি থাকি।' রূপ-গঠনেও লিরিকের একটা স্বভাব সরলতা অনায়াসে এসেছে, বুদ্ধি ও চতুরতার কোনো চিহ্ন নেই। ভাবের স্নিগ্ধ কোমলতার গন্ধ রূপের প্রকাশেও স্পষ্ট। এ জাতীয় কবিতা পঞ্চাশের অনেকেই লিখেছেন। নরেশ গুহই ব্যতিক্রম যিনি রাজনীতি ও সমাজনীতি কবিতায় ঢুকতে দেন নি চল্লিশের কবি হয়েও।

অরুণ ভট্টাচার্য

অরুণ ভট্টাচার্য অনেকটা গৃহস্থ কবি, সাধারণ কথা সহজ সুরে বলেন এবং তাঁর কথার মধ্যেও তিরিশের প্রায় সকল কবির শব্দ ও কণ্ঠস্বর পাওয়া যায়, বিষয়বস্তু ও ভাষা প্রকাশে তেমন কোনো উচ্চকিত তীব্রতা নেই, বিস্ময়ের শিহরনজাত জাগরণ নেই, যাতে আমরা মুগ্ধ হতে পারি। প্রেম—সেও যেন কেমন থিতিয়ে পড়া তরঙ্গের ঢেউ : 'হৃদয় খুঁড়লে গভীর জল / তারার আলোয় ঝিলিমিলি / জলের গভীর পদ্মটিতে / তোমার মুখের আদল দেখি।' কিন্তু 'হাওয়া দেয়' কবিতায় 'স্বামীর জন্য' কবিতাগুচ্ছ তাঁর হৃদয়ের কোমল সুর সঙ্কেতে, সংক্ষিপ্ত বাক্যে, নরম চিত্রকল্পে, গোপন বেদনার রঙে সুন্দর ফুটে উঠেছে : 'নীল কমল ফোটাবো বলে তোমার দরজায় / ঢুকতে গিয়ে দেখতে পেলাম রক্ত কমল ফুটে আছে তোমার বাগান ভরে।' 'পদ্ম গন্ধে বাতাস উঠবে ভরে / আকাশ খুশি বাতাস খুশি কত কী যে / দেখতে পেলে বিরল ভুবনখানি / বসে থাকবো সারা সকালবেলা।' এই কোমল খুশির আনন্দেই তাঁর কবিতার জগৎ একটা শিরশিরানি জাগায় মাত্র।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মঙ্গলাচরণের সমষ্টিগত চেতনায় উপলব্ধি ও জীবনভাবনা অতি মিষ্টি ধ্বনির সুরে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের বদলে পাঠককে ঘুম পাড়িয়ে দেয় : 'সির্‌সির্‌ ছোঁয়া চুলে চোখে-মুখে ছোঁয়া তির্‌তির্‌ / জলে নিমডালে পাতায় পাতায় গুমোটের ফাঁদে / পাথরের ফাঁকে ফাটলে ফোকরে মাটির তিতির / ছাড়া পায় ওড়ে গুন্‌গুন্‌ ওড়ে দোলা দেয় চাঁদে।' অনেক কবিতার বিষয়বস্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক, এমন কি ভাষার মধ্যেও, 'পেটে পিঠে এক হয়ে মেয়েটা ফুটপাথে মরে আছে / কেবল তাকিয়ে ওর জ্যান্ত চোখ দুটো।' তিরিশের কবিদের ধারা অনুসরণ করেই লেখেন : 'পার হচ্ছে ক্যাক্‌টাস্‌ কাঁটায় / ইটে ভগ্ন মূল্যবোধে নগ্ন মাঠ প্রত্যাশার চোরাবালি, পার / হয়ে যাচ্ছে বিধ্বস্ত স্নায়ুর দেশ রোমহর্ষধর্ষিত সময় / না, আজ সময় নেই'। এসব উক্তির মধ্যে জীবনের বোধ খুব গভীর নয়, বিষ্ণু দে যেখানে এই বোধের মধ্য দিয়ে সর্বজনীন হতাশায় এক উন্নত মননে উঠতে চেষ্টা করেন। আসলে বিষয়বস্তু ও ভাষার মধ্যে বিরোধ তাঁর কবিসত্তারই বিরোধ। মঙ্গলাচরণ হয়তো সার্থক রোমান্টিক কবি হতে পারতেন, যে রোমান্টিকতার স্তব্ধতায় ধ্বনির মাধুর্যে বুঁদ হওয়া যেতো, কিন্তু দেশকালের অভিশাপে তাঁকে তা হতে দেয় নি। তিনি যে যুগচেতনা থেকে সরে এসে কতখানি সার্থক চৈতন্যময় কবিতা লিখতে পারেন 'শব্দ' কবিতাটি তার নজির : 'ভাঙে রঙ শত লক্ষ / বেগুনিলালের বর্ণালীতে সৌরভশিহরে তিক্ত ও পেলব / স্বাদে, কাঁপে, কেঁপে আলীঢ় সে লগ্ন হয় অক্ষরে কীর্তনের গানে : / চৈতন্য অস্তিত্ব মূল খোঁজে, সত্তা চৈতন্যের অচ্ছোদ আকাশ।'

সিদ্ধেশ্বর সেন

সিদ্ধেশ্বরের যদিচ কোনো বই নেই, সম্প্রতি মায়াকোভস্কির 'লেনিন' মহাকাব্য অনুবাদ করেছেন, তবু তাঁর কবিতার প্রভাব পরবর্তীকালে প্রচণ্ড, সেই হিসেবে আলোচিতব্য। সিদ্ধেশ্বর বক্তব্যের দিক থেকে কিছু নতুনত্ব দিয়েছেন বলে মনে হয় না। তাঁর এমন কোনো কবিতা নেই, যা আমার সেন্সিবিলিটিকে প্রসারিত করতে পারে। কিন্তু তিনি কবিজীবনের প্রথমেই পঙক্তি ভাঙবার একটা পদ্ধতি শিখে নিয়েছিলেন, এই পদ্ধতিটা নিশ্চয়ই

কামিংসের কাছ থেকে নয়, আমার যতোদূর মনে পড়ছে মায়াকোভস্কির কাছ থেকে। একটা চরণকে বিভিন্নভাবে সাজিয়েছেন, কখনো এককভাবে, কখনো দীর্ঘায়ত করে, কখনো স্পেস দিয়ে, কখনো ছেদ দিয়ে। যেখানে সাধারণভাবে পর্ব মেলানো যায়নামনে হয়, সেখানেও একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মধুসূদনের রীতিটাকেই আর একটু বাড়িয়েছেন ; পরের পর্বের অর্ধাংশকে আগের পর্বের শেষে টেনে এনেছেন, যেমন : 'তোমার বিপুল জাগরণের মধ্যে, আমার / প্রবল মূর্ছা' 'আমার প্রবল মূর্ছা' পরের চরণে বসানো যেতো, কিন্তু 'আমার' শব্দটির প্রতি অত্যধিক জোর দেবার জন্যে প্রথম চরণের শেষে বসিয়েছেন, এতে শব্দের মূল্যবোধ ও পরিমাণ বাড়ছে, শব্দগুলি বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন করবার ফলে প্রত্যেকটা শব্দে জোর পড়ছে, এড়িয়ে যাবার উপায় থাকছে না, সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় সিদ্ধেশ্বর বামপন্থী কবিতার রাজ্যে বক্তব্যের স্থানে উচ্চারণের আধিপত্য এনে কবিতার একঘেয়েমির জগতে একটা বৈচিত্র্য এনেছেন, এই বৈচিত্র্যের জন্যে তিনি স্মরণীয়, এই উচ্চারণের ও ঝোঁকের মধ্যেই তাঁর আবেগের উত্থানপতন ঘটে, ছোটবড়ো স্বরের মিলনে একটা ঝড়ের স্পন্দন জাগায়। এই স্পন্দন মন্ত্রের মতো কিনা, আমি জানি না। কারণ মন্ত্র কবিতা নয়, যখন নবার্ণ মন্ত্র উচ্চারণ করি ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্লৌঁ হ্রীঁ ক্লীঁ নমঃ, এগুলির মধ্যে অর্থ নয়, ধ্বনির গাম্ভীর্য আসে ; আর আসে প্রতিটি অক্ষরের মধ্যে সঙ্কেত, যে সঙ্কেতের অর্থ পূর্বেই বুদ্ধির দ্বারা নিরূপিত। মন্ত্র বলতে যদি শুধু ধ্বনির গাম্ভীর্য বোঝায়, এবং কবিতায় ব্যবহৃত ধ্বনি মন্ত্রধ্বনি, তাহলে আমার কিছু বলবার নেই। 'চৈত্রের চাতক বলেছিল' কবিতায় আছে 'চৈত্রের চাতক বলেছিল, 'স্ফটিক জল' / স্ফটিক, / জল / জিহ্বা, আল্— / জিহ্বা গিয়ে ঠেকে / ব্রহ্মাণ্ড তালুতে / শুক্‌নো ও খট্‌খটে, শুকনো ও / খট্‌খটে / জরা বন্ধ্যাত্ব এক অকাল দ্বিপ্রহর মাথায় / জলন্ত প্রপঞ্চ-যায় নিয়ে, হেঁটে।' কবি তৃষ্ণার্ত, কিন্তু দ্বিপ্রহরে কোনো জল মিলছে না, তাকে স্পষ্ট করবার জন্যেই 'স্ফটিক' 'জল' 'জিহ্বা' 'আল—' আবেগে ও গাম্ভীর্যে উচ্চারণ করতে চাইছেন, যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন, কথা বেরুতে চায় না, তাই কাটা কাটা শব্দ উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু দ্বিপ্রহরের ব্যাপকত্ব বোঝাবার জন্যে 'জরাবন্ধ্যাত্ব' চরণটি দীর্ঘ, ছেদচিহ্নও বহুদূরে প্রসারিত। লেখ্য কবিতার ক্ষেত্রে শ্রাব্য কবিতা এনেছেন, শব্দের ওজন বাড়িয়েছেন, এই দুটো দিক থেকে

সিদ্ধেশ্বর কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। যদিও আমার মনে হয় এগুলিও তিনি পেয়েছেন বিষ্ণু দে অমিয় চক্রবর্তী সুভাষ মুখোপাধ্যায় বুদ্ধদেবের কাছ থেকে, তাকে আরো প্রসারিত করেছেন মাত্র। পর্ববিন্যাসের ছাঁচে না ঢেলে পর্ব-বিন্যাস ভেঙে দিয়ে বিচ্ছিন্নতায় শব্দের স্বাতন্ত্র্য এনেছেন। বিপর্যস্ত পর্বগুলিকে একটা ছাঁচে ফেলা যায়, যেমন বলাকার ছন্দকে অমূল্যধন ফেলেছিলেন। কিন্তু যখন প্রচলিত ছন্দে লেখেন, তখন কবিতা এমনি বিবর্ণ হয়ে দাঁড়ায়, যে তা একান্ত অপাঠ্য বলে মনে হয়, 'যে জাতক' কবিতাটি তার নজির :

যখন ছিলাম অন্ধ-আত্ম নক্ষত্র-দেদীপ্যমান
শূন্য বিশালতা, উহ্, তথতা-আকাশ হিমাঙ্গন
ত্রিতল জগৎ স্বর্গ মর্ত্য অধস্তল উল্লঙ্ঘন
ছিল দেহী রক্তপিণ্ড পঞ্চেন্দ্রিয় ভ্রূণস্থপ্রমাণ
ছিল আচ্ছাদিত বর্ম, স্নেহ বন্ধ, মাতৃগ্রহ গন্ধ

ছককাটা বিবৃতি ছাড়া হৃদয়ের ও আবেগের কোনো চিহ্ন নেই, তাই একটি 'ছিন্ন সংলাপে' আবার উচ্চারণের আবেগে ফিরে এসেছেন। সিদ্ধেশ্বর উচ্চারণ আবেগের কবি, কিন্তু উচ্চারণের আবেগেই কবিতার প্রকৃত স্বধর্ম নিহিত নয়। এই বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্যেই কি 'কাব্যগ্রন্থ' আর প্রকাশ করলেন না ?

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শব্দের সংগীতে, ছন্দের লীলায় বক্তব্যের সাবলীলতায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এককালে আমাদের মনকে আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু কবিতার জগৎ থেকে তাঁর অপসরণ এখন রাজনীতির ক্ষেত্রে, তাই কবিতা এখন আর নিটোল হয়ে ওঠে না। ভাবের জটিলতা ও ভাষার কারুকার্য হারিয়ে গেছে, সংক্ষিপ্ত ও অতি-সংক্ষিপ্ত হয়েছে তাঁর কবিতা, সংক্ষিপ্ত কবিতার মধ্যে হঠাৎ চমকানো সঙ্কেত চিত্রকল্প মনকে ক্ষণিকের জন্যে মুক্তি দেয় : 'প্রজাপতি! প্রজাপতি! পৌষ এসেছে কাঁথা মুড়ি দিয়ে / গাছের পাতাগুলি হলুদ কেবল ঝরে, কেবল ঝরে / মাঝে মাঝে খুনীর মনেও সন্ধ্যার নিবন্ত তুষার আগুনের মতো লাল হয়ে যায়।' কিন্তু এখনকার অধিকাংশ কবিতাই ধাঁধার মতো, এবং রাগে ক্রোধে চিৎকারে ক্ষুব্ধ, ক্ষুব্ধতা কোনো প্রকারেই কবিতা জাগাতে পারে না।

অথচ এই কবিই 'লখিন্দর' লিখেছিলেন, সেখানে তাঁর কবিসত্তা পূর্ণ চৈতন্যে বিরাজিত, জগৎ ও মনের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, নতুন প্রত্যয়ে উদ্বোধিত, পৃথিবীকে কুরুক্ষেত্র ও ক্ষুব্ধ বলরামের স্মৃতি থেকে রক্ষা করা যায় না বলেই মাটিতে বুক রেখে ঘুমুতে চেয়েছেন। জীবনানন্দের ধারায়ই বলেছেন : 'এখানে এই ঘাসে হৃদয় ঢেকে নিয়ে ঘুচাবো দ্বন্দ্বের জয়ের ক্লান্তি / বলো না কথা পাখি'। এই বাস্তব দৈনন্দিনের মধ্যেই হঠাৎ আকাশে ছোঁড়া কল্পনার ঢেলায় বিস্মিত হতে চেয়েছেন। ইয়েট্সের মুখোশ খুলে বলেন : 'কান্নাকে শরীরে নিয়ে কার ঘরে কয় ফোঁটা দিয়ে গেলে আলো?' শরীরে কান্নার আলো মেখেই তাঁর কবিতা একদিকে মানবতায় উজ্জীবিত, অন্যদিকে বিদ্রোহে উচ্চকিত। নতুন জীবনের প্রার্থনায় শিশুর সঙ্কেতে অপূর্বতা পায়; 'সূর্য উঠছে, বান্ধবি শোণিত সিক্ত জননীগর্ভ ছিন্ন জেগেছে।' এই সূর্য শিশু স্বাধীনতার ও মুক্তির। এর পাশেই আছে ব্যক্তিচৈতন্যের দ্বন্দ্ব : 'প্রেমের রোগ নয়নে তার ঘুমের রোগ দেহে।' কবির ও যুগের যন্ত্রণাই এই সঙ্কেতে ব্যক্ত, তার সঙ্গে মিলেছে ক্ষণিকের মুহূর্ত বেদনা, এগুলির মধ্যে তাঁর বিচিত্র মনের ছবি পাওয়া যায়। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, 'লখিন্দর' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে কবিচৈতন্য সামগ্রিকতার বন্ধনে ঋদ্ধ। ছন্দ প্যাটার্ন স্বর ও স্বরের দোলা মিশ্র চিত্রকল্প, আর্কিটাইপের মধ্যে জাদু আনবার অনায়াস চেষ্টা, বিভিন্ন ফর্ম তাঁর অনুভূতিকে প্রকাশবেদ্য করেছে, একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, বক্তব্য অনুভূতির স্রোতে গন্ধ ছড়ায়। তাঁর স্বর যে অর্থবহ কতোখানি এই পঙক্তির মধ্যে তা প্রকাশিত : 'কালোর কানে কানে আলোর কী যে কথা/গানের মতো কথা গানের সুরে সুরে / বাঁশির সুরে সুরে কী যেন দেয়া নেয়া / পরান দেয়া আর হৃদয় নেওয়া বুঝি।' এই স্বরের মোহই শব্দগুলির অনুভব ও ছবি জাগায়। জটিল চিত্রকল্পের একটি সার্থক উদাহরণ : 'রুপোলি জ্যোৎস্নার মদে ভিজানো কোনো এক মেয়ের শরীর / স্নানের জলের মতো সে শরীর থেকে আলোর মদ গড়িয়ে পড়ছে।' সুতরাং রাজনৈতিক বিবৃতি ও ক্ষোভ তাঁর কবিচৈতন্যের মূল কথা নয়, তাঁর চৈতন্যকে আলোড়িত করেছে প্রেম, বিচিত্র রূপরসগন্ধবর্ণ। এগুলি ছেড়ে যখন জোর করে কবিতা লেখেন, সেগুলি তখন চোখ ধাঁধানো চমক হয়ে দাঁড়ায়। তবু সুর তাঁর সত্তার মধ্যে আছে বলে একটা হৃদ্যতা স্পর্শ করে। তাঁর কবিসত্তা

কিভাবে পৃথিবীর সামগ্রিক বোধকে একসঙ্গে গাঁথতে পারে, চিত্রকল্পগুলিই তার উদাহরণ: 'একাকী যুবতী চাঁদ মাঝরাতে ফাঁকা ট্রেনে চুরি করে দুর্ভিক্ষের চাল।' 'রূপকথার ছেঁড়া পাতার অন্ধকারে কেটে নেয় বুভুক্ষু ইঁদুর।' 'কখনো বিকেল এলে হংসবলাকার পাখায় ঘুমের স্বর নিয়ে তন্দ্রুতে কথা গানের মতো বাজে।' 'লখিন্দরে'র প্রথম দিকের কবিতাগুলির মধ্যে ক্লান্তিই মূল স্বর, একটা বিষণ্ণ ঘুমের কাতরতা কাজ করছে, ক্লান্তি অনেকটা সমাসোক্তির মতো। এই ক্লান্তি সম্ভবত জীবনানন্দ থেকে পেয়েছেন যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গতা। পদ্য প্যাটার্ন, বিভিন্ন ছন্দ, দোলা, অক্ষর চিত্র বিন্যাস, ছবি ও স্বর সব মিলে প্রথম দিকের কবিতায় একটা আবহ সৃষ্টি করে। কিন্তু শেষের দিকে সমাজসচেতনতা উৎকট, যুগের বীভৎস দৃশ্য তাঁকে পীড়িত করেছে, 'নচিকেতা' কবিতায় জীবনের প্রত্যয় প্রকাশ করেছেন: 'অগ্নিদগ্ধ দুই হাতে কতো বার খুলবে তুমি যমের দুয়ার?' এবং একেবারে শেষের দিকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার স্বরের জাদু চিত্রের মোহ কমে এসেছে, রাজনীতির দিকে এগিয়ে 'পরিশুদ্ধ মানবতাই জীবন' এ সত্য প্রকাশ করেছেন। সেগুলিই বর্তমান তীব্রতর সংবেদনা হারিয়ে অনুভবময় চিত্রের প্রকাশের বদলে ধাঁধায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু কবিচিত্ত যে দ্বিধা-বিভক্ত তাঁর একটি সম্প্রতি গদ্য লেখায় ব্যক্ত। প্রথমে বলেছেন: 'কবির কাজ থাকে নিজে পরিশুদ্ধ হওয়ার, অপরকে সুস্থ, নিরাময় কামনা করার এবং হয়তো হয়তো-বা নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে মিছিল বের করার।' শেষের দিকে জীবনানন্দ প্রমুখ কবিদের স্বীকার করে বলেছেন: 'যদি এই সময়ে তাঁদের মতো নির্জন কোনো শিল্পী তাঁর ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতাগুলি রক্তে নিয়ে ভিন্ন জগতের কবিতা রচনা করতে চান, সে কবিতা যদি প্রকৃত অর্থে সৎ ও স্বচ্ছ হয়, সেই শিল্পীকে বাংলাদেশ নিশ্চয় কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে না।' বুদ্ধিজীবী কবির সমস্যা!

রাম বসু

বামপন্থী কবিতা পড়ে আমার মনের মধ্যে প্লেটোর দ্বৈত বিরোধের সমস্যা শুধু জেগে ওঠে, একদিকে আইডিয়ার পরিচ্ছন্ন জগৎ, অন্যদিকে ইন্দ্রিয়ের জগৎ। কান্টের মতো এঁদের জগৎ দুভাগে বিভক্ত, একদিকে বিশ্ববস্তুর মধ্যে

নিয়ম শৃঙ্খলা দেখতে পান, অন্যদিকে বস্তুর স্বরূপে (thing-in-itself) কোনো ধারণা বা নিয়মের সীমানা খুঁজে পায়না। এঁদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আইডিয়ার পরিচ্ছন্ন জগৎ, তাকেই জোর করে প্রকাশ করতে চান কবিতার ক্ষেত্রে, কিন্তু বিরোধ বাঁধে ইন্দ্রিয়ের অন্ধকার জগতের সঙ্গে. তাই এঁদের কবিতায় এই দ্বৈরথ চিত্র সর্বত্র। কিন্তু দুটোকে মেলাবার শক্তি অথবা দুটো থেকে নতুন বোধের আবির্ভাব খুব কম কবির মধ্যেই রয়েছে, বামপন্থীরা অন্ধজগতের কথা বাদ দিয়ে আশার ও আকাঙ্ক্ষার কথা অনুভূতিময় শব্দের পরিবর্তে চিত্রের রূপান্তরের বদলে শুধু বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই দ্বৈত বিরোধে মনের গহনের জটিলতা নেই, দুটোই বাইরের জগতের ভাবনা, আর যারা তথাকথিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং একান্ত আধুনিক, বামপন্থীদের ভাষায় যারা বুর্জোয়া বাস্তবতার ধারক, তারা যুঙের a complexis oppossitorum এ ভুক্তভোগী। একদিকে ইন্‌স্টিংক্টের প্রভাবে দুলতে থাকে, অন্যদিকে বুদ্ধির তীব্রতার জলতে থাকে, এই দুই চরমের দ্বন্দ্বেই তার জ্বালা বিপর্যয় এবং নিষ্ক্রিয়তা। যুঙ এই ট্রাজিক দ্বন্দ্বের সমাধান খুঁজেছেন দুঃখভোগ ও আত্মসমর্পণের মধ্যে। ইয়েট্‌স্‌ই বোধ হয় আমাদের যুগে বিরোধের জ্বালায় ক্ষতবিক্ষত নায়ক। এ ছাড়া বামপন্থী কবিদের মধ্যে বয়সের অভিজ্ঞতায় কবিতা রচনার ক্রমস্তর পেরিয়ে যাঁরা স্থিতধী হতে চেয়েছেন বা হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্লেটোর সেই বিরোধ নেই, আকাঙ্ক্ষার বিবৃতি নেই, সহজ হৃদয়ে সরল আন্তরিকতার সঙ্গে মানবতার সামগ্রিক বোধকে শুধু প্রকাশ করেন, কাব্যের ফর্ম ছন্দ মিল স্তবক সংগীত চিত্রকল্প সুর কোনো কিছুকেই আর শিল্পনৈপুণ্যের ক্ষেত্রে এনে শিল্পসৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত করতে চান না। কবিতা একটি কঠিন সংগঠন কর্ম, কবিতার উপাদান সামগ্রিকতায় কি ভাবে সমন্বিত হয় একটি কবিতায়, কি ভাবে বহু ও বিভিন্ন বস্তু ঐক্য আনে—এগুলি সম্বন্ধে তাঁদের অবহেলা চূড়ান্ত। যেখানে অলংকার ও চিত্রকল্প থাকে না, সেখানেও সহজ ও স্বভাবউক্তির মধ্যে বিভিন্ন বস্তুর ঘনবিন্যাসে একটা নিবিড় চিত্ররস আসে, ছবি ভেসে ওঠে, অনুভূতি নিবিড়তা পায়, যেমন রবীন্দ্রনাথের এ দুটি পঙক্তি : 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে / আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে।' এ প্রায় গদ্য উক্তি, শুধু সুরের গোপন জাদু কাজ করছে, কিন্তু মেঘজমা আঁধার দিনের সঙ্গে কবির নিঃসঙ্গতা বোধ ও আর্তি দুটি বিভিন্ন বস্তুকে সমন্বিত করছে বলেই উপাদানের জটিল ঐক্য বোধ

আনে, সংগঠন সৃষ্টি হয়। কিন্তু যেখানে এটা হয় না, সেখানে কবিতা হয়ে ওঠে না, কারণ কবিতা শিল্পসৃষ্টি, যে সৃষ্টির সঙ্গে প্রকৃতিজগতের জটিল ঐক্যের সাদৃশ্য আছে। সৎ কবিদের এ কথা ভুললে চলে না। রাম বসুর কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে এতো কথা বলতে হলো এই কারণে যে তিনি কবি-জীবনের প্রথমে প্লেটোর দুই জগতের বিরোধ নিয়ে সংগ্রাম করেছেন, পরিচ্ছিন্ন বোধকে প্রকাশ করবার দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অতি সাম্প্রতিক কবিতায় কবির ভূমিকা ত্যাগ করে মানবদরদী ফকিরের ভূমিকা নিয়েছেন। একথা আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না যে সমগ্র সত্য বলে কিছু নেই, সত্যের দিকে আমাদের যে গতি তা একটা সত্যের রূপ বা ফর্ম, এই ফর্মের বিশ্বাসের মধ্যেই আমরা নিরন্তর ঘুরে বেড়াই, কিন্তু ফর্মের মধ্যেই আমাদের অস্তিত্বে সত্য সামগ্রিকতা লাভ করতে পারে। অস্তিত্বটাই বড়ো ও প্রধান কথা, এইঅস্তিত্বেই বহুপ্রকার বিচিত্র সত্য পূর্ণতা পায়, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট সত্যের সীমায় অস্তিত্বের বেদনায় আমরা পৌছতে পারি না। ইয়েস্‌পারের এই মানবমনের বিশ্লেষণের সঙ্গে কবির নিরন্তর সৃষ্টক্রিয়ার যোগ আছে, কিন্তু ফকির হলে মনের এই নিরন্তর সৃষ্টিক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায়, এমন কি উদার ব্যাপ্ত বেদনাও খুব একটা তীব্রতা আনতে পারে না, তা শুধু বেদনাই, তাতে প্রকাশ থাকে না। প্রকাশের মধ্যে সমস্ত অস্তিত্বের স্রোত সমগ্রতা পায়।

'যখন যন্ত্রণা' কবিতাগুচ্ছে সমাজের হতাশা ও যন্ত্রণাই প্রকাশ পাচ্ছে : 'এই বুক অন্ধকার, এই মন কুমীরের দাঁতে ল্যাজের ঝাপটে আলুথালু নটেগাছ'। ছন্দমিল ধ্বনি অনুপ্রাসে মঙ্গলাচরণের সাদৃশ্য বড়ো মারাত্মক, ছককাটা কথার চিত্র অবিরল। মাঝে মাঝে সুকান্তের বিবৃতি উচ্চকিত, সময় সেনের চিত্র উন্মথিত, কিন্তু এ সব সত্ত্বেও রাম বসুর প্রকৃতিপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে, নিসর্গ-প্রীতির সৌন্দর্যের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের বীভৎসতা একটা বৈপরীত্য জাগাচ্ছে। 'দুপুরের অকূল বাতাসে শালের অরণ্যে উত্তর সাগরের গান / ধূসর নীল পাহাড়ের সংহত উদার গাম্ভীর্য', এর সঙ্গে 'জীবিকার' জোয়াল ঘাড়ে মানুষ ফাঁদে পড়া মহিষ' বিসদৃশ চিত্রের সমাহার। অথচ রোমান্টিকতার স্তব্ধতার বুঁদ এখানে আছে : 'আচ্ছন্ন করেছে ঘন গন্ধের অন্ধকার।' আর আছে গ্রাম বাংলার চিত্র। কিন্তু কবির প্রত্যয় ব্যক্ত এখানে : 'নদীর গানে ত শ্রমের কল্লোল / নারীর চোখে শস্যের গভীরতা / শিশুর কলরবে মেঘের

উচ্ছ্বাস / তাকে রক্ষা করতেই পৌরুষ।' এই সবই বাইরের কথা, আর কথার যেখানে এতো ফুলঝুরি, শিল্পের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। সেদিক থেকে 'অন্তরালে প্রতিমা' বাক্‌সম্পদে অনেক ঋদ্ধ এবং মনে হয় রাম বসুর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ।

'অন্তরালে প্রতিমা' কবিতায় একটা গোপন রোমান্টিকতা প্রকাশ পেয়েছে, এই রোমান্টিকতা স্তব্ধতার, নৈঃশব্দ্যের, গভীরতার, নিঃস্বতার, অন্ধকারের, এখানেই তিনি বুঁদ হতে চান। 'আমার নীরবতা তোমার পায়ের নীচে স্বর্ণরেখা নদী।' 'নক্ষত্রখচিত সৌধ হীরা-দ্যুতি নির্জনতা একী?' 'শিরার জটিল বাগানে রক্তের প্রথম আদেশ সঞ্চারিত শস্যের ভিতরে / আমি যা গড়ি তা এক নিভৃতের পান্নার কোরক।' 'কোথায় শ্যামল ভূমি, স্তব্ধ হ্রদ আমার আশ্রয়।' আর বর্তমানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বলছেন: 'আমার দিগন্ত নেই, ঈশ্বর অঙ্গার, স্মৃতি, পাপ / কেবল তৃষ্ণার ধোঁয়া অবরুদ্ধ দেহের শিবিরে / কুণ্ডলী পাকিয়ে স্তম্ভ, দেওয়ালে খিলানে মনস্তাপ / নিষাদ শিকারে মত্ত লক্ষ্য ভেদ সে করে তিমিরে।' আর তাঁর আকাঙ্ক্ষার জগৎ হচ্ছে:

জানি সে-ই কবি যে চণ্ডাল মহা শ্মশানের
নির্মোহ নিজের কেন্দ্রে, প্রলয় নাচের সমে যার
হাতের সলীল তাল। অস্তিত্বের কুটজ কুসুম
মাধুর্য কোরকে ধরে প্রেম, দাহ, অম্লান ফসল
মুখের কলঙ্ক চিহ্ন মুছে নেয় শিখার বল্লরী
বিচূর্ণ নিসর্গে আজ অপরূপ আত্মার প্রতিমা

এই সমস্ত উক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'যে ধ্রবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে / মিলাব তাই জীবনগানে। গগনে তব বিমল নীল হৃদয়ে লব তাহারি মিল / শান্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে / বাজায় উষা নিশীথ কূলে যে গীত ভাষা / সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে মোর নবীন আশা' এ সমস্ত বাণীকেই স্মরণ করায়, শুধু নতুন শব্দের রূপনির্মাণে অভিনবত্ব এসেছে।

এই গ্রন্থের প্রথমদিকে কবির অস্থিরতা ও দোদুল্যমানতা দুই বিরোধী চিত্রে প্রকাশিত। এর পরে শস্যের ভেতরে দুধ, মাটির গাঢ়তাপ, হাঁপরের মধ্যে গনগনের কথার সমাচার উপলব্ধি করেও আত্মস্থ হতে পারেন নি, 'সব আছে, নেই আত্মস্থ হবার শক্তি।' কিন্তু শেষের দিকে স্থিরতায় এসে

পৌঁছেছেনঃ 'অন্তর্দাহ সাম্রাজ্যের মাঝখানে, শিকড়ের জন্মের স্বদেশ / অস্থিরতা আমাকে ছোঁবে না।' এবং তাঁর কবিসত্তায় সমগ্র কিছু বাঁধতে চেয়েছেনঃ 'সত্তায় সমগ্র গাঁথো / মানুষ, পৃথিবী, রোদ, অগ্নি, ইচ্ছা, নদী।' এই স্থির বিশ্বাসের মধ্যেই তাঁর পরিণতি ঘটেছে, এবং কবিতার মধ্যেই তা ঘটে। এই কারণেই তিনি বলেন 'কুমীরের ক্লিন্ন মুখ তাই ঢের শ্রেয় / অনু-গণিতের গুপ্ত বিষধর প্রতিভার চেয়ে।' এই উপলব্ধির প্রশান্তি 'অন্তরালে প্রতিমা'য় সুস্পষ্ট। এর আগে ব্যথার তীব্রতায় ও ব্যর্থতায় বলেছিলেনঃ 'আমি আর রূপান্তর চাই না শর্বরী / দেখেছি মৃতের মাংস পৃথিবীর উর্বরতা হয় / এবং তাতেই ধন্য, আমি যেন কৃতজ্ঞতা হই।'

রাম বসু যদিচ আধুনিক বামপন্থী কবি, তবু তাঁর শব্দে বর্ণনায় নিসর্গপ্রীতি রোমান্টিক কবিদের মতোই প্রকাশ পেয়েছেঃ 'নিম্নভূমি রূপবতী, সমারোহ চোখের তারায় / সরু পথ সুপ্ত, সাপ, ডোরাকাটা করমের বন / মেরুজ্যোতি সমুদ্রের আলুথালু উল্লাসে গর্জায় / সবুজ ফেনার পাখি গায় মাখে স্ফটিক নির্জন।' 'চিতাবাঘিনীর মতো নদীটা জ্যোৎস্নার জঙলে / মোহিনী কণ্ঠে কতবার ডেকেছে পাতালে বাসরে।' কিছু কিছু চিত্রকল্প জীবনানন্দের শব্দকে স্মরণ করায়ঃ 'বুড়ি চাঁদ ঘুরে ঘুরে বিনাশের দিকে হাঁটে শেষে'। কিন্তু এই নিসর্গ-প্রীতি তাঁর সত্তার গভীর উপলব্ধি থেকে উঠে এসেছে, তাই এতো স্বচ্ছন্দ, এবং সুরের জাদুতে প্রতীকিত। জীবনের প্রত্যয় এতো স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে এই কারণেই, কোথাও মনে হয় না এ প্রত্যয় চেষ্টাকৃত। প্রকৃতির সঙ্গে প্রেম ও নারী এক হয়ে গেছে। 'তরুমূলে থাম যদি স্তব্ধতার মতো অবারিত নিসর্গে সম্পূর্ণ হয়ে'। অথচ আধুনিক কবির মতো প্রেমের তীব্র প্যাশনের অভাব নেইঃ 'মাতাও মাতাও তুমি উন্মাদক নাভিকুণ্ডলের / রোমাঞ্চ কস্তুরী গন্ধে, দাঁতে কাটো বিদ্যুতের হার / উন্মুখ জিভের ডগা গোলাপের মতো সুষমার / মুখের হীরক দীপ্তি রহস্যের দূর মণ্ডলের।' এ ছবিগুলিই রাম বসুর কবিতায় একই বক্তব্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন আবহ নিয়ে এসেছে। এবং ছবি সম্বন্ধে নিজেও সজাগ: 'উপমার বাঁকে দৃশ্য অদৃশ্যের মুখ ভ্যাখে যেন।' এই কারণেই দৃশ্যের বিচিত্রতা তাঁর কবিতায় বারংবার এসেছে, এবং জীবনানন্দের কবিতায় যে শব্দগুলি ধ্বংসের ক্ষয়ের, রাম বসুর কাছে তা আনন্দের প্রত্যয়ের আশার। যদিও মঙ্গলাচরণের শর্করা নয়, কিন্তু শব্দে

তিনিও সংগীত ধ্বনি আবহ তৈরি করতে চান ; 'অক্লান্ত শূন্যতা তুমি শেষে গ্রাস করে নেবে নাকি / অথবা বাজাবো আমি নীল শূন্য বেহালার মত।' এর ঠিক বিপরীত কোটিতে তরুণ সান্যাল, ওঁর শব্দ কর্কশ এবড়োথেবড়ো। রাম বসুর কবিতার ত্রুটি হচ্ছে একই কথা বারংবার বলেছেন, ছন্দের মধ্যে গদ্য ছাড়া পয়ারের আর কোনো বৈচিত্র্য নেই, শব্দের প্রতীকগুলি একই ভাবে নির্ধারিত, এলিঅটের শব্দের প্রতীক বারবার দেখা দিয়েছে : 'আমরা অন্তিমে নিবেদিত / সে অন্তিম আদির সূচনা।' একটি কবিতায় মাত্র ব্যঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণত রাম বসু 'অন্তরালে প্রতিমা'য় কোনো বিবৃতি দেন নি, সবই উপলব্ধির চিত্রিত শব্দ, শুধু শেষের কবিতার মধ্যে একটি অসংগত পঙক্তি মারাত্মক ভাবে আঘাত দেয় : 'ধ্বংসের লালসা থেকে মানুষকে রক্ষা করা কবিতার কাজ।' রাম বসুর কাব্যভাষা সম্বন্ধে অনেকের আপত্তি হচ্ছে এই যে তিনি স্মৃতিমন্থিত শব্দের ব্যবহার করে আধুনিক হয়েছেন, ট্রামবাস র‍্যাশন সিনেমা এরোপ্লেন ক্রেন পেরাম্বুলেটার বুলডজার প্রভৃতি শব্দ থাকা প্রয়োজনীয়। এর উত্তর হচ্ছে যে কবিতায় শব্দ আর্কিটাইপ হয়ে ওঠে, যদি রাম বসুর চিত্তে এই শব্দগুলি আর্কিটাইপ হয়ে উঠতে না পারে, তাহলে তাকে জোর করে ব্যবহার না করে সততার পরিচয় দিয়েছেন, তরুণের মতো কৃত্রিমতা আনেন নি।

'হে অগ্নি, প্রবাহ' কবিতায় আগের মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে, তবে কবিতার মধ্যে আর হৃদয়ের টেন্‌সন কিছু নেই। প্রত্যয় এতো দৃঢ়, আনন্দের বিহ্বলতা এখানে চরমতম, তাই বলে কামনা বীভৎসতা ব্যথা যে নেই, তা নয়, তবে তা ক্ষণিক্। মনে হয়, বোধের উক্তি আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে, নিটোলতা ও সংহতি নেই, কিন্তু শেষের 'গায়ত্রী' কবিতা প্রার্থনায় বেদমন্ত্রের মতো উচ্চারিত, এগুলি কবিতা কি না তার বিচার উঠতে পারে, কিন্তু উপলব্ধি ও প্রত্যয় অত্যন্ত স্বাভাবিক। এখান থেকেই ঋষি ফকিরের আবির্ভাব। 'হে নারী, যে তুমি প্রেমিকা জননী আমাদের আচ্ছাদিত/কর যেন কৃষ্ণপক্ষের নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করে চেতনা / হে অদিতি, আমাদের ব্যাপ্ত কর একটি নিটোলে যেন / হৃদয় হয় হোমাগ্নি ;কবিত বাক্‌রূপ ধ্বনি।'

অরবিন্দ গুহ

এলিঅটের পর কবিতার জগতে অনেকাংশে একটা দুর্বার বোধ কাজ করছে যে কবিতাকে বিনা দ্বিধায় বুদ্ধিগ্রাহ্য অথবা জটিল অনুভূতির অরণ্যে নিবিড় করে তুলতে হবে। ফলে যাঁরা আকাশ আলোর বেদনায় অতি সহজেই মুগ্ধ হয়ে তাঁদের বিস্মিতবেদনা প্রকাশ করতে চাইতেন, তাঁরা আজ সংকুচিত, নতুবা সেই বেদনাকে জটিল করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে মূল সুরটাকে ব্যাহত করেন। 'নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত' কবিতা গ্রন্থটির মধ্যে কবির সেই প্রেম-সম্পর্কিত মুহূর্ত বেদনায় অলংকৃত, সেই অলংকৃত চিত্রই এই কবিতার প্রাণ। 'স্বাদগন্ধ' 'জনান্তিকে' 'রঙেরেখায়' কবিতা তিনটি ছাড়া প্রায় সব কবিতাই প্রেমের বেদনায় চিত্রিত আল্পনা, কোনোটিতে নায়িকাকে লক্ষ্য করে, কোনোটিতে প্রেমের বেদনায় কবিচিত্তের বিধুর আলোড়নে। মিলন নয়, ব্যর্থ প্রত্যাখ্যান, অভিমান, না-পাওয়ার বেদনা, ভয়ে দূরে চলে আসা, স্বৈরিণীর প্রেমে ঘৃণা ও হতাশা, রোমান্টিক অতীতচারিতা এগুলিই অরবিন্দের কবিতার মূল সুর। বর্তমানের এই ক্ষীণায়ু জীবনে অন্তরে প্রেম ভালোবাসার দুর্বার কামনা, কিন্তু পরম লগ্ন কখনো এলো না, তাই রহস্য উন্মোচিত হলো না, প্রাণে সাড়া মিললো না, দিতে গিয়েও দেওয়া হলো না, নিলো না। তবু কবির প্রার্থনা, 'তুমি আসবে অন্ধকারে। ঘাসে আলো কেন ? পুনর্বসু অনুরাধা অতন্দ্র আকাশে।' তাই কবির কাছে নারী কখনো সমুদ্র, কখনো নদী, কখনো ভালোবাসাই দুর্জয় নদী। নদীর কল্পনা ও চিত্র তাঁর কবিতায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, 'নদীর হৃদয়ে ক্ষুধা শরীরে পিপাসা আমার প্রেম জানে তার নদীতে বসতি।' প্রেম ও প্রকৃতি মাঝে মাঝে মাঝে একাকার হয়ে গেছে। এবং আরম্ভ কবিতাটির মধ্যেই কবির ব্যক্তিজীবনের দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে, প্রেমে ধরা দিতে পারছেন না : 'বারংবার যাত্রারম্ভ জলে স্থলে বাহিরে অন্তরে এবং প্রত্যেকবার ফিরে আসি নিঃসন্তান ঘরে।' প্রেমের কবিতার মধ্যে এই মনোভাব ও ইন্দ্রিয়তীক্ষ্ণতা বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

অরবিন্দ রোমান্টিক, অরবিন্দ প্রেমিক। প্রেমের মুহূর্তকুসুম ফোটাতে তাঁর যত্নের ও কষ্টের প্রয়োজন হয় না, স্বচ্ছন্দ কথ্যভঙ্গির সংগীতের প্রচলিত ছন্দেই কবিতার চিত্ররূপ ধরা পড়েছে। ছন্দের সচেতনতা ঢেকে গেছে গতির প্রবাহে। মনে হয়, কবিতার জন্যে তাঁকে শ্রম স্বীকার করতে হয় না,

বেদনাকে প্রকাশ করে ফেলাই যেন তাঁর লক্ষ্য। এই কারণে তাঁর কবিতায় পুরনো ছন্দ, পুরনো ভাষা, পুরনো সম্বোধন এসেছে। চেষ্টায় এগুলিকে বাদ দেন নি। এবং একটি বেদনার ভাষাকেই নানাভাবে কবিতার মধ্যে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। প্রেরণাবিষ্ট কবির মতোই তাঁর রচনার ধারা চলেছে। কবিতার ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র তিনি পরিশ্রমী গবেষক, এবং হাসির গল্প রচয়িতা। তাঁর কবিতায় রূপকথার মায়ামোহ ব্যঙ্গহাসি কিছু থাকলেও পরিশ্রমের কোনো চিহ্ন নেই, ফলে কিছু অতিভাষণ এসেছে, একান্ত গদ্য উক্তি ব্যবহৃত হয়েছে, তবু অরবিন্দ তাঁর বেদনাকে চিত্রিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমার দুঃখ অরবিন্দ আজ ইন্দ্রমিত্র। গবেষণামূলক বৃহৎ গদ্য গ্রন্থেই তাঁর আগ্রহ, কবিতা আজ তাঁর কাছে পরিত্যক্ত।

১. অনেক সময় কবিসত্তার বিরোধীচেতনা, বিপরীতচেতনাও বিপরীতধর্মী কবিকে ভালোভাবে বুঝবার সহায়তা করে। বুদ্ধদেব বসুও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা আলোচনায় সেই বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর 'কালের পুতুল' বইয়ে। তিনিই প্রায় তিরিশ বছর আগে বলেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যের অভিনবত্ব পদে পদে চমক লাগায়। এই চমক বিষয়বস্তুতে ও আঙ্গিকে। তিনিই প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমকে পরিহার করে কাব্য রচনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর আঙ্গিকের দখল অসাধারণ। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঁর কবিতা সমষ্টির মুক্তিতে নিবেদিত, অগাধ উল্লাসে উদ্দীপিত, বিশ্বাসের ঝোঁকে তাঁর কবিতা সরল, জনগণের প্রতি তাঁর নজর থাকবার জন্যে অনেক কবিতাতেই উচ্চস্বর ধ্বনিত, বক্তৃতার ঢঙ উচ্চকিত। কিন্তু সবচেয়ে কৃতিত্ব হলো তাঁর কবিতায় ছন্দের দোলা, রচনায় একধরনের lilt, বিশ্বাসের সঙ্গে আবেগ, আঙ্গিক ও ছন্দের নিপুণতা, মাত্রাপ্রধান ছন্দে মিলহীনতা, পয়ারে হসন্ত শব্দের সঙ্কোচন ও প্রসারণ; ব্যঙ্গের সঙ্গে বেদনার দীর্ঘশ্বাস, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চিত্রকল্পের রূপান্তর, সংক্ষিপ্ত বাক্যের ধৈর্য ও স্থৈর্য, ব্যঙ্গের বঙ্কিমা। সুভাষের কবিতার মধ্যে বিষ্ণু দে ও সমর সেনের প্রভাব স্পষ্ট। প্রবন্ধের শেষে বুদ্ধদেব এ কথাও বলেছেন যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে সরল কবিতার পাশে জটিল কবিতাও রয়েছে, এবং এই কবিচরিত্রের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেতে হলে মানুষ ও কর্মীর ভূমিকা ছেড়ে কবিসাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। আমাদের দেখা দরকার, বুদ্ধদেবের এই আশা পরবর্তীকালে কার্যকরী হয়েছে কিনা।

২. একালে মণীন্দ্র রায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বিরোধিতা করেছেন অন্যভাবে। তাঁর মতে এই কবিতাগুলির বলবার ধরন আপত্তিকর, কারণ এগুলি আপ্তবাক্য, এ ঘোষণা মাত্র, কবির ব্যক্তিহৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ নেই। প্রথমত তা নয় কিন্তু ঘোষণা বা আপ্তবাক্যের মধ্যে মনবুদ্ধি হৃদয় যদি একাত্ম থাকে, তাহলে সেও এক প্রকার অভিজ্ঞতা বইকি। কিন্তু দেখতে হবে, সত্যি তাতে অভিজ্ঞতা ধরা পড়েছে কি না।

পঞ্চাশের কবির জবানবন্দী

পঞ্চাশের কবিদের ছেলেবেলা কেটেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সাইরেনের শব্দে, অগাস্ট বিপ্লবের নিপীড়নের যন্ত্রণা কাতরতার অনুভবে, বোমের শব্দে ও আগুনের তাপে, জাতীয় জীবনের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ও সমগ্র পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতার বিপ্লবে। নেতাজির মুক্তি সংগ্রাম একদিকে উদ্দীপ্ত করেছে, কংগ্রেস ও কম্যুনিস্টনীতি আমাদের পেছু টেনে ধরেছে। ইংরেজের সাহিত্যের পৃথিবীব্যাপী খ্যাতির জোয়ারে ভেসেছি, আর মাউন্টব্যাটন নামক ইংরেজের শয়তানিতে দলীয় নেতারা পা দিয়েছে দেখে চোখের জল ফেলেছি। আমাদের কৈশোর কেটেছে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায়, বঙ্গবিভাগের খণ্ডিত ও নিঃসঙ্গতার বোধে এবং গান্ধির মৃত্যুতে। অখণ্ড ভারতের রাজনৈতিক নেতার মৃত্যু ভারতকে খণ্ডিত ও মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে গেছে। বাল্য ও কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে যখন আমরা পা দিয়েছি আমাদের হৃদয়দুয়ারে তখন প্রজাতন্ত্রের আশা আলো জাগাচ্ছে, ভাঙনের মধ্যেও কিছু প্রেরণা জাগছে, কিন্তু লেডি মাউণ্টব্যাটনের সঙ্গে নেহেরুর ওঠাবসা, কমনওয়েল্থ নামক অদ্ভুত পদার্থের কাছে ভারতের বশ্যতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইংরেজি রাষ্ট্রনীতির অনুকরণ, যৌবনে আমাদের শুধু দ্বিধার সমুদ্র জাগিয়েছে। এবং আরো দ্বিধা জাগিয়েছে আশা উজ্জ্বল কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রসার। আমাদের কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষাকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে, রক্ত নিঙড়ে নিয়েছে যখন দেখেছি কম্যুনিস্টদের ওপর নির্মম অত্যাচার চলেছে, জাতীয় ভাষা নিয়ে সংশয় ও বিচ্ছিন্নতা গড়ে উঠেছে, চোদ্দ কি ষোল রাষ্ট্রের মধ্যে বিভেদ বুদ্ধি জেগেছে, মানুষে মানুষে ঈর্ষার হিংসা জ্বলে উঠেছে। জাতীয়তাবাদপ্রচারে ভারতের ঐক্য প্রচেষ্টার অন্তরালে ভাষা নিয়ে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য মাথা চাড়িয়ে উঠেছে এবং তাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকার দেশের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছিল। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো লোকেরাও ক্ষমতার লোভে দেশের সত্তা বিকিয়ে দিয়েছিলেন। কেন্দ্র চাইছে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ঐক্য চাপিয়ে দিতে, আর অন্য রাজ্যগুলি চাইছে শক্তি অধিকার করতে, দুয়ের মধ্যে বিরোধ তীব্র

হয়ে উঠেছে। এই বিরোধ হতাশাকে তীব্রতর করেছে অগণিত উদ্বাস্তু। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা মাঝে মাঝে আনন্দে নেচে উঠেছি, উন্মাদ হয়েছি নির্বাচনের আনন্দের আশায়। কিন্তু যখন নির্বাচিত ব্যক্তিদের চেহারা দেখেছি, তখন অশিক্ষিত জনগণের দ্বারা মূর্খ নির্বাচনের প্রহসনে আমাদের চিত্ত ব্যথায় মুচড়ে উঠেছে। একদিকে পরিকল্পনার নামে জাতীয় উন্নতি ও চাকরির সংস্থানের প্রচেষ্টা, অন্যদিকে শাসনতন্ত্রের অসুবিধার জন্যে বিশৃঙ্খলা শিথিলতা ও দুর্বলতার জন্যে চুরি, কাজে ফাঁকি, অসৎ ও চতুর বণিক শ্রেণীর ধনবৃদ্ধি, সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব। এই সব কারণেই আমাদের যৌবনের রক্ত রাঙা দিনে সোভিয়েত রাশিয়ার হাতুড়ি ও কাস্তে লাঞ্ছিত রক্ত পতাকা লাল সমুদ্রের দিগন্ত আনতো। কারণ জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থীদের বিশ্বাস-ঘাতকতা, বিশেষ করে বিপিনচন্দ্র পাল ও সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর, আমরা ভুলতে পারিনি। আমাদের মনের গহন গভীরে বিশুদ্ধ বিপ্লবের বেদনা কাজ করছিল, মনের অতি গোপনে ব্যারিস্টার বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতার কেতা দুরস্ত বুলি হয়তো আমরা পছন্দ করতুম না, কারণ তাদের সত্তার বিরোধ আমাদের দুঃখ দিত।

আমরা এই বিরোধের মধ্যে সময় ও জীবন কাটিয়েছি, ফলে আমাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র, জটিল, ব্যাপক। সাহিত্যে যা প্রতিফলিত হয়েছে, তার মধ্যেও এই দ্বন্দ্বমূলক জটিলতা কখনো ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে, কখনো প্রত্যক্ষ বাস্তবের রূপ নিয়েছে। আমাদের চোখের সামনে চল্লিশের প্রচারধর্মী কবিদের ব্যর্থতা জ্বলজ্বল করছিল, সুতরাং শিল্পের দুয়ারে আমরা নত মস্তকে সৌন্দর্য ভিক্ষা করতে দ্বিধাবোধ করিনি। কিন্তু টানাপোড়েনেই আমাদের দশকের বড়ো কথা। বৈদেশিক রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের নেশায় নেহেরুর কথায় আমরা উল্লসিত হয়েছি, চীন রুশকে ভাই ভাই করেছি, কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংরেজ-নির্দেশিত বিচ্ছিন্নতা ও শাসন, নির্বিকার ঔদাসীন্য, অর্থাৎ নন্‌কমিট্যাল থিওরি ও 'নিউট্রাল মনিজ্‌ম্‌' আমাদের যৌবনের রক্তে বিদ্রোহ জাগিয়ে দিয়েছিল। সর্বোপরি এ কথা আমরা কেউই ভুলতে পারি নি, আমাদের দেশকে বিচ্ছিন্ন করবার মূলে রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থবুদ্ধি ও সিংহাসনাধিকারই ছিল মৌল সত্য, দেশের প্রতি ভালোবাসা নয়। আমরা দেখেছি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী রাজনীতিবিদ্‌দের কথার চাতুরি এবং

শয়তানি, মুখে মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা বলছে, অথচ নিজের ছেলেমেয়েকে বিলেতে শিক্ষা নিতে পাঠাচ্ছে। তাই যখন লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুকে শেয়ালদা হাসনাবাদ বসিরহাট ধুবুলিয়ার রাস্তায় পথে ঘাটে শেয়ালকুকুরের মতো এক সঙ্গে ডাস্টবিন থেকে খাবার খুঁটে খেতে দেখেছি, দেখেছি ন্যাঙটো হয়ে যুবতী মেয়েকে দেহ বিক্রি করতে, তখন সমস্ত জাতীয়তাবাদী নেতাদের ওপর ঘৃণা ও ধিক্কার জেগেছে। আজকে দেশের অরাজকতার মূলে রয়েছে নেহেরুর অনির্দিষ্ট সংকল্প, কার্যে ও কথায় বিরোধিতা, পুঁজিপতিদের কাছে তাঁর পরম নির্ভরতা এবং তাঁর গদির ওপর লোভ। আজকে কংগ্রেসের খণ্ড বিচ্ছিন্নতা, গজিয়ে-ওঠা বিভিন্ন পার্টির দৌরাত্ম্য, বণিক ও সাধারণ মানুষের অসততা, চরমপন্থী যুবকদের ধ্বংসের আনন্দ আমাদের যৌবনের সংবেদনশীল হৃদয়ে গোপনে কাজ করছিল। ষাটের দশকের শেষের দিকে এর প্রতিক্রিয়া তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। চল্লিশের দশকের কবিদের তবু একটা জাতীয়তাবোধ কাজ করতো, কিন্তু আমাদের কাছে সেই আদর্শ লুপ্ত। হারিয়ে-যাওয়া সুভাষচন্দ্রের জন্যে শুধু একটা বিস্মৃত বেদনা মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করতো।

বিভিন্ন টেন্‌সনের মধ্যে আমাদের জীবন কেটেছে, সেই টেন্‌সনকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি হৃদয়ের গভীর কান্নায় আমরা মাঝে মাঝে উচ্চকিত হয়েছি। আমাদের রোমান্টিকতার সঙ্গে ব্ল্যাক রোমান্টিকতা, আলোর সঙ্গে অন্ধকার, দেহকামনার সঙ্গে অতীন্দ্রিয় বোধ, স্বদেশকে ভালোবাসার সঙ্গে নিরাশ্রয়তা, নাস্তিত্বের সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাস, পাপ ও পুণ্য পাশাপাশি হাত ধরে চলেছে। যাঁদের কাছে শিল্পের নিখুঁত সামগ্রী পেয়েছি, আমরা তাঁদেরই গ্রহণ করেছি, গ্রহণের ব্যাপারে কোনো কট্টর মতবাদ আমাদের বিভ্রান্ত করে নি। বিভ্রান্ত করে নি বলেই পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্যে বহুল বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাবে, যা ষাটের দশকে বিরল।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সাংখ্যের সৎকার্যবাদে বলে কারণই কার্য ঘটায়, ছানার কারণ দুধ, আগুনের কারণ কাঠ। অসৎকার্যবাদী বৌদ্ধেরা এই সত্যে বিশ্বাসী নয়, বলেন, ছানার কারণ দুধ হতে পারে না, যদিও দুধ থেকেই ছানা হয়, দুধ ও ছানার মধ্যে অনেক ঘটনা রয়েছে, পরিবর্তন রয়েছে, সেগুলি না হলে ছানা

হতে পারতো না, দুধ শুধু ছানার হেতু-প্রত্যয়, দুধের পর ছানার আবির্ভাব ঘটেছে। কবিতার শব্দের অর্থের ধ্বনির ব্যাপারেও শব্দের হেতু-প্রত্যয়কে প্রাথমিক অর্থে ধরতে পারি, কবিতার পঙক্তিতে শব্দ আগে-পরের আকর্ষণ-বিকর্ষণে, শব্দে বিন্যস্ত ধ্বনি ও অর্থ স্মৃতি-স্নাত বেদনার অভিঘাতে পঙক্তির অনুষঙ্গে বোধের একটা সামগ্রিকতা নিয়ে আসে। কপিলের মতো বলতে পারি না একটি নির্দিষ্ট শব্দ কারণরূপেও সেই একটি বিশেষ কার্যরূপ অর্থকে সর্বদা উৎপন্ন করে, অথবা ভর্তৃহরির মতো একথাও জোর দিয়ে বলতে পারি না যে প্রত্যেক শব্দেরই বিশিষ্ট শক্তি নিহিত রয়েছে। 'পশ্যন্তী' অবস্থার মধ্য দিয়ে সমস্ত সুখদুঃখসংসারঅভিজ্ঞতার আশ্রয়রূপে, শব্দবোধের প্রকাশ হলেও, বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন শব্দের পারস্পরিক সংযোগে বস্তুজগতের ঘটনাকে নূতন ঘটনায় রূপান্তরিত করে। সেখানে শব্দের অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট শক্তিও অন্য শক্তির সঙ্গে মিশে নূতন শক্তি লাভ করে। অলোকরঞ্জনের কবিতার শব্দ এমনিভাবে শব্দের অভিঘাতে নূতন শক্তি লাভ করেছে, শব্দের দ্বারা প্রকাশিত ঘটনা জগতে নূতন ঘটনার জন্ম দেয়। পার্থক্যটা আরো স্পষ্ট করে বোঝা যাবে সুধীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে অলোকরঞ্জনের ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের পার্থক্যে। স্ফোটবাদের এক জায়গায় আছে শব্দ যখন বুদ্ধির রাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকে, তখন শুধু অর্থকে উদ্বোধিত করতে থাকে, এবং প্রাণের মধ্যে অধিষ্ঠিত হলে শব্দের প্রকাশ ঘটে বাক্যে। সুধীন্দ্রনাথের সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের মধ্যে এই বুদ্ধি ও প্রাণের পার্থক্যই রয়েছে ; দুজনের কবিতা থেকে কবিতার কিছু অংশ তুলে দিলে কিছুটা স্পষ্ট হয় :

কিন্তু যেথা সর্পিল নিষেধ
স্বপুচ্ছের উপজীব্যে সাধে আত্মবেদ

প্রমিতির বিষবৃক্ষে, অমিতির অচিন্ত্য অভাবে। সুধীন্দ্রনাথ : প্রার্থনা।

প্রতিটি শব্দ এখানে অর্থের আভিজাত্যে উচ্চকিত। স্ফোটবাদীদের মতোই প্রত্যেকটি শব্দ বিশিষ্ট শক্তিতে নিহিত। প্রত্যেক শব্দের ধ্বনির উচ্চারণে, বিলুপ্তিতে, স্মৃতির সাহায্যে একটি অর্থবোধের সামগ্রিকতা কিছুক্ষণের জন্যেও বাক্যের মধ্যে আমাদের চিত্তবৃত্তিকে থামিয়ে দিতে বাধ্য হয়, বাক্যের মধ্যে একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সম্পর্ক নদীর মতো সহজ স্বচ্ছন্দ নয়, একটি শব্দের ধ্বনির ও অনুষঙ্গের সংগীতের গন্ধ আলো অন্য শব্দকে গলিয়ে দিতে পারছে

না, ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না, কোনো শব্দই প্রেমের আত্মত্যাগে কোনো কিছু সমর্পণ করছে না, এবং গ্রহণের দাবিতে কিছু অধিকার করছে না। গ্রহণবর্জনে নির্বিশেষ সত্য হয়ে উঠছে না, অথচ বৈয়াকরণিক পদ্ধতিতেই বুদ্ধির সাহায্যে সংযোগ ঘটছে। এর কারণ অতি-নিরূপিত সংস্কৃত শব্দের প্রচুর ব্যবহার। বলা বাহুল্য, শব্দ প্রয়োগের ব্যাপারে সুধীন্দ্রনাথ সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর বুদ্ধিনিরূপিত শব্দআদর্শ অনুসরণ করেছিলেন ইংরেজ দার্শনিকদের পথ ধরে। অলোকরঞ্জন এদিক থেকে তৎসম শব্দ অত্যধিক ব্যবহার করেও শব্দের আলো ও গন্ধ ছড়াতে পেরেছেন :

আলিঙ্গনের মহোৎসবে
রাশি-রাশি কূর্পাসক উড়ে পড়ে পঞ্চশরের মন্ত্রণায়—
এক প্রান্তে, একা,
একমাত্র ব্যতিক্রম সুদেষ্ণা আমার
আলীঢ় ভঙ্গিতে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
অথৈ বৃষ্টিতে ভিজছে, বৃষ্টি এসে কৌতূহলী দাঁত…

অথবা : বোধিপর্ণের মতো এ যে বড়ো দারুণ শীর্ণতা
সুদেষ্ণার, তার
দক্ষিণ হাতের অরত্নির দীর্ঘ অনশন সহিষ্ণু দীধিতি
কোমরের তূণে
ক্ষমার মতন স্নিগ্ধ রক্তাভ অক্রোধ কাঞ্চীদাম ;

এখানে তৎসম শব্দগুলি স্থির হয়ে নেই, জ্বলছে এবং জ্বালাচ্ছে, ছাড়ছে ও নিচ্ছে, প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য শিল্পের অঙ্গভঙ্গি ছবির মতো দুলে উঠছে। 'মহোৎসবে'র সঙ্গে 'আলিঙ্গন' এবং তার সঙ্গে 'কূর্পাসক' 'পঞ্চশর' কামনার বহ্নিকে তীব্রভাবে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। 'আলীঢ়' শব্দটির বৈদিক অর্থ মার্জিত, সাধারণ অর্থ তীর নিক্ষেপ কালে সামনে পেছনে দু'পায়ের অবস্থান। কূর্পাসকের পাশে আলীঢ়ভঙ্গি বৈষম্যের জাদু সৃষ্টি করছে। শব্দগুলির কিছু অপরিচিত, কিন্তু ছন্দের ধ্বনির সংগীতে সুর-সৃষ্টি করছে, এই সুর উচ্চকিত অনুপ্রাসে নয়, গোপন ধ্বনির উত্থানপতনে ঝঙ্কারে, অন্ত্যমিলে। অপরিচিত শব্দের বাধা সরে যাচ্ছে আবেগময় সংগীতের কাঁপনে। অলোকরঞ্জনের পক্ষে এটা সম্ভব

হয়েছে তাঁর নিজস্ব বাক্‌রীতির সঙ্গে এটা স্বাভাবিক হয়েছে বলে। তাই বলছিলুম, শব্দ প্রাণে অধিষ্ঠিত হলে বাক্যরূপে তার প্রকাশ ঘটে। উপরি-উদ্ধৃত অংশে স্বতন্ত্র শব্দের কোনো মূল্য নেই, সমগ্র বাক্যে শব্দের আলো ছিটকে পড়ছে। দুরন্ত অথচ সংহত আবেগে কাঁপছে। অর্থযুক্ত সংগীতই অলোকরঞ্জনের আরাধ্য।

এই শব্দবিন্যাসের সঙ্গে যেটি কাজ করছে সেটি হলো ছন্দধ্বনিমিলের বিস্ময়কর নিপুণতা, যা জাদুর নামান্তর। অলোকরঞ্জন এতো অনায়াসে অন্ত্যমিল বুনতে পারেন যে আমাদের মনের দ্বারে বিস্ময়ের অভিঘাতে নূতন জগতের দিগন্ত অনুরণিত হতে থাকে, শ্রবণজাত আনন্দ হৃদয়ের উত্তেজনার সঙ্গে মিশে আমাদের বিশ্বস্ত বিচারবুদ্ধিকে পর্যন্ত প্রভাবিত করতে থাকে। 'মাউথ অর্গান-'এর, সঙ্গে 'অর্ঘ্যদান', 'খনি'র সঙ্গে 'মা-মণি', 'ডোমপাড়ায়' এবং 'তম্বুরায়' 'যাবো না'র সঙ্গে 'দুর্ভাবনা' অদ্ভুত মিল রচনা করে। শুধু মিল নয়, পঙক্তির মধ্যে শব্দবিন্যাসে ধ্বনির আন্দোলিত হিল্লোল প্রসারিত করে দিয়েছেন। 'তবু অবাক, আঁখিপদ্মে ছিল না ভর্ৎসনা / অনুক্ত আকৃতি ছিল রক্ত কোকনদে।' 'অ' এবং 'আ' এর ধ্বনির সমাহারে 'ত' 'ক' এবং 'ন' এর গুঞ্জনে পঙক্তি দুটি দুলিয়ে দিয়েছেন। এবং ধ্বনির এই কম্পনের সঙ্গে পরস্পর শব্দের প্রভাবে এবং অনুক্ত শব্দের আবহে নিত্য প্রবহমান অর্থের চঞ্চলতা জাগিয়ে দিচ্ছে, প্রত্যেকটি শব্দ থেকে ধ্বনিময় অর্থ পারস্পরিক শব্দকে প্রভাবিত করছে। ধ্বনি ও অর্থের প্রতীত্যসমুৎপাদ এমনিভাবেই গড়ে উঠছে এখানে। কারণ এই ধ্বনি ও অর্থের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরস্পর বিরোধী অর্থসমন্বিত শব্দের সংঘাত, সঙ্কেতের ব্যবহার, সংহত, জমাট ও রহস্যময় নিবিড়তা, 'রোজ রাত্রে একই গোলাপ আবৃত্ত করো না', 'গোলাপ' এখানে অনুভূতির সঙ্কেতে জ্বলছে। যদিও অলোকরঞ্জন নির্দেশতথ্য ব্যবহার করেন খুব কম, তথাপি যখন এর ব্যবহার করেন, তখন নির্দেশের ধ্বনিচিত্রময় অভিজ্ঞতাকে নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করে নেন। তাঁর কাব্যের দুর্বোধ্যতা এসেছে পঙক্তির অতি সংহতির জন্যে, বিচ্ছিন্ন উপমা, ছন্দস্পন্দজাত নূতন অর্থের ব্যঞ্জনা, সুনির্বাচিত বিশেষণও কিছুটা সাহায্য করেছে এ ব্যাপারে।

অলোকরঞ্জন শব্দবিলাসী নয়, শব্দ তাঁর কাছে জীবন, তাই ছন্দের সঙ্গে তাকে বাঁধতে কষ্ট হয় না। তাঁর ছন্দোকুশলতাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বাংলার

তিনটি ছন্দ অবলীলাক্রমে তিনি ব্যবহার করেন, কারো প্রতি যে বিশেষ পক্ষপাত আছে তা মনে হয় না। ছন্দের সঙ্গে পঙক্তির দৈর্ঘ্য, মিলবিন্যাসও তাঁর নিপুণতার পরিচয় দেয়, মাঝে মাঝে ত্রিয়োলেতের মতো মিল ব্যবহার করেছেন, প্রথম চতুর্থ পঙক্তি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙক্তির মিলের সঙ্গে মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে অনেকগুলি পঙক্তিকে জুড়ে মিল ব্যবহার করেছেন, ফলে কবিতাটি নিটোল হয়ে উঠছে। পর্ব ব্যবহারে যদিচ তিনি প্রচলিত রীতিকেই মেনে চলেন, তবু বুদ্ধদেবের অনুসরণে পয়ারের প্রথম আট মাত্রার পর্বে তিন-দুই-তিন, দুই-তিন-তিন, চার-আট ব্যবহার করেছেন, 'মুখ' কবিতাটি তার উদাহরণ। তবে এই ধরনের নজির খুব নেই। এবং মাত্রাবৃত্তের আন্দোলিত ধ্বনিতে তাঁর স্বচ্ছন্দগতি নির্ভার হয় বেশি। অলোকরঞ্জনই এযুগে এখনো দুঃসাহসিকতার সঙ্গে ধ্বনির মোহে চলতি ভাষার সঙ্গে তথাকথিত কাব্যিক ভাষা ব্যবহার করতে সঙ্কুচিত হন না, 'জ্বলে উঠছে' বোঝাতে 'জ্বলি' ব্যবহার করেন, 'খিলখিল' তাঁর কাছে 'খিলিখিলি' হয়ে ওঠে। 'অর্পিলাম', 'তব' ব্যবহার করতে বাঁধে না, মুখের ভাষাকে, গদ্য উক্তিকে, একালে তরুণ কবিদের মধ্যে তিনিই এখনো কাব্যিক ভাষায় উন্নীত করবার চেষ্টা করেন। হয়তো এই কারণেই স্বাতন্ত্র্যের জন্যে বহুল পরিমাণে তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন। 'দীপঙ্কর বিতৃষ্ণা', 'এই জানালা থেকে আমি তোমার জননীকে / উদয় সূর্য দেখিয়েছিলাম চৈত্র নবারুণে'। এবং কৌতূহলী পাঠকের কাছে ধরা পড়বে যে পূর্ব যুগের অতি তৎসম শব্দ বর্তমানকালে তাঁর রচনায় কমে এসেছে, মুখের ভাষার কাছে এসেছেন। তৎসত্ত্বেও তারাপদ, সুধেন্দু, শক্তির মতো ব্যবহার করেন না, অথচ বিনয় ও আলোকের থেকেও শব্দবিন্যাস একান্ত পৃথক। অলোকরঞ্জনের শব্দ সম্বন্ধে একটি জিনিসই আমার চোখে পড়ে, এ ভাষা আবেগের, দ্বন্দ্বমথিত নাটকীয় চরিত্রের তীব্র বিরোধ ও ভাবনাকণ্টক এর মধ্যে নেই। এবং মাঝে মাঝে একটি ইমেজ দিয়েই কবিতায় তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। কিন্তু তবু, তাঁরই ভাষায় শব্দের 'বাণীবিহীন মন্ত্র' প্রচলিত বাধা সরিয়ে নূতন রহস্য সৃষ্টি করে। অনুভূতির আদিমতার সঙ্গে ভাষার এই মন্ত্রযুক্ত আদিমতা আমাদের এক নূতন অনুভূতির জগতে নিয়ে যায়।

১৮৭২ সালে গ্যেটে প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছিলেন : 'প্রকৃতির চিন্তা আছে, সে নিরন্তর ভাবতে পারে, মানুষের মতো নয় প্রকৃতির মতোই ভাবতে পারে।

তার ভাষা নেই, কথা নেই, কিন্তু সে ভাষা ও হৃদয় তৈরি করে, যার সাহায্যে সে কথা বলে, অনুভব করে। আমি হচ্ছি সেই যে প্রকৃতি সম্বন্ধে কথা বলে। না, এ হচ্ছে সেই প্রকৃতি যে সত্য মিথ্যা সব কিছু বলছে। সব জিনিসের জন্যে দোষ তারি, কৃতিত্ব তারি।'

অলোকরঞ্জনকেও এই প্রকৃতি নারীরূপে তাঁকে সৃষ্টি করেছে, তাঁর অনুভবের মধ্যে বাক্‌স্পন্দের মধ্যে প্রকৃতিই কথা বলছে, কিন্তু এই নারী রমেন্দ্রকুমারের মতো মোহনীয় জাদু আকর্ষণে মনকে স্নিগ্ধ প্রশান্তির মধ্যে ডুবিয়ে রাখে না, সুধেন্দুর না-পাওয়ার বেদনার আকাঙ্ক্ষা আর্তিকে ব্যাকুল করে না, অথবা শারীর কামনার গর্ভে গতির স্তব্ধতা আনে না। এই প্রকৃতি উদাসীনতায় রহস্যময়, বিশ্বাসঘাতকতার চাতুরিতে নিপুণ, মাংসল লোভে উচ্চকিত। এই নারীই তাঁর কাছে ঈশ্বরী হয়ে উঠেছে। সুতরাং ঈশ্বরকেন্দ্রিক কবিতার মধ্যেও সেই ছলনাময়ী রমণী বারংবার কবিচিত্তকে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে, তাই 'একটি পুরুষ, তার চোখে তবু আক্রোশ, রুক্ষতা :/অন্যটি নারী, তার চোখে মুখে অটুট স্বর্ণলতা।' এই কারণেই নারীর মধ্য দিয়ে তাঁর হৃদয়ের ঈর্ষা বেদনা হতাশা মারাত্মক, তীব্র। পেতে চাইছেন অথচ পাচ্ছেন না বলে হতাশা, এর কারণ রমণী, 'ভাবো নি, কেন না সমর্পণকে তুমি জয়তীর ধর্ম বলে মনে করো।' অথবা রমণীকে পাবার জন্যে ব্যর্থতা নয়, রমণী তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে, কিন্তু সেই ধৃত রমণীর বুকের গভীরে অন্ধকার কালো চুলের অতলে কবির ব্যর্থতা জাগছে, 'আচম্বিতে চুম্বনের বৈশ্বানরে দেখি আমায় রেখে গিয়েছে সেই স্বাবলম্বী নারী।' 'বিনা অছিলায় আমার সঙ্গে যে মেয়ে মিশতো তাঁর ঠোঁট উচ্ছিষ্ট।' দয়িতের মৃত্যু সত্ত্বেও, রমণীর শাড়িতে কামনার রক্তজবা। সময়ের পরিবর্তনে ব্যক্তিগত বিশ্বের কস্তুরিও পাল্টে যায়। রমণী চলে যাওয়ার জন্যই অগাধ শূন্যতা। 'হিরণ্য কঙ্কুয়ে/দেহাবেশে দারুণ দীপ্তি দেখতে পাবো ভেবে/হত্যাভূমির কাছে গিয়ে আমার ভুবন আবার উঠল কেঁপে/মৃতদেহের ভূমণ্ডলও গ্রাস করেছো অ্যাসিড দিয়ে ড'লে।' নতুবা : 'কুয়াশা অগ্নিময়/আমাকে শিখিয়ে দিল প্রতিটি মন্দির নিম্নে রাখে/প্রলয় শেষের ভস্ম/আমাদের দুজনের ঘরে/হে অটুট তুমি বুঝি রেখেছো অযুত গৃহদাহ।' এই রিক্ততা শূন্যতা ব্যর্থতাই তাঁর প্রেমের কবিতাগুলিকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে, তবু এই নারী ঈশ্বরীর কাছেই, সুদেষ্ণার মতো আদর্শ আকাঙ্ক্ষার কাছে তাকে

সমর্পণ করতে হয়েছে, 'তবু আবার, অন্তিম দুঃসাহসে তোমার বেদীতে আমি রক্ত চন্দন অর্পিলাম।' এইখানেই বুদ্ধদেবের অনুসরণে বোদ্‌লেয়ারীয় নারী প্রকৃতিকে জড় বলে ঘৃণা করেন নি তিনি। হয়তো নারীর কাছ থেকে এই ব্যর্থতা পেয়ে নিষ্পাপ শিশুর আদিমতার মধ্যেই মুক্তি চেয়েছেন : 'ভগবান জানি না, কাকে প্রেম বলে জানি না/মানবো যা বলবে, মা-মণি।' প্রকৃতির এতো বিরূপতা সত্ত্বেও তার কাছে নিজেকে যেমন অর্পণ করেছেন, তেমনি প্রকৃতির অন্য রূপও প্রত্যক্ষ করেছেন : 'নারীর বুকের দুটি সত্তা বুঝতে পেরে গেছি।' এই দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যেই তাঁর প্রেমের কবিতা দুলছে। তীব্র হয়ে উঠছে, সংরক্ত আবেগে হৃদয়কে মুচড়ে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের 'তোমার সৃষ্টির পথ' কবিতা ব্যাখ্যায় অলোকরঞ্জনের বক্তব্য অসংগত ঠেকলেও তাঁর নিজের কবিতা প্রসঙ্গে প্রকৃতির ব্যাখ্যা মূল্যবান : 'এই নিয়তি বা ছলনাময়ী কবির ঈশ্বরী, যিনি দিতি ও অদিতির যুগ্ম প্রতিমা, যাকে কবি প্রকৃত পক্ষে তাঁরই স্বোপার্জিত পুরস্কার দেওয়ার অধিকারিণী বলে সাব্যস্ত করেছেন। এই দাত্রী সুতরাং নূতন কিছু দিচ্ছেন না, কবির মৌলিক ঐশ্বর্য তাকে প্রত্যর্পণ করেছেন।'

প্রেমই অলোকরঞ্জনের কবিতার মূল সুর, এখানেই তাঁর চৈতন্য ও অবচেতনা তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে প্রতিভাত করছে, শিল্পরূপে সঙ্কট ব্যক্ত হচ্ছে। আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শারদ পূর্ণিমায় সৌন্দর্যপ্রেমলক্ষ্মীর জন্যে প্রতীক্ষা করছেন, কিন্তু কেউ আসছে না, রমণী অন্তর্হিত, কাউকে কেউ আহ্বান করে বলছে না কে জাগছে, তাই কোজাগরী নিষিদ্ধ, অথবা রমণী অন্তর্হিত হয়েছে বলে তার প্রতি আকাঙ্ক্ষা নিষিদ্ধ, অথচ শারদ পূর্ণিমায় তারই জন্যে ব্যাকুলতা। এই রিক্ততাই এই কাব্যগ্রন্থের মূল কথা, হয়তো ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুলতা থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বর দেখা দিচ্ছেন না, জেগে আছেন, তবু ঈশ্বর নিষিদ্ধ। এই ঈশ্বরকে সব দিয়েও ঈশ্বর ধরা দেন না, তাই বলে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারান নি। বরং ঈশ্বরের দেওয়া সমস্ত নির্মম পরীক্ষা চ্যালেঞ্জ-স্বরূপ স্বীকার করে নিয়ে তাঁর আত্মপ্রত্যয়কে উচ্চকিত করেছেন : 'যে দিকে ফেরাও উট এই ছাখো করপুটে এক গণ্ডুষ/বিশ্বাসের জল, তুমি পান করো, আমি জল না খেয়ে মরবো।' ঈশ্বরের এই নিষ্ঠুরতা কখনো তিনি করুণাময় বলে ব্যঙ্গ করেছেন, তবু তাঁর বিশ্বাস, 'রুক্ষ উপেক্ষার তলে কম্বল মখমল শিহরে।' নারীর মতোই ঈশ্বর তাঁর কাছ থেকে চলে গেছেন, এই হারিয়ে-

যাওয়া নারীর ও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই তাঁকে ফিরে পাবার জন্যে আর্ত ব্যাকুলতা প্রার্থনায় ভেঙে পড়েছেন ; 'তুমি চলে গেছো বলে আমাকে গাহন করাবার কেউ নেই, যত্রতত্র সেরে নিই মধ্যাহ্ন ভোজন।' এখানেই প্রেমিকা ও ঈশ্বর প্রায় একাসনে, যেমন 'গীতাঞ্জলি'র কিছু কিছু কবিতায়। অর্থের ও ভাবের এই চঞ্চলতাই ভক্তির নির্দিষ্ট পথ থেকে সরিয়ে এনে কবিতাগুলিকে রহস্যময় ব্যঞ্জনা দান করেছে। প্রেমের এই আকুল বেদনা বিরহ, বিচ্ছেদ নিষ্ঠুরতা অথচ তাকে কেন্দ্র করেই হৃদয়ের আর্তি যদি ভগবৎ বিষয়ক কবিতায় না থাকতো, তাহলে কবিতাগুলি সাধকগীতি হতো মাত্র। কবি নিজেই এ সম্বন্ধে বলেছেন : 'এক আজানের নদীর জলে তোমার এবং ঈশ্বরের মুখ একই সঙ্গে পাঠ করেছি।' 'ছেলেটি' : 'নতুন মন্দির হবে বলে' 'একটি ভুল প্রায়শ্চিত্ত' 'পথের পথিক' 'পথে' 'তীর্থযাত্রী' প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্র-অনুসৃত ধর্মসাধনাই বিভিন্ন চিত্রকল্পে প্রতীকে ফুটে উঠেছে। একদিকে পৃথিবীর এই সৌন্দর্য, অন্যদিকে ঈশ্বরকে পাবার জন্যে অন্তহীন পথ চলা, একদিকে তাঁর কাতর প্রার্থনা ; 'কেমন করে এড়িয়ে যাই বসুমতীর মায়া ?' অন্যদিকে সীমাহীন পথের প্রান্তে শূন্যতাবোধের কান্না, 'এখন কোথায় যাবো'। এমনি করে পুরনো মূল্যবোধের সঙ্গে অলোকরঞ্জনের কবিতার যোগসূত্র রচিত হয়েছে। এবং অলোকরঞ্জনই তরুণ কবিদের মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যের পুণ্যধারা তাঁর কবিতার মর্মমূলে অনুপ্রবেশ করিয়ে নিতে পেরেছেন, চর্যাপদের ও বাউলের সহজিয়া তত্ত্ব, তান্ত্রিকের দেহধর্মী যোগ, বৈষ্ণবের ঈশ্বর প্রেম, শাক্তগীতির ভক্ত-ভগবানের চ্যালেঞ্জ, রবীন্দ্রনাথের পথের পথিক ভাবনা, তাঁর কবিতায় চকিতে আলোছায়া খেলে যায় : 'চেয়ে দেখি চন্দ্র এসে পাপীর হাতের ছাপ সুষুম্নার মাপ তুলে নিয়ে আমায় দেখায়।' 'আমি কি দুখেরে ডরাই ? আমি তো প্রস্তুত হয়ে আসি/রাখি কুবলয় কোকনদে বুক, বুকে মোহারী বাঁশি।' এখানেই অলোকরঞ্জনের কৃতিত্ব তাঁর অধিক পড়াশোনা সত্ত্বেও কবিতার দেহে মনে পাণ্ডিত্যের কাঠিন্য তৈরি করেননি।

'যৌবন বাউলে'র অলোকরঞ্জন রোমান্টিকতায় বাস্তব জগৎ থেকে সরে গিয়ে মনের বনে বাউল সেজেছিলেন। এই কাব্যগ্রন্থে রাখালিয়া গানের প্রতি দু'একটি কবিতায় অনুরক্তি ও স্বীকৃতি আছে, কিন্তু প্রকৃতির সংবেদনা, তার নিষ্ঠুরতা, মোহ, প্রেম, আকর্ষণে অলোকরঞ্জন স্নান করেছেন। যদিচ

অলোকরঞ্জন প্রকৃতির আকর্ষণবিকর্ষণের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, তথাপি তিনি সামাজিক জীব, জগতের কুৎসিত জঘন্যতা তাঁকেও পীড়া দেয়, 'ক্ষুধার্ত পথ পথের দুরূহ প্রান্ত, কাঁকন-খোয়ান এই গলি, দস্যু অধ্যুষিত ফাটলস্ফারিত প্রকাণ্ড ময়দান' তিনিও পার হতে চান, যুদ্ধবাজ মানববিরোধীদের বিরুদ্ধে তিনিও জোর দিয়ে বলেন, 'তোমাকে মেধাবী তেজে তীব্র অভিশাপ দিতে হবে।' তিনিও বাপের হোটেলে-খাওয়া রকবাজদের দুষ্কৃতি লক্ষ্য করেছেন। যেহেতু কর্মের পথ কবির নয়, ইচ্ছা থাকলেও অনুভূতির জগতে ঘোরা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই, সেই হেতু শুধু অনুভূতির বিশুদ্ধ জগতে উত্তাল বেদনায় ভেঙে পড়েছেন: 'আমার শুধু চোখের দেখা, আমার শুধু কান্না পাওয়া হাত-পা-বাঁধা এখন আমার আলোয় ও অন্ধকারে।' প্রকৃত কবির এই সামগ্রিক ব্যাপ্ত অনুভূতি ছাড়া আর কিই-বা থাকতে পারে? তিনি মন্ত্রের ভেতর সমস্ত জগৎকে নিয়ে মন্ত্রের বাইরে সুন্দরের দরবারে শীতের উঠোনে কাঁপছেন।

২

বিষয়বস্তুর দিক থেকে 'রক্তাক্ত ঝরোখা'র কবিতাগুলি 'নিষিদ্ধ কোজাগরী' থেকে খুব একটা পৃথক নয়, কিন্তু 'প্রেমিকের সংসারে' অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুচ্ছে অলোকরঞ্জনের ভাষাশিল্প সংহতির নামে এমন এক চূড়ান্ত সীমায় এসে পৌঁছেছে যেখানে 'ধাঁধা' ও সংহতির পার্থক্য প্রায় ঘুচে গেছে, সম্ভবত এই অনুভূতি কাজ করছে বলে বুদ্ধিজাত শব্দের ব্যায়ামে ধ্বনিমোহ কাজে লাগিয়েছেন, চমক আনতে চাইছেন, বিরোধী শব্দের সমন্বয়ে আকস্মিক চমক ঘটাতে চেয়েছেন, এবং কবিতার শেষে প্রশ্নের অকস্মাৎ ধাক্কা দিয়ে অনুভূতিকে অন্যদিকে মোড় ঘোরাতে চেয়েছেন। শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন যেন পাল্লা দিয়ে এখন কবিতার সংহতি আনতে গিয়ে তার আয়তনকে ক্ষুদ্রতম করতে চাইছেন, কিন্তু আমরা ভুলে যাই, স্বাস্থ্যের জন্যেই ব্যায়াম, পেশার জন্যে নয়। তবে শব্দের এই ব্যায়াম, ধ্বনির নিপুণ কারুকার্য, অপ্রত্যাশিত অন্ত্যমিল, গোপন সুরের ধারা, বিরোধী শব্দের সমন্বয়ে ও খণ্ডচিত্রে অনেকটা রমণীয় হয়ে ওঠে, কিন্তু এগুলি সবই করেন মাথার সাহায্যে, ধ্বনিময় শব্দের সাহায্যে অন্ত্যমিলের সৌকর্য যে

তিনি আনেন, তাতে হৃদয়বৃত্তি সাম্প্রতিককালে কতখানি কাজ করে বলা কষ্টসাধ্য। সংস্কৃত শব্দের প্রতি তাঁর দুর্বার আকর্ষণও একপ্রকার 'অব্‌সেশন'। ফলে অলোকরঞ্জন নিজেকেই নিজে অনুকরণ ও অনুসরণ করছেন, কাব্যে শব্দের ও ধ্বনিমিলের টেক্‌নিকের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। 'প্রেমিকের সংসারে' কবিতায় এবংবিধ দোষ দেখা গেলেও 'রক্তাক্ত ঝরোখা' ও 'রুদ্রাক্ষের ঋতু'র কবিতায় তা নেই, সেখানে আবেগকেই তিনি সংহত করেছেন, সংহতির কৌশলকে ধাঁধায় নিয়ে যান নি, ফলে কবিতাগুলিও বিভিন্ন আকারের হয়েছে। 'অন্য অন্য রমণীরা অঞ্জনার মতো অসহায় পঙক্তিতে' 'অ' ধ্বনির অনুপ্রাস কাজ করছে, 'ন' এসে কোমলতা যুক্ত করেছে। এর সঙ্গে যদি তুলনা করি এই পঙক্তিটি তাহলে অস্বাভাবিকতা প্রকট হয়ে উঠবে: 'বিকিনি-পরা বিদেশিনীর সহজ বিকিকিনি চেনো কি তুমি? 'চিনি'।' যমক এবং অনুপ্রাস দুইই এখানে কবিকে প্রলুব্ধ চৈতন্যে মাতিয়ে দিয়েছে। ধ্বনির নূপুর বাজাবার জন্যেই চেষ্টিত: 'যজুর্মন্ত্রের উচ্চারণে শরৎ সম্মোহ রচে অধ্বর্যু', অধ্বর্যু—যিনি যজুর্বেদের মন্ত্র পড়ে অগ্নিতে আহুতি দেন। এখানে কে কাকে অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছে? শরৎ যদি অধ্বর্যু হয় তাহলে কিসের জন্যে কাকে সে আহুতি দিচ্ছে? শরৎ যে সম্মোহ রচে তাতে কোন ধ্বনির উচ্চারণের প্রয়োজন হয় না, নীরব নীল নীলিমার বুকে শাদা মেঘের খেলা ও নীচে প্রকৃতির শোভা সব মিলে নীরবতারই সমারোহ। কিন্তু কবিকে পেয়ে বসেছে 'অধ্বর্যু' শব্দ। 'নিষিদ্ধ কোজাগরী'র শেষের দিকে এ মারপ্যাচে ঝুঁকেছিলেন, এখানে প্রায় পরিসমাপ্তির পথে।

আমার বক্তব্য হচ্ছে সংস্কৃত শব্দের মোহ এবং প্রসঙ্গনির্দেশ অলোকরঞ্জনকে অনেক সময় জোর করে পেয়ে বসে। এই গ্রন্থে সুষুম্না, হেরুকভ্রবীণা, বৈধী-রাগানুগা ভক্তি প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এগুলি অনুভূতির ক্ষণিক উদ্‌ভাসন মাত্র; বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে প্রগাঢ় বোধ থেকে জাত নয়। কিন্তু এর মধ্য থেকেই তাঁর জ্বালাময় অনুভূতির তীব্র প্রকাশ ঘটে চিত্রকল্পের চমৎকারিত্বে। যেমন: 'অভুক্ত দেবতার অর্ঘ্যের আপেল চিরে রক্ত আমি সইতে পারছি না'। ব্যক্তিগত এই তীব্র বেদনার থেকেই যুগের সর্বজনীন বেদনাকে প্রশ্নের আকারে প্রকাশ করতে চাইছেন এই চরণ দুটির মধ্যে: 'গোধূলির বিন্ধ্যাচলে আমাদের অকৃতার্থতা কি অর্ঘ্য ও দেবতা মিলে আমাদের

শতাব্দীর পাখি ?' এর সঙ্গে তুলনা করলে 'বেহায়া সময়' কবিতাটি নিছকই বুদ্ধির কারসাজি বলে মনে হয়।

এখানে স্পষ্টভাবে জীবন সম্বন্ধে, নারী সম্পর্কে অলোকরঞ্জনের বোধ বিভিন্নভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, 'আহত মানুষ পশুর মতন, নখরে / আদিম পাথর, যতোই টগর করবী / তাকে দাও, সে যে হাঙরের মতো গিলবে সে-ফুল হাঁ করে / আমার এক অভিজ্ঞতায় সে এক মানবী।' নারী সম্বন্ধে এই তিক্ত মনোভাবই তাঁর কবিতায় বিচিত্র স্বাদ এখানে তৈরি করেছে, কখনো চলে-যাওয়া রমণীর জন্যে তীব্র বেদনা, মনে হয় পথ হারিয়ে যায়, নিজস্ব রাজধানী হারিয়ে যায়, কখনো প্রেমিকা তাঁর ভিতরের মধ্যে এবং প্রেমিকার মুখের মধ্যেই বাঁচামরার ঐকতান। কখনো প্রকৃতি ও প্রেমের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। এই রমণীকে দেখেই তাঁর মনে হয়েছে : 'কিন্তু তুমি লাস্যের চকিতে বশ করেছ মৃত্যুকে, হে মৈত্রেয়ী প্রলয় !' রমণীর নষ্টামি অর্থাৎ একনিষ্ঠ প্রেমে বিতৃষ্ণা কবিকে পাগল করে তোলে, তাই আসক্তির সঙ্গে জ্বালা যুগপৎ তাঁকে দগ্ধ করে; এই দগ্ধ চিত্তের দহন চিত্র অনেক কবিতাতেই ধরা পড়েছে, তাঁর তীব্র প্যাশন উৎকটভাবে ব্যক্ত হয়ে পড়েছে :

> নিরপেক্ষ মধ্যপথের হিরণ তৃপ্তি বুকে আঁকড়ে
> চলতে যাবো এমন সময় তুমি আদিম রক্তহ্রদে
> নেয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে ঠোঁট দিয়ে খুব তলায় হাতড়ে
> খনিজ কোন প্রদীপ আনলে, তারপরে সেই প্রদীপ ভাঙলে
> আছড়ে ফেলে পাড়ের উপর ; অন্ধকারে আমার খ-ধূপ
> জ্বলছিল যেই তুমি তখন হাসছিলে খুব একতলাতে।

এই নারী সম্বন্ধে জীবনবোধের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনদর্শনের কথাও ব্যক্ত হয়েছে, গির্জার ঝরোখায় বিচিত্র ছবির মতোই তাঁর জীবনবোধে দাগী দস্যু, পুণ্যলতা, কুরূপা স্বৈরেখী একত্র হয়েছে : 'এই সব চরিত্র ছবি আমার হৃদয় রক্ত লেগে / ঘূর্ণিযোগে অবশেষে ঈশ্বরে পরিগণিত···একি···।' এবং হেমন্তনিশীথে বাতিঘরের রক্তাক্ত ঝরোখায় এই সব চিত্র ধরা পড়ছে। তাই শ্রমণের মতো তিনি শুধু চলতে চেয়েছেন, জেগে থাকতে চেয়েছেন : 'তবে আমার এখন থেকে জেগে থাকার আমৃত্যু-ভূমিকা—। নিসর্গের যেমন জাগরণ ; / সন্তাপের ভিতরে জ্ব'লে শ্রাবণী-মেলায়

ধারায় ভিজে। মাঘের তুষার তুষানলে জ্ব'লে ভিজে / যাত্রাকাল, সারা জীবন।'

এর পরের কবিতার মধ্যেও এমনি বিভিন্ন জীবনবোধ প্রকাশ পেয়েছে, ছোট শিশু পবিত্রতা, বুড়ি অসহায়তা ও লাল পাগড়ি দানবীয়তার প্রতীকরূপে প্রতিভাত। নিজের নিঃসঙ্গ কান্নাকে বাইরে অসভ্য চিৎকারে ডোবাতে চাইছেন। ভালোবাসা সমস্ত হতাশাকে ভেদ করেও মৃত্যুর রাত্রিতে জেগে ওঠে, তাকে কিছুতেই রুদ্ধ করা যায় না। নারীর জন্যেই পাতাল মেঘে তাঁকে নামতে হয়; আর যে রমণী তাঁকে ভোলায় সে আঁধার রমণী। এই 'আঁধার' ও 'পাতাল' প্রেমের কবিতায় তাঁর হৃদয়ের প্রতীক। কিন্তু কেন এই অবস্থা হয়েছে? তার উত্তরে বলেছেন নিজের দোষেই তিনি রমণীকে হারিয়েছেন, অপরের সঙ্গে তাঁর প্রিয়তমাকে কৌতূহলবশত বিপরীতার্থক বারান্দায় দেখতে চেয়েছিলেন বলেই সেই নারী বিদায় নিয়েছে। এক ঝলক আলোকে সে যেমন কাছে এসেছে, আর এক ঝলক আলোকে সে দূরে চলে গেছে।

এখানেও তাঁর কবিতার রূপগঠন ক্ষুদ্রতম হয়ে উঠেছে, 'বিপরীতার্থক বারান্দা' 'আঁধার রমণী', 'বধির দূরত্ব', 'দুস্মৃতির কদর্য পসরা' প্রভৃতি শব্দ-সংযোগে চমক আনতে চাইছেন, এবং ধ্বনি মিল সুর তাঁর করায়ত্ত বলে অনায়াসে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা দোলা জাগিয়ে দিতে পেরেছেন, কিন্তু রিডের ভাষায় 'ফর্ম'কে যদি ক্ষেত্রের পরিমাপ, ভল্যুম, সময়-ব্যবধান, স্বরবিন্যাস হিসাবে বিভিন্ন উপাদানের সংগঠন বুঝি, তাহলে এর মধ্যে অবশ্যই অভাব দেখা যাবে। আশা করবো কবির সাম্প্রতিক জর্মানভ্রমণ তাঁকে নতুন দিক্‌দর্শন করাবে কবিতার জগতে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

'যে কোনো নিঃশ্বাসে' সমরেন্দ্র রোমান্টিকতা, দৃশ্যময় চিত্র, প্যাশন, যৌবনের বেদনার গান, প্রত্যয়ের চেয়ে ইন্দ্রিয়চেতনা প্রভৃতি বিষয়কে তীব্র ও বলিষ্ঠ অনুভূতির সঙ্গে স্বচ্ছন্দ সহজ ও সরলভাবে লিরিকের মতো প্রকাশ করেছেন। হারিয়ে-যাওয়া প্রেম, নির্জনতা, স্তব্ধতা, স্মরণীয় আলো, অধরা কান্না, নিহিত পবিত্রতাকে ধরবার জন্যে তাঁর আকাঙ্ক্ষা এখানে তীব্র। প্রেম

মেধা স্মৃতি অন্ধকারকে বিশাল মাঠের অবকাশে নিয়ে যেতে চাইছেন, 'সনাতন অন্ধকারে আমাকে ফিরিয়ে নাও জনক-জননী', নতুবা, 'চলে যাই চলে যাই অন্য অন্ত, দীর্ঘ অন্তরালে ; / ডেকেছে অশান্ত পুষ্প, আমি যার আবির্ভাব খুঁজি / অধীর অস্তিত্বে, রক্তে, ফুল উন্মোচন !' এবং এই আকুতি প্রকাশ করেছেন বারংবার : 'যেন কবেকার আমি উৎসবের আগে / প্রতিটি স্পর্শের তাপে শব্দময় করে তুলি তোমার সকাশ !...একটি গোলাপ কবে হাহাকার করেছিল শরীরে তোমার সব স্পষ্ট খুঁজে গেছি।' এই সমস্ত পঙক্তির মধ্যে একটা বিষণ্ণ বিষাদ ধুলোর হাওয়ায় যেন কাঁদে, প্রেমের কবিতার মধ্যে প্যাশনের তীব্রতা থাকলেও কোথায় যেন একটা উদাসীনতা তাঁকে দূরে টেনে নিয়ে যায়। এখানেই এর সার্থকতা।

'চারিদিকে পৃথিবী' (১৯৬৫) কবিতাগ্রন্থে এই স্বচ্ছন্দতা ও সহজ প্রকাশভঙ্গি অনেকটা দূরে চলে গেছে। নিবিড় নিটোলতা হারিয়ে গেছে, যৌবনের বেদনা ও বিষাদের জায়গায় পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর প্রতি প্রেম ও মমতা গড়ে উঠেছে এবং ভ্রাম্যমাণের দৃষ্টিতে পৃথিবীর চলমানরূপ অনেকাংশে ধরা পড়েছে, জীবনের চেয়ে শব্দময় কবিতাই যেন তাঁর জীবনের পরিধিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, নির্দেশ এসে স্থানগ্রহণ করেছে, খাদের স্বরের বদলে স্বর এখানে চড়া, ব্যঙ্গপরায়ণ, শব্দসংযোজনের ফলে নূতন চিত্রকল্পের আচমকা আঘাত আসছে, বলবার কায়দায় নূতনভঙ্গি এসেছে, কিন্তু এ সকলের ভেতর দিয়ে তাঁর মনের গহন গভীর নির্জন মিষ্টিক রহস্যানুভূতিই প্রকাশ পেয়েছে বিচ্ছিন্ন অবিন্যস্ত পঙক্তির মধ্যে। 'গড়ে না সন্ন্যাসী ধ্যানে শেষ নীরবতাব্রতীর প্রতিমা।' 'নিরাকার আলোর প্রণতি / বুকে নিয়ে নিশিদিন কি এক দুর্লভ অভিশাপে / ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত, তবু রূপান্তর আমার নিয়তি। / আমি মেঘে রৌদ্রে, আমি ধান্যশীর্ষ নাচানো হাওয়ায়, / আমি দিগন্তের অন্ধকারে নক্ষত্রশিখরে, আমি নদীর প্রধান স্রোতে, / প্রকৃতির সমস্ত প্রতীকে ; তবু কাঁপে / আমার অম্লান পুণ্য না-পাওয়া মহার্ঘ বিষাদে।' এই বক্তব্যকেই বলবার কায়দায় নতুন করে বলতে চেয়েছেন : 'তিনটি ধ্বনির সঙ্গে একটি প্রণাম। তুমি কেন / জ্যেষ্ঠ ধ্বনি জবা করে তোল ।' অথবা 'কেননা চুম্বনে দক্ষ সংগমক্ষমতা ছাড়া অন্য কিছু জানাবার নেই।' 'অনৃত আঁধারে এনে জন্মের শুদ্ধতা পেতে চায়।' 'এখনো ক্ষুধার মতো তোমার সকাল মনে পড়ে'। এই শব্দসমন্বয়জাত চিত্রের

দাবিতেই সমরেন্দ্র আমাদের মনে কূটাভাস তৈরি করতে পারেন। ভাষা ও অনুভূতির বলিষ্ঠতাও এখানে অনস্বীকার্য।

কিন্তু এর পরের কবিতায় অনুভূতির অভিনবত্ব নেই, বরং তাঁর মনে গোপন রোমান্টিকতার নির্জন গোধূলি আলো-কে কঠিন শব্দের আড়ালে ঢাকতে চাইছেন। কঠিন শব্দ, উল্লেখ নির্দেশ, সুদৃঢ় বিন্যাস এগুলির সাহায্যে তিনি মুখোশ তৈরি করতে চাইছেন, 'হরিণপালানো বনবাসকৃশ ক্রমশ মৃত্যু' 'বিবাহিত তমসায়'। কবিতা ব্যাপারটা আজকাল তাঁর কাছে শব্দের নির্মাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তিনি নিজেই বলেছেন যে, কুমোর যেমন মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরি করে নিখুঁত কর্মদক্ষতায়, শব্দক্ষমতায় কবিকেও তেমনিভাবে শব্দপ্রতিমা তৈরি করতে হয়। তাই শব্দের অদ্ভুত ক্রিয়া আমাদের মজিয়ে রাখে, কিন্তু অনুভূতিকে আবিষ্ট করতে পারে না। 'পরোক্ষ' কবিতার মধ্যে রহস্যাতীত যে ইঙ্গিতের কথা বলেছেন তা স্বীকার করে নিলেও এই কথটি বিশেষ মূল্যবান : 'লেখার বিষয় ছাড়া লিখতে শিখেছি।' অর্থাৎ নির্মাণকার্য চলেছে। অনুভূতি ছাড়া যদিও এই নির্মাণে তাঁর হাতের বলিষ্ঠতা ও প্যাশনতপ্ত হৃদয়ের তীব্রতা মাঝে মাঝে সোচ্চার হয়ে ওঠে, সূর্যের প্রখরতা তাঁর ভাষায় দহন আনে, কিন্তু বিষয়ের ও অনুভূতির দিক থেকে নূতন কোন দিক্‌দর্শন এতে হচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ 'সম্ভবা' কবিতাটি উল্লেখ করা যায়। তবুও রচনার এক অভিনবত্বের জন্যে আকর্ষণীয়।

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

কবিতাগুলি ছোট্ট, কিন্তু ছোট ছোট শব্দ ও ভাষায় ব্যঞ্জনা সঙ্কেত ফুটে ওঠে। সংক্ষিপ্ত ভাষণের মধ্য দিয়েই তাঁর বলিষ্ঠ অনাড়ম্বর কথা আন্তরিকতার স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়। মূল কথাটা বলেই তিনি খালাস, তাই তাঁর কবিতা ছোট হয়, তাকে বিস্তারিত করবার কোনো ইমেজের বা আবেগের প্রেরণা নেই। বিবৃতিই এখানে কাব্য ; কারণ বিবৃতি নিবিড় অনুভূতির ফলে এতো গাঢ় হয়েছে যে অন্য কোনো ইমেজের অস্তিত্বই এখানে কল্পনা করা যায় না। আমার সবচেয়ে অবাক লেগেছে প্রেমের কবিতায় এতো তীব্র দ্বন্দ্ব ও জ্বালা থাকা সত্ত্বেও অন্য মহিলা কবিদের মতো তাঁর কবিতায় রাঙা কামনার বুক

ফাটা আর্তনাদ ও আঁতুর ঘরে ভ্রূণ নষ্ট করবার অশ্লীলতা নেই। সংক্ষিপ্ত সংহত তীক্ষ্ণ ভাষণেই বিজয়ার কবিতার সার্থকতা।

প্রেমের মধ্যেই তাঁর জ্বালা, দ্বন্দ্ব, টেন্‌সন ; এ জ্বালা তীব্র হলে গাঢ় দাহন, না থাকলে মৃত্যু, অর্থাৎ কোনো উপায়েই তার থেকে মুক্তি নেই। পুরুষের খেলাকে ভালোবাসা বলে ভুল হয়েছে, অবজ্ঞাকে খেলা বলে ভুল করেছেন, তাই স্বামী-স্ত্রী কখনো একাত্ম হতে পারে নি। পুরুষকে যে ভালবাসায় নারী আপন করে নিতে পারে নি, দোষ পুরুষের নয়, দোষ নিজের ওপরই আরোপ করেছেন কবি, অথচ ভালোবাসা পাবার জন্যে তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা। নিজের ওপর দোষ টেনে আনলেও পুরুষের ধূসর চিত্তের জন্যেই তাঁর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট হয়েছে। ফলত স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব থেকেই গেছে। এই জ্বালার তীব্রতা প্রেম কবিতাগুলিকে আস্বাদ্য করে তুলেছে। এই কারণেই কি মেঘের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছেন ?

বিজয়া মুখোপাধ্যায় কবিতা ও ভগবানকে একই আসনে বসিয়েছেন ; তাই ঈশ্বরের মতো কবিতার করুণার ভিখিরি, এবং সময় সান্ত্বনা লোভের কাছে দয়া প্রার্থনা করেছেন। এগুলি থেকে অতিক্রম করে নির্মলতার অগ্নি লাভ করেন, স্পর্শে তাপ পাওয়া যায়, ঘ্রাণে দৃষ্টির প্রার্থিত পাত্রে সুধাধারা নেমে আসে। ভগবানের মতোই কবিতার পায়ে মাথা রেখেছেন। কবিকে প্রেরণা জোগায় রক্ত কাঞ্চন, রাজস্থানি হাওয়া ও নিঃসঙ্গ যুবক। রক্ত কাঞ্চন অর্থাৎ রঙিন হৃদয়, রঙিন হৃদয় হলেও মর্ত্যধূলির সংরাগে অভিভব, মরুভূমির হাওয়ার মধ্যেই দৃপ্ত বিশ্বাস, এবং নিঃসঙ্গ যুবকের দুই চোখের মধ্যেই নক্ষত্রের আলো, বস্তুর এই বিপরীত ধর্মের মধ্যেই তাঁর প্রেরণা সক্রিয়, এগুলির মধ্যেই তাঁর কাব্য-জগৎ।

এই কবিতাগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে বিজয়া তাঁর আগের কাব্যগ্রন্থ 'আমার প্রভুর জন্য' কবিতা থেকে জীবন ও জগতের অনেক জটিল আবর্তে নিজেকে মিলিয়ে নিয়েছেন, তার ফলে তাঁর প্রকাশভঙ্গিও স্বতন্ত্র হয়েছে। আগেকার কবিতায় ভাবনা ছিল একমুখীন, অনেক সময় ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ, চলমান ছবির মতো হালকা, রোমান্টিক প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় তীব্র, রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষায় নিমজ্জিত, মনে হয় এখানে আরো গভীরে এসেছেন, প্রকাশে স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পেয়েছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সুনীল 'আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি' গ্রন্থের কবিতায় সম্ভবত লরেন্সের মতোই বলতে চেয়েছেন, 'স্মরণ রেখো, দক্ষ পদ্য পঞ্চাশ বছরে মৃত।' তাই উচ্ছল আবেগের বাঁধনহারা গতিই ছিল তাঁর কবিতার মৌল প্রবণতা। গ্রিগ্সনের মতো কেউ প্রশ্ন তুলবেন, নিবিড় অনুভূতির অভাবই সংহত নিটোল কবিতার অনুপস্থিতি। এর মধ্যে কিছুটা সত্য আছে, তবে নিবিড় অনুভূতিও প্রকাশের সময় হাল্‌কা হয়ে যায়, সেখানে প্রয়োজন মালার্মের শব্দের ব্যায়াম। সুনীল এ ব্যায়ামে এখানকার অধিকাংশ কবিতায় প্রস্তুত ছিলেন না। প্রস্তুত ছিলেন না বলা ভুল, 'একা এবং কয়েকজন' কাব্যগ্রন্থে বিভিন্ন ছন্দমিলধ্বনির নূপুরে স্বচ্ছন্দে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছেন, তাই হয়তো 'আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি' গ্রন্থে তাকে ভাঙতে চেয়েছেন, প্রসারিত হতে চাইছেন। কিন্তু পরবর্তীকালের কবিতায় বিশেষ করে 'বন্দী, জেগে আছো' কাব্যগ্রন্থে ভাষা সংহত, অনেকটা নিরাভরণ এবং সরল।

'একা এবং কয়েকজন' কাব্যগ্রন্থেই অনেকের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও সুনীলের কবিজীবনের বীজ অঙ্কুরিত। প্রকৃতিপ্রীতির সঙ্গে কামনা ও প্যাশন একই সঙ্গে জড়িত ('তবু তার দুই শঙ্খ স্তনে পূজার বন্দনা বাজে আদিগন্ত রাত্রির নির্জন')। প্রেমের স্মৃতিবেদনায় বড়ো বিহ্বল, যুগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিষ্পেষণে ব্যর্থতা হতাশা ও নিঃসঙ্গতা বড়ো তীব্র ('আপন রক্তের সঙ্গে মিশিয়েছে সময়ের বিষ'), নিঃসঙ্গতার ক্লান্তি ও অন্ধকার তাঁকে ঘিরে ধরেছে, জীবনের প্রতি মমত্ববোধ ও মর্ত্যপ্রীতির মধ্যে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা জাগ্রৎ, কিন্তু এ সকলকে অতিক্রম করে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে কুমারীর প্রথম প্রেমের মতো বেদনার নবীন বিস্ময়। সে বিস্ময় আকাশ বাতাস সমুদ্র প্রেমে সঞ্চারিত। এবং 'অসহিষ্ণু যৌবনের জ্বালা' অভিব্যক্ত কবির রচনায় : 'তাই অন্তহীন বনে রেখে যায় গন্ধে স্পর্শে অসহিষ্ণু যৌবনের জ্বালা।' এই ভাষার মধ্যে গোপন ছন্দধ্বনির ঝঙ্কারও লক্ষণীয়।

সুনীল বুদ্ধদেবের মতো রোমান্টিক কবিসত্তারই উত্তরাধিকারী, তবে এই রোমান্টিকতা সাধারণ অর্থে প্রেমপ্রকৃতিনারীর মধ্যে নেই, আছে বাসনায়, ইচ্ছায়। তারাপদের মতোই বাল্যকৈশোরের যে স্বপ্নমায়া নিসর্গপ্রকৃতির মধ্যে পেয়েছেন, তাকে কলকাতায় নাগরিক সভ্যতার মধ্যে এসে হারিয়েছেন,

এই হারানো প্রেমটা তাঁর চিত্তের গোপনে একান্তে লুকিয়ে থাকে, মাঝে মাঝে বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ে, এবং তখুনি বোঝা যায় তাঁর চিত্তের বেদনা কোথায় লুকিয়ে রয়েছে। 'ভ্রূ-পল্লবে ডাক দিলে, দেখা হবে চন্দনের বনে— / সুগন্ধের সঙ্গ পাবো দ্বিপ্রহরে বিজন ছায়ায়, / …তুমি কি অমূলতরু, স্নিগ্ধ জ্যোতি, চন্দন চন্দন দৃষ্টিতে কি শান্তি দিলে চন্দন চন্দন / আমার কুঠার দূরে ফেলে দেব, চলো যাই গভীর গভীরতম বনে।' এই রোমান্টিকতার আর একটা প্রকাশ ভাষাশিল্পে। ডিলান টমাসের মতো শব্দের উন্মাদনা অতটা না থাক, কিন্তু শব্দের জাদুমোহ উচ্ছ্বাস ঝঙ্কার সংগীত তাঁকে বারংবার ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর কল্পনা ও সৃষ্টি ক্ষমতার সঙ্গে প্লাবনমুখী উদ্দামতা অনেক সময় তাঁকে ভাসিয়ে দেয়। প্যাশনে সুনীল যেমন উদ্দীপ্ত, আবেগে দৃপ্ত কম্পমান, প্রকাশে শক্ত দৃঢ় তেমনি, তেমনি ভাষাতেও দৃঢ় শক্তি। তাঁকে কোনো প্রকারেই বাঁধনে বাঁক মানানো যায় না। 'আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি' কাব্যগ্রন্থে এই আবেগ প্যাশন উচ্ছ্বাস প্রকট। এখানেই সুনীলের শক্তি, তাই বলে যে বুদ্ধি কাজ করে না তা নয়, তবে বুদ্ধি দিয়েই বুদ্ধিকে হার মানাতে চান সুনীল। কারণ লক্ষ্য অনেকটা অর্থের d'ere´glement.

'আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি' কাব্যগ্রন্থের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রত্যিটি কবিতা প্যাশনের, আবেগের ও রূপবোধের ছোঁয়ায় দীপ্ত, প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে নাগরিকতার অভিশাপ জড়িয়ে রয়েছে, আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব হ্যাঁ ও না একই সঙ্গে অনুভব, নারীদেহের যৌনভোগের মধ্যেও কোথায় একটা জ্বালা, তাঁর মনোভাবের দৃপ্ততার মধ্যেও নিঃসঙ্গতা, অসহায়তা, রিক্ততা, অপ্রেম ; এই কারণেই তাঁর ক্রোধ অভিমান রোষ গালাগালি বেরিয়ে আসে। দুর্দান্ত বাচ্চা ছেলে যেমন তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু না পেলে ভেঙে চুরমার করে দিতে চায়, সুনীলও এই কলকাতা নগরীর ছলনার অভিশাপে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে না পেয়ে সমস্ত পৃথিবীকে খিস্তি দিয়ে উঠেছেন, নিজের ওপর অসংখ্য অত্যাচার করেছেন, তাই তাঁর কবিতায় 'পেচ্ছাপ ও কান্না' একই সঙ্গে কাজ করে, পাপ ও দুঃখবোধ মাঝে মাঝে চারিয়ে উঠেছে, ('পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না') 'উপরে বৃষ্টিতে শুধু বিষ অহর্নিশ / আমার স্বাধীন পাতালে গড়িয়ে গেছে অমৃতের ফল', যদিও র‍্যাঁবো সম্বন্ধে সুনীল সজাগ, তবুও এই পাপবোধ খ্রিশ্চান ধর্মবোধ থেকে জাত নয়, সমাজ

ও পরিবেশের চাপেই তাঁর মনের মধ্যে এই দুই প্রকৃতি কাজ করেছে, এই পাপকে ক্ষালিত করতে চাইছেন নারীর প্রেমে, 'আজ মনে হয় আমারও সমস্ত পাপ আঙুলের নখের প্রতীকে তোমার চুলের মধ্যে খেলা করে দ্বিধাময় আদরে সম্প্রতি।' এবং এখান থেকেই আর একটি শর্ত উঠছে পাপ ও নারীকে সুনীল তাঁর কাব্যে অঙ্গীভূত করেছেন, এবং করেছেন বলেই নারীর শরীর দেহভোগ কামনা কারুকে বাদ দেন নি। ইন্দ্রিয়গাঢ়তা মারাত্মক দেখা দিয়েছে। একদিকে অতিরিক্ত কামনায়, দেহভোগের লালসায় নারীর শরীর অরণ্যে ঘুরেছেন, অন্যদিকে নারীর জন্যে তাঁর গভীর আকূতি, জিরো আওয়ারে উপস্থিত হয়েছেম, সেখানে সে স্ত্রীলোক নয়, নারীরূপে আবির্ভূত। এমনকি ছন্দও তাঁর কাছে নারী : 'গায়ত্রীর মতো নারী শুয়ে আছে, বিশাল জঘন মেলে / পর্ব ভেঙে ইশারায় আমাকে উপুড় হতে বলে / আমি তার শরীর বিস্তৃত করি, দুই বক্ষোদেশ ছিঁড়ে ক্রমশ পয়ারে / নিয়ে আসি, উরুদ্বয়ে কিছু কথ্য অশ্লীলতা মিশিয়ে চকিতে খুলে ফেলি আরবের অলংকার, যদিও নিশ্চিত / কাঙাল কুকুর হয়ে মাঝে মাঝে আমি বড় মিলন প্রত্যাশী।' শেষ বাক্যটি সুনীলের কাব্যরচনার বৈশিষ্ট্য, দুই বিরোধী ও বিপরীত মনোভাব যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি ফুটে উঠেছে আকস্মিক নাটকীয় ব্যঙ্গকুশলতা, পাঠককে একটা ধাক্কা দেয়, এই ধাক্কা দেওয়াটাই সুনীলের অভিপ্রেত এবং বুদ্ধির কারসাজি। যেমন 'শেষযাত্রী' কবিতার শেষ অংশ। সব মিলে সুনীলের কবিতার জীবন ব্যক্ত হয়েছে তিনটি শব্দে : পরিত্রাণ, সংগম ও কান্না।

শক্তি জীবন ব্যাপারে নিরাসক্ত ভ্রমণই হচ্ছে তাঁর মূল কথা, ছেড়ে যাওয়া। কিন্তু সুনীল সংগম অর্থে বুঝিয়েছেন : 'বিপুল তীর্থের পুণ্য নয় সর্বগ্রাস যেমন জীবন আর জীবনী লেখক।' কলকাতা নগরী যেমন তাঁকে সর্বগ্রাস করেছে, তেমনি তিনিও সমগ্র কলকাতা নগরীকে সর্বগ্রাস করতে চাইছেন। এই অর্থে আধুনিক কবিদের মধ্যে সুনীল অন্তত এই বইয়ে পূর্ণ নাগরিক। নাগরিকতার মধ্যে হৃদয় প্রেম নারীই প্রধান স্থান অধিকার করেছে। আমার বারবার মনে হয়েছে, প্রকৃতি মানুষকে দুইভাবে আকর্ষণ করে, এক নিসর্গপ্রকৃতি তার সৌন্দর্য দিয়ে, আর এক নারীপ্রকৃতি তার রূপ দিয়ে। সুনীলের এই বইয়ের কবিতায় নিসর্গ বর্ণনা কোথায়ও নেই, মনের দ্বন্দ্ব এত বেশি, জ্বালা এত প্রচণ্ড, তাতে মানুষই তাঁকে আকর্ষণ করেছে। কিন্তু

প্রকৃতি নারীরূপে তাঁকে ভুলিয়েছে, ভুলিয়েছে বলেই নারীর রূপকে নগ্ন করে তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে তার সৌন্দর্য পান করবার চেষ্টা করেছেন। নিসর্গবিহীন নগরীর বুকে নারীই সেই বিশ্বপ্রকৃতি, সুনীল এই প্রকৃতিকে স্তব করেছেন, নিন্দা করেছেন, তার বৃত্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এও সেই রোমান্টিকতা!

বলা বাহুল্য, ক্ষয়িষ্ণু জীবনের চিত্রই সুনীলের কবিতায় স্থান পেয়েছে, জীবনে যেখানে ক্ষয়ের পচনের ধ্বংসের চিহ্ন প্রকট, সেখানে শিল্পীর সংবেদনশীল চিত্তে তার আলোড়ন ঘটবেই, তবে পার্থক্য এই যে ক্ষয়কে দেখিয়ে তার ওপর পায়ে হেঁটে অনেকে অন্যত্র ছাড়িয়ে যায়, কেউ এর মধ্যেই বেদনানুভব করে। সুনীল বর্তমানের এই অস্তিত্ব সম্বন্ধেই প্রশ্ন করেছেন : 'এই কি মানুষ জন্ম? নাকি শেষ পুরোহিত-কঙ্কালের পাশাখেলা?' বুকের মধ্যে হাওয়া ঘোরে, রক্তে হৃদয় অবহেলিত, মানুষের ভেতরে কুকুরটাকে দেখবে বলেই কুকুর হয়ে বসতে হয়, ছারপোকার পাশে ছারপোকা হয়ে হাঁটতে হয়, স্ত্রীলোক তাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না, এই দৃশ্যলোক ফুঁ দিয়ে উড়িয়েছে, ক্রোধের বারুদ নেই, ফুলের ভালোবাসা নেই, অতীত ঐতিহ্য মুছে ফেলেছে, শ্মশানে মৃত্যুর বদলে ঘুম, সময় অন্তর্হিত, চিঠির বাণ্ডিল উইপোকায় খেয়ে ফেলেছে, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ইঁদুর কেটে খাচ্ছে, তাই 'পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া এই অবেলায় কিছুই মনে পড়ে না।' পূজা ও হত্যার মধ্যে আতঙ্ক, মন নেই, শুধু শরীরটাই সত্য। সুনীলের এই মানসিক অবস্থার মধ্যেই কলকাতাকে কেন্দ্র করে তাঁর দীপ্ত প্যাশন ও আবেগ তুরন্তবেগে বেরিয়ে এসেছে। একদিকে অশ্রুজল, মাটির মায়ায় জীবনের জন্য নতজানু হয়েছেন, অন্যদিকে কব্জির পাশে নোংরা হাতের জন্যে, বুকের কাছাকাছি ভিয়েতনাম জাগিয়ে তোলার জন্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠেছে। একদিকে কবিতাই জীবন, অন্যদিকে ভালোবাসার জন্যে কবিতার পিঠে ছুরি মেরে চলে যাচ্ছেন। একদিকে পরিবর্তমান সময়ের চিন্তা, যেখানে গাঙ্গেয় সভ্যতা ও নারী উধাও, তিনকাল ইঁদুর কেটে নিচ্ছে, অন্যদিকে নীরাকে পাবার জন্যে জিরো আওয়ার, সমস্ত স্তব্ধতা।

সুনীলের দৃপ্ত স্মার্ট কথ্যভঙ্গির মধ্যেও সুরের ছন্দের ঝঙ্কার চমৎকার, ইংরেজি দেশি স্ল্যাঙ ও তৎসম শব্দ অবলীলায় তাঁর বাক্যে সোনার মতো গলে যায়, অন্ত্যমিল, মধ্যমিল ও অনুপ্রাসধ্বনি গোপনে কাজ করে বলে প্রথমে

চোখে পড়ে না, কিন্তু পড়তে বসলে আকর্ষণ করে, গোপন মিল দিয়ে পাঠককে তিনি আঁকড়ে ধরেন, ছড়ার ছন্দে চমৎকার কবিতা থাকলেও ('মহারাজ আমি তোমার') কাব্যশরীরিনীর দুই বক্ষোদেশ ছিঁড়ে ক্রমশ পয়ারে নিয়ে আসেন, ভাঙা পয়ারই এখানে তাঁর বাহন। বাক্যের সমস্ত শব্দ এক সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়ে মাঝে মাঝে বোল্ড টাইপ ব্যবহার করে, বাক্যের শব্দগুলিকে ভেঙে সিঁড়ির মতো সাজিয়ে, বোল্ড টাইপের সঙ্গে গদ্য ব্যাখ্যা দিয়ে, গদ্য কবিতার ঢঙে বিভিন্ন প্রকার দৃশ্যত বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করেছেন, 'কয়েক মুহূর্তে', 'পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না', 'একটি কবিতা লেখা' তারি নিদর্শন। একটা আকস্মিকতা, খাপছাড়া ভাব, চমক, ভাষার উন্মাদনা শব্দের ওলোটপালট আমাদের অভ্যস্ত অনুভূতিতে অভিঘাত জাগায়। বাক্যের শেষে ছেদহীনতা নূতন বোধের জন্ম দেয়, অর্থবোধ পরে আসে। অনেক কবিতায় পূর্ব প্রস্তাব পরিণতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না, বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমাহার হয়ে উঠছে। কিন্তু সুনীলের কৃতিত্ব এইখানে যে ওঁর কোনো কথাই বক্তব্য নয়, তথাকথিত চিত্রকল্প হয়তো ওঁর কবিতায় অনেক কম, কিন্তু সমগ্র কবিতাটাই একটা কাহিনী ও চিত্রের বলয়। এই সাঙ্কেতিক চিত্র কাহিনীবৃত্তের ও চমকপ্রদ পরিবেশ রচনায় মধ্যেই পরিণতি এসেছে। অদ্ভুত অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টিও এই দিক থেকে লক্ষণীয়, 'রাত্রির বর্ণনা', 'আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়' দ্রষ্টব্য।

সুনীল শঙ্খ ঘোষের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'পাঠককে প্রথমেই জেনে রাখতে হবে, কবিতার কিছু লাইনের মানে থাকে, কিছু লাইনের কোনোই মানে থাকে না। প্রতি লাইনের ব্যাখ্যার ইচ্ছে মূঢ়তা ও অসংগত প্রয়াসমাত্র।...সত্যিকারের কবিতা অন্বয়ের অতীত'। অন্য একটি প্রবন্ধে বলেছেন : 'আমাকে মুগ্ধ অসহায় করাই ছিল কবির উদ্দেশ্য।' এই উক্তিগুলি সুনীলের কাব্যরসাস্বাদনে সহায়তা করে এবং বিভ্রান্তিও ঘটায়। পূর্বোক্ত গ্রন্থে অনুভূতির জটিলতা, শব্দের উন্মাদনা, বাক্যের উচ্ছ্বাস, প্যাশনের তীব্রতা এমন অনেক বাক্য ও শব্দগুচ্ছ এনেছে যাকে অন্বয়ে মেলাতে গেলে সামগ্রিক কবিতাটি চোখের সামনে প্রথমে রাখতে হয়, 'ভ্রমণ' 'সহমরণ' কবিতা দুটি তার উদাহরণ। 'কিছু লাইনের কোনোই মানে থাকে না' কথাটা সত্যি নয় ; কারণ কবি অর্থের জন্যে কোনো শব্দ প্রয়োগ না

করলেও ধ্বনির জন্যে ব্যবহার করেন, এই ধ্বনিসংগীতসুরে অনুষঙ্গে অর্থ তৈরি করে, সমগ্র কবিতার মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। প্রতিটি শব্দের ধ্বনির কোনো মানে না থাকলে কবিতা পাঠের কোনো আনন্দ নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে কোল্‌রিজ ও পো অস্পষ্টতার দাবিতেই অর্থের বাইরে সংগীতের সুরের অনিবার্যতা মেনে নিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে প্রতীকী কবিতায় এর চূড়ান্ত রূপ লক্ষ্য করা যায়, এবং চল্লিশের দশকে ডিলান টমাস রোমান্টিকতায় তাকে আবার জাগিয়ে তুলেছিলেন। সুনীলের এই সব উক্তি এই ধারাকে ও সুররেয়ালিস্ত স্বয়ংক্রিয় লেখাকে স্মরণ করায়। কিন্তু পরবর্তী কাব্যে আবেগ উচ্ছ্বাস প্যাশন যৌন আকৃতি রোমান্টিক বাসনা সব থাকলেও ভাষার এই উদ্দামতা, এবং এলিঅটের ভাষায় 'শ্রাব্য কল্পনা', বুদ্ধির দ্বারা সংযত সংহত করেছেন। পূর্ববর্তী কবিতার থেকে এই কবিতাগ্রন্থে কয়েকটি পার্থক্য চোখে পড়ে। সুনীলের সেই উদ্দামতা আর নেই, শান্ত করুণ ধীর হয়েছে, উদ্দামতা যেমন নেই, তেমনি নেই জটিল অনুভূতির অনুষঙ্গজড়িত সঙ্কেত-চিত্র, দ্বন্দ্বমুখর তীব্র নাটকীয়তা, নেই এন্‌রিটের মতো শিথিল কথ্যভঙ্গির মধ্যে কৌতুকমিশ্রিত ব্যঙ্গ, ঠাট্টা, ধাক্কা মারার প্রবণতা। পূর্বের কবিতায় পৃথিবীর সংস্পর্শে কবিচিত্তের সংবেদনা বিভিন্ন অনুভূতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু 'বন্দী, জেগে আছো' কাব্যগ্রন্থে প্রাক্তন জীবনের জন্যে অনুশোচনা, নূতন স্বর্গবোধের আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। এখন নূতন বোধ : 'আমি এই সন্ধ্যা একটু গাঢ় হলে নদীতে আচমন সেরে যজ্ঞে বসবো।' সুনীলের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে নিসর্গের স্থান ছিল না বললেই চলে, যদিচ এখানে মানবের সম্পর্কেই প্রকৃতির বর্ণনার মাধুর্য, তবু নিসর্গ তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে আকর্ষণ করছে, তাঁকে মুক্তি দিচ্ছে। সর্বোপরি বৃহত্তর ক্ষেত্রে মুক্তির জন্যে আকাঙ্ক্ষা জাগছে : 'আমার আর সময় নেই, আমি এখন / পেরিয়ে মজাদিঘির কোণ, প্রণাম করে অরণ্যের সিংহাসন, সামনে ঘুরে দিগন্তের চেয়ে একটু দূরে যাবো।' হয়তো 'স্ত্রীলোকের ইশারায় বহু ভুল অরণ্যে' ঘুরে এই মুক্তি চাইছেন, এই শহরে বাস করাই তো অরণ্যে বাস করা, 'পৃথিবীতে বড় বেশি দুঃখ আমি পেয়ে গেছি, অবিশ্বাসে / আমি খুনী ; আমি পাতাল শহরে জালিয়াৎ, আমি অরণ্যের / পলাতক, মাংসের দোকানে ঋণী, উৎসব ভাণ্ডার ছদ্মবেশী / গুপ্তচর। / তবুও দ্বিধায় আমি ভুলিনি স্বর্গের পথ, যে-রকম প্রাক্তন

স্বদেশ।' পূর্বের যৌবনের নীরা যমুনাতে রূপান্তরিত হয়েছে, এই যমুনা শুধু নারী নয়, খুকিও বটে, যার্কে নিয়ে স্বর্গের বাগানে ছুটোছুটি করবার বাসনা জাগে।

সুনীলের কবিতায় প্রহরী, নিশান, বন্দী, সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, রানী, হলুদ রঙ বারংবার ঘুরে আসে। রোমান্টিক বিস্ময় আনন্দ প্রকাশ করতে তিনি একটি প্রাচীন বস্তুধর্মী ইমেজ ব্যবহার করেন : 'পুরনো সিন্দুকে যেন লুকনো গিনির মতো ঝলসে উঠল চোখ।' 'বন্দী, জেগে আছো' গ্রন্থে এ সব চিত্রকল্প ও ছবি তো আছেই, তার সঙ্গে আছে পুরোহিত ব্রাহ্মণ যজ্ঞ আচমন, কোপ্‌টিক খ্রিশ্চান, সেমিটিক, হিন্দু প্রভৃতি শব্দ-সম্বলিত চিত্র ও ভাবাবেগ। টম্‌সন-লুকাচ হয়তো এতে সামন্ততান্ত্রিক মর্জি খুঁজবেন!

'আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি'র ভাবনা এখানে নূতনভাবে অনুসৃত হয়েছে। 'বন্দী, জেগে আছো' মূল কবিতায় বিশ্ব-পৃথিবীর বন্দী দশাকেই দু'রকমভাবে উপস্থাপিত করেছেন, সাধারণ বন্দী যেমন বন্দীশালায় পদক্ষেপে শিকলের শব্দে মাথার ভিতরে জ্বালা নিয়ে জেগে থাকে, তেমনি বন্দীশালার বাইরে সাধারণ মানুষও; 'প্রেমের নিভৃত শিল্পে, পণ্যে, পিপাসায়, লোভে অত্যন্ত সব মানুষের খেলা ঘরে বন্দী।' জীবনের নিঃসঙ্গতা, অসাড়তা, অসহায়তা এখানেও ব্যক্ত, এখানেও প্রেম ও কামনার দ্বন্দ্ব, পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও না-পাবার বেদনায় তীব্রতা বোধ :

আমি পুরোহিত, দেখো আমার চামর বাহু, স্বতোৎসার শ্লোক
হৃদয় অহিন্দু, মুখ সেমেটিক, প্রেমে ভিন্ন কোপ্‌টিক খৃস্টান
আশৈশব থেকে আমি পুরোহিত হয়ে উঠে তোমার রূপের কাছে ঋণী
তোমার রূপের কাছে অগ্নি, হেম, শস্য, হবি—পদাঘাতে পূজার আসন
ছড়িয়ে লুকাও তুমি বারবার, তখন তন্ত্রের ক্ষোভে অসহিষ্ণু আমি
সবলে তোমার বুকে বসি প্রেত সাধনায়, জীবন জাগাতে চেয়ে জীবনের ক্ষয়
ওষ্ঠের আর্দ্রতা থেকে রক্ত ঝরে, নারীর বদলে আমি স্ত্রীলোকের কাছে
মাথা খুঁড়ি, পুরোহিত থেকে আমি পুরুষের মতো চোখে ক্রূরতা ছড়িয়ে
আঙুলে আকাশ ছুঁই, তোমার নিঃশ্বাস থেকে নক্ষত্রের জন্ম হলে
আমি তাকে কাশ্যপের পাশে রেখে আসি।

সুনীল 'অশ্লীল' প্রবন্ধে নিজেই বলেছেন : 'যৌন বাসনাই তো সমস্ত

মহৎ ও সামাজিক কর্মের প্রেরণা।' তাই সুনীলের কবিতায় নারীই কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে, তাকে ঘিরেই তাঁর দর্শন গড়ে উঠেছে, জীবনবোধের তীব্রতা দেখা দিয়েছে, তার প্রভাবেই চিত্তে দেহজ সৌন্দর্যের আবির্ভাব; ব্যক্তিগত উপলব্ধির মধ্যেই বস্তুঅতীত রহস্য। 'দ্বারভাঙা জেলার রমণী' কবিতায় রূপময়ী সতেজ রমণীকে প্রকৃতির মধ্যে দুই শহরের মাঝখানে গঙ্গার ওপরে লোকজগতের বাইরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন; রমণীর যোনি-সৃষ্টিকেন্দ্রে বিশ্ব-প্রকৃতি স্তব্ধ, রমণীই সমস্ত কিছু চালনা করছে: 'তখন সর্বনাশের কাছে সৃষ্টি হাঁটু গেড়ে বসে আছে, / তখন বিষণ্ণতার কাছে অবিশ্বাস তার আত্মার মুক্তি মূল্য পেয়ে গেছে / সব ধ্বংসের পর / শুধু দ্বারভাঙা জেলার সেই রমণীই সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো / কেননা ঐ মুহূর্তে সে মোষ তাড়ানোর স্বপ্ন দেখছিল।' এই আত্মশক্তিই তাঁর কাব্যের বিষয়; তাই 'পাপীকে চুম্বন করো তুমি, তাই দ্বার খোলে স্বর্গের প্রহরী।' একদিকে আত্মশক্তির লীলা, অন্যদিকে নারীর রোমান্টিক সত্তা, এই দুই কোটিতেই সুনীলের ঘোরাফেরা। এবং মাঝে মাঝে তাঁর রোমান্টিকতা কালো শিল্পকে অবলম্বন করে, কালো রোমান্টিকতার পথে তখন বোদ্‌লেয়ার র‍্যাবোর ভীষণতার অন্ধকার সৌন্দর্য, রমণীর বিষবাষ্প তাঁকে পেয়ে বসে, মেডুসার মতো বাণীর বন্দনা করেন: 'লুব্ধ প্রতিহারী তোমার উন্মুখ স্তনে মুখ দিয়ে টানে গুপ্ত বিষ, বিষ বিষ অন্ধকার বিষে ভরে যাক বাণী ওরে বিষকন্যা, তোর নগ্ন শরীরের দুলে-ওঠা মোহিনী মায়ায় অ্যারিস্টটলকে তুই ঘোড়া কর, প্রগাঢ় তামসে তোর নাচের উৎসব শুরু হোক।'

কিন্তু এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিজীবনের রক্তিম আলোর নীচে চিঠি পাবার আকাঙ্ক্ষা, অনুশোচনাময় ভুলের আত্মস্বীকারোক্তি, প্রকৃতির উদার বিস্তৃতির মধ্যে হৃদয়ের মুক্তি: 'পাহাড় চূড়ায় পৃথিবীকে পদতলে রেখে, আমার নাভিমূল থেকে উঠে আসে বিষণ্ণ, ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস এই নির্জনতাই আমার ক্ষমাপ্রার্থী অশ্রুমোচনের মুহূর্ত।' সুনীলের এই পরিবর্তন ও উত্তরণ লক্ষিতব্য।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

তিরিশের কবিদের অনুসরণ যদিচ পঞ্চাশের কবিদের কারুকে পেয়ে

বসেছিল, তবু সময়ের ও বয়সের পার্থক্যের জন্যে নূতন উপাদান ও মর্জিও দেখা গেছে। বুদ্ধদেবের জীবনদর্শন সুনীলের প্রেমের কবিতায় রয়েছে, মিলনের স্বাদ রয়েছে, একদিকে সুনীল যেমন নরনারীর ক্রুদ্ধ যুদ্ধ, ঠোঁটে রক্ত, জঙ্ঘার উত্থান নিন্দা করেছেন, তেমনি অন্যদিকে তথাকথিত শরীরহীন ভালোবাসায় তাঁর ঘৃণা সোচ্চার : 'ভালোবাসা চলে যায় একমাস সতেরদিন পর।' কিন্তু তবু বুদ্ধদেবের চেয়ে সুনীলের রূপকল্প, ছন্দভাষা, পরিস্থিতি কল্পনা এতো পৃথক যে অভিনবত্বই আমাদের অভিভূত করে। বুদ্ধদেব ভাবনায় উদ্দাম, বন্য হতে পারেন, কিন্তু ভাষাশিল্পে কার্যত পরিশীলিত, এবং উদ্দামতাও ব্যক্তি-অভিজ্ঞতায় রুদ্ধ। তুরন্তগতিবেগ নেই। এ প্রসঙ্গে আর একটি সমস্যার কথা মনে পড়ছে, অধ্যাপকশ্রেণীর কবিতায় শব্দ যেমন তুরন্তগতির ধ্বনির মোহ আনে না, বাঁধনহারাগতিতে এগিয়ে যেতে পারে না, তেমনি সংযত হতে গিয়ে রুদ্ধ হয়, মাঝে মাঝে দম আটকে আসে। তাই শিক্ষকতা কর্মের বাইরে স্বাধীনভাবে অন্য কাজের ফাঁকে যাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁদের কবিতার শব্দে যে প্রচণ্ডগতি, অভিনব সুরের ঝঙ্কার শোনা যায়, অধ্যাপনাকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের রচনায় তা মেলে না। সুনীল, শরৎ ও শক্তির কবিতা তারি প্রমাণ। এঁদের কবিতায় শব্দের ধ্বনিচিত্র ও সুর যতটা কাজ করে, অর্থের প্রগাঢ়তা ততটা কাজ করে না। তবু শক্তি ও সুনীলের চেয়ে শরতের কবিতা অনেক স্পষ্ট ও অর্থবহুল, নিরাভরণ ও সুরের ঝঙ্কার কম।

'কোথায় সেই দীর্ঘ চোখ' কাব্যগ্রন্থে শরতের অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে। নারী সম্পর্কে আগের কামনালোভলালসাপ্যাশন একটি কবিতায়ও নেই, নেই ব্যক্তিগত জীবনের হাহাকার, সুখদুঃখবেদনাহতাশা। বৃহত্তর জীবন তাঁকে উদার বিস্তৃতির মধ্যে নিয়ে গেছে। এর প্রতিটি কবিতার ভাবনার মধ্যে সর্বজনীনতা এমন অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাতে হৃদয়মন বিশালতা পায়, মুক্তি লাভ করে। 'কোথায় সেই দীর্ঘ চোখ' কবিতায় কোনো নারী তার সতেজ সৌন্দর্য নিয়ে আহ্বান জানাচ্ছে না, বরং পাতায়-ছাওয়া অতিথি বৎসল কুটিরের জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগাচ্ছে, সেই দীর্ঘ চোখের আকুলতা জাগাচ্ছে, 'যার ভিতরে চক্ষু হানলে মৃত্যু হানলে মৃত্যু—হানলে মরণ / তার শীতল ছায়া বিছিয়ে দেবে জলে / পালক দিয়ে বাতাস করবে।' এই সদর্থক প্রশান্ত ও সুস্থ জীবনের আকুল আকৃতিই এই কাব্যগ্রন্থের মৌল

বৈশিষ্ট্য, তা প্রেমে জীবনে এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কে।' কবি বলতে চাইছেন 'বিশাল বন্দিত্ব থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি।' আধুনিক যুগের মানুষের শুধু ব্যর্থ যুদ্ধ, জগৎকে-ছাড়িয়েও সর্বব্যাপী হাহাকার, ভূমির ভিত্তিহীন মানুষের দোদুল্যমান অবস্থা, নিঃসঙ্গ একাকিত্ব কবিকে পীড়িত করছে। কিন্তু এগুলি থেকে মুক্তি, এই অভিশপ্ত জীবনের জন্যে মার্জনা প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে, জীবনবিহীন সৌন্দর্যে কবির আকাঙ্ক্ষা নেই, তাই একান্ত বেকার ফক্কড় ছাতিমের চেয়ে ব্যবহার্য নিমই কবির স্ত্রীর কাঙ্ক্ষিত। জুয়াখেলায় ভাগ্যান্বেষণের জন্যে বিভিন্ন ঘরে ঘুঁটি দেন না; জীবনে একবার ঠিক ঘুঁটি পড়বে, যদি ভাগ্যের তল্লাসে এঘর ওঘর ছুটোছুটি না করে নিজের প্রিয় শিবিরে স্বাধীন থাকা যায়; তখন সমস্ত ধন লুণ্ঠন করেও দুই হাতে কুলোবে না। 'তখন সমস্ত ধন লুণ্ঠন করেও কিছু কিছু ভিক্ষা থেকে যাবে—।' ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখকে অতিক্রম করে বা বাদ দিয়ে 'এই বিশ্বে কত মানুষের ওড়াউড়ি মজ্জমান সূর্য নিয়ে অমরত্ব খেলা' এগুলিই দেখতে চেয়েছেন। ঘুমের ভিতর দূর নৌকার মতন শাদা ওষধিশরীর মানুষের রুগ্নতাকে সুস্থ করে দিতে চাইছেন। চামেলির মতো জীবনের উচ্ছ্বাসগন্ধে আমোদিত হয়েছেন, জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগে উল্লসিত, তাই অকস্মাৎ বন্ধুর আবির্ভাব কবিচিত্তকে উদ্বেল করে, সন্ন্যাসীর ব্যোম শব্দে বিশ্ব ভ্রমণের অভীপ্সা জাগে, মানুষের জন্যে অপার করুণা ও ভালবাসা উচ্ছ্রিত হয়ে ওঠে, নীতিবাক্যের মতো শরৎ বলে উঠেছেন: 'জিজীবিষা ছাড়া অন্য লোভ নেই, মানুষশাবকদের প্রতি / ঈষৎ মমত্ব ছাড়া বোধ নেই, তাই/যারা আত্মহত্যা করে, তাদের প্রচণ্ড ঘৃণা করি।' মৃত্যু ধ্বংস বটে, কিন্তু দুর্ঘটনা, জীবনই সত্য; 'ভালোবাসা একমাস সতেরোদিন পরে চলে যায়' এ উক্তির বিরুদ্ধে প্রেমের দর্শন খাড়া করে বলেছেন যে ভালোবাসার ধনরত্নময় বিজয়গৌরব শেষ হয়ে গেলেও ভালোবাসার প্রতিনিধি রাজদণ্ড নিয়ে ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং সুনীলের কথা সত্য নয়। আবার সুনীলের মতো শরৎও ভুলের জন্যে শোচনায় মগ্ন, ক্ষমাপ্রার্থী: 'সন্ধান নয় এখন ক্ষমা চাইবার সময়। পৃথিবীর সব নিরপরাধ মানুষ এই সময়ে প্রার্থনা করে। বলি, তোমরা আমার সঙ্গে এসো, ওই ঠাণ্ডা ঘাসের ওপর আমরা নতজানু হয়ে বসি।...হে মহাদ্যুতি আমাদের শরীর থেকে রাত্রি মুছিয়ে দাও, তেমনি আজ আবার বলতে ইচ্ছা করছিল,

আমাদের প্রসারিত বুকের ওপর ছড়িয়ে দাও ক্ষমা : অজস্র লঘু শাদা নিঃশব্দ টগর ফুল।'

এই আকাঙ্ক্ষাই এখানকার মূল বক্তব্য। একদিকে চালচিত্র শান্ত নধর প্রতিমার আকর্ষণ, অন্যদিকে কঠোর সন্ন্যাসীর আকর্ষণ, দুয়ের মধ্যে কবিচিত্ত দ্বিধাবিভক্ত, তাঁর রক্ত ক্ষরিত হচ্ছে। কিন্তু এই দ্বিধা ছাড়িয়ে মানুষের মতন হয়ে উঠতে চাইছেন।

এই মূল অনুভূতির বৃন্তে সামান্য কয়েকটি কবিতায় কৌতুক, শব্দ নিয়ে খেলা, নাগর সভ্যতার ব্যঙ্গ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কৌতূহলী মনোভাব, মুখর ও নীরব দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে।

শরৎ এই কবিতায় পরিবর্তিত, সংশোধিত এবং বিবর্তনের মুখে। কিন্তু শিল্পরীতিতে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে না। শরতের এই কবিতা বড় বেশি উচ্ছল, তাৎক্ষণিক, দ্বন্দ্বহীন, স্ফুলিঙ্গবর্ষী, জটিলতাবর্জিত ; এতো তাড়াতাড়ি স্বচ্ছন্দ-ভাবে বলে যান যে ভাববার ফুরসৎ পাওয়া যায় না, জিরিয়ে বসে চেখে স্বাদ নেয়া যায় না, একটা ছবি একটা চলন্ত অনুভূতি জাগিয়েই শেষ হয়ে যায়। তাঁর হাতে গল্প বলার রীতি, পরিস্থিতির সার্থক উদ্‌ভাবনপ্রচেষ্টা, কৌতুককর পরিবেশরচনা, নাটকীয় চমক, সংলাপে মুখের কথ্য ভাষার ব্যবহার এতো সার্থক হওয়া সত্ত্বেও, কথার স্রোতে না থামার জন্যে গুরু বিষয় লঘু হয়ে যাচ্ছে তুচ্ছ বিষয়কে নিয়ে প্রতীক নির্মাণে তিনি সিদ্ধহস্ত, শব্দবিন্যাসে তাঁর অপূর্ব নৈপুণ্য, তবুও শিল্পের দাবি মেটাতে পারছেন না, কারণ শিল্পে আমরা পূর্ণ মানসিকতার জটিল অনুভূতির সামঞ্জস্য প্রত্যাশা করি। শরতের কবিতা পড়তে পড়তে আমার বারংবার মনে হয়েছে যে এঁর হাতে কাব্যনাট্য চমৎকার ফুটতো, তার সমস্ত উপাদান তাঁর লেখায় রয়েছে। ছবি ও চিত্রকল্পের চেয়ে কাহিনীর গতি, চরিত্ররূপায়ন, সমগ্র অংশ মিলে একটা সাঙ্কেতিক অথচ বাস্তবচিত্ররচনা কাব্যনাট্যের সম্ভাবনাকে সূচিত করছে। ভাষা কত স্বচ্ছন্দ, গতিবান, কথ্য, সংলাপধর্মী, ইঙ্গিতবাহী অথচ স্ল্যাঙবিহীন হতে পারে এ তারি নিদর্শন :

> সকলে ভাগ্যের খোঁজে ছুটে যায় এদিক ওদিক
> আমি হরতনের শিবিরে
> সিকিটি দিলাম।

কবিতা : চিত্রিত ছায়া

খেলা শুরু হোক, ও হে সর্দার, এবার
কৌটোর ভেতরে পাশা নাড়ো·
ওল্‌টাও এবার ঢাকনা, দেখি কি উঠেছে
হরতন ইস্কা চিড়িতন?
নাকি লম্বা মুখের মতন চৌকো লাল! (জুয়া)

২.

শরৎ তাঁর একটি গদ্য লেখায় নিজের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা লিখেছেন : ১. 'আমার কাছে কবিতা লেখা একটা অত্যন্ত জরুরি এবং প্রিয় কাজ। ঢের কষ্ট লাঘব হয় শুধু না, আনন্দের অনুভূতিগুলিও হয় তীব্রতর।' ২. 'জীবিকা আমার অনেকখানি ব্যাবহারিক স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ দেয়। প্রায়শই তার প্রতি বিরক্ত হই, কিন্তু তাকে বর্জন করা যুক্তিযুক্ত মনে করতে পারিনি এখনও।' ৩. কবিতা লিখে নিজেকে সুখী করা এবং নিজের মতো আরো কাউকে খুশি করবার দায়িত্ব থাকে। ৪. 'সব বিশ্বাস হারিয়ে গেলেও আমাদের সততার প্রতি আস্থা এখনও নষ্ট হয় নি। সৃষ্টিশীল রচনায় কবি কতখানি প্রতিভা অর্থাৎ হাতযশ তার পরীক্ষা তো কিছুকাল পরে হবে। আপাতত অনেষ্টি বজায় থাকলেই যথেষ্ট।' ৫. 'যখন যা লিখতে ইচ্ছে হয় তাই লিখি।' ৬. 'মানুষকে তৃণজ্ঞান করতে নেই। মানুষই কবিতার সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরণা, বিশেষ করে শহরের মানুষ। প্রকৃতি বড়ো বেশি পুনরাবৃত্তি করে, অথচ মানুষের পরস্পর বিরোধিতা সত্ত্বেও, বা পরস্পর বিরোধিতার জন্যেই সমস্ত ব্যাপারটা এতো সজীব এবং প্রাণবন্ত হয়ে থাকে যে বেঁচে থাকার লোভ সংবরণ করা যায় না। একটা মানুষ যখন পাওয়া গেছে, তাই নিয়ে কি যে করি, কত কি যে করি।' ৭. 'রমণী রাত্রি শ্মশান এক সময়ে আমার অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ছিল। এই তিনটি দর্পণে বারবার আমি নিজেকে দেখতে চেয়েছি। কলকাতা ছাড়ার পর এরা আমায় বর্জন করেছে। ...এর ফলে যদি আমার কবিতার চরিত্র বদলে যায়, তবে পাঠক যেন আমায় দোষ না দেন। আরো অনেক দিক আছে, জীবনের আরো ঢের আকর্ষণ আছে।' ৮. 'কলকাতা আমায় এখনো বড়ো টানে। কলকাতার নিন্দে

শুনলে আমার খুব ব্যথা করে ওঠে। কোনোদিন যদি ফিরে যাই, কলকাতাকে আমি বদলে দেবো।'

এই সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে কয়েকটি জিনিস লক্ষণীয়, ব্যাবহারিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেই তাঁর কবিতা ব্যক্তির মনের ও হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে, দ্বিতীয়ত প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে শহরের মানুষের প্রেম তাঁর কবিতাকে, বিশেষ করে 'আহত ভ্রূ-বিলাসের' কবিতাগুলিকে বিচিত্র ও আস্বাদ্য করে তুলেছে, ডিলান টমাসও তাঁর কবিতা সংকলনের ভূমিকায় বলেছিলেন মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও ভগবানের প্রশংসা নিয়ে যদি তাঁর কবিতা লেখা না হয়, তাহলে তাঁর নিন্দিত হওয়া কর্তব্য। তবে শরতের এই মানবপ্রেম শ্রেণী-সংগ্রামের নয়, ব্যক্তির হৃদয়ের মিলনানুভূতি ও বৈচিত্র্য থেকে এসেছে; তৃতীয়ত, শরৎ অজ্ঞাতেই শেষে একটি গুরুতর কথা বলেছেন, এতে প্রমাণিত হচ্ছে, কবিতা নিছকই কবিতা নয়, কবিতার সাহায্যে যে সত্য ও সৌন্দর্যানুভূতি সৃষ্টি করা যায়, তার সাহায্যে মানুষের মনকে পাল্টে দিতে পারা যায়, সুতরাং কবিতার সেই আদিম জাদুক্রিয়া শরৎ অস্বীকার করেন নি। চতুর্থত, জীবন সম্বন্ধে কোনো পূর্ব নির্দিষ্ট ছক্ কেটে না লেখার ফলে পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য আসছে, জীবনের বোধ বিস্তারিত হচ্ছে, এলিঅটের মতো শরৎও বলেছেন যে লেখার আন্তরিকতাই হলো মূল কথা, এই আন্তরিকতা থাকলে যে কোনো লেখাই সাহিত্য হয়ে ওঠে। এর মানদণ্ডেই স্বীকার করবো প্রকৃতি তাঁর কাব্যে স্থান গ্রহণ করবে।

শরতের কাব্যের পরিবর্তন শরৎ নিজেই স্বীকার করেছেন, এবং সেই পরিবর্তন 'কোথায় সেই দীর্ঘ চোখ'-এ ধরা পড়েছে। পাঠকের কাছে এই পরিবর্তন বিষয়ের ও উপাদানের। 'আহত ভ্রূ-বিলাসের' কবিতাগুলি শুধু রমণী রাত্রি শ্মশান সম্পর্কিত নয়, তাঁর যৌবনের তীব্র প্যাশন, নগ্ন কামনা, রক্তরাঙা লোভ, ছন্দসংগীত ঝড়ের আবেগে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর কবিতায় হৃদয়ের আবেগ এতো তীব্র ও স্বচ্ছন্দ যে চিত্র ও চিত্রকল্প সেখানে অনেক কম, কিন্তু কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যে কয়েকটি চিত্রকল্প বেরিয়ে আসে, তা সঙ্কেতের মাধুর্যে হৃদয়ে আটকে বসে, কথ্যভঙ্গির মধ্যে, স্ল্যাঙের মধ্যে সাধুভাষার শব্দগুচ্ছ মনকে চমকে দেয়, চমকে দেয় বলেই সমগ্র কবিতাটা নূতন অনুভূতিতে সহসা উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে: 'আমাকে ডাকলে না কই গান বাজনা এলাহি ব্যাপার,

যেখানে হচ্ছিল' 'একটু দূরে ঘন অন্ধকার / জঙ্গল নিঃশব্দে ভয় দেখাচ্ছিল একা এক নক্তচারিণীকে।' 'নক্তচারিণীকে' শব্দটির মধ্যে বিমলির সমগ্র চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সহসা ব্যক্ত হয়ে ওঠে। শরতের দ্বন্দ্ব এখানে নাটকীয়তায় উচ্চকিত। তবে এখানকার কবিতা নিঃসঙ্গের কবিতা, যৌবনপ্রবাসে গৃহহীনের কবিতা, এই নিঃসঙ্গ মানুষটির মুখের ডান পাশে 'প্রীত পুরোহিত বিনীত নম্র', 'বামপাশ ঘোর সবুজ বর্ণ অসহায় ক্রোধ'; এই দুয়ের জ্বালায় তাঁর চিত্ত ক্ষতবিক্ষত। পিপাসায় কাতর, কামনার জ্বরে কম্পমান, খুকি সিরিজের সমস্ত ছবিগুলিই যৌন কামনায় ভরা। তবে শুদ্ধ মানবিকতা যে হৃদয়ের গোপনে কাজ করছিল 'মণিমালা' 'চারজন ও বিমলির' মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, এবং সেই পথ ধরেই ব্যক্তিহৃদয়ের কামনা ও নারীর লোভ অতিক্রম করে উদার মানবিক বোধে ও জ্ঞানপ্রৌঢ়িতে পদার্পণ করেছেন, তাই আজ একথা তিনি বলতে পারেন : 'সব মানুষের মধ্যেই একটা ছেলেমানুষ বসবাস করে এই কথা মনে রাখলে আর কারুর প্রতি ঘৃণা হয় না, রাগ হয় না।' বিভক্ত দেশের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়েছে : 'জগন্নাথের মতো বড়ো বড়ো চোখ মেলে লুলা দেশটা তাকিয়ে থাকে, চোখ দিয়ে ওর জল পড়ে না।' সমস্ত দেশের উন্নতির জন্যে তাঁর মনের মধ্যে বেদনা জাগছে, 'চাষ করো', এমনিভাবে নক্‌শা সিরিজের টুক্‌রো টুক্‌রো ছবির মধ্য দিয়ে তাঁর মনের বিভিন্ন লীলা প্রকাশ পাচ্ছে, এই লীলার মধ্য দিয়ে শরৎ নিজেকে প্রসারিত করতে চাইছেন। তবে রূপগঠনের দিক থেকে, নিবিড়তা ছন্দ ও সুরের মানদণ্ডে, তীক্ষ্ণ ছবির অভিনবত্বে, কবিতার প্যাটার্নের বিচিত্রতায় ও নাটকীয়তায় 'আহত ভ্রূ-বিলাসে'র কবিতাগুলি যে-ভাবে মনকে নিবিড়তায় আচ্ছন্ন করে, এই সিরিজের কবিতাগুলি তা পারে না, আমার বিশ্বাস কবিতাগুলি অতি সরল হয়ে যাচ্ছে। হয়তো এই বিষয়বস্তু থেকেই ঘননিবিড়তা পরে আসবে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'সোনার মাছি খুন করেছি' কয়েক বছরের মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে কবিত্বের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এর উল্লেখযোগ্যতা

শক্তির কাব্যপরিণামে, কথ্য শব্দের ব্যবহারে, ছন্দোহীনতার মধ্যে সংগীত-স্পন্দে, চিত্ররীতিতে, উচ্ছৃংখল রূপনির্মিতির মধ্যে, সর্বোপরি শক্তির মানসিক জীবনের আন্তর পরিচয়ে এবং তাঁর কল্পস্বর্গের আকাঙ্ক্ষায়।

শক্তি একটি গদ্য প্রবন্ধে অন্য কবিদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে ব্যক্তিগত মিথের প্রতিষ্ঠার মধ্যেই কবির শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে। এবং প্রত্যেক কবিরই একটি কল্পস্বর্গ রয়েছে। 'সেখানে ক্ষীর সমুদ্র, মেঘ পালকের বিকেল থেকে রঙ ছড়ানো অস্থিরাশি, মানমন্দির, টেরো ডাকটিল, কুয়োশিরো স্রোত তো আছেই, তার সঙ্গে আছে খর্জুর বীথি, আফিম ফুল, সাইপ্রেস ও তমাল।' এবং ঐ প্রবন্ধ পড়েই শক্তির মানসিকতা জানা যায় যে শক্তি যৌবনের উত্তাপ ও আবেগকে অনিবার্যভাবে স্বীকার করতে চান, এবং কবিত্বের মৌলিক আগুনই কবিতাকে শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্থকতা দান করে, ছন্দের প্রতি তাঁর সহজ আকর্ষণ আছে। প্রত্যেক কবিই, এলিঅটের মতো, গদ্য প্রবন্ধে তাঁর কবিতা শিল্পের নিজস্ব আদর্শরীতিকে ব্যাখ্যা করতে চান, এখানে শক্তিও অপরের কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে নিজের আদর্শের কথা ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং তাঁর কাব্যে উপরোক্ত তথ্যগুলি বিশেষ আলোচনা করা কর্তব্য। দেখেছি ও শুনেছি 'সোনার মাছি খুন করেছি' বইটির আগে একটি গীতি-কবিতার মধ্যে প্রচলিত সংগীতে, প্রাচীন শব্দের কাব্যিক ব্যবহারে, মাধুর্যের ও লাবণ্যের প্রাচুর্যে কবিতাকে রূপময় করে তুলবার জন্যে নিন্দিত ভর্ৎসিত ও তিরস্কৃত হয়েছেন। কোনো কবি যখন নিজের লক্ষ্যে পৌছুবার জন্যে যাত্রা করেন, তখন পথের দৃশ্যের আনন্দ তো তাঁকে গ্রহণ করতে হয়, প্রাচীন ঐতিহ্যকে গ্রহণ না করলে নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় কি করে? শক্তির কবিতার মধ্যে ছবি ও গান যে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে আছে, যা পড়া মাত্র আঁকড়ে ধরে থাকে, তা কি এই চেষ্টার অভাবে সম্ভবপর হতে পারতো? 'হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য' 'ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো'র মধ্যে যার সূচনা, 'অনন্তনক্ষত্র বীথির' মধ্যে তারই চিত্রসংগীত, 'সোনার মাছির' মধ্যে তারই সমন্বয়।

শক্তি অস্থির অশান্ত, অব্যবস্থিত চিত্ত, কিন্তু দুরন্ত দুর্বার অথচ শক্তিমান। ওঁর মনে কৈশোর যৌবনের স্বপ্ন নেচে বেড়ায়, তাই প্রতিটি বস্তুকে নূতন চোখে দেখতে পারেন, ওঁর চোখে নূতন ছবি ভেসে ওঠে, জগৎ ও জীবন ওঁর কাছে চলমান, কোথাও স্থির হয়ে নেই, স্টেশন থেকে স্টেশনে অনবরত চলেছে,

ট্রেনে চলতে গিয়ে গাঁয়ের সবুজ গাছগাছালি বনবাদাড় নদী জোনাকি আঁধার রোদ্দুর সব এক সঙ্গে দেখেছেন, কোথাও স্থির গম্ভীর চিত্র নেই, চলচ্চিত্রের মতো, চলচ্চিত্রের ছবির মধ্যে শব্দধ্বনি ও সংগীত তাঁর কাব্যকে আস্বাদ্যমান করে তুলেছে। শক্তি জীবনকে ধ্যানীর মতো নীরবে, গম্ভীরভাবে দেখতে পারেন না, ওঁর মনের মধ্যে জগৎ বিচিত্র বর্ণ-গন্ধের উচ্ছ্বাস নিয়ে চঞ্চলতা সৃষ্টি করে, এই চঞ্চলতাই তাঁর কাব্যে রূপহীনতার রূপ নিয়ে তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। তাই রেখে ঢেকে বলা তাঁর অভ্যাস নয়। হৃদয়ে ও মুখে যা আসে, তাকেই কলমের ডগায় প্রকাশ করতে পারেন, ছন্নছাড়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে আগের ও পরের সঙ্গে মিশিয়ে স্মৃতি বর্তমান সব একাকার করে ফেলেন, তাঁর দুর্দান্ত প্যাশন রাগ ক্রোধ অভিমান ভালোবাসা, তাই একই শব্দ একই বাক্য পুনরাবৃত্ত করে, বলাতে ক্লান্তি নেই, সুদীর্ঘ হয়ে যায়, তবু এই ওলোটপালটে বিসদৃশ ছবির সাহায্যে ছবির মধ্যে একটা সামগ্রিকতা বোধ কাজ করে, অস্পষ্ট ছবিগুলির ধারায় রেখায় আবর্তে একটি চলন্ত মনের সজীব প্রাণ যেন স্পন্দিত হচ্ছে, ব্যাকুল বাঁশরির আহ্বান জানিয়ে আমাদের টেনে নিয়ে যায়। 'পুনর্বিবেচনা' কবিতাটি এই টেকনিকের সার্থক উদাহরণ। 'আমি পারতপক্ষে, পরিমার্জনা স্বীকার করি না—যেমনভাবে চিত্র ও সংগীতময় পঙক্তি আসে, ঠিক তেমনভাবেই কাগজের ওপর বসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত।' যদিও এমনি উক্তি রিল্‌কেও এলিজি প্রসঙ্গে করেছেন, তবু এই মন্তব্য সুররেয়ালিস্তদের সঙ্গে এক মুক্ত রচনারীতির স্বাধর্ম্য নিয়ে আসে কিছুটা। এই রূপরীতিকে আপোলিন্যারের মনের মুক্ত গতির ও রূপের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ব্রেতোঁ যদিও ফ্রয়েডীয় অবচেতন মনের মুক্ত অনুষঙ্গের সঙ্গে আত্মার অসীম অজানা রহস্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তবু কোথায় একটা যুক্তি ও শৃঙ্খলা কাজ করে ; আর ব্রেতোঁ, জাক্ মারিতঁ্যা'র ভাষায়, সংকীর্ণ আপন হৃদয়ের কথা প্রকাশ করেছেন, ফলে বৃহত্তর মানবজগৎ তাঁর মধ্যে ধরা দেয় নি। সুতরাং শক্তির এই উচ্ছৃঙ্খল রূপরীতি সামান্য সুররেয়ালিস্ত কবিতার স্পর্শ আনলেও কল্পনাই তাঁকে চালিত করেছে, স্বয়ংক্রিয় রচনা নয়। উদ্ভট কল্পনা এবং স্বপ্নজগতের সঙ্গে ঈষৎ সাদৃশ্য ছাড়া অন্য কোনো গভীরে তাৎপর্য অন্তত আমার চোখে পড়ে না। এই উদ্ভট ও স্বপ্নজগতের ছবি এই বইয়ের প্রথম কবিতা, 'সে বড়ো সুখের সময় নয়'-এ রয়েছে। 'মনে করো; গাড়ি রেখে ইস্টিশান দৌড়ুচ্ছে, নিবন্ত ভুমের পাশে

তারার আলো / মনে করো, জুতো হাঁটছে, পা রয়েছে স্থির, আকাশ পাতাল এতোল বেতোল / মনে করো, শিশুর কাঁধে মড়ার পাল্কি ছুটেছে নিমতলা— পরপারে / বুড়োদের লম্বালম্বি বাসরঘরী নাচ।' শক্তির কবিতার বক্তব্যের নূতনত্ব এখানে হয়তো নেই, কিন্তু ছবিগুলিই ওঁর প্রাণ; ছবি বলার ধরনটা ওঁর মধ্যে বিশেষ আকর্ষণীয়। এযেন আমরা নির্জন প্রান্তরে দিগন্ত প্রসারিত ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি, নীচে বিবর্ণ পাতা ছড়ানো রয়েছে, উঁই বিষপিঁপড়ে হেঁটে যাচ্ছে, সাপের বুকে হেঁটে চলে যাওয়ার দাগ জেগে আছে, পাশে খালনদীর রেখা, কতপ্রকার বন্যপ্রাণী, আর নিবিড় বনের ফাঁক দিয়ে শাদা আলোর লুকোচুরি, নবীন পাতার হাততালি-দেওয়া আনন্দ, আকাশ ও বনের ফাঁক দিয়ে অদৃশ্য সেতু সৃষ্টি করছে, দূরান্তে অস্পষ্ট বাড়ি ঘর সঙ্কেতের মতো ভাসছে, এমন একটি সামগ্রিকতা এই কাব্যগ্রন্থে শক্তির বিশিষ্ট কবিতার মধ্যে রয়েছে। 'উড়ন্ত সিংহাসনে'র টুকরো কবিতা জড়ো করলেও এমনি একটা বোধ আসে। প্রত্যেক শব্দের বিশিষ্ট অর্থের স্বাতন্ত্র্যের চেয়ে ইম্প্রেশন বোধটাই মুখ্য।

এই বিষয়ে তাঁর ছন্দের কথাও আসে। গদ্য এবং ভাঙা পয়ার তাঁর বিশিষ্ট কবিতায় মিলে গেছে। গদ্য কবিতাগুলির মধ্যে সহজ স্বচ্ছন্দগতি লক্ষ্য করা যায়, ওঁর মনের চঞ্চলতা ছবির সংগীতে দ্রুত পঙক্তির মধ্যে ধরা পড়ে, পঙক্তির দ্রুত ছবির সাহায্যে লাফিয়ে লাফিয়ে মালা তৈরি হতে থাকে, এবং বর্তমান অতীত একসঙ্গে বাঁধা পড়ে; 'অলৌকিক পশ্চাদ্‌ ভ্রমণ' ও 'পুনর্বিবেচনা' বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। এই গদ্যছন্দের মধ্যে হঠাৎ আসে ভাঙা পয়ার, 'এবার বসন্তকালে বৃষ্টি হলো স্বপ্নের ভিতর / স্বপ্নের ভিতরে হলো বজ্রপাত / তাও বহুবার', এবং শেষের দিকে সমিল পদ্য থমকে দাঁড়িয়েছে, 'কখন সুদূর বলে চলে আসি কাছে / ভালো মন্দ কথা বলি দুটি / আজ বিশ্লেষণ করো, কদর্থও আছে / মেলে না আমার লব্ধ ছুটি।' 'নীল ভালোবাসায়' 'বিষ পিঁপড়ে' কবিতায় ছড়ার ছন্দের দ্রুত সংগীত নেচে উঠেছে ওঁর মনের প্রবণতা অনুযায়ী, 'খুন করে নীল ভালোবাসায় চমকপ্রদ জড়িয়ে গেলাম।' (যদিও ছন্দে সামান্য ত্রুটি আছে, এই কবিতায় দ্বিতীয় পঙক্তি কিছুতেই কোনো ছন্দে ফেলা যায় না) কিন্তু ওঁর কবিতায় চলমান সংগীত ও ছবিই চোখকে জোর করে আটকে রাখে, 'তুমি কেন আলিসার

থেকে সবল কাকের মুহ্যমান নিস্পৃহ পতন দেখে শিউরে উঠেছিলে / তুমি কেন বনানীর ভিতরের হ্রদে দেখেছিলে একান্নটি পদ্মফুল /' অথবা, 'যখন নার্সের বুকে হাসপাতালের রাত খুলে দেয় অবাধ বাদুড়।' অথবা, 'চাঁদের খবর তুমি আশা করো শুধু জ্যোৎস্না রাতে / দীঘার সমুদ্রতট ভরে যায় পাগল ছায়ায় / জোনাকির বর্তমান লুকোচুরি ভালোবেসেছিলে।' শক্তির কবিতা উচ্ছৃঙ্খল ও উল্লম্ফন বৃত্তিকে মেনে চললেও একটা গল্পের চরিত্রের নাটকীয় অস্থির দ্বন্দ্ব আছে, একটু অনুধাবন করলেই চোখে পড়ে। কিন্তু কথ্যরীতিকে কেন্দ্র করে দ্রুত চিত্রের ইন্দ্রিয়ঘন নিবিড়তা কতকগুলি চিত্রকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। 'আমার কথা অল্প বলি, কথার কথা নয় অবশ্য / দাগ-মারা ঘা—গর্তে পেছোল উলুকঝুলুক সাধ বাসনার আসল কথা, সঙ্গে যাওয়া।' গোপন অনুপ্রাস এবং চিত্রের উদ্‌ভটত্ব সচকিত করে এবং আকৃষ্ট করে, যেমন; 'বিছানায় আজই তুমি পেয়েছ কাছিম।' বিষ্ণু দে'র ঢঙে রবীন্দ্রনাথের পঙক্তিকে কখনো আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তিতে, কখনো বিসদৃশ ছবির জন্য ব্যবহার করেছেন; 'যখনি আকাশে থাকো ও চাঁদ চোখের জলে লাগলো জোয়ার', কিন্তু দ্বিতীয় পঙক্তি এই পঙক্তিই অন্য বোধ নিয়ে এসেছে; 'ও চাঁদ চোখের জলে বাংলোর সস্‌প্যানে পোড়া মাংস, রুটি, বোরুন্ড-মানিনী।'

শক্তি রবীন্দ্রনাথেরই মতো পথিক, রবীন্দ্রনাথেরই মতো বলতে পারেন 'পথের হাওয়ায় কি সুর বাজে বাজে আমার বুকের মাঝে বাজে বেদনায়।' সম্মুখ চলাতেই তাঁর আনন্দ, সম্মুখ চলতে গিয়ে পেছনে স্মৃতির চাবুক মারে, সেখানে কীট দেখেন; কিন্তু পেছনে তাকালেই স্তব্ধতার মধ্যে বালিয়াড়ি। এখানেই শক্তির কৃতিত্ব, অনাবিল সম্মুখ চলা তাঁর কপালে নেই, পেছনে ফিরে তাকাতে হয়, তাতেই তাঁর দ্বন্দ্ব ভালোভাবে ফোটে, নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়। সোনার মাছি খুন করেছিলেন মুক্তির জন্যে, সার্থক ভাবে বেঁচে থাকবার জন্যে, সমুদ্রে পাড়ি দেবার আকাঙ্ক্ষায়, হেঁটোয় কাঁটা, ওপারে কাঁটা এই দীর্ঘ জীবনযাপন থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই তাঁর বাসনা, কিন্তু খুন করে সোনার মাছির নীল ভালোবাসায় জড়িয়ে গেছেন। এই দ্বন্দ্বই তাঁর মিথ্‌কে সুন্দরতর করেছে। শক্তি নিজেই তাঁর জীবনদর্শনের কথা বলেছেন :

যাত্রী তুমি, পথে বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এইতো চাই, বিচার বিশ্লেষণ তোমার নয়
তোমার নয় কুটকচাল, টানা পোড়েন সর্বজনীন
মৌতাত, রাধেশ্যাম
যাত্রী তুমি, পথে বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এইতো চাই।

এই নিস্পৃহ চলাই তাঁর বাসনার হাহাকার হলুদ নদী সবুজ বন তাঁকে অনন্তকাল ধরে টানছে, তাই প্রেম প্রকৃতি জগৎ সম্বন্ধে আসক্তি থাকা সত্ত্বেও উচ্চকণ্ঠে শক্তি বলতে পেরেছেন 'ত্যাগে আমার ভাগ বসেছে, এই বসন্তে বৃষ্টি হবে।' তাই পা-চাপা প্যান্ট জঙলা সভ্যতাকে বিদেশ মনে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এই জগৎ পরিহার করা তাঁর বাসনা নয়, এই জগৎ থেকে উত্তরণই তাঁর লক্ষ্য ; 'নদীর দুটো দিকই দরকার, আমি তো আর ব্রিজ বাঁধছি না।' বালককালের দোল মঞ্চই তাঁকে শিখিয়েছে 'ঘাট ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে আছে লিপ্তিবিহীন নৌকা বাওয়া। সমস্ত সম্মুখে যাবে ফিরে তাকাতে করলে মানা।' তাই স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম, নদী, নৌকা, এঞ্জিন, জাহাজ, সমুদ্র, পথ, পথিক এই শব্দগুলি বার বার আসছে। স্টেশন শক্তির কাছে বিভিন্ন সঙ্কেত নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, কখনো জীবন, কখনো আকাঙ্ক্ষা, কখনো স্তব্ধতা, প্রচ্ছন্ন অর্থসহ এমনি একটি জীবনবোধকে অর্থাৎ মিথ্ সৃষ্টি করতে চাইছেন। শক্তি এই জীবন থেকে মুক্ত হবার জন্যে যাত্রাপথের আনন্দ গানে এমন মেতেছেন যে তাঁর হৃদয়পুরের প্রকৃত পরিচয় আমরা পাই না। এখানেও সেই জীবন সম্বন্ধে স্থিরতার অভাব, যে স্থিরতায় জীবনবোধের স্পষ্টতা প্রত্যক্ষীভূত হতে পারে ; সুতরাং এযুগেও নূতন রীতিতে শক্তি সুদূর চঞ্চলের রোমান্টিক পথিক, পেছনে ফিরতে যাঁর প্রবল দ্বিধা।

এই উদাসীন পথিকের নিস্পৃহ দৃষ্টির জন্যেই প্রেমের মধ্যে ইন্দ্রিয়জ আবেগ থাকা সত্ত্বেও সুনীলের মতো দেহের আস্বাদ ও লেগে থাকার প্রাণান্তকর যন্ত্রণাবোধ নেই। অথচ প্রেমের কবিতার মধ্যে দুঃখবোধ জ্বালা ঈর্ষা হতাশা রয়েছে। 'মনীষার ভালবাসা মাহুতের মতো ছিল উঁচু', কিন্তু এই ভালোবাসাও রাতের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো, কারণ, 'ঘোড়ার বালামচি বেহালায় মেহুম্নিন পৃথিবীর সীমান্তে সতত চলে যায়, পড়ে থাকে গির্জায় কৃতঘ্ন যিশু।' সুতরাং

কবিতা : চিত্রিত ছায়া

এই প্রবাস জগতের ভালোবাসা বিবাহ পথের টানের জন্যেই পুনর্বিবেচনা করতে হয়। মনীষার প্রেমের রাতের বাজারের জন্যেই কি শক্তি এমনিভাবে প্রশ্ন করেছেন, 'তুমি কেন যথেচ্ছাচারের কাছে আপনাকে সঁপেছিলে'। একদিকে যেতেও হচ্ছে, অথচ ছেড়ে চলে-যাওয়া নারীর জন্যে ঈর্ষা হতাশা প্রেমকে বুকে নিয়ে যাচ্ছেন। নারী ও প্রকৃতি শক্তির কবিতায় সব সময়ই স্থান বদল করে, প্রেমিকার সঙ্গে তাই যাওয়া-আসা খেলা চলে। প্রেমিকা, আত্মসম্বোধন, আকাঙ্ক্ষা—এসব প্রায় সব সময়ই 'তুমি' হয়ে যায়, এই তুমিকে ভালোভাবে বুঝতে পারলেই কবিতায় চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়া যায়। নারীকে শয়নে নয়, উন্নত দণ্ডায়মানরূপের সৌন্দর্যের উপলব্ধির মধ্যেই সার্থকতা তাঁর। নারীর ভালোবাসার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্যেই তার শরীরে বিষপিঁপড়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন, কেননা কবির দুঃখবোধই তাঁকে মাঝে মাঝে সাপের কামড় বসিয়েছে। জীবনের এই হাসিকান্না ডুমুরের গাছের মতোই একসঙ্গে নিয়ে চলেছেন। কবির কাছে মৃত্যু এখনো রোমান্টিক স্বপ্নরঙিন। আমাদের মাতাল জীবনের করুণ অসহায়রূপ প্রথম কবিতার মধ্যে ওলোটপালটভাবে সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে বিবাহের ছবির মধ্যে।

শক্তি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে ভয় হয়, সংগীতের ছন্দ এবং চিত্রের লোভে প্রকৃত কবিতার রাজত্ব থেকে সরে না আসেন। এবং একই কথার পুনরুক্তি তাঁর সমগ্র কাব্যজীবনকে গৌণ কবির পর্যায়ে টেনে নিয়ে না যায়। সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অলোকরঞ্জন, রমেন্দ্রকুমার, প্রণবেন্দু, শঙ্খ ঘোষের শব্দ ও কাব্যের সংহতির অতি কাঠিন্যই হয়তো শক্তিকে উচ্ছৃঙ্খল যুক্তিপরম্পরাহীন দীর্ঘ বাক্য ও শব্দগঠনে প্রতিক্রিয়া জুগিয়েছে। কিন্তু সুররেয়ালিস্তদের ব্যর্থতা থেকে এই অভিজ্ঞতা নিতে হবে, কবিতা ভালেরির ভাষায় শব্দধ্বনিঅর্থের অর্কেস্ট্রা, এবং তার জন্যে বৈজ্ঞানিক সমীকরণ না হোক, বুদ্ধিগ্রাহ্য মার্জনা প্রয়োজন, তা না হলে অর্থহীন ধ্বনিচিত্রে পর্যবসিত হবে। সুতরাং কিছুটা স্থিরতা, ধ্যান, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা পরিণতির জন্যেই আবশ্যিক। 'ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো'র গতিময়তাই এখনো তাঁকে চালিত করছে।

২.

ডিলান টমাসের কবিতা 'এ রিফ্যুজাল টু মোর্ন' আলোচনা করতে গিয়ে টমাসের চিত্রকল্প প্রসঙ্গে হেনরি গিব্‌সন কতকগুলি মারাত্মক প্রশ্ন তুলেছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন টেমসের সঙ্গে রাইড (ride) ব্যবহার করা হচ্ছে কেন? 'দি লঙ ফ্রেণ্ডস্' 'ওয়ার্মস' অথবা 'উইড্‌স্'-এর মানে কি? 'ডাউন'-এর সঙ্গে 'স্টেশন অব্ ব্রেথ্' এর যোগ কি ভূগর্ভস্থ কিছুকে ব্যঞ্জিত করছে? কেন জলের পুঁতি পূজা বেদী-নয় এবং শস্য স্বর্গ নয়? এর উত্তরে বলেছিলেন যে টমাসের চিত্রকল্প নির্দিষ্ট ও সচেতন নয়। 'ম্যাপ অব লাভে' গ্রেন, গোল্ডেন, সোভারেন ইয়লো মূল বিষয়ের সঙ্গে অসংলগ্ন হলেও একটা সতেজ চিত্রকল্প তৈরি করছে। এমনিভাবে নষ্ট চিত্রকল্প টমাসের কবিতায় কাজ করে, নূতন-ভাবে স্পষ্ট হয়, রোমান্টিকদের মতোই ঝড়ের সঙ্গে হৃদয়কে মেলান। গিব্‌সন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে টমাসের বিশেষ প্রতিভা জানে কিভাবে প্রথাগত ও নির্বোধ শব্দকে নতুনত্বের চমকে চিন্তায় নাড়া জাগিয়ে তুলতে হয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'সোনার মাছি খুন করেছি' 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান' গ্রন্থে চিত্রকল্প প্রসঙ্গে এই একই কথা জীবনানন্দের প্রভাবকে স্বীকার করেও নির্ভয়ে বলা যায়।

চিত্রকল্পের ব্যবহার সম্বন্ধে ডিলান টমাস বলেছেন : 'আমার কবিতায় বহু চিত্রকল্পের দরকার হয়, কারণ এর কেন্দ্রে চিত্রকল্পের গুচ্ছ রয়েছে। আমি একটি চিত্রকল্প তৈরি করি, যদিও তৈরি করা শব্দটা যথার্থ নয়, হয়তো অনুভূতিতে একটি চিত্রকল্প আমার মধ্যে তৈরি হতে দিই এবং তারপর আমার সমালোচনা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে তা প্রয়োগ করি; আর একটার জন্ম দিই, দ্বিতীয় চিত্রকল্পকে প্রথম চিত্রকল্পটিকে বিরোধিতা করতে দিই; তৃতীয় চিত্রকল্প তৈরি করি, একসঙ্গে অন্য দুটোর চিত্রকল্প থেকে, একটা চতুর্থ বিরোধী চিত্রকল্প জন্ম নেয়, এবং সবগুলিকে আমার আরোপিত রূপসীমায় সংঘাতময় হতে দিই...আমার যে কোনো কবিতার জীবন একটা কেন্দ্রীয় চিত্রকল্পের চারদিকে সমকেন্দ্রিক উপায়ে চলতে পারে না, কেন্দ্র থেকে জীবন অবশ্যই আসবে; এক চিত্রকল্প অবশ্যই জন্মাবে এবং অপরটার মধ্যে মরবে এবং আমার চিত্রকল্পের যে কোনো পর্যায়ক্রম সৃষ্টির, পুনঃসৃষ্টির, ধ্বংসের, বিরোধের অবশ্য পর্যায়ক্রম হয়ে উঠবে...' আমার ধারণা, শক্তিও চিত্রকল্প সম্বন্ধে এসব কথা অনায়াসে বলতে পারেন।

কবিতা : চিত্রিত ছায়া

হুসের্ল 'Logische Untersuchungen' রচনায় তাঁর দর্শনের 'স্বরূপ' বা 'নির্যাস' সম্বন্ধে সাহিত্যের ভাষার সঞ্চরমানতার তুলনা করেছেন, মনের গভীরে বস্তুর অস্তিত্ব বা প্রমাণ সম্বন্ধে বলেছেন যে এর মধ্যে অর্থের অভীপ্সাময় স্বজ্ঞাজাত পরিপূর্ণতার ধারণা কাজ করে। লেখকের সঙ্গে পাঠকের ভাবের আদান-প্রদানেই ভাষার কাজ, কারণ ভাষা যে ব্যবহার করে এবং ব্যবহৃত ভাষা যে বোঝে, এই ভাষার মধ্যে অর্থ রয়েছে। অর্থের ইচ্ছাই ভাষায় প্রকাশিত ঘটনা এবং সচেতন বিষয়ীর মধ্যে কার্যকরী যোগসূত্র। এই অর্থের ইচ্ছা না থাকলে সচেতন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারতো না ইন্‌ট্যুইশন বা স্বজ্ঞার মধ্যে, অর্থাৎ ভাষা ব্যবহারকারীর স্বজ্ঞার মধ্যে বস্তু বা বিষয় শুধুমাত্র ঈপ্সিত হয় না, বস্তু সেখানে উপস্থাপিত। সুতরাং সচেতনতার মধ্যে ইচ্ছা ও বস্তু যুগপৎ উপস্থিত। যখন স্বজ্ঞার মধ্যে বস্তু ঈপ্সিত ও প্রদত্ত হয়, তখন ঈপ্সিত বস্তু ও প্রদত্ত বস্তু এক হয়ে যায়। সচেতন বিষয়ী এই একাত্মতা সম্বন্ধে অবহিত, বস্তু এক হয়ে যায়। পরিপূর্ণ হয়। কবিরাও যে-ভাষা ব্যবহার করেন তাতে অর্থের ইচ্ছা থাকে, এবং কবির মনের স্বজ্ঞায় এবং সচেতন ইচ্ছার সঙ্গে তাঁর ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে বস্তুকে তিনি অবশ্যম্ভাবীরূপে উপস্থাপিত করেন, আর এই বস্তুর সাহায্যেই পাঠকের মনে কবির অভীপ্সিত অর্থের উদয় ঘটে। চরম সুররেয়ালিস্তদের রচনায় কি ঘটে জানিনা, ডিলান টমাস বা শক্তির কবিতায় ভাষার মধ্যে ও চিত্রকল্পে বস্তু বর্তমান, তাই পাঠক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

'সোনার মাছি খুন করেছি' থেকে বক্তব্যে খুব একটা নূতন না হলেও শক্তি এখানে মানবিক বেদনায় একান্ত কাতর, হেমন্তের অরণ্যে যে পোস্টম্যান হলুদপাতা কুড়িয়ে নিচ্ছে চিঠির ঝুলিতে, তাতে পাতা ও বৃক্ষের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু মানুষের মতো দূরত্ব বাড়ছে না, 'একটি গাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব বাড়তে দেখি নি আমি'; গাছেরা একই জায়গায় আছে, কিন্তু মানুষ চিঠির লোভে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, তাই সে নির্জন একাকী, আত্মপরিচয়হীন। শক্তিও জানে, সব কিছু চলে গেলেও জীবন থাকে, জীবন থাকে বলেই তাঁর আকাঙ্ক্ষা: 'শেষমেষ বুকের কাছের নরম মাটিতে ফুটন্ত টগর বসিয়ে চৌ-চম্পট—ঝটানধরা ছোঁয়ার বাইরে'। আর তখনি মনে হয়: 'বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে হয় হৃদয়ের উদ্‌ঘাটন / সে সময়ে পর্দা সরে যায় প্রাচীদিগন্তের দিকে।' এছাড়া এখানে পথের নেশা, প্রেমের

সুতীব্র কিন্তু কোমল ব্যথা ও বিরহ, নিঃসঙ্গতা প্রকৃতির দৃশ্য তাঁর চিত্তকে ভরিয়ে রেখেছে। পূর্বের কাব্যের চেয়ে এই কাব্য আরো রূপের দিক থেকে বিশৃঙ্খল, হয়তো-বা এলোমেলো, এলোমেলো বিস্তৃত ঝোপের মধ্যে যেমন মাঝে মাঝে ফুলের শোভা সমগ্র ঝোপটাকে রমণীয় করে তোলে, শক্তির কবিতায় কয়েকটি চিত্রকল্প এলোমেলো বিশৃঙ্খল বিস্তৃতিকে রমণীয় করে রেখেছে, চিত্রকল্পগুলি মাঝে মাঝে সঙ্কেতের রোদ্দুরে দুলতে থাকে। য়ুঙের ভাষায় 'সমষ্টিগত অচেতন' থেকে হয়তো-বা তাঁর ছবিগুলি বেরিয়ে আসে : 'রঙিন টালির ছাতে উড়ে এসে পড়েছে সজিনা, সজিনা পথেও ঝরে শীতের বাতাসে।' নতুবা, 'পথের পাশে ডালিম ফুটেছিল খুব। পৃথিবীতে আমরণ প্রেম আর শয়ন ঘর ছাড়া কিছু নেই।' এই পথ-সংলগ্ন ডালিমের রক্ত কামনা শয়ন ঘরের প্রেমে নিবিড় হচ্ছে। শক্তির কবিতা ভালোভাবে বুঝতে হলে চিত্রকল্পগুলিকে মিলিয়ে তার সূক্ষ্ম পরিবর্তন ও তাৎপর্য, ক্রমান্বয় সূক্ষ্মভাবে বুঝতে হবে। শক্তি উজ্জ্বল ঘাড়ে হাত রেখে কুয়োর কালো জলে একাকী খেলা দেখেছেন, এবং তা সরে আসতে আসতে আলিসার মাংসে পরিণত হয়েছে। শক্তিই সম্ভবত একালে এমন একজন কবি যিনি কবিতায় হরদম বিভাষা ও ইডিয়ম ব্যবহার করেন, 'হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য' থেকে শুরু এবং প্রচলিত কথ্য বাক্‌ভঙ্গি ও ইডিয়মকে নূতন অর্থে ব্যঞ্জনা দেন : 'সুমুন্দির পো, আলোশুদ্ধু নদীতে ডুব্ দেলেন। ফেশান্ কতো, হতো বটে কচ্ছপের পেরান।' এ সবের মধ্যে তাঁর উদাসী বাউল মনের গেরুয়া রঙই বেদনায় ছড়িয়ে পড়েছে। সব কিছু ছুঁয়ে আছেন।

কবিতার ফর্মে এই উচ্ছৃঙ্খলতাই শক্তির একমাত্র পরিচয় নয়, প্রচলিত ফর্মে—সনেটে, তাঁর সৃষ্টিকর্ম কতখানি সুন্দর হতে পারে, তাঁর লেখা বিভিন্ন সনেটগুলি এবং প্রথম বইয়ের কিছু কবিতা তার পরিচয় দিচ্ছে এবং শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। সংবৃত চার অক্ষরের ছড়ার ছন্দের সুরের জাদু ও মিল ব্যঙ্গ ও অন্য কবিতায় ব্যক্ত। সংবৃত চার অক্ষরের ব্যবহারে নিয়ম ভাঙতে তাঁর কবিসত্তা স্বচ্ছন্দ। এমনিভাবে ছন্দে ও ছন্দোহীনতার মধ্যে তাঁর সৃষ্টিক্রিয়া প্রসারিত।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সদর স্ট্রিটের বারান্দা' পঞ্চাশের কবিদের একটি প্রৌঢ় দৃষ্টান্ত। বইটির দুটি অংশ, প্রথম অংশে আছে আধুনিক মানসিকতার এবং কবির সাম্প্রতিক জীবনবোধের পরিচয়, দ্বিতীয় অংশে আছে তাঁর অর্বাচীন মনস্কতার চিহ্ন। অথচ দ্বিতীয় অংশে বাংলার তিনটি ছন্দ নিয়ে অভ্যস্ত হবার চেষ্টা করেছেন, সাংবেদনিক সততায় নিত্য পরিবর্তমান বস্তু ও ভাবকে ধরতে চেষ্টা করেছেন, লিরিকের স্বচ্ছন্দ রূপকে পাবার চেষ্টা করেছেন এবং স্বভাবতই মূলে ও গভীরে খুব একটা নাড়া দেয় না। কিন্তু কবিকে জানতে হলে এই কবিতাগুলি পাঠকের কাছে অপরিহার্য।

প্রণবেন্দু ব্যক্তিগত ভাবে রিল্‌কের কবিতা ভালোবাসেন, রিল্‌কের কবিতার প্রভাব স্বীকার করেন। এবং সহজ স্বরে গভীর কথা বলতে পারাকেই কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করেন। সাধারণভাবে কন্‌সেপ্টের চেয়ে কবিতায় শব্দে ভাবে চিত্রকল্পে পার্‌সেপ্‌শনকে চরম মূল্য দিতে চান। শেষেরটি সকল কবিরই কাম্য, সুতরাং পূর্বোক্ত দুটি শর্ত কিভাবে কবিতায় কাজ করেছে, তা বিচার্য।

'সদর স্ট্রিটের বারান্দা'র বিশিষ্ট কবিতাগুলি ভালোভাবে খুঁটিয়ে পড়লে সতেজ চমকপ্রদ তুচ্ছ ও গভীর চলতি চিত্রকল্প নাড়া দেয়, এলিঅট পাউণ্ডের কবিতা আলোচনায় কবিতাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন, 'ভর্স এ্যাজ স্পিচ' ও 'ভর্স এ্যাজ সঙ', দ্বিতীয়টির গীতিময়তা প্রণবেন্দুর কবিতায় খুবই বিরল, কিন্তু কবিতার ভাষাশিল্প চিত্রকল্পের মাধ্যমে মাঝে মাঝে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, একটি খণ্ড চিত্রের মধ্যেই পুরো কবিতা পাওয়া যায়। এই চিত্রকল্পের পেছনে কাজ করছে আইডিয়া ভাবনা অনুভূতি। এক্ষেত্রে তাঁর মানসিকতায় সাঙ্কেতিক কবিতার ধর্ম চকিতে ধরা পড়ে, এবং তার প্রভাবও সুস্পষ্ট। কিন্তু যে অর্থে মালার্মে সঙ্কেতধর্মী এবং আর্টে নৈর্ব্যক্তিক সত্তা প্রকাশে আগ্রহী, তা তাঁর মধ্যে নেই। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঁর কবিতা বিভিন্ন স্তরে গেছে। তাঁর কাছে জীবন জীবনসংগ্রাম নয়, 'সোনাল ফুল রাত্রিবেলা ঝরে / সকালবেলা তুমি আমার ঘরে।' চলমানতাই জীবন কবি বঝতে পারছেন তাঁর অন্তর্যামী, মৃত্যুবহতার এই জীবনের নদীটিকে জলে

ভরে রাখছেন, কবির সর্বাঙ্গ ক্ষালন করে মেজে ঘষে অঙ্গ উজ্জ্বল করছেন। ('ফরাসডাঙা')। প্রণবেন্দু যদিও আপন অনুভূতির ও আইডিয়ার জগতে বাস করতেই একান্ত অভিলাষী, তবু এই জগতের রূপরস তাঁকে মুগ্ধ করে, তাই পালিত ময়ূরের সঙ্গে কথোপকথন হয় ও প্রশ্ন জাগে, 'তোমার কেকার ডাকে জেগে ওঠা বাহির ভিতর সব ছেড়ে যেতে হবে !!' কিন্তু কবিতায় কবির আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, 'কোথাও যাবো না, শুধু বিকেল বিকেল ঘুড়ি ওড়ানোর ক্ষীণ, করুণ বাঁশরি কান পেতে নেবো।' এ ছাড়া কিছু কিছু কবিতায় অসহায়তা, ব্যর্থতা, কামনার ও স্বপ্নের অচিরতার্থতাকে নিয়ে বেঁচে থাকা ও মৃত্যুবোধ ফুটে উঠেছে, 'মানুষ', 'একটি মৃত পাখি', 'তোমরা', তার উদাহরণ। কিন্তু প্রণবেন্দুর সার্থকতা ফুটে উঠেছে প্রেমের কবিতায়। এই কবিতাগুলি প্রত্যক্ষ বাস্তব নয়, স্মৃতিস্নাত মনের চিত্রে প্রশ্নের ব্যাকুলতায় স্নিগ্ধ করুণ বিষাদময় হতাশমর্মর। এই প্রেমের, কবিতার ব্যক্তিঅনুভূতি সর্বজনীনতায় পৌছেছে। যে নারীকে কবি ভালোবেসেছেন, সে নারীকে তিনি পাননি, সেই অপ্রাপণীয়া অধরা নারী তাঁর চিন্তার অনুভূতির জগৎ ছেয়ে আছে, তাঁর জীবন নদীতে রঙিন ঊর্মি সৃষ্টি করেছে। এই নারী সম্বন্ধে জেগে উঠেছে কখনো ঈর্ষা অভিমান ক্রোধ, কাছে পাবার জন্যে ব্যাকুলতা, কখনো আপন মনে প্রশ্ন করে জেনেছেন প্রেমিকাকে চিনতে না পারার জন্যেই হয় তো ঘৃণায় দূরে চলে গেছে সে। হয়তো মিলনের কলহই প্রেমিকাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে, তাই কবিহৃদয়ের 'নোটন' 'বকুলের' চেয়েও প্রেমিকার প্রত্যাশা আরো গভীর, সেই কারণেই প্রচণ্ড ঘৃণায় আড়াল করেছে। কবির মনে কখনো দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলেছে, 'তুমি যে আমার নও তা কখনো মানতে পারিনা,' কারণ কবির জীবনের শিকড় ছুঁয়ে বসে আছে সে ; 'সব আচ্ছাদিত রস আমার ভেতর থেকে খুঁড়ে নিয়ে গেছো তবু বাঁচাতে শেখোনি।' যে ব্যক্তি প্রেমিকাকে পেয়েছে, তার সম্বন্ধে ক্রোধ অসূয়া জাগছে, প্রেমিকা আজ কাছে নেই, তবু আতুর পাখির ডাকের মতো 'প্রেমিকার' কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছেন যেন, চলে-যাওয়া প্রেমিকা 'হঠাৎ হাওয়ায় ছাখো আবার নিভৃত থেকে সব উড়ে আসে মেঘের নৌকা সব টলে উঠে'। 'প্রেমিকাকে' কবিতাগুচ্ছের আখ্যানভাগের মধ্যে কবির ব্যক্তিহৃদয়ের অনুভূতি আকাঙ্ক্ষা প্রশ্নব্যাকুলতা, প্রেম সম্পর্কে তাঁর জীবনবোধ সবই প্রকাশিত

হয়েছে। প্রেম কবির কাছে রিল্‌কের মতোই রূপান্তরের প্রতীক, পূর্ণতার নামান্তর, 'প্রেমে আকাশ পথবর্ত্মরেখাহীন অরণ্যশিখর ছুঁয়ে সাড়া দেয়', 'ট্রেনের চাকায় সব দিকদেশ ফুলের তোড়ার মতো সার বেঁধে ফোটে, আর তীব্র বাঁশি বাজে।' তাই প্রেমিকাকে শয্যার বালিশে পাওয়া যায় না, প্রচণ্ড ঘৃণায় বালিশ আড়াল করে সে কেঁপে কেঁপে ওঠে। না-পাওয়ার মধ্যে বেদনা ও আনন্দই এই কবিতাগুচ্ছের মর্মরিত বেদনানির্ঝর। প্রেমিকার বিরহে দীর্ঘ দিবসরজনী অনুভূতির চিত্রে ও রঙে রঙিন, কবির এই প্রেমের দ্বন্দ্বই তাঁর জগৎ ও জীবনকে নূতন বোধে রূপান্তরিত করছে।

এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যেই রিল্‌কের এলিজির কাব্যছন্দ ও রূপরীতির সাদৃশ্য চোখে পড়ে; সুরহীন গদ্যভঙ্গিতে, অক্ষরবৃত্তের ভাঙা ছন্দে, কখনো কেটে কেটে, কখনো প্রবহমানতায়, খণ্ড চিত্রকল্পে ও প্রতীকে, ছোট বড় স্তবকে, অতিরিক্ত প্রশ্নবিতর্কে, অত্যধিক আত্মকেন্দ্রিক ঘটনার সংযোজনের ফলে লাফানো ঢঙে একটা বিশিষ্ট রীতি ফুটে উঠেছে। প্রণবেন্দুর কবিতায় অতিরিক্ত প্রশ্নাকুলতা, সুরহীনতা, প্রতীকের প্রতি দুর্মর আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও কবিতায় রূপগঠনে ঘনপিনদ্ধতা প্রশংসনীয়। তবে অতিরিক্ত বৈঠকি ও ঘরোয়া হতে গিয়ে চলতি কথ্য ও প্রশ্নকাতরতার রীতি কবিতার গভীরে প্রবেশ করতে কখনো নিষেধ করে, আর্ট হতে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। যদিও কবির একটি বিশিষ্ট মনোভাব আছে, তবু মৌহূর্তিক বেদনার ক্ষণিক প্রকাশ মাঝে মাঝে পীড়া দেয়। সুর সর্বদাই নিচু সুরে, কখনোই উদ্দীপ্ত নয়। ফলে একঘেয়েমির সম্ভাবনা থেকে যায়।

প্রণবেন্দুর কবিতায় এই প্রশ্ন-প্রবণতা কেন? তাঁর কবিতায় প্রশ্ন যেখানে সার্থক হয়ে উঠেছে, সেখানে প্রশ্ন সার্ত্রের ভাষায় শুধু বলা চলে বাচনিক নক্‌শা নয়, বচনের সুনির্দিষ্ট চিত্রকল্প, একটি বস্তুসত্যে প্রতিষ্ঠিত। যে রহস্যনিয়তিকে ও সৌন্দর্যকে জানতে পারছি না, বুঝতে পারছি না তাকে নির্বিকল্প প্রশ্ন করার মধ্যেই তো হৃদয়ের আর্তি প্রকাশ পাচ্ছে। এই অনুত্তর প্রশ্নের মধ্যেই তো জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছা এবং জানতে না পারার ব্যর্থতাবোধ কাজ করছে।

সুধেন্দু মল্লিক

এলিঅট পাউণ্ড সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে বলেছেন মহত্ব বা মহানুভাব কাল নির্ধারণ করবে, সাময়িক কালের সমালোচক কাব্যালোচনায় দেখবে কবির রচনায় আন্তরিকতা আছে কি না। সুধেন্দু মল্লিকের কবিতা পড়তে বসে বার বার এই কথাই মনে হয়েছে, একই সুরের করুণ পুনরাবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন দৃশ্য ও চিত্রে তাঁর আন্তরিকতা গভীরতরভাবে প্রকাশ পেয়েছে, বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁর বিশিষ্ট কবিতায়—যার মধ্যে তাঁর এই মানসিকতা ছাপ ফেলেছে।

সুধেন্দুর কবিতায় তারাপদর মতো হেঁকে বলার প্রবণতা নেই, শক্তির লাফিয়ে চলা নেই, বিচ্ছিন্নতা নেই, প্রণবেন্দুর অতি নিয়ন্ত্রিত চেষ্টা নেই, তথাকথিত প্রগতিবাদী কবিতায় উচ্চকিত চিৎকার নেই, শব্দ ও অর্থের জন্যে তীব্র হাহাকার বোধ নেই, নির্জন বনানীর অভ্যন্তরে গোপনে স্বচ্ছ ঝর্নার ধারার মতো নিয়ত উচ্ছ্রিত। সুধেন্দু যুগের প্রভাব এড়াতে পারেন নি বলে কিছু কিছু দীর্ঘ কবিতায় এলিঅটীয় ভঙ্গিতে এবং লাফিয়ে চলার রীতিতে মনের বিচ্ছিন্নতা প্রকাশ করেছেন, তাঁর সত্তার মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা, আঘাত, ছেঁড়াখোঁড়া রক্তের দাগ, স্নায়ুগ্রস্ততা—এগুলিও লক্ষ্য করেছেন, 'অবতরণ' 'আত্মজীবনী' কবিতায় এদের রূপ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সুধেন্দুর কবিতার বিশিষ্টতা নিহিত সদর্থক ও সার্থক অর্থে লিরিক কবিতার নিটোল চিত্রসংগীতে, যে চিত্রসংগীত স্বতঃস্ফূর্তভাবে হৃদয় থেকে সহজভাবে বেরিয়ে আসে, কোনো বাধার সম্মুখীন হয় না, এবং সরলতা স্বাচ্ছন্দ্য স্বতঃস্ফূর্ততার দিক থেকে বর্তমান যুগের আধুনিক কবিদের মধ্যে কেবলমাত্র বিনয় ও সুধেন্দুই লিরিক কবির মতো আপন মনের নগ্ন অনাবৃত বেদনা রঙিন স্রোতে প্রকাশে সমর্থ। এদিক থেকে তাঁর পিতামহের ঐতিহ্য তাঁকে একটা সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি দান করেছে। আপন হৃদয় ছাড়া অন্য সব ব্যাপারেই উদাসীন, এতো নিবিড়ভাবে আপন মনের কথা নিয়ে ব্যস্ত যে তাঁর মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ অন্য প্রসঙ্গ মাঝে মাঝে চোখ এড়িয়ে যায়, আপন মন দিয়ে প্রকৃতিকে প্রভাবিত করতে চাইছেন। তাঁর বিশিষ্ট ও সার্থক কবিতায় হৃদয় ও প্রকৃতির সহযোগে সঙ্কেত-সংগীত-চিত্রে একটা নিবিড় হার্মনি সৃষ্টি করে। তাই ব্যঙ্গবিদ্রূপখোঁচা, ছন্নছাড়া মনোভাব, বুদ্ধিবাদ, চেতনাপ্রবাহ, থমকে-যাওয়া বেদনা, খুঁড়িয়ে

চলা জীবনের বিচ্ছিন্নতা বোধ, আমার বিশ্বাস, স্থধেন্দুর কবিতায় ভালো মানায় না। তাঁর বিশিষ্টতা লিরিকের নিটোল কবিতায়, যেখানে ছন্দসংগীত কথ্যভাষার মধ্য দিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে বেরিয়ে আসে, বেদনাবদ্ধ চিত্রের অভিনবত্ব পাঠকের মনকে দূরান্তরে টেনে নিয়ে যায়। সাফো থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত লিরিক কবিতার যে ধারা, তাতে এই কথ্য ভাষার সহজ সংগীতেই হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। গ্রীসে সাফো ও পিণ্ডার টেকনিকের দিক থেকে দুই মানসিকতার প্রতীক, পিণ্ডারের কবিতা বুদ্ধিগ্রাহ্য নির্দেশাত্মক কবিতাকে ইঙ্গিত করছে, আর সাফো আপন হৃদয়ের শুধু প্রেমের কথাই আপন বন্ধুদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছেন, স্থধেন্দুও এই প্রেমকেই শুধু বর্ণনা করতে চেয়েছেন। আপন মনেই এই প্রেমের বেদনার কথা প্রকাশ করেছেন, সে কথা কাউকে উদ্দেশ করে নয়। কখনো আপন মনে, আপন সত্তার কাছে, কখনো কল্পনায় বাস্তবকে ভুলে গেছেন, কোনো কবিতায় মনে হয় কাউকে তিনি কথা শোনাচ্ছেন, কথা শোনাতে শোনাতে আপনার মনের মধ্যে চলে গেছেন, আবার নিজের কথা বলতে বলতে পরকে শুনিয়ে দেন। তাঁর সার্থক কবিতা মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হৃদয়ানুভূতির নিবিড়তায় যেন নিটোল হয়ে উঠেছে। 'বুকের মধ্যে সিঁদুরে মেঘ / রক্তপাদপ / স্রোতস্বিনী / ফলও আছে ফুলও আছে—সমান সমান / অনাবশ্যক আঘাত হেনে করেছো পান এক স্বভাবে / পান্থ আমার, এতে কি আর তৃষ্ণা যাবে ?'

স্থধেন্দুর কবিতায়, প্রথমেই বলেছি, বিষয় বৈচিত্র্য নেই, তবু প্রকৃতি, কৌতুকপ্রিয়তা, ব্যঙ্গ, বিচ্ছিন্নতা, ভয়ভীষণতা নিয়ে কিছু কবিতা আছে। এযুগের কবিদের ঢঙসর্বস্ব একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সকলেই বাউলের আদর্শে অনুপ্রাণিত, ঘর ছাড়া উদাসীন পথিকের অন্যমনস্কতায় প্রলুব্ধ। এই সব বিষয়ে স্থধেন্দুও কাব্য রচনা করেছেন। তবে স্থধেন্দুর ক্ষেত্রে বাউল ও উদাসীন পথিকের অন্যমনস্কতার একটি গূঢ় তাৎপর্য এসেছে প্রেমের বিচ্ছেদবেদনা থেকে। ছড়ার ছন্দের কবিতার দুলুনি তাঁর কথ্য ভাষার সঙ্গে অপূর্ব সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে। তাঁর কথ্যভাষা এতো ঘরোয়া যে মাঝে মাঝে মেয়েলি কথ্যরীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'তোমার বড়ো বাড় বেড়েছে, দাঁড়াও তোমার হচ্ছে।' স্থধেন্দু আপন মন নিয়ে ব্যস্ত বলেই বাইরের জগতের

সঙ্গে তাঁর বিরোধ থাকা সত্ত্বেও তারাপদের মতো সুধেন্দু রেগে চিৎকার করেন নি, হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেছেন। এই হৃদয় ছুঁয়ে আছে প্রকৃতির আলোছায়ার আল্পনা, পথের দীর্ঘশ্বাস, ইষ্টিশন, বাতাস, হাওয়া, নদী, নৌকা, আকাশ, জল, অন্ধকার। নাগরিক জীবনের দুর্দণ্ড প্রতাপ তাঁর হৃদয়ের গভীরে কোনো আসন দখল করতে পারে নি। ফলে চিরায়ত রোমান্টিক কবিদের মতোই তাঁর হৃদয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষার বেদনা নিয়ে বর্তমান জীবনের ক্ষণিকতা থেকে নিত্য পরিবর্তমান আকুলতার জগতে উধাও হতে চেয়েছেন। সুতরাং লিরিক ও রোমান্টিকতার এই যুগলবেণী সুধেন্দুর কবিতায় লক্ষ্য করা যায়।

প্রেমই সুধেন্দুর কবিতার মূল সুর, বিপ্রলম্ভ প্রেমের বিলাপেই 'বৃষ্টিকে করেছ বৃষ্টি' ছেয়ে আছে, বিচ্ছেদ ব্যথাতুর হতাশ কবির স্মৃতির আলোয় কবির প্রেমিকার ছবি চকিতে-আভাসে দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে, প্রেমই কবিকে পাগল করেছে, নির্জনতায় ঠেলে নিয়ে গেছে, বিষণ্ণ ব্যথায় মোচড় দিচ্ছে, শীতের সূর্যাস্তে নরম ম্লান রোদে প্রেমিকার স্মৃতি আসন্ন রাত্রির ব্যর্থতায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এই পেয়ে-হারানোর বেদনার গানই সুধেন্দুর প্রেমের পরিচয়। কিন্তু বেদনার হতাশার মধ্যেই তাঁর কবিতা শেষ নয়, না-পাবার বেদনা, হারাবার বিচ্ছেদ যেমন তাঁকে টান দিচ্ছে, তেমনি মনের মধ্যে তাঁর তীব্র প্রত্যাশার নীল আগুন জ্বলছে, আকুল প্রার্থনা বিষণ্ণতায় জাগছে, 'যেখানেই যাও ফিরে আসার কথাটা মনে রেখো / ছেড়ে যাওয়ার নিস্পৃহতা আর পড়ে থাকার বিষাদ / একদিন যেন পরস্পরের মুখ দেখে।' নতুবা : 'ভালোবাসার কালে গিয়েছো আড়ালে / কতবার রঙখড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে / যেন কথা বলতে বলতে মুখ এঁকে রাখি আশেপাশে।' অথবা : সরে গিয়েও দেখছি তুমি আছো, সরিয়ে দিলেও দেখছি আমি আছি।' কবি নিজেকে সঁপে দিয়ে আকুল প্রার্থনায় ভেঙে পড়েছেন : 'সব দেবো / দেয়াল মুচড়ে শুধু একবার দেখা হতে দাও।' কবিহৃদয়ের কথাই জানি, কিন্তু প্রেমিকার মনের কোনো গোপন কথা জানতে পারি না, নারীর রহস্যই এখানে মোহনীয় রঙ তৈরি করেছে। এই রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কবির ভীরু লাজুক মনোভাব, আলসেমি, অন্যমনস্কতা, দরজা পেরিয়ে যাবার জন্যে সাহসের অভাব, দরজা খোলা রয়েছে, ভয়ে ও লজ্জায় সাহসে ভর করে তাকে ডাকতে

পারেন নি : 'হঠাৎ আমার খুব ভয় লাগে / দরজা এমন খোলা থাকলে / কি করে ভেতরে যাই বলো, বন্ধ দেখলে / কড়া নাড়তাম। তোমার নাম ধরে ডাকতাম ·····খোলা দরজায় / কি কড়া নাড়তে পারি !' দরজা সুধেন্দুর কবিতায় একটি প্রতীক। তাই আপন মনে এই নারীকে ভালোবেসেছেন, আহ্বান জানিয়েছেন, প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, নদীর সঙ্গে নারী এক হয়ে যাচ্ছে, 'দেখেছি তুমি কি রোরুদ্যমানা নদী / বর্ষায় উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাকে ভেঙে নিয়ে যাবে।' অথবা, 'তোমার নির্মল মুখ শাপলা পদ্মের / সে বুঝি গ্রামের সরোবর / প্রতি পুজো পার্বণেই তুলে আনা যাবে।' প্রকৃতির সঙ্গে প্রায় একাত্ম হয়ে মিলে মিশে যেতে চায়, 'তুমি কি নির্দেশ করে কিছু রেখে যাও গাছের পাতায় / যার আবরণে পাখি ডাকে / আমার গলার নীচে মৃত নদী আজো বহমান।' সমর্পণ করে নিজেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভেবেছেন, নিজের জন্যে প্রার্থনার কোনো প্রয়োজন নেই, প্রতিমার কাছে দাঁড়ালে প্রেমিকার ছবিই মনে পড়ে, নিজেকে কাঙাল বানিয়েছেন, তবু এই কাঙাল রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে বলেছেন ; 'তোমারই জয় হোক', কারণ 'আমার রাত্রির হাত নেমে চলেছে জলের দিকে যে জল রয়েছে, তার ধ্বনি বাজে, তোমার গভীরে।' কবির জীবনমরণ নির্ভর করছে প্রেমিকার ভালোবাসার ওপর, 'তুমি দরজার ওপার থেকে আমাকে যতোদিন ভালোবাসবে আমি ঠিক ততোদিন বেঁচে থাকবো।' তবু কবির চিত্তের ব্যর্থতা প্রেমিকা ঢাকতে পারেনি, বেদনায় কবি কাতরে উঠেছেন, 'কি নিয়ে থাকবো যদি সব চলে যায়।' এই প্রেমের ব্যর্থতার জন্যেই বিষণ্ন হৃদয় নিয়ে জীবন থেকে দূরে অন্য জীবনে অথবা এই জীবনের মধ্যে নিবিড় নির্জনতার গন্ধে বিলীন হতে চেয়েছেন। এই নির্জনতা ও প্রেমের ব্যর্থতাবোধ থেকেই এই জীবনকে একঘেয়ে মনে হয়েছে, চাকরি জীবনে, বাস্তব জীবনে ভুতুড়ে ভয়ের রূপ নিয়ে একটা অনুভূতি তাঁকে চেপে মারছে, নির্জন আত্মায় লোভ হিংসা জাগছে। ভয়ের ও কৌতুকের কবিতার মধ্যেও তাঁরই মনের ভাব কাজ করছে। 'ট্রেন এসে যায়' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের গানের টুকরো অংশ নিয়ে গঠিত কবিতার কয়েক জায়গায় সুধেন্দু নিজের মনোভাবকে গড়ে তুলেছেন, রবীন্দ্রনাথের গানগুলির বেদনাই সুধেন্দুর বেদনায় বর্তমানের ভাষায় একান্ত মিলে গেছে বলে মনে হয়। সুতরাং প্রেমের ঐতিহ্যের পথেই সুধেন্দু

এগিয়েছেন : 'আমার পরান যাহা চায় তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে / কেন বাজাও কাঁকন কনকন সখি ভাবনা কাহারে বলে / তুই ফেলে এসেছিস মনরে আজ সারাটা দুপুর / ছিন্ন পাতায় সাজাই তরণী আমার যেদিন ভেসে গেছে।'

সুধেন্দুর কণ্ঠস্বর এতো নির্জন এতো মৃদু এতো নীরব পদসঞ্চারে এগিয়ে চলে যে জোর করে বলা তাঁর কাছে অশোভন বলে মনে হয়। তাঁর ভাষার সংগীতের সঙ্গে, ছন্দের মিলের সঙ্গে, কথ্যরীতির সঙ্গে, লাজুকভীরু প্রেমিকের গোপন বেদনার কাজল-মাখা আকাঙ্ক্ষার রঙিন চিত্র সুন্দর মিলেছে। এমন কি গদ্যছন্দের কবিতার মধ্যেও সুরের তরঙ্গিত ছন্দ দুলে ওঠে। সুধেন্দুর কবিতার মধ্যে কথ্যরীতির চলতি ভাষার সুরের সঙ্গে ও কথোপকথনের রীতি মাঝে মাঝে নূতন স্বাদ আনে। এবং সুধেন্দুর কবিতা যে একই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে রচিত হওয়া সত্ত্বেও একঘেয়ে লাগে না, তার কারণ, অভিনব চিত্রসৃষ্টি ও সুরের দোলা, হয়তো সব কবিতা নিটোল হয় না, কিন্তু ভালো কবিতায় এই চিত্রসংগীত মনকে টেনে রাখে, যেমন : 'তুমিও না যদি বোঝো বলো তবে এমন নিঃশ্বাস তোমার কপোলে এসে কুয়াশার মতো জমে কেন?' 'তুমি মমতায় ভোর রাতের পদ্মপাতা একফোঁটা জল বুকে ধরে স্থির জড়িয়ে আছো।' 'ব্যক্তিগত বেড়া বাঁধবার সময় আমার অন্যমনস্কতা / আকন্দ ধুলোর মতো ভেসে চলেছিল যে কোনো শূন্যতার দিকে।' 'ব্যর্থতা কি ঢাকতে পারছো কেন্দ্রাভিমুখ, না পারছো স্বপ্নাচ্ছন্ন ধনুক থেকে ছিটকে যেতে।' 'দেখি হাত দিয়ে টানলে নিজের ছায়াটাও আলগা হয়ে আসে ছবি ঢেকে রাখা কাগজের মতো।'

তবে প্রেমিকের সঙ্গে মায়ের অনুষঙ্গ মাঝে মাঝে স্নিগ্ধতা আনলেও, এবং একটা স্নেহকোমলতা জাগালেও অনেক সময় দৃষ্টিকটু ও শ্রুতিকটু মনে হয়। কবিতায় অতিরিক্ত কথ্যরীতি অনেক সময় আসল পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। সর্বোপরি সুধেন্দুর লিরিক কবিতার নিটোলরূপে লাফানো ভঙ্গি মাঝে মাঝে সুর কেটে দেয়, এবং যেহেতু বেশি এবং একই জাতীয় লেখা অধিক লেখেন, তাই একঘেয়ে হতে বাধ্য হয়, ফর্মে সম্ভবত আর একটু সংযত হওয়া চলে। অতিরিক্ত আত্মরতিপরায়ণতা বস্তুজগৎকে উপেক্ষা করে। তবু, প্রেমকে অবলম্বন করে চলতি ছবি নয়, একটি স্থায়ীভাবকেই ফোটাতে চেয়েছেন।

সুতরাং সাম্প্রতিক অন্য কবিদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য স্মরণীয় ও উল্লেখ্য।

'বৃষ্টিকে করেছ বৃষ্টি' কাব্যের পর সুধেন্দুর কবিতায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু সূক্ষ্ম পরিবর্তন ধরা পড়েছে। সুধেন্দুর কবিতায়ও বৃষ্টি একটা প্রতীক, বৃষ্টির সঙ্গে বিরহের মধুরতা, ভালোবাসার আকর্ষণ মোহ জড়িয়ে ছিল বলে কবির কাছে বৃষ্টির সার্থকতা পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু আজ বৃষ্টির সেই সার্থকতা নেই, বরং অতৃপ্তি, ব্যর্থতা, নিজের মনে প্রশ্ন, এতো বৃষ্টি নিয়ে কি করবো, বৃষ্টিতে মধুরতার আস্বাদের চেয়ে বৃষ্টিতে একা ভেজার মধ্যে নিঃসঙ্গ ব্যর্থতা জাগছে, ঝাউয়ের ডালে ঝড়ের মতো হৃদয় কাঁপছে। যতোদূর মনে পড়ছে আগের কোনো কবিতায় কবির প্রেমিকা অপরের সংসার উজ্জ্বল করে ছিল না, কিন্তু এখানকার কবিতায় দেখা যাচ্ছে এই প্রেমিকা শুধু অপরের সংসার উজ্জ্বল করে নেই, জাফ্রানি রঙে তাকে কেমন মানিয়েছে কবির কাছে তা জানতে চাইছে। ফলে পরকীয়া প্রেমে কবির ব্যর্থতা ও অতৃপ্তি আরো বাড়ছে। একদিকে প্রেমজীবনের এই ব্যর্থতা, অন্যদিকে বাস্তবজীবনের শূন্যতা ও হতাশা ঘাসের প্রতীকে ফুটে উঠেছে, এই সর্বময় শূন্যতার মধ্যে পাখির মতো উধাও হবার কামনা জাগে, সেখানেই হয়তো বাঁচবার আনন্দ, প্রেমিকার কাছে গিয়ে হারিয়ে যাবার থেকে মুক্তি। ভাষা ও ছন্দ, এবং সুর আরো সাবলীল এখানে, এতো সহজ করে মনের গভীর কথা একালে পঞ্চাশের কবিরা সুধেন্দুর মতো বোধ হয় কেউ বলতে পারেন না, যাতে ব্যঙ্গবিদ্রূপের হুল নেই, শুধু হৃদয়ের স্বচ্ছপ্রকাশ।

শঙ্খ ঘোষ

শঙ্খ ঘোষ পেশায় অধ্যাপক, পাণ্ডিত্যে বিদগ্ধ, কবিতায় মার্জিত, সমালোচনায় রিচার্ডস্‌রীতি গ্রহণে ও সবিশেষ ব্যাখ্যায় উৎসাহী, কবিতার রূপনির্মিতিতে মালার্মে-ভ্যলেরি-ইয়েট্‌সরীতিতে পরিশীলিত, জীবনচেতনায় ঈশ্বরসমন্বিত ব্যাপকতর জগৎধর্মী মানববোধে বিস্তৃত, ভারতীয় ও রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যধারায় একান্ত পরিপুষ্ট এবং ছন্দে অতি কুশলী। রবীন্দ্রনাথের কবিতা

আলোচনায় তাঁর এই বিভিন্ন মানসিকতা ফুটে উঠেছে, এবং সেখানে কবিতা সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। বলেছেন : 'কবিতা বোঝানোর দায়িত্ব নেয় না, কবিতা কেবল প্রাণিত করে,' কবিতায় 'শব্দগুচ্ছের পরস্পর সংঘর্ষেই দেহী অভিজ্ঞতার' 'ব্যাপক আভাস ছায়াচ্ছন্নরূপে রচিত হয়ে যায়।' কবিতা ঘনতর, আবহময় ও জটিল তাৎপর্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এবং কবিতার স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করে রচনার স্বরভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের ওপর। কবিতার অন্তর্লীন ছন্দের দুলকি পাঠকের শ্রুতিতে মুহূর্তের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে যায়।' বলা বাহুল্য, এই সব বক্তব্য তাঁর কবিতা রচনায় প্রভাবিত করে। তাই তাঁর রচনা বিলম্বিত হয়, কবিতার আকার সংক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, প্রতিটি শব্দ অনুভূতি ও সঙ্কেতে গূঢ়ার্থরূপ লাভ করে, ছন্দের ও মিলের কৌশলে ধ্বনিজাত সংগীত মুহূর্তে পাঠককে আক্রান্ত করে। তাঁর কবিতায় চটুলতা নেই, হাল্‌কা চাল নেই, ছন্দের আপাত চটুলতা শব্দের কৌতুকে সত্তার গভীরে অপ্রত্যাশিত বেদনার স্তরে নিয়ে যায়। কবিতা যে কোনো প্রকারেই মুক্ত নয়, এলিঅটীয় এই উক্তি, শঙ্খ ঘোষ অলোকরঞ্জন র:মেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী প্রভৃতির কবিতা রচনায় প্রত্যক্ষ করা যায়।

এই কবিতার রূপনির্মিতি ও মর্জির মধ্যে শঙ্খ ঘোষের ব্যক্তিজীবনের ছাপ রয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। শঙ্খ ঘোষ বাক্‌সংযত, প্রতিটি শব্দে অনুভূতি ও বুদ্ধি প্রয়োগে সচেষ্ট, খাদের থেকে তারায় তাঁর কণ্ঠস্বর ওঠে না, তাঁর আচার-আচরণে চলনেবলনে নিরাভরণ অথচ ব্যক্তিত্ব দীপ্যমান, উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রাণের যাত্রা চলে না বলে তাঁকে মাঝে মাঝে কিছু নিরুত্তাপ মনে হয়, তাঁর সযত্নলালিত উচ্চারণরীতির মধ্যে এক প্রকার 'অ্যাফেক্টেশন' রয়েছে—এই সমস্তই 'নিহিত পাতাল ছায়া'র মধ্যে দৃষ্টিগোচর ও শ্রুতিগোচর করা যাবে। তিনি আমার পরিচিত বলেই তাঁর ব্যক্তিরূপ কবিতায় প্রতিফলিত হতে দেখেছি। সার্থক শিল্পের বিচারে শব্দই মুখ্য—ব্যক্তিরূপের আলোচনায় অনধিকার প্রবেশ বাঞ্ছনীয় নয়। তবু মানুষের দুর্বলতা এই যে সে ব্যক্তিকে এড়িয়ে যেতে পারে না।

শঙ্খ ঘোষের 'দিনগুলি রাতগুলি' (১৯৫৪) প্রথম কাব্যগ্রন্থের মধ্যেই তাঁর কবিপরিচয় লুকিয়ে আছে। বাংলা কাব্যের সমস্ত ছন্দ ও সুরের বিভিন্ন পরীক্ষা এখানেই তিনি শুরু করেছেন, ছন্দের বিচিত্রতার জন্যে এই গ্রন্থটি

সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে স্মরণীয়। এই বইয়ে তাঁর কবিতা দীর্ঘ আবেগের উচ্ছ্বাসে উচ্ছল : 'প্রেমের বিষাণে তারা ছুটে ছুটে মাথা কুটে মরে ভয়ে কাঁপে দুরান্তর' অথবা, 'প্রচণ্ড আবেগে ফেটে পড়তে চাওয়া ভালোবাসায় দুরন্ত ঢেউ অস্থির করে তোলে নিঃসীম ব্যবধান মগ্নস্থির মাটির ঘন কান্তি।' এই উষ্ণ স্পর্শ ও উচ্ছলতা একালের কবিতায় অনেক কম। এই কারণেই 'দিনগুলি রাতগুলি' ইন্দ্রিয়সংবেদনায় অনেকাংশে নিবিড়। 'আমার জীবন তুমি জর্জরিত করো এই দিনে রাত্রে দুপুরে বিকেলে' এই বোধেই এখানকার কবিতা উদ্দীপ্ত। পৃথিবীর সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে উন্মুখ, জীবনদর্শনের বলিষ্ঠ প্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে : 'আমার জীবন থেকে বড়ো / পৃথিবী বিস্তৃত করো দৃঢ় মেঘে তৃণে সূর্যে ভয় / জীর্ণতার ঝড়ে।' 'কলহপর' কবিতায় বলেছেন: 'আমাকে ভুবন দাও আমি দেব সমস্ত অমিয়।' অন্যত্র বলেছেন : 'ধুলোতে তুই লগ্ন হলে আনন্দে এই শূন্য খোলে জট।' এই ভুবন এখন 'নিহিত পাতাল ছায়ায়' এসে মিশেছে। 'সপ্তর্ষি' কবিতায় ধর্মীয় চেতনা ব্যক্ত। কিছু কিছু কবিতায় যন্ত্রণা নিরাশা হতাশার কথা আছে, যুগের কথা আছে। কিন্তু কবিতা ও হৃদয় নিয়েই তাঁর আত্মমগ্নতা। জীবনানন্দীয় ঢঙে বলেছেন : 'আহা বেদনা বুঝি ভালো-বাসে তোমার হৃদয়।' এবং এই বইয়েতেই ধ্বনি সংগীত চিত্রকল্প ছন্দের জন্যে শব্দের সাধনা ও ব্যায়াম শুরু করেছেন। হয়তো শব্দের পেলব কোমল জাদু এই কারণেই বেশি, এই কারণেই এই মোহ থেকে শঙ্খ ঘোষ মুক্ত হতে পারছেন না, জীবনের বন্ধুর কর্কশ পথের শব্দ তাঁকে আকৃষ্ট করে না। ছন্দ ও সুর সম্বন্ধে বৈচিত্র্যের যতো চিন্তাভাবনা এই কাব্যেই তা রূপ পেয়েছে। ৩৪ অক্ষরের পয়ারের চরণের ব্যবহার সম্ভবত শঙ্খ ঘোষই বাংলায় প্রথম করেন, এর পর শক্তি ৩০ অক্ষরের পয়ার ব্যবহার করেছেন, 'হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য' বইয়ে। '১১ই জানুয়ারি ; দুপুর' কবিতায় ৩৪, ২৮, ৩২, ৩০, ২৮ অক্ষরের চরণ ব্যবহার করেছেন, এবং এই চরণগুলির পর্ববিন্যাসও বিভিন্ন প্রকারের ; ৮+৮+৮+৮+২, ৮+৬+৬+৮, ১০+৮+৮+৬, ৮+১০+৮+৪, ১০+৮+১০, এই কবিতায় পয়ার ও শ্বাসাঘাত একসঙ্গে মিলিয়েছেন। এই কবিতার শেষাংশ মাত্রাবৃত্তে পড়া যায়, 'বাঁধে রে যন্ত্রণা তার' জায়গায় এসে থামতে হয় 'যন্ত্রণা' শব্দের মাত্রায়। তখন একে স্বরবৃত্তে পড়তে হয়। 'বাঁধে রে' অতিমাত্রিক পর্ব, তাই স্পেস দিয়েছেন, 'যন্ত্রণা তার' শ্বাসঘাতের

চারমাত্রা, এই ভাবে আবার 'বাঁধে সে' অতিমাত্রিক তিনমাত্রা এসেছে, 'তমস্বিনী' চার মাত্রা। এমনি ভাবে ৩+৪ মিলে শ্বাসাঘাতে সাত মাত্রার ছন্দের ঢঙ এনেছেন। আমি সাত মাত্রার শ্বাসাঘাত রূপে পড়তেই প্রস্তুত, যা মাত্রাবৃত্তে পাওয়া যায়। এইভাবে শ্বাসাঘাতের পরীক্ষা এর আগে কেউ করেছেন বলে জানি না। আর এ কাব্যে সুরও সংগীতের মতো এগিয়েছে; 'জলের ডালায় যদি হৃদয় প্রসার করি, তোমারি বিকাশ।' অথচ গদ্য ছন্দের প্রতি আকর্ষণও রয়েছে 'সপ্তর্ষি' কবিতায়, যদিও গদ্য ছন্দের সঙ্গে ভাঙা পয়ার এখানে অনেক জায়গায় মিশেছে। এবং তিন ছন্দের মিশ্রণও কিছু কিছু জায়গায় আছে অন্য কবিতায়। এই ছন্দ সচেতনতা তাঁর কবিতায় সুরের মৃদু কোমল মোহ বেদনার গভীর গোপন বিস্ময়ে পাঠকের চিত্তকে সংক্রামিত করতে থাকে, যা হয়তো একালে অনেকে পছন্দ করেন না।

'নিহিত পাতাল ছায়া'য় তিনটি অংশ। প্রত্যেক অংশের পূর্বে কাব্যসমৃদ্ধ নিটোল গদ্যে সেই অংশের মূল কথা বলেছেন। 'বিপুলা পৃথিবী'র মধ্যে প্রথম জাত সন্তান পরিবেশের চাপে অস্বস্তি বোধ করছে; 'একদিন সে এসে পড়েছিল এই ভুল মানুষের অরণ্যে। হাতে তাদের গা ছুঁতে গিয়ে কর্কশ বল্কল লাগে বারে বারে।' 'জরাজটিল অরণ্যে তাঁর ঠাঁই হলো না, ঠাঁই হলো না ভালোবাসার আকাশে। সে নেমে থাকলো মধ্য পথের অজস্র শূন্যের মাঝখানে। নিঃসীম নিঃসঙ্গ শূন্যে কেঁপে উঠলো হৃদয়, ভয়ে জমজম করতে থাকলো তার রাত্রির মতো হৃদয়।' কবি তাঁর জীবনদেবতার কাছে উন্মুক্ত চোখে এই বিপুলা পৃথিবীকে সহ্য করবার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। এই বিপুলা পৃথিবীর সঙ্গেই 'ঘর'-এ প্রেমের দ্বন্দ্ব। প্রেমিকার নিপীড়ন দেহ ভরে আস্বাদ করে আস্তে আস্তে উন্মোচিত হতে থাকে কবির সমস্ত অন্ধকার। বাইরের পৃথিবী ও ঘরের দ্বন্দ্বের সীমা পেরিয়ে কবি আপন অন্তরাত্মার মুখোমুখি হয়েছেন। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, কবি সেখানে দ্বৈত সত্তার কাছে জীর্ণ উচ্ছিষ্ট ভাষা ছাড়িয়ে নূতন শব্দের ও সুরে কথা শুনতে চাইছেন, এই সত্তায় ভাষা মহাশূন্যে অন্ধকারের ফুটে ওঠার মতন, প্রথম আবির্ভাবের মতো শুচি, কুমারী শস্পের মতো গভীর। এই পৃথিবী এবং অন্তহীন নাস্তির মধ্যে কবির চিত্ত দোদুল্যমান। সুতরাং বিপুলা পৃথিবী ও ঘর ছাড়িয়ে অন্ধকারে সত্তার মুখোমুখি হয়েছেন, কিন্তু প্রকৃত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নি, হয়তো তাই 'এখন সময়

নয়।' এই পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রন্থের অন্তিম কবিতাটি আলোচনা করতে হবে, বিষয়ের ও রচনানির্মিতির পরিণতিও এই 'সুন্দরে'র মধ্যে লক্ষিতব্য। কিন্তু বলা বাহুল্য, কাব্যগ্রন্থে এই গদ্য ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন ছিল, যেখানে শঙ্খ ঘোষ নিজেই বলেন কবিতা শুধু প্রাণিত করে, অন্য কিছু করে না।

প্রচলিত ও প্রাত্যহিক জীবনের টুকরো শব্দ ও ছবি ছন্দের ও সুরের কৌশলে 'নিহিত পাতাল ছায়া'য় ছড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রাত্যহিক জীবনের চেয়ে জগৎ ও জীবন, সময়, জগতের অভিঘাত, ব্যক্তি ও ব্যক্তি সত্তার মৌল দ্বন্দ্ব, ব্যক্তির সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক, জীবনের ব্যর্থতাবোধের জন্য ক্রোধক্ষোভঈর্ষা, রবীন্দ্রনাথের মতো ভগবানকে পাবার জন্যে আকুল প্রার্থনার ঘনায়িত বেদনা, অর্থাৎ এক কথায় বলা চলে, দর্শন ও হৃদয়ের গভীরতর সমস্যাকে কেন্দ্র করে তাঁর কবিতার শব্দচিত্রসুর মূর্তি ধরেছে। তাঁর সত্তার ক্ষতবিক্ষত রূপই তাঁর কবিতা। এবং এই কারণেই আমার মনে হয়েছে, তাঁর কবিতায় নির্দেশাত্মক শব্দ ও পাণ্ডিত্যগত দুর্বোধ্যতা না থাকা সত্ত্বেও সচেতন বুদ্ধির পরিশীলিত ও চেষ্টিত দুর্বোধ্যতা জড়িয়ে রয়েছে। কোলরিজ-কথিত ইমাজিনেশনের সহজ স্বচ্ছন্দতা খুব কম। রোমান্টিকদের উচ্ছলতা নয়, ইমাজিনেশনের স্বচ্ছন্দতা সম্ভবত সকলেরই প্রার্থিত।

কিন্তু এযুগে জগৎ ও জীবনকে ব্যক্তিহৃদয়ের সম্পর্কে বেঁধে কবিতা রচনার গাম্ভীর্য তরুণ কবিদের মধ্যে খুব কম। এদিক থেকে শঙ্খ ঘোষের কবিতার কৃতিত্ব অপরিসীম। বেঁচে থাকতে গেলে জীবনের যে মৌল সমস্যাগুলি আমাদের নাড়ায়, 'নিহিত পাতাল ছায়া'র জগৎ জীবন প্রেম ও আত্মার গভীরে এই সমস্যা আমাদের গভীরভাবে ভাবায়। তাই 'দিনগুলি রাতগুলি'র উচ্ছল জীবনবোধের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর জীবন সম্পর্কে কবিহৃদয়ের এই তীক্ষ্ণ সচেতনতা তাঁর কবি পরিণামকে সূচিত করে। তেমনি 'সুন্দর' কবিতার মধ্যে বক্তব্যের নাটকীয় দ্বন্দ্ব পরিণামের সঙ্গে কবিতার টেকনিকের পরিণাম সূচনা করে। এই কারণেই 'সুন্দর' এই গ্রন্থের সমাপ্তি কবিতা। কবি আপন সত্তাকেই ডুবিয়ে দিয়েছেন, অচেতনার জন্যে ও প্রলোভনে, কারণ গুপ্ত পাতাল ছায়া সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। সত্তাকে নিমজ্জিত করবার জন্যে যে পাপ তাকেই প্রকাশ করে তিনি মানুষের করুণার টানে ক্ষালিত করতে চাইছেন। কারণ আপন সত্তার কাছে কবির প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের মধ্যে উত্তরও রয়েছে, 'যদি-বা

নিজেরই ছায়া হঠাৎ জড়িয়ে ধরে বলে : / তুমি কি সুন্দর নও ? বেঁচে আছো কেন পৃথিবীতে ?' নিজের সত্তাকে গোপন অন্ধকারে নিমজ্জিত করবার দরকার নেই, পৃথিবীতে যখন বেঁচে আছি, তখন আমার মতো করে মানিয়ে নিতে হবে। সু-সমতাই সুন্দরের লক্ষণ। আমার সুষমতা দিয়েই পৃথিবীর সঙ্গে বেঁচে থাকতে হবে, তবেই আমি সুন্দর। এ ব্যাখ্যা আমার মনের কল্পনা নয়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি কবিতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ কথাই কবি বলেছেন : 'বহির্জীবন থেকে নিজেকে খণ্ডিত করে নয়, তার মধ্যে সরে এসেই হতে হবে প্রস্তুত। আপন অসম্পূর্ণতার বেদনায় ধিকৃত হয়ে নয়, সেই বেদনা আত্মসাৎ করেও নামতে হবে পৃথিবীর কেন্দ্রে, কেন না : 'ফুল্ ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত।'' এখান থেকেই তাঁর গীতোক্ত কর্মবাদের শুরু। তবে লক্ষণীয়, কবি এই ধারণায় এখনো নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন নি। তাই জিজ্ঞাসা করেছেন, নতুবা প্রশ্নটা একটা ঢঙও হতে পারে।

শঙ্খ ঘোষের কিছু কিছু কবিতা আছে, যা শুধু মুহূর্তকে নিয়ে রচনা, ('মুনিয়া', 'দুপুরের পাখি'), এমন অনেক কবিতা আছে যেগুলি, আমার মনে হয়, সংক্ষিপ্ততার জন্যে দানা বেঁধে উঠতে পারে নি, মধ্যে মধ্যে কয়েকটি পঙক্তি মুক্তোর মতো শুধু চমকে ওঠে, ('বাস্তু', 'রাস্তা', 'কিউ'), এ বইয়ে এমন কতক-গুলি কবিতা রয়েছে অর্থের চেয়ে সুর ও ছন্দের দোলার জন্যে মিল বসানো হয়েছে, ('চাবুক'), প্রেমের ও রাগক্রোধের আবেগ কিছু কিছু কবিতায় এত গভীরে গোপনে যে ধরাই যায় না। বাক্‌মিতি সচেষ্টতায় প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে বলেও আপাতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর চিত্রকল্প গড়ে উঠেছে স্তবকের বৃত্তে, একটি শব্দে বা পঙক্তির মধ্যে নয়, শ্বাসাঘাত ও ছড়া, ভাঙা পয়ার, মাত্রাবৃত্ত, মিশ্রছন্দ প্রভৃতি ছন্দকৌশল সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। মিলের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন পথ ধরে গড়ে উঠেছে, স্তবকে, পঙক্তি পেরিয়ে, পয়ারে বিচ্ছিন্নভাবে ; কখনো মিলহীন ভাঙা পয়ার ব্যবহার করেছেন। ভাষার মধ্যে চলতি রূপ রয়েছে, জনতার ও কৌতুককর শব্দ রয়েছে, এবং অনেকাংশেই জীবন্ত। রবীন্দ্রনাথের গানের ধ্বনির রণন মাঝে মাঝে শোনা যায় ('ঘর : ১'), রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দ কিছু কবিতায় সক্রিয়। অনেকগুলি কবিতায় একটা স্থির গল্পকাহিনী পরিণামী হয়ে উঠেছে, তাই গতি এসেছে, ঘটনার নাটকীয়তা দেখা দিয়েছে, সংলাপে দুর্দান্ত আবেগ ধরা দিয়েছে। অনেক

কবিতায়ই অলোকরঞ্জনের মতো আমিও লক্ষ্য করেছি, objective correlativityর অভাব রয়েছে। দু'একটি কবিতায় মিথ্‌কে তিনি নূতনভাবে সাজাবার চেষ্টা করেছেন, ('বা সুপর্ণা')। কিন্তু শঙ্খ ঘোষের কৃতিত্ব তিনি নাগরিক শব্দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়েও জল নৌকা ছায়া গাছ জ্যোৎস্না আলো উজান মেখলা এই সব শব্দের মধ্য দিয়ে চিরন্তন প্রতীক গড়ে তুলেছেন। 'বুড়ি' অতীত অন্ধকারের প্রতীক হিসাবে তাঁর কাছে বারংবার এসেছে। হোয়াইটহেডের ভাষায় প্রতীকের একটা লক্ষণই হলো প্রতীকিত জিনিসকে উল্লেখযোগ্য করে তোলা। এবং হোয়াইটহেড 'প্রতীকতা' গ্রন্থের শেষে এক জায়গায় বলেছেন : 'প্রাচীন সঙ্কেতের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুভূতি ও ইন্‌স্টিংক্টের সমন্বয়ে নূতন কিছু যোগ না করলে পরিণামে জীবন পরিপুষ্টতার অভাবে মারা যাবে, নতুবা নৈরাজ্যে ধ্বংস হবে।' শঙ্খ ঘোষের কবিতায় প্রতীকিত শব্দে এই প্রাচীন ও নবীনের অনুভূতিজনিত সমন্বয় রয়েছে, এবং তাঁর কিছু কিছু কবিতায় শেক্‌সপিয়র, এলিঅট, বোদ্‌লেয়ার, অমিয় চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রীতি ও বক্তব্য রয়েছে। গদ্য থেকে পৃথক করবার জন্যে শব্দকে মসৃণ ও ললিত করবার চেষ্টা ও প্রবণতাও লক্ষণীয়। কিছু অংশ অবশ্য স্মরণীয় : 'শরীর ভরে ঢেলে দিয়েছি, আগুন প্রবণতা।' 'ক্রুত মুকুরের ছায়া কিছু কিছু দিঘিভরা অবসান। এখন আমার পথে পথিক জটিল পদতল।'.

'নষ্ট' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের শব্দ শোনা গেলেও শঙ্খ ঘোষের আর্তি চমৎকার ধরা পড়েছে :

> কিন্তু তোমার অমোঘ মুঠি ধরে বুকের মোরগঝুঁটি
> সন্ধ্যাবেলা শুধু আমার
> মুখের রঙে
> ঝরে পড়ার ঝরে পড়ার
> ঝরে পড়ার শব্দ জানে তুমি আমার নষ্ট প্রভু!

আলোক সরকার

পাঠক মার্জনা করবেন, আলোক সরকারের কবিতা পড়তে গিয়ে বারংবার

এই শব্দগুচ্ছ ও পঙক্তিগুলি আমার মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হতে থাকে, প্রতিধ্বনি জাগায়, ধ্বনির অনুষঙ্গ বেদনার চিত্র হয়ে ওঠে: Je dis une fleur ; et hors de l'oubli oú ma voix relégue aucun contour en tant que quelque chose d'autre que les calices sus, musicalement, se léve, idée même et suave, l'absente de tous bouquets'. (Divagations) 'Un peu profond ruisseau calomnié la mort'. 'Musicienne de silence'. 'De scintillations sitôt le septuor.' 'L'insensibilité de l'azur et de pierres'. 'Oui, dans une île que l'air charge/ De vue et non de visions/Toute fleur s'étalait plus large/Sans que nous en devisions' উদ্ধৃতি আরো বাড়ানো যায়, তবে এমনি শব্দের প্রতিধ্বনি ও আবহ আলোকের কবিতায় সর্বত্র। যে ফুলের কথা তিনি বলেন, তা আদর্শফুলের, এ ফুলের মধ্যে সব ফুলের সৌন্দর্য রয়েছে, এবং সব ফুলকে ছাড়িয়ে অন্য একটি রহস্যাতীত বস্তু হয়ে উঠছে। পৃথিবীর চারিদিকে এই সুন্দর বস্তুর মধ্যেই তাঁর কাঙ্ক্ষিত আদর্শ লুকিয়ে আছে, এবং সেই আদর্শই অন্য সব বস্তুকে সুন্দর করে তুলছে। আলোকও রহস্যাতীত পরম বিশুদ্ধ অদ্বিতীয়কে প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে দেখতে চেয়েছেন এবং অনুভব করতে চেয়েছেন। 'পাখির কাঁপা', 'ঝাউবন', 'নির্জনতা', 'আদিম রাত্রি' আড়ালের দুয়ার উন্মুক্ত করে রহস্যের গোলাপ উন্মোচিত করে। সমুদ্র ও নীলিমাকে এক সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন, ঝড় মেঘ রৌদ্রের সমন্বয়ে স্তব্ধ মিষ্টিক অনুভূতি আনবার প্রয়াসে নিবিষ্ট, 'ভালোবাসা, বিবিধ ফুলের তাপে মালা গাঁথো, মালার সংহতি দাও, গাঢ় স্তব্ধ একক সাগর।' নেপথ্যে কোথায় বাঁশির স্বর শুনেছেন, অকলুষ পবিত্র ও নতুন আনতে চাইছেন, 'ভালোবাসা, প্রায় ভোর হয়ে এলো, এইবার নতুন দিঘির/আধো-অন্ধকার জলে স্নান করে এসো।' এক মুহূর্তের ফিরে চাওয়ায় কাশবন দুলে ওঠে, দিগন্ত ব্যথিয়ে মেঘ আসে, 'মেঘের সজল নম্র একটি তারায় নীল সমগ্র আকাশ' 'দিঘির ভেতরে অলৌকিক ছায়ায় স্পন্দিত সোপান গড়ে ওঠে,' রুদ্ধ অপেক্ষায় একটি আকাশ অনালোকে দীপ্ত হয়ে ওঠে যেন, 'কোনখানে সোনালি খাঁচায় দুঃখ, অবগুণ্ঠিত হীরা নিশীথিনী আহত গোপন।' এমনিভাবে সকল বস্তুর সঙ্গে বন্ধুতা গড়ে উঠেছে, সবুজ পাতায় হলুদ ফুলের প্রতিবাদী বিস্ময় জাগছে, নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলির মধ্যে মালার্মীয় আদর্শের স্বরূপ ধরা পড়ে:

কবিতা : চিত্রিত ছায়া

নির্নিমেষ আগ্রহী হাওয়ায়
তামসী ভ্রমর, স্বপ্ন প্রজাপতি, সম্পূর্ণ নিলয়ে
অদৃশ্য সানাই বাজে, শঙ্খধ্বনি, কলকণ্ঠ উন্মুখর হীরা
বিশাল ছবির ধ্যান, মূর্ত উপস্থিতি, সপ্রাণ শূন্যতা
উচ্চারিত মুগ্ধ আবির্ভাবে।

'সপ্রাণ শূন্যতা উচ্চারিত মুগ্ধ আবির্ভাবে' মালার্মের শূন্যতাকেই বোঝাচ্ছে, যে শূন্যতা পরমেরই নামান্তর। 'অনুত্তেজ', 'স্থির নিয়ম' 'নির্মোহ', 'নিরাসক্ত', 'নিস্পৃহ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে আলোক পরমের সর্বজনীনতাকে আনতে চাইছেন, কেননা আসক্তি উত্তেজনা তো বিশেষ বিষয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। 'ভালোবাসা', 'করুণা' 'মমতা' 'অভিমান' পরমেরই বিভিন্ন নাম। এই পরমকে উন্মোচিত করবার চাবি খুঁজেছেন—যে চাবি দিয়ে 'আকাশের মৌলিক শুভ্রতা' 'সুদূর সম্মোহ', 'বিশুদ্ধ পৃথিবী' আনা যায়।

হয়তো প্রতীকী কবিদের মতোই আলোক মনে করেন কবিতায় বস্তুজগতের অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করতে পারা যায় না। তাই তাঁর ভাষা ও শব্দগুচ্ছ প্রকৃতি জগৎকে ঘিরে রয়েছে, গাছ ফুল নদী পাখি সমুদ্র বালি সূর্য চাঁদ জল তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এবং বস্তুজগতের দ্বন্দ্ব, এর বাস্তবতা, জ্বালা, বিরোধ হতাশা, টেনসন্, গ্লানি, কলঙ্ক, রক্তক্ষত হৃদয়ের নিঃসঙ্গ দুঃস্বপ্ন, গহন গভীর প্রাণের দোলাচল অনিশ্চয়তা, সমাজ ও ব্যক্তির সংঘর্ষ, তীব্র প্যাশন, প্রেম ভালোবাসার জ্বালা ও বিরহ আলোকের কাব্যে নেই, কারণ এগুলি হয়তো-বা অভিজ্ঞতার স্তরে আসতে পারেনি। 'বেড়াল' কবিতাটির মধ্যেই শুধু রহস্যাতীত শাদা পাখির মৃত্যুতে বেড়ালকৃত জগতের কলঙ্ককে সামান্য কয়েকটি শব্দের স্পর্শে চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন, এ ছাড়া সর্বত্রই তাঁর প্রীত প্রাণের অনুচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। সব কবিতার মধ্যেই একই সুর, একই প্রকার শব্দবিন্যাস ও ধ্বনির সমারোহ, 'বিতত', 'আতত', 'কীর্ণ', 'হীরা' শব্দের পুনরাবৃত্তি মারাত্মক। এই একই সুরের সমতলতার বৈচিত্র্যের তরঙ্গ জাগায় শুধু বিভিন্ন চিত্র ও অনুভূতির স্তরের তাপমাত্রার ওঠানামায়। আমাদের এযুগে আলোক এক চরম ব্যতিক্রম, বিরোধী ; শান্ত ধ্যানের নিবিড়তায় ধর্মীয় আত্মিকতা সর্বত্র দেখেছেন। অলোকরঞ্জন ঈশ্বরবিশ্বাসী, কিন্তু ঈশ্বরকে নিয়ে প্রেমিকার মতোই তাঁর দ্বন্দ্বলীলার বৈচিত্র্য চলেছে, শঙ্খ ঘোষের বোধ, অতৃপ্তি, অপূর্ণতা

পাপবোধ ঈশ্বরকে ঘিরে ঘূর্ণি তোলে, কিন্তু আলোক একেবারে স্থির, ওঁর হৃদয়ে কোনো অপ্রত্যয়ের ছিদ্র নেই, তাই 'স্থির বিস্ময়' ও 'সংহত' শব্দ তিনি বারংবার ব্যবহার করেন। তাঁর এই বিশুদ্ধ জগতে কৌশলের বালাই নেই, সবই অচেষ্টিত, এমনকি সাপও অবিরোধী, তার কোমল মসৃণতায় অনায়াস ভঙ্গি দেখেছেন। আমাদের এ যুগের কবিদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা যেন আলোক পরমাতীত রহস্যের ধ্বনিময় রূপে একসঙ্গে নিবিড়ভাবে প্রকাশ করতে চাইছেন, আমরা যা পাই না, অথচ চাই, আলোক তারই কবি।

শব্দ প্রয়োগেও মালার্মের রীতির গাঢ় অনুসরণ লক্ষিতব্য। আঘাতের চমক আনবার জন্যে বিশেষ্যকে বিশেষণ করতে চাইছেন; 'দুই পাশে সবুজ ঘাসের স্বাভাবিক'। হয়তো সমস্ত কিছুকে একত্র ও সমন্বয় করবার জন্যেই অন্বয় মানেন না, ছেদচিহ্ন উঠিয়ে দেন, 'সারাদিন রৌদ্র প্রতিহত আলো রচিত নীলিমা' 'দুইটি হরিণ নিমীলিতা বড়ো চোখ নিস্পৃহ শ্রাবণ' 'পাথির সমগ্র কাঁপে ঝাউবন নির্জনতা আদিম রাত্রির দুয়ার উন্মুক্ত ক'রে একটি গোলাপ।' শেষ পঙক্তিটিকে এ রকমভাবে সাজানো যায়: ঝাউবন নির্জনতা আদিম রাত্রির দুয়ার উন্মুক্ত ক'রে একটি গোলাপ পাথির সমগ্র কাঁপে। বিশেষ্য বিশেষণের স্থান বদল করে, কারকবিভক্তিও মানতে চান না, 'তেপান্তর নাকি নীল পক্ষীরাজ নিরুদ্দেশ ছোটে।' কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য, শব্দগুলি সঙ্কেতিত নয়, ধ্বনির কারুকার্যে জাদুময় হয়ে ওঠে না, সংস্কৃত শব্দজাত স্বরের সমতলতা এর মধ্যে রয়েছে, এবং এই অতিরিক্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের ফলেই কবিতায় ব্যক্তিগত হৃদয়ের উষ্ণতা ধরা পড়ে না। মাঝে মাঝে পাণ্ডুর মনে হয়, হয়তো আলোকের এটা লক্ষ্যও হতে পারে। কারণ সর্বজনীনতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি উপলব্ধির কোনো মূল্য নেই, কিন্তু মিস্টিকতা আনবার জন্যে পৃথিবীর যতো নিবিড় বস্তু ও শব্দ আনতে চাইছেন, তাতো মন্ময় কবিতারই লক্ষণ। তাই শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারে আলোক বাস্তব জগৎ, পৃথিবী ও মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে বা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তিনি যে কবোষ্ণ শব্দের তাপে বস্তুকে প্রতীক করে তুলতে পারেন 'গোপন ঘর' কবিতাটি তার নজির: 'আনন্দ আমার চাই সমস্ত বিকেল বেলা চাই / আমি এক প্রেমিকার বাড়ি খুঁজে নেবো।' আমার বক্তব্য হলো, অতিরিক্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করলে পাণ্ডুর বিবর্ণতা আসতে বাধ্য এবং পাঠকের মুখও মেরে আসে। এই রহস্যাতীত

যেমন বস্তু-অতীত, আবার বস্তুর মধ্যেও, সুতরাং এর শব্দধ্বনিতে এর দুটো দিকই থাকা দরকার।

বাঙালি কবি যথার্থরূপে মালার্মের পথিক হতে পারেন না, কারণ ফরাশি মননের গাণিতিক বিশুদ্ধতা হঠাৎ রুদ্ধ আবেগের বিস্ফোরণে চূর্ণ হয়ে যায়, আর মালার্মে যেখানে পৃথিবীতেই নিঃসঙ্গ। যদিও আলোক ব্যাকরণ উল্লঙ্ঘনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পরিমিত শব্দের বিশুদ্ধ গাণিতিক রীতির অভাব সর্বত্র। দ্বিতীয়ত, মালার্মের সব কবিতার মধ্যেই একটা দ্বন্দ্ব ও টেন্‌সন্‌, বস্তু ও বস্তু-অতীত, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াতীত—এ দুয়ের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়, আলোকের কবিতা এ দিক থেকে একান্তপক্ষে একমুখীন ও সরল, এবং ধর্মবেত্তার বিশ্বাসের মতো স্থির। তৃতীয়ত, মালার্মের উল্লাস ছিল একান্তই নান্দনিক, নান্দনিক উল্লাসেই তিনি শব্দের ব্যায়াম করেছেন, ইমোশনের প্রকাশে নয়, কিন্তু আলোক ইয়েট্‌সের মতোই শব্দার্থে জগদাতীত রহস্যের অনুভূতিই পাঠকের কাছে সঞ্চার করতে চাইছেন। হয়তো আলোকের স্বাতন্ত্র্য বোধও কিছুটা এ পথে তাঁকে চালিত করেছে।

তবু, মালার্মের মিস্টিকতার আদর্শে এ যুগে আলোক আমাদের মধ্যে কিছুটা স্বতন্ত্র এবং একক, সম্ভবত দেবীপ্রসাদ এই ধার কিছুটা গ্রহণ করতে চান, 'লা পয়েজি'র বিভিন্ন সংখ্যায় ও 'গভীর' কবিতায় তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে।

রঞ্জিত সিংহ

মঞ্চলোকে কৃপাপ্রার্থী ঝটে
বিপ্রতীপে ভিড়ি দেশান্তর
অমৃতত্বে যখন যেরূপ ঘটে
জতুগৃহে রাগী-ছোকরার ঘর।

*　　　*　　　*

অতএব

ভারম্যুথে হুইস্কির সফেন সমুদ্রে দিকভ্রান্ত
নিশীথ-গণ্ডোলা নিয়ে অনিমেষ, বালটিঅলা, ডুবে
সঙ্গে রীণা, লোপামুদ্রা, চূর্ণ ল্যাম্পপোস্ট, আর্তনাদ,
ভীষণ স্তব্ধতা।

এই দুটি উদ্ধৃতির মধ্যেই রঞ্জিত সিংহের এক প্রকার মানসিকতা দেখতে পাওয়া যায়, যাতে তিনি বিষ্ণু দে এবং সুধীন্দ্রনাথের ভঙ্গিকে তাঁর নিজের কাব্যে আয়ত্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অদৃষ্টচর'-এ (১৯৬৩) এর নজির সর্বত্র, সেখানে তাঁর বিষয়বস্তু অনুভূতি, যে অনুভূতি জগতের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়েছে, এবং সেই অনুভূতিতে জটিলতা খুব একটা নেই, কিন্তু ভাষাকে এঁদের প্রভাবেই শিল্পিত করতে চেয়েছেন। এই চেষ্টার ফলে একটা কাজ হয়েছে এই যে রঞ্জিত সিংহ অনাবশ্যক ভাব কাব্য থেকে দূর করতে পেরেছেন। কিন্তু 'অদৃষ্টচরে'র কাব্যধারা যদি তিনি বয়ে নিয়ে যেতেন, তাহলে তাঁর কবিতা এই প্রচলিত রীতিকেই অনুসরণ করতো। তাই 'অন্যায় মৃগয়া' (১৯৬৮) কাব্যের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ও রূপগঠনের অভিনবত্ব পাঠকদের আকৃষ্ট করে। এই বইয়ের শেষে 'নষ্ট বাগান' কবিতাগুচ্ছে আগের ধারাকেই বয়ে নিয়ে চলেছেন, তবে নিজের মতো করে, এবং হালকা চালে ব্যঙ্গে চটুলতায় তাঁর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে।

'অন্যায় মৃগয়া' কাব্যগ্রন্থে কবি সত্যি এক নূতনবোধকে আনতে চেয়েছেন, এ কবিতা রোমান্টিক জাতীয় নয়, তাৎক্ষণিক অনুভূতির প্রকাশে ব্যস্ত নয়, নাটকীয় চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্বে তাঁর হৃদয় এখানে ক্ষত বিক্ষত। রক্তের গভীরে কোনো পাপবোধ, যে পাপবোধ তাঁর ব্যক্তিগত নয়, সেটাই তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, স্মৃতি দুঃস্বপ্ন বিভীষিকা জাগাচ্ছে। ছায়া অনুসারী স্মৃতির একগুঁয়ে তাড়না তাঁর চিত্তকে মাঝে মাঝে আতঙ্কিত করে এলিঅটের নাটকের সংলাপের মতো। তিনিও এযুগের নিরাশ্রয়তা, অসহায়তা মৃত্যুবোধকে প্রকাশ করেছেন, একটি নারীর মুখ দিয়ে বণিক সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকাশ করেছেন, প্রকাশ করেছেন এ যুগের কপটতা ও ছলনার শয়তানিকে—যাতে আমরা এযুগের অন্যায় মৃগয়া, এ সবের মধ্যে তাঁর ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ মিশে গেছে, কিন্তু এগুলি শুধু অনুভূতির প্রকাশ নয়, নাটকীয় চরিত্রের মতো সংলাপের কাহিনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন; জীবনটাকে তিনি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তুলনা করেছেন, এবং এই রঙ্গমঞ্চে কখনো নিজেই ট্রাজিক নায়কের মতো ক্ষতাক্ত হৃদয়ের সংলাপ বলেছেন, এবং তাঁর পাশের পাত্রপাত্রীদের সেইভাবে সাজিয়েছেন। চরিত্রের এই বস্তুধর্মী রূপায়নেই এই কবিতাগুলির সার্থকতা। এবং এই চরিত্রের মধ্যে মনস্তত্ত্বজনিত

বিভিন্ন বিরোধ একসঙ্গে কাজ করে, এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই সজাগ : 'আমি কি তাহলে মনস্তত্ত্বের ঘোরানো সিঁড়ি ধরে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছি।' চলমান জীবনের কাহিনীর মধ্যে মাঝে মাঝে অনুভূতির তীব্র তীর ছুটে আসে, প্রশ্নের আকারে আমাদের বিদ্ধ করে : 'অবিনাশ ওরা চলে কিসের সন্ধানে? কারা সুখের অনলে দগ্ধ হলো। অঙ্গুলি পোড়ায় কারা গৃহের সম্মানে?' এই বস্তুধর্মী নাটকীয় সংলাপের মধ্যে দু'একটি পঙক্তির আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা তাই বেশি অভিনবত্ব সৃষ্টি করে : 'আধো-অন্ধকারে লীন হতে হতে দিনের হেনার সমন্বয় আমাকে দেখালে।'

কাব্য-সমালোচনায় তিনি শব্দের অনুরাগী, তাঁর কাব্যের মধ্যেও এর প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট। তিনি যে সমাজের ও পরিবেশের মানুষ, তারি ভাষা ব্যবহার করতে তিনি বদ্ধপরিকর। দক্ষিণ কলকাতার শিক্ষিত মার্জিত অমায়িক ভদ্রলোকের ভাষা ও ভঙ্গি 'অন্যায় মৃগয়া'র কাব্যগ্রন্থে সর্বত্র, দেশী বিদেশি শব্দপ্রয়োগ তাই যথেষ্ট, এঁদের ভাষায়ই এঁদের জীবম বর্ণিত হয়েছে। 'কুশীলব' কবিতাটি এ গ্রন্থের সার্থক কবিতা বলে মনে হয়…'কার্নিশ বেয়ে শহরের সূর্যাস্তের ছবি, শ্যাওলার ঘন আস্তরণ, ব্যক্তিত্ব ও স্বভাবের রঙ পাল্টানো, দেওয়ালের ইটের মৃত্তিকায় পরিণতি' এ সবই প্রতীকী হয়ে উঠেছে। এগুলির মধ্য দিয়েই তাঁর ব্যর্থতা, হতাশা রিক্ততা আঁধার বিষাদ ঘন নিবিড় হয়ে উঠেছে, এগুলি প্রত্যেকটি চরিত্ররূপে প্রতিভাত : 'চোখের সম্মুখে শুধু শ্যাওলার ঘন আস্তরণ/বাড়ির কার্নিশভাঙা ছাতে/দ্রুত সন্ধ্যা হাওয়ায় হারিয়ে যাওয়া তুচ্ছ মৃত্যুর সংবাদ।/সংখ্যাতীত কুশীলব।/অর্থহীন তর্ক, বাদ-প্রতিবাদ, আর্তনাদ।'

শিবশম্ভু পাল

রাস্‌কিন আর্ট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একবার একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন যে কোনো কুমারী তার হৃত প্রেমের গান গাইতে পারে, কিন্তু কোনো কৃপণ তার অপহৃত অর্থের গান গাইতে পারে না। এর কারণ প্লেখনভ বলেছেন যে এর মধ্যে কোনো উন্নত আদর্শ নেই, তাই কৃপণের গান আমাদের অভিভূত করতে পারে না, গায়ককৃপণের মধ্যে এবং অন্য লোকের

মধ্যে হৃদয়বেদ্যসঞ্চরমাণতা আনতে পারে না। সুতরাং কৃপণ কোনো গান গাইতে পারে না, হৃত অর্থের গান তাকে অবশ্যই চেপে রাখতে হয়। আমি জানিনা, উনবিংশ শতাব্দীর রাস্কিনের কথা উনবিংশ শতাব্দীতেই খেটেছিল কিনা, শপ্তদশ শতাব্দীর স্পেনের সাহিত্য খুঁজলেও সম্ভবত রাস্কিনের কুমারীর গান চাপা পড়তে পারে, কিন্তু সাহিত্যের আদর্শবাদ এবং মঙ্গলবোধকে স্বীকার করে নিলে সর্বজন হৃদয়বেদ্য মহান অনুভূতিকে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। শিবশম্ভুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঘরে দূরে দিগন্তরেখায়' সেই দিগন্ত উদ্‌ভাসিত বিচিত্র আলোবর্ণময় প্রথাসিদ্ধ মহান অনুভূতিবেদ্য প্রেমের গানই কুমারীচিত্তের অভিমুখী হয়েছে। 'অভিসার, দুপুরে' কবিতায় সঙ্কেতময় দুপুর নায়িকার প্রতিচ্ছবি, তাঁকে কেন্দ্র করেই প্রেমের চিত্র এঁকেছেন, এখানে উৎকণ্ঠা অবসাদ মিলনবিরহস্মৃতি অনুতাপ সবই রয়েছে, কিন্তু ডাবের জলের মতো স্নিগ্ধ এবং উপকারী : 'গ্রীষ্মের দুপুর ডাকছে, হে দয়িত এসো / ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে / উৎকণ্ঠা অবসাদ কাকে বলে জেনে নিও, মিলনবিরহ / স্মৃতি আর অনুতাপ ডাবের জলের মতো গলার ভেতর / উপভোগ করে নিও রোদে।'

শিবশম্ভুর কাব্যেও প্রেমই হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু। প্রেমের জন্যই পরিপার্শ্বের সমস্ত জগৎটাকে অনাবিল ও মুক্ত করতে চেয়েছেন। দীপ্ত আলোকের ধারায় উদার অপাবৃত বিস্ময়কে জাগাতে চাইছেন। ক্ষয়িষ্ণু সমাজে বসে ক্ষয়ের দৃশ্য তিনি এড়াতে পারেন নি, ফলে তাঁর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাস্তব সমাজের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায় : 'দস্যুদল অতর্কিতে লুটে নিল মেরুদণ্ড বাঁকানো নিয়তি / ঝড় উঠল দূর থেকে, তোমার হাসির শব্দ আমায় রক্তাক্ত করে গেল।' অথবা 'আমার জামার নীচে, পিঠে / অসংখ্য ছুরির দাগ, ছুরিতে দিয়েছে শান কানাগলি, ভোর / চরিত্র খুইয়ে কবে মিলে গেছে লোভার্ত ফলায় / আমি আর কতোদিন গ্রাম্য থেকে যাবো!' এমনি আরো অনেক ক্ষয়িষ্ণু সমাজের টুকরো ছবি, ছন্নছাড়া জীবনের প্রতিভাস, অনিকেত মনোভাব ফুটে উঠেছে, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে তাঁর শতধাদীর্ণ চিত্তদ্বন্দ্বব্যথা, হতাশা এবং সর্বোপরি প্রত্যয়বেদ্য আকাঙ্ক্ষা। যেহেতু আকাঙ্ক্ষার সোনালি জগৎ তাঁকে বারবার টেনে নিয়ে যায়, সেইহেতু এই প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটাতে চান। এই রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পরেই সেই ধ্যানমগ্ন নির্জনতা আসবে,

যাতে নিজেকে চেনা যায়, প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করা যায়। কারণ কবির কাছে কবিতা হচ্ছে মিলন, উদারপুণ্যজীবন : 'কৃপণ জ্যোৎস্নার রেখা ধরে আমায় ওখানে যেতে হবে / ক্লান্তি থেকে ক্লান্তিহীনতায় / যেতে হবে পুণ্যব্রতে আজীবন, জ্যোতিষ্কমণ্ডলে / একটিমাত্র কবিতার অমোঘ প্রণয়ে।' কবির আকাঙ্ক্ষা অলৌকিক ঝড়। স্পষ্ট করে তিনি বলতে চেয়েছেন 'কিছু বন্ধু চাই', 'ভালোবাসা চাই', 'উৎসব খুব ভালো লাগে।' তাই সম্ভবত শিবশম্ভু কবিতার মর্মস্পর্শী জগৎ থেকে ক্রোধে রাগে বক্তব্যের চিৎকার করে ক্ষয়িষ্ণুদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন : 'বাজার থেকে দুঃখ কিনে এনে স্বচ্ছ পানপাত্র ভরাব না।' কারণ হাত বাড়ালেই দুঃখ ও পরিতাপ। এই সমস্ত উক্তি তিরিশ দশকের ইংরেজি কবিতা ও ষাট দশকের কবি স্টেভেন্সনের উক্তি স্মরণ করায়।

সুতরাং শিবশম্ভুর জগৎ প্রেমের জগৎ, এই প্রেমের জগৎ নায়িকার কাছে একান্ত প্রত্যর্পিত। প্রত্যর্পিত হয়েছেন বলেই রিক্ততা, ব্যর্থতা বিরহবেদনায় তীব্রতা অনুভব করেছেন, 'আমি চাইনা ছায়ার সহজতা। / স্পষ্ট করে / দু'হাত দিয়ে উপবনের মতন তোমায় / শরীর ধরে / সন্ধ্যা ভাষায় গভীর কথকতা চাইতে গিয়ে বিপুল ব্যর্থতা।' আপনার হতাশার মধ্যে নায়িকার উজ্জ্বল সম্ভাবনার চিত্র দেখেছেন। 'এটুকু আমার অধিকার কণ্টকমুকুট পরে কেটে যায় উন্নিদ্র রজনী।' কিন্তু প্রেমের প্রগাঢ়তায় এগুলি ছিন্ন চিত্র, চলমান মনোভাব, আসলে প্রেম তাঁকে মহিমান্বিত করেছে, প্রেম তাঁর কাছে অম্লান শুভ্রতা নিয়ে এসেছে, ভালোবাসা মুক্ত, কাঙ্ক্ষিত পরাজয়ের মধ্যে অহংকারনমিত মিলন, অপরিচয়ের বিস্ময় শেষ হয় না। নায়িকার কথা শুনেই কবির মনে হয়েছে :

> কেন সূর্য হয়ে যায় আমার যন্ত্রণা, কেন আমার কল্পনা
> বৃষ্টি হয়, কেন স্মৃতি অনুকূল হাওয়া·········
> ভরে যায় বনতল কবিতার ছায়াঘন অসংখ্য উদ্ভিদে

সমস্ত বইয়ের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতাই প্রকাশ পাচ্ছে, এমনি প্রকৃতি চিত্র নেই, কিন্তু প্রকৃতির ছবি প্রতীকের রূপ নিয়ে তাঁর বেদনা প্রকাশ করছে। দু'একটি কবিতায় সময়ের দাতা ও গ্রহীতা রূপ ফুটে উঠেছে এবং বেশ কয়েকটি কবিতায় কবিতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে : 'সেখানে

সাজাতে হবে বিনিদ্র রাত্রির শস্ত প্রেম, লক্ষ্যভেদী স্পন্দিত শব্দের অস্ত্র অমোঘ নিক্ষেপ।'

এই শব্দগুলির মধ্যেই একটা দুর্বলতা লুকিয়ে রয়েছে। এতো স্বচ্ছন্দে প্রচলিত শব্দে শিবশম্ভু কার কথা বলছেন, আমাদের জটিল অভিজ্ঞতায় কোন নূতনতর অজানা অপ্রকাশিত গুপ্ত বেদনার জগৎ উদ্ভাসিত করছেন, প্রচলিত বক্তব্যকে গ্রহণ করেই কি শুধু আন্তরিক হওয়া যায়, না নূতন কিছু উদ্ভাবন করলে আন্তরিকতা আরো গভীরতর হয়। অস্বীকার করি না তাঁর প্রেমের কবিতায় ও অন্যান্য কবিতায় আন্তরিকতার জন্যে নূতন চিত্রকল্প এসেছে, বলার ভঙ্গির মধ্যে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য এসেছে, কিন্তু যে কথা তিনি বলছেন তা কি আমাদের অজানা ? অজানা যদি না হয় তাহলে 'উপায়' কি কবিতা ? উপায় বলছি এই কারণে যে তিনি অনেক সময় ইচ্ছা করে শব্দের ও বাক্যের সম্পর্ক পরিহার করে প্রতীক ব্যবহার করতে চাইছেন, একটা অনভিপ্রেত চমক ছুঁড়ে দিতে চাইছেন, তাতে আঘাত সৃষ্টি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পরিণতিতে এই আঘাত থেকে আমাদের অভিজ্ঞতায় নূতন সংবেদনা সংযোজিত হচ্ছে না। এবং তাঁর কাব্যের ইডিয়ম এবং বলার ভঙ্গি-গুলি প্রায়শ সেই সব কবিদের কবিতার কথা স্মরণ করায় যাঁরা ক্ষয়িষ্ণু কবিগোষ্ঠীর দলে পড়েন। পড়তে পড়তে আমাকে বারংবার থামতে হয়েছে, সমস্ত কবিতায় ঐক্য বিধৃত একটি চিত্রকল্প ধরতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি, খণ্ড পূর্ণতা পাচ্ছে না, পরিণামী হচ্ছে না, মনে হয় মাঝখানে থমকে চমকে দিল, ভাষা কথ্য ভাষা হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত প্রত্যয়কে উত্তরাধিকারীর মতো ব্যবহার করাতে কোথায় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে, প্রচলিত কবিদের মতোই প্রবহমান পঙক্তি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ছেদ ব্যবহার করে অর্থ সুস্পষ্ট করেন নি বাক্যের শেষে, অথচ এঁর কবিতায় এরা প্রত্যাশিত। স্বভাবতই ইচ্ছাকৃত দুর্বোধ্যতা, এবং অনেক তথ্য একসঙ্গে বিন্যাসের সাহায্যেও একটা অস্পষ্টতা আসছে। যদি রেভের্দির কথা স্বীকার করি তাহলে বলতে হয় চিত্রকল্পে দুটো রিয়্যালিটিকে একসঙ্গে বাঁধতে পারছেন না, প্রচলিত ছবিকেই অভিপ্রায়ে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি অনেক রকম ছন্দ ব্যবহার করেছেন, ছড়ার ছন্দে তাঁর হাত সুস্পষ্ট ও দক্ষ, কিন্তু পয়ারই রচনা করেছেন বেশি, অনুপ্রাসে মধ্যঅন্ত্যমিলে, অন্ত্যমিলের বৈচিত্র্যে সংগীতের সুর জাগে, কিন্তু নিজস্ব

ভাষা সৃষ্টির ব্যাপারটা থেকেই যাচ্ছে, ছন্দে স্বভাবত তাঁর ত্রুটি থাকে না, কিন্তু পয়ারে 'নির্বাচনের প্রয়োজন ; দু'নৌকায় পা রাখতে নেই' পঙক্তিতে 'নির্বাচনের প্রয়োজন' আট অক্ষর ধরবার জন্যে কত সংক্ষিপ্ত করে পড়বো এবং কার ওপর জোর দেবো ? 'আকাশ থেকে রৌদ্র সোনামুখি/তোমার গায়ে/ আঁকাবাঁকা নদীর ওপর ভ্রাম্যমাণ / সোনার নায়ে/ স্বয়ংপ্রকাশ সহজতা, বুঝি / ঘুমের আগে আরামে চোখ বুঁজি'। নায়িকার গায়ে নদীর ওপর ও সোনার নায়ে রৌদ্রপাতের মধ্যে গতিচঞ্চলতার সৌন্দর্য হঠাৎ 'ঘুমের আগে আরামে চোখ বুঁজি'র মধ্যে আঘাত পাচ্ছে, কারণ তিনটি চিত্রের যে স্বভাব উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য তা চোখ বুঁজে দেখবার মতো নয়। হয়তো এও হতে পারে দৃশ্যের রমণীয়তা তাঁকে আরামের ঘুম আনাচ্ছে। কিন্তু ঘুম আনলে আর ছবি থাকে কোথায় ? যা হোক্, শিবশম্ভু যদি মনে করেন প্রচলিত বিশ্বাস ও চিন্তাকে শুধু আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে ভাষায় রূপ দিয়ে যুগের বৃন্তে পাতা হয়ে থাকবেন, তাহলে আমার কিছু বলবার নেই। তবু যে প্রত্যয়ে তিনি আন্তরিক, তাতেও ফাটল রয়েছে। প্রকৃত বামপন্থী কবিতা বা সাহিত্য কখনো ভবিষ্যৎকে এভাবে বলে না : 'সম্মুখে কেবল দেখি আবছায়া দিবসরজনী।' এবং অতীত স্মৃতির প্রতি এমন আকুলকণ্ঠে বেদনা জাগায় না : 'সে যে আত্মহারা ছিল রক্তের রণনে সে যে কত যুগ আগে'। এসব দেখেই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় শিবশম্ভু এখনো কবিতায় দুই জগতের অন্তর্বর্তীস্থলে অজ্ঞাতে ভাসছেন। তবে ভরসার কথা, এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ এবং ভবিষ্যতে বিবর্তন হয়তো লক্ষ্য করবো।"

১ ৯ ডিসেম্বর

শিবশম্ভু একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন : 'প্রায় কুড়ি বছর ধরে কবিতা লিখছি ; আশ্চর্য, এখনও ছন্দছাড়া কবিতা লিখতে পারি নি, পারি না। কেন জানি না, ডিসিপ্লিন জিনিশটা লেখার ব্যাপারে আমাকে ভীষণভাবে দখল করে রাখে।' বলা বাহুল্য, এই শৃঙ্খলা তাঁর কবিতায় যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে, এবং অলোকরঞ্জন ও শঙ্খ ঘোষের ধারাই এখানে লক্ষণীয়। ছন্দে মিলে ধ্বনিতে একটা নিটোল মূর্তি তৈরি করতে চাইছেন, কিন্তু এই নিটোলতা ঠিক নিবিড়তার জন্যে নয়, বা নিবিড় অনুভূতির জন্যেও নয়, কারণ অনেক তাৎক্ষণিক

অনুভূতি সক্রিয়, ফলে রূপগঠনের ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তি সক্রিয়, এর আগের কবিতাতেও ছিল, তবে এতোটা বেশি পরিমাণে ছিল না। সম্ভবত ষাটের তরুণ কবিদের শিথিল রূপগঠনের প্রতিক্রিয়ার ফলেই এটা হয়েছে।

ভাবের দিক থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কবির ব্যক্তিগত হৃদয়ের দ্বন্দ্ব টেন্‌সনই এখানে কাজ করছে, পেণ্ডুলামের মতো তাঁর দোলাচলবৃত্তি, প্রতিযোগিতার মধ্যেই ক্রীড়াসুখ, লেখা কাগজের কাটাকুটির খশড়ার মধ্যেই নিমগ্নতা। যথাযোগ্য উপমেয় তাঁর কাঙ্ক্ষিত শূন্যস্থান ও শিল্প-রুচি পূর্ণ করে নি, পূর্ণ করেনি বলেই যাবতীয় সংবেদনা আক্রমণের চিহ্ন নিয়ে চিরস্থায়ী, সেখানে কোনো স্থিরতা নেই আজ। 'সমালোচনার জবাবে' কবিতার মধ্যেই তাঁর বর্তমানের মানসিকতা ধরা পড়েছে : 'অথচ দ্বিধারা থাকে আমৃত্যু বেঁচে।' এই দ্বিধা সংশয়ে দোলায়িত কবিচিত্ত শিশুকন্যা তোতনের মধ্যেই পরম সান্ত্বনা ও তৃপ্তিলাভ করতে পারেন, শিশুর মধ্য দিয়েই যখন জগৎ দেখা যায় তখন নীচের শহর মিথ্যা ও অনাবশ্যক বলে মনে হয়, শিশুর কাছে রয়েছেন বলেই পুণ্যধর্ম ও লীলা খেলা।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রণব প্রায় পনেরো বৎসর আগে 'অতলান্ত' নামে একটি চটি কবিতার বই লিখেছিলেন, দীর্ঘদিনবাদে 'অনেকদিনের শূন্যতা' একগুচ্ছ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গানের কথা নেওয়ার মধ্যেই ওঁর মনের কথা প্রকাশ পেয়েছে, মৌন বীণার তন্ত্রকে যেমন রবীন্দ্রনাথ সুধারবে জাগাতে চেয়েছেন, এই দীর্ঘদিনের কবিতা না লেখার শূন্যতাকেও প্রণব ভরতে চেয়েছেন কবিতার ফুল ফোটানোর গানে। কবিতার মধ্যেই নিখিল উৎসব, মিলন শতদল, প্রেমের অরূপ মূর্তি দেখা দেবে, কবিতাই সকলের সঙ্গে মিলন ঘটাবে। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে শূন্যতা ভরতে চেয়েছেন, প্রণব চেয়েছেন কবিতাকে উদ্দেশ্য করে।

এই কারণেই কবিতা সৃষ্টির ব্যাপারটা তাঁর অধিকাংশ কবিতায় স্থান দখল করে আছে : 'কবিতাই পারে তিনটি পিপাসু কণ্ঠের তৃষ্ণার ও শান্তির জল একটিই কলসীতে রেখে দিতে।' কিন্তু কবিতার ক্রূর তৃপ্তি কবিকে ভুলে

থাকে, মাঘের রাত্রির শীতের মতো তাঁকে কাঁপায়। 'তীব্র দ্যুতি অভিজ্ঞতা' বুকের ভেতরে লুকিয়ে ছিল বলেই কবিতার জন্যে রক্তের ভেতরে স্রোত বয়ে যায়, 'বুকের ভিতরে পথ, চলে অবিচ্ছিন্ন ধ্বংস ও নির্মাণ।' এই ধারাকে রেখেছে বলেই কবিতার হাত থেকে তাঁর ত্রাণ নেই। হৃদয়ের কবিতার উদ্দেশ্যে তাঁর কণ্ঠ সোচ্চার : 'ধ্বনিহীনতার স্রোতে জ্বলে ওঠো / পুঞ্জ পুঞ্জ শব্দের ভার / স্তব্ধ কঠিন প্রান্তর ভূমি রূপান্তরের দীপ্ত জ্বালায়, দাউ দাউ জ্বলে যাক / তুমি জাগো সেই নীল অগ্নিমালায়।' কবিতা সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকে জাগ্রৎ করবার বাসনাই তাঁকে শিল্পের জগতে নিয়ে গেছে। এবং এই শিল্পের জগতে তাঁর অবস্থান বলেই বহির্জগতের বাস্তবতা তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত।

প্রণবের প্রেমের কবিতার মধ্যে একটা বেদনা রোমাণ্টিক বিরহ গোপন আলোর মতো কাজ করে, প্রেমের আবেগেই তাঁর মনে হয় : 'এক মুহূর্ত অনন্তকাল মৃত্যুর স্থির ধনুক ছেঁড়া ছিলায়।' কিন্তু দুজন সমুদ্রের দুই তীরে, শুধু আশা : 'বুকের ভিতরে তবু টের পায় দেখা হবে।' তাই স্বেচ্ছা নির্বাসনের অপেক্ষার মধ্যেই তাঁর সান্ত্বনা। এই কারণেই কবিতার প্রেরণা ও নারীর প্রেরণা প্রণবের কবিতায় এক হয়ে যায়। আবার কখনো অপ্রেমের কঠিন নিঃশ্বাসে বাসুকির ফণা জেগে ওঠে। 'সপ্তপদী' কবিতাটির মধ্যেই তাঁর বিরহবেদনা তীব্রতর হয়েছে, একদিন যে ছিল প্রেমিকা, আজকে বিবাহের দিনের সাতবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করছে, এই নারীর অগ্নি প্রদক্ষিণের মধ্যেই অতীত প্রেমের স্মৃতিকে পবিত্র হোমানলে পুড়িয়ে দিয়েছে, তাই কবির দীর্ঘ হাহাকারে শেষ পঙক্তি ভেঙে পড়েছে : 'এখন কোথায় পা রাখি। জ্যোৎস্না পোড়ায় সপ্তপদী।' এই বিরহ কোমল বেদনার হাহাকারের পাশেই আছে তিরিশ বছরের প্রাণহীন জীবনের রিক্ততার ছবি : 'বুকের বাঁদিকে ঘৃণার গর্ত, লোভের আঁচিল/দুরাকাঙ্ক্ষার দীর্ঘ নখর, চিবুকে আহত/প্রতিশোধ, চুলে রুক্ষতা হিংসার কালো তিল/সারা দেহে ঝরে পড়ে বিতৃষ্ণা শ্লেষ্মার মতো।' এই দুই চেতনাই প্রণবকে অধিকার করেছে বেশি, এর দ্বারাই প্রকৃতি ও জগতে বিভিন্ন দৃশ্যের গন্ধের রহস্য ব্যাকুল বিষাদ ও যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। দু'একটি ব্যঙ্গ কবিতা আছে, তাতে তাঁর কবিপ্রতিভার মূল সুর নিহিত নয়। 'হাত তালির পরে' কবিতায় জনপ্রিয়তা ওপর তাঁর অনুভব ও কটাক্ষ বুদ্ধদেব বসুর একটি ইংরেজি শব্দকেই মনে পড়িয়ে দেয় : জনপ্রিয়তা দুর্গন্ধময়, প্রণব সেখানে বলেছেন

সর্বনাশ। প্রণব পঞ্চাশের কবি হলেও চল্লিশের ধারার স্পষ্টবাদিতাকে স্বীকার করেছেন ; ভাষা অতিস্পষ্ট, যুক্তিপূর্ণ ও অর্থবহ, ছন্দের নিখুঁত নিপুণতা বিস্ময়কর, মিলের মোহ প্রবল, একটা পেলব মিষ্টত্ব আনতে চান। ওঁর কবিতার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গির সঙ্গে এলিজাবেথ জেনিঙস্-এর একটা সাদৃশ্য আছে। শব্দের ধ্বনিতে দুটি একটি শব্দে সঙ্কেত ফুটে ওঠে, যেমন 'হাততালি' কবিতায় 'সুন' শব্দটি। জীবনের গভীরতর সমস্যার জটিলতায় তাঁর কবিতা আবর্তিত নয়, কিন্তু এই গুণগুলির জন্যে তাঁর কবিতা সুখপাঠ্য। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তাঁর এই কবিসত্তাকে প্রভাবিত করেছে নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, অরুণ সরকার ও নরেশ গুহ। নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর অনেক শব্দ তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়, আর বহিরঙ্গ রূপায়নের দিক থেকে অরুণ সরকার স্মরণীয়। সুরের দিক থেকে নরেশ গুহ।

শক্তিব্রত ঘোষ

শক্তিব্রত ঘোষ কবুল করেছেন তাঁর কবিতার তিনটি স্তর, পূর্ণাঙ্গ নিটোল লিরিক থেকে বুদ্ধিবাদজনিত নাগরিক জীবনের ক্ষণিকতা, এবং এই নাগরিক জীবনের ক্ষণিকতা উত্তরবঙ্গের নিসর্গের স্তব্ধ ধ্যানে পরিণতি লাভ করেছে, এই প্রকৃতিই শেষ পর্যন্ত দেবতায় রূপান্তরিত। সম্প্রতি প্রকাশিত 'পতাকা' কবিতায় এই ঈশ্বরবোধ প্রকাশিত। এই সঙ্গে একথাও ঘোষণা করেছেন যে তাঁর কবিতার বহিরঙ্গের প্যাটার্নে লিরিকের প্রভাব থাকলেও বুদ্ধিজাত মননই তাঁর শব্দচয়ন ও কবিতার ভাববস্তুতে বিলসিত। সংলাপধর্মিতার সঙ্গে নাট্যধর্মিতা, লিরিকের সঙ্গে কাহিনী বা আখ্যান কাব্যের আকার, টুকরো ছবির সঙ্গে বিস্তৃত ছবি, উপমার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কেত এগুলিকেই ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু কবির এই কথাগুলি কাব্যে কতোখানি প্রকাশিত হয়েছে, সেটাই আলোচ্য। আলোচ্য এই কারণে ইদানীংকালে তাঁর কবিতা রচনার প্রবৃত্তি একটা ব্যর্থ হতাশায় পর্যবসিত হয়েছে, কারণ এখন তাঁর মনে হয় কবিতা রচনা করে কিছু হয় না। এটা যদি সমর সেনের মনোভাব থেকে আসতো, তাহলে তার ব্যাখ্যা অন্যরকম ভাবে করা যেতো, কিন্তু সমর সেনের সেই মনোভাব শক্তির নেই, সুতরাং কবিতা ব্যাপারটা কি যৌবনের বিলাস, প্রৌঢ় বয়সের শব্দবিলাসিতা, সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে মাঝে মাঝে শব্দের

ব্যায়াম, লোকের কাছে পরিচয়ের মানপত্র? 'পতাকা' কবিতায় তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন কিন্তু শব্দে ও ভাবার্থে কি ভাব প্রকাশ ঘটেছে?

ধীরে ধীরে এক পিরামিড গড়ে উঠছে। কিন্তু
চুড়োয় নিশান নেই কোনো,
কোন তেনজিং বা হিলারি কি শুধু অভিষেকের ঘোষণা?
অবিশ্বাস্য চীনেরাও কি শাবল ও দড়ির সঙ্গে টুকরো
নিশান নিতে ভুলে গিয়েছিল?
অথবা চুড়োয় ঠিক মাথায় সেই প্রতিকারহীন নীল
স্তব্ধ পতাকায়

ওড়ে করতাল:

কেউ কি আছেন, কেউ আছেন কি?

'অথবা চুড়োয় ঠিক মাথায় সেই প্রতিকারহীন নীল স্তব্ধ পতাকায় ওড়ে করতাল' কি অন্যান্য বাক্যের সঙ্গে ঘন নিবিড় যোগ সংস্থাপন করছে? অথচ আন্তরিকতায় শক্তিও যে কবিতা লিখতে পারেন 'অন্যতর' কাব্যে তার নজির আছে, সেখানে দার্জিলিঙের প্রকৃতি তাঁর চেতনাকে অন্যতর জগতে নিয়ে গেছে, জীবনের নৈরাজ্যের মধ্যেও প্রকৃতি সময় নদীর স্রোতে নকল স্বর্গ তৈরি করছে। ভাষা ছন্দ এখানে অনেক সহজ। যদিও জীবনের গহন গভীরে তাঁর কবিতা পৌঁছয় না। যেখানে শক্তিব্রত সচেতন সেখানে সুধীন্দ্র দত্তের ইডিয়ম রীতি বাকসংহতি সংক্ষিপ্তি, সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে দেশজ শব্দের ব্যবহার ছন্দ মিলের অনুরাগ রয়েছে। তাঁর কবিতায় সংক্ষিপ্ত বাক্যে টুকরো ছবির ফুটে ওঠে, চিত্রের মধ্যেই ওঁর বক্তব্য ধরা পড়ে, মুহূর্ত বেদনার মধ্যে ওঁর চিত্ত শান্তি পায়। একটি কবিতায় হরপ্রসাদের জীবনদর্শনের সঙ্গে সাদৃশ্য চোখে পড়ে: 'দূর গ্রামান্তের আলোরেখা সংসার, সংসারে অসংখ্য হিংসার সিদ্ধান্ত, হয়ে যায়, / হঠাৎ ভয় পাওয়ার বুক শান্ত হয়, / ফোটে প্রাঙ্গণে মাধবী।' শক্তিব্রতের অতি সচেতনতার ফলে কবিতার ধর্ম যেমন বিনষ্ট, তেমনি কিছু শব্দের সমাহার গড়ে উঠেছে, 'রৌদ্রের অবাক নাগরিক' 'প্রাক্তন অলস কৌতূহল' 'নিরুদ্দেশ বেদনার স্পন্দলীন মালিন্য সংগীতে' 'ভুলের সীমা ধ্রুবশ্বাস সমুৎকীর্ণ বিস্মৃত অশেষ'। এগুলি শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু দে'র

অনুকরণকেই উচ্চকিত করে। শক্তিব্রতের বিরুদ্ধে আমার প্রধান অভিযোগ কাব্যজগতে তিনি পাদপ্রদীপের অংশ নিয়েছেন।

কবিরুল ইসলাম

কবিরুল ইস্‌লামের কবিতায় জটিলতর বেদনার ঘূর্ণি অন্ধকারে বিষম বিষমহীরুহ গড়ে তোলে নি। প্রাচীন ঋষির মতোই বিস্ময় কৌতূহলে সরল ও সহজভাবে আলোকিত সীমান্তে পৌছুবার অদম্য আকুতি প্রকাশ করেছেন। প্রাচীন মন্ত্রের মতো সূর্যমন্ত্র উদ্‌গীত করেছেন, 'হে সূর্যসংকাশ ভালোবাসা / আলোয় আলোয় অনির্বাণ মুখে তার তোমারই প্রতিমা।' প্রার্থনা করেছেন, 'জলে পাপ ধুয়ে দাও অলৌকিক জলে।' তর্ক এড়িয়ে নিষ্পাপ শিশুর বিশ্বাসে জীবন ঘিরে অমূর্ত রহস্যকে লাভ করবার আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন। সরল ভালোবাসা ও অকৃত্রিম কৌতূহল তাঁর কবিতাকে এক বিস্ফারতায় উন্নীত করে, যা এযুগের কবিতায় বিরল দৃষ্ট। এই ভালোবাসার সঙ্গে মিশেছে ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস। সব মিলে হয়তো রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল রোমান্টিকতার মানববোধ কবিরুলের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাকে অনেক দ্বন্দ্ব আঘাতের মধ্যে দিয়ে লাভ করেছেন, কবিরুল জীবনের প্রারম্ভেই লাভ করেছেন। এ যেন আজন্মলালিত গভীর বিশ্বাস। তাই তাঁর কবিতায় প্রয়াসের কোনো চিহ্ন নেই। 'আমি তটের সমীপে' কবিতায় বলেছেন, 'আমি রক্তের আশ্রয়ে জন্মসূত্রে ভাগ্যবান।' অন্যত্র বলেছেন; 'বস্তুত কবিতা পাঠ ঈশ্বরেরই স্তব। মনে হয়, এই সব শব্দবর্ণগন্ধের স্বভাবে/ একদিন এ পৃথিবী আমাদের বাসযোগ্য হবে/জন্মের জানালা খুলে যাবে একদিন/সব কথা গান হবে/সব গান আলো/কেন না আলোই ভালোবাসা।' এই সাংশ্লেষণিক জীবনবোধ বিনয়ের কবিতাকে স্মরণ করায়।

দুঃখের কথা যে তিনি স্বীকার করেন না, তা নয়, তবে তেমন কোনো সাড়া জাগায় না। এবং প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে একটি প্রত্যাখ্যানজনিত হতাশা কাজ করছে। যেহেতু কবিরুল সূচিবিদ্ধ যন্ত্রণাকে একমাত্র উপায় বলে গ্রহণ করেন না, বৃহৎ, মানব ও ভালোবাসায় তাঁর চিত্ত উন্মুখ, সেই

হেতু এই জাতীয় কবিতায় তাঁর সার্থকতা বা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় না। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'ভালোবাসা হে আমার বিকল্প ঈশ্বর।'

কবিরুলের কবিতায় এই একমুখী সুর সুন্দর ফুটে উঠেছে। এখানে বিরোধী বিপরীত কথা নেই। সূর্যের প্রতীক তাঁর কবিতায় বারংবার একটি স্বকীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সূর্য নদী বৃক্ষ তাঁর ভালোবাসায় রঙিন। হয়তো একই কথার পুনরাবৃত্তি তাঁর কবিতায় মাঝে মাঝে একঘেয়েমি সৃষ্টি করে, সরল স্বচ্ছন্দ উচ্ছলতা ও রবীন্দ্রনাথ থেকে আহৃত শব্দের প্রয়োগ, প্রেমের কবিতার অস্পষ্টতা, অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাত্রিক ছন্দের বহুল ব্যবহার, এ যুগের জটিলতায় ও বৈচিত্র্যের অভ্যস্ত পাঠকের পীড়া দেবে, কিন্তু তবু কবিরুল ইসলামের কবিতায় সরল সহজ বিস্ফারতা ক্লান্ত অন্ধকারের বুকে উষার প্রশান্ত দিগন্ত। ভয় শুধু একই ভাব ও ভাবনা, শব্দ ব্যবহার ও চিত্রকল্প বারবার ফিরে ফিরে না আসে।

কিন্তু এ ভয় আমার থেকেই গেল। সম্প্রতি প্রকাশিত 'তুমি রোদ্দুরের দিকে' কাব্যগ্রন্থে কবিচিত্তের তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। 'অন্ধকার সারাক্ষণ আমাদের স্নায়ুর উপর' এই বোধ প্রথমদিকের কিছু কবিতায় প্রকাশিত। কিন্তু তারপরেই প্রেমে ও বিশ্বাসে আবার ফিরে এসেছেন, সেই একমুখীন সরলতায় হৃদয়ের প্রকাশ, শুধু আন্তরিকতার জন্যেই হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। 'তুমি আজ কোথায় জানি না / আমি শুধু তোমার স্মৃতির সারাৎসার।'

এই স্মৃতিবেদনার রিক্ত শূন্যতা তাঁর কবিতায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, বেদনায়ই তিনি বলে ওঠেন : 'কথা ছিলো দেখা হবে / কথা আছে একদিন দেখা হবে / একটি প্রদীপ আজো জ্বলে যায় সন্তর্পণে আড়ালে আড়ালে।' এই প্রেমের শূন্যতায়ই তিনি গৃহহারা : 'আমি নিত্য বাড়ির সন্ধানে আছি / আমি বাড়ির ভিতরে বাড়ি / ঘরের ভেতরে ঘর চাই / তুমি খুঁজে দেবে?' বাংলা দেশের ওপর কবিতা আমাকে তেমন নাড়া দেয় না, আর 'রোদ্দুর' শব্দ বাংলায় 'ক্লিশে' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারাপদ রায়

তারাপদ রায়ের 'ছিলাম ভালোবাসার নীল পতাকা তলে স্বাধীন' পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সহৃদয় পাঠকের কাছে একটি বেদনা জেগে উঠবে, সেটি হলো : তারাপদ স্বপ্নস্বর্গ থেকে এই তুচ্ছ পৃথিবীতে জোর করে আনীত হয়েছেন। তাই স্বপ্নের জগৎকে হারিয়ে শহরে এসে তাঁর রাগ বেড়ে যাচ্ছে, রাগের ফলে বিদ্রূপ চিৎকার গালাগাল করছেন, তুখোড় কথা ছড়াচ্ছেন, তাই রাগ বিদ্রূপ চিৎকার গালাগালির মধ্যেই কালো অন্ধকার নিথর জলে হৃদয়ের রক্তগোলাপ স্মৃতির আলোয় জেগে ওঠে, সন্ধ্যাশেষে হতাশার আকাশের মেঘের অন্ধকারে যেমন বিদ্যুৎ চমকে ওঠে, তেমনি করে স্মৃতি ও স্বপ্ন চিকিয়ে যায়। আসলে তারাপদর মনের ভেতরটা স্বরের বৃষ্টির ধারায় ফুলের গন্ধে কোমল। কিন্তু বাস্তব জগতের রূঢ়তায় তুচ্ছতার আঘাতে তাকে না পেয়ে রাগে ফুঁসে উঠে মুখে যাচ্ছেতাই বলছেন। তারাপদ এখানে তাঁর চারপাশের প্রত্যক্ষ বস্তুজগৎ ও আদর্শ জগতের দ্বন্দ্বের মাঝখানে। এই দ্বন্দ্ব থেকে তাঁর উত্তরণ প্রয়োজন, সেই উত্তরণের জন্যে সাধনা স্থৈর্য দুঃখবোধ সহিষ্ণুতা আবশ্যক। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তাঁর উত্তরণ ঘটবে। আপাতত এই গ্রন্থে যা দেখতে পাচ্ছি তা হলো তাঁর 'প্রতিমা' হারিয়ে গেছে, সেই হারিয়ে যাওয়া প্রতিমার খোঁজে স্মৃতির মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাকে না পেয়ে তাঁর রাগ বাড়ছে। যেমন প্রথম কবিতার মধ্যেই আছে অতীত স্মৃতি চারণার রীতিতে :

> ছিলাম ভালোবাসার নীল পতাকাতলে স্বাধীন
> কয়েকদিন মাত্র তবু এখনো সেই স্বাধীনতার স্বাদ
> এখনো ভোলা গেল না।

কিন্তু সেই অতীত তারাপদ আজ হারিয়ে ফেলেছেন, এই হারিয়ে ফেলার বেদনা তাঁর প্রায় প্রত্যেক কবিতার মধ্যে আছে : নিম্নোক্ত ছবিটির মধ্যেই তারাপদর জীবনের মূল স্বর বোঝা যাচ্ছে :

> স্বপ্নের জাহাজগুলি ডুবে গেলো বালিশের নীচের বন্দরে।
> গভীর ঘুমের মধ্যে আর্তকণ্ঠে একজন হেল্প হেল্প করে

কবিতা : চিত্রিত ছায়া

ভীষণ চেঁচালো : লাইফ বোট ঠিক কোথাও ছিল না।

অথবা, ভীষণ পুরনো এক পূর্ণিমার সস্তা গোলচাঁদ
সেই দিনই শ্যামবাজারে ফিরতে ফিরতে হারিয়ে ফেলেছি।

নতুবা, আমার স্বপ্নের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে স্বপ্নের ভিতরে
আদিগন্ত ধরাশায়ী দীর্ঘ বনস্পতি।
অনন্ত উড়ন্ত বন চতুর্দিকে সর্বত্র এখন।

পূর্ব বাংলার ছেলে তারাপদের জীবনের সুর যেন এই কলকাতা শহরই গিলে ফেলেছে। শহরের বিচিত্র দৃশ্যে তাঁর সংবেদনশীল মন ধরা দেয়, অবাক কৌশলে চারদিকে তাকান, তারপর বাচালের মতো বকতে থাকেন, বন্ধুদের কানে তালা ধরে ; অসীম কৌতুহলে সব ব্যাপারেই উচ্ছল কিশোরের মতো বলার আকুল আগ্রহ, একদিকে এই শহর যেমন তাঁর বাচালতা সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে শহরে বাস করেই তাঁর মনে হয়েছে সিন্দুকের মতো বদ্ধ বাড়ি আলোজ্বলা হঠাৎ সন্ধ্যায়,

শহরতলীর প্রান্তে অন্ধকার কালো জলে
জাহাজের মতো ভেসে যায়।

আলো-জ্বলা খিদিরপুর ডকের তিনজন সারেংএর কাছে মনে হয়েছে ; 'দূর বন্দরের থেকে নিয়ে আসা জলপাই গাছের/ বিশাল বিশাল ছায়া চারদিক ছড়ায় এখন।' তবু বারবার এই বেদনার কথা ভুলতে পারেন নি তারাপদ। বালির চড়ায় ষ্টিম লঞ্চ ঠেকে গেছে, 'তরী আমার খেয়া আমার খেয়া আমার ভেলা আমার জাহাজ আমার জলের নীচে।' বেদনায় বলে উঠেছেন : 'পদ্মার খেয়ালি নৌকা অতলে হারায়, / জবা ফুল, ভাঙা চাঁদ, ভ্রাম্যমাণ চিল কখন ছিনিয়ে নেয় ঢাকা মেলে কর্কশ হুইসিল।' তাই এই জীবন সমাধানহীন বনবাস বলে মনে হয়েছে। এই বনবাসের জীবনে অতীত শেফালির জন্যে কেঁদেছেন, বর্তমানে তাকে না পেয়ে ভবিষ্যতের শহর জীবনে ভোটের বাক্সের মধ্যেই তাঁকে পেতে চেয়েছেন : 'শেফালির মার্কা মারা বাক্স চাই। শেফালি ফুলের জন্যে ভোট চাই।' আশ্চর্য অতীত স্মৃতিজনিত শেফালি তাঁর মনের কোণে এতই প্রভাব বিস্তার করেছে যে একটি কবিতায় তিনি শেফালির উল্লেখ করেছেন সাতাশবার। কবিতাটির মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ও শহরের বিরোধ, প্রাচীনের মধ্যে যখন ফেরা যাবে না, তখন শহরের পরিবেশেই

শেফালির আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। তাই তাঁর বিশিষ্ট সঙ্কেত ফুটে উঠেছে জল বৃষ্টি নদী সমুদ্র জাহাজ নৌকার পুনরাবৃত্ত শব্দে। এই ব্যর্থতার মধ্যে এই প্রত্যাশাই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে : 'কিছুই জানিনা শুধু / নিঝুম নিঝুমপুর চলো, চলো চলো।' এই একই সুর বিভিন্ন দৃশ্যে পরিবেশে চিত্রে চঞ্চল মুহূর্তের বেদনায় ক্ষণিক চিত্রের ছোঁয়ার মতো ভেসে উঠেছে। কয়েকটি কবিতা বাদ দিলে অধিকাংশ কবিতার দোষই হচ্ছে বড় চঞ্চল, বড় উচ্ছল, বড় উচ্ছ্বাসময় এবং সরল। চঞ্চল উচ্ছ্বাসের মধ্যে গোটা কয়েক পঙক্তি অবিস্মরণীয়ভাবে শুধু মনের মধ্যে গেঁথে থাকে : 'সামনের গাছের ছায়া সারা বেলা রাস্তার ধুলো ঘেঁটে এলোমেলো শুয়ে থেকে রোদ পড়তেই ইয়ারের মতো ডিগবাজি দিয়ে ঘুরে ঢুকলো।' তারাপদ ভাবেন, যা দেখা যায় তাকে নিয়ে তক্ষুনি কবিতা রচনা করা যায়, ফলে স্থৈর্য তাঁর কবিতায় প্রায়শ নেই। এত সহজে যে কবিতা রচনা করতে পারা যায়, তারাপদের কবিতা না পড়লে কল্পনা করতেও অবাক লাগে। অথচ ভালো কবিতায় সময় অনেক কিছু দাবি করে।

স্মৃতির জগতের স্বপ্নের তারাপদ কলকাতায় নাগরিক জীবনে এসে কৌতুকপ্রিয় ব্যঙ্গকুশলী হাস্যরসিক বাচাল হয়ে উঠেছেন। তাঁর একই কবিতায় এই দুয়ের বিরোধ চমৎকার লক্ষ্য করা যায়। 'ভূতের রসিকতা' কবিতাটি দ্রষ্টব্য।

অথচ একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে তারাপদের কবিতায় ভাষার স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি তরতরিয়ে গদ্যের মতো সহজে টেনে নিয়ে যায়, এই স্বচ্ছন্দ গতির সঙ্গে সংগীতের মৃদু কোমলধ্বনি নূপুরের মতো বাজতে থাকে। ('প্যারিসের সায়াহ্নের গন্ধ মাখা যৌবনের আরক্ত রুমাল' ইত্যাদি) এই সংগীতকে কেন্দ্র করেই পাউণ্ডের ভাষায় বলতে পারি তিনি কাব্যিক। কথ্য বাংলা শব্দ, স্ল্যাঙ ইংরেজি শব্দ অবলীলাক্রমে মধুর স্মৃতিচারণের সঙ্গে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন। 'জাস্ট কিছু লিখে রাখা ডট পেন্সিলের খোঁচা দিয়ে', অথবা 'গভীর ঘুমের মধ্যে, আর্তকণ্ঠে একজন, হেল্প হেল্প করে ভীষণ চেঁচালো, লাইফ বোট ঠিক কোথাও ছিল না।' এই ভাষায় কৌতুক ও ব্যঙ্গ অপূর্ব জমে, সর্বোপরি নাটকীয় সংলাপের ও আড্ডার ভাষার চূড়ান্ত নমুনা এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ভাষা লক্ষ্য করলে স্পষ্ট বোঝা যায় এক

লহমায় যা দেখেন, এক মুহূর্তে তাকে প্রকাশ করতে ব্যস্ত। দু একটি কবিতায় টেকনিকের নূতনত্ব আছে, তবে তাঁর মূল সুরের সঙ্গে খাপ খায় না।

আদর্শ আকাঙ্ক্ষার বিরোধ ছাড়া ঈশ্বর-বিশ্বাস, ঈশ্বরকে নিয়ে ঠাট্টা, আত্মজিজ্ঞাসা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, কবিতার শব্দ, স্বপ্ন নিয়ে কল্পনা কয়েকটি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।

'স্বাগতম্' কবিতার শেষ পঙক্তিতে তারাপদ বলেছেন : 'হে কর্তা, তাহলে আমি পাপোশে পা মুছে ফিরে যাবো।' এই হতাশ করুণ জিজ্ঞাসা আজকে সকলের। ভেতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, কিন্তু পারা যাচ্ছে না বলেই রাগের পাহাড় গর্জে উঠছে। আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তবের বিরোধে ব্যর্থতাই তো জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

দিব্যেন্দু পালিত

আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি না যে দিব্যেন্দুর কবিতা আমি ভালো-ভাবে বুঝেছি। কিন্তু কতগুলি জটিল চিত্রের ও সংগীতের আস্বাদন আমার রক্তধারায় শিহরন জাগায়। নিশ্চিত করে না বোঝার মূলে দায়িত্ব কার, সমালোচকের দাপট বলবে 'অবজেক্টিভ্ কোরিলেটিভিটি' নেই, কবির অহংকার বলবে মেলাতে পারো নি। কিন্তু মেলাতে গিয়েও যখন মেলে না তখন দোষ দেবো কাকে। আসলে দিব্যেন্দুর গল্পকার সত্তা কবিতায় পেয়ে বসেছে, অর্থাৎ বুদ্ধির বিশ্লেষণে যা স্বাভাবিক, কবিতার ঘন সংহতির মধ্যে হয়ে উঠেছে 'স্টাণ্ট', যা অনবরত পাঠককে ধাক্কা দেয়। গল্পের দাবিতেই বিভিন্ন চিত্রের এতো নিপুণ সমাহার ঘটে একই পঙক্তির মধ্যে, একটু অসাবধান হলেই রসাভাস হবার সম্ভাবনা, 'সবার কুশল জানি' 'বিপজ্জনক ভ্রমণ' 'দিনযাপন : আগস্ট, ১৯৬১,' 'আমার বন্ধুকে আমি' প্রভৃতি কবিতা এর উদাহরণ। ডোনাল্ড হল্ নিজের কবিতারচনা সম্পর্কে এক জায়গায় একটি কথা বলেছেন যে দুটি উপাদান তাঁর রচনাকার্যে সর্বদা সক্রিয় : অচেতন অতি-স্থিরতা এবং প্রাক্‌চেতন জ্ঞান। এই দুয়ের দোলায় তাঁর কবিতা দোদুল্যমান। আমার মনে হয় দিব্যেন্দুর কবিতায় প্রাক্‌চেতন জ্ঞান যতোটা সক্রিয়, অচেতন অতি-স্থিরতা

সেই পরিমাণে লক্ষণীয় নয়। এই কারণেই তাঁর একই কবিতায় ব্যঙ্গের ও কৌতুকের সঙ্গে অতি গভীর বিষাদ ও আত্মসমীক্ষা কবিতাগুলিকে জটিল করে তুলেছে। কবিতাগুলি একমুখীন নিটোল সরল রোমান্টিক নয়, কবির অনুভূতির বিচিত্র উপাদান একসঙ্গে জড়িত। পৃথিবীর সমস্ত নর-নারীকে জানবার পরও যেমন আত্মসমীক্ষা বাকি থাকে, তেমনি থাকে সহিষ্ণুতা, যার মধ্যে বিষাদ গোধূলি বর্তমান। একদিকে খেয়ালি রোমান্টিকতা, অন্যদিকে এই রোমান্টিকতার মধ্য দিয়েই এ যুগের সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রেমের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেই প্রেমের ব্যর্থতা এবং গহন গভীরতলে এক কাপুরুষতা লুকিয়ে রয়েছে। প্রেম অ-প্রেমের দ্বন্দ্বে তিনি ক্ষতবিক্ষত, প্রেমের জন্যে যার প্রতীক্ষা তিনি করছেন, সে হয়তো কাল্পনিক, কবি নিজেরই প্রতীক্ষা করছেন। কখনো পাপকেই পরম আত্মীয় বলে মনে হয়েছে, আমাদের ঘরে তারই প্রবেশ ঘটে নীরবে : 'গায়ের চাদর ফেলে পা টিপে পা টিপে / মন্দিরের বেদী থেকে একটি গভীর পাপ আস্তে উঠে এলো।' 'জলাতঙ্ক' কবিতায় জলকে নিয়ে বিভিন্ন জনের স্বপ্ন ও অমল জাদু শেষ পর্যন্ত 'পেঁচিয়ে ওঠে সত্তা জুড়ে বিষাক্ত ভয়।' 'রাজার বাড়ি অনেক দূরে' নাম শুনলেই রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতার কথা মনে পড়ে এবং এই রোমান্টিকতা প্রথমদিকে আছেও, কিন্তু কবিতাটি শেষ হয়েছে তৃষ্ণা ও তরল আঁধারে এবং শান্ত হবার প্রার্থনায়। কিন্তু ভয় : 'সত্যি কিছু আছে নাকি! / দুরন্ত দিন, ফলন্ত মাঠ? / যাকে পাবার ইচ্ছা ছিলো? / জানিনা তা। এখন শুধু / তৃষ্ণা, আমার / রক্ত, এবং তরল আঁধার— / নেমে আসছে, নেমে যাচ্ছি হঠাৎ যেন / সিঁড়ির গাঢ় অন্ধকারে / তবু— / নিঃস্ব হবার আগে যেন শান্ত হতে পারি।' এ যুগের জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বময় মানসিকতার ও বিরোধী মানসতার সচেতন চিত্রই এই কাব্যের সর্বত্র উজ্জ্বল। কিছু কিছু কবিতায় সুনীলের সঙ্গে বোধের সাদৃশ্য আছে। নিজের এই পরিচয় সম্বন্ধে দিব্যেন্দু সচেতন; নিজের সম্বন্ধে বলেছেন : 'কাপালিক কবি ব'সে, পদ্মাসন, স্খলিত অন্তরে।' তাই কবিতার প্রথমে 'চেতনা উদ্ধৃত করে বেদনার নীল অঙ্গুরীয়' বলবার পরেই বলেছেন :

শবাধারে নষ্ট ফুল, জরায়ু গভীর থেকে ডিম্বের পুতুল
ক্ষোভে, আর্তনাদে ভাঙে, রক্তের চিৎকার, কেঁদে ওঠে।

বিপুল মেদিনী-পৃষ্ঠে দেবতাকে ! অসুর রমণী
স্তনাগ্রে সূচিত করে ধ্বংসের বীজাণু, দুধ ফোঁটা ফোঁটা ঝরে।
'শবাধারে নষ্ট ফুল'

তাই নিজেকে নিয়ে এমন ব্যঙ্গ করতেও তিনি কুণ্ঠিত নন, দুঃখহীনতার সংক্রামক রোগে ভুগতে ভুগতে কবির মাথার ঘিলু খসে যায়, আর তারপর 'নোংরা জলে, পুরীষ প্রবাহে / অবশেষে পাণ্ডুলিপি ভাসে।' পুরীষ প্রবাহে যদি পাণ্ডুলিপি ভেসে যায়, তাহলে লেখার মানে কি ? মানে কি আছে তা ঠিক নয়, তবে জীবনে এই সত্য, তাই এই ব্যঙ্গ। গদ্যের ঋজুতা শ্লীলতা অশ্লীলতা বর্ণনার সাবলীলতা এবং বুদ্ধির মননশীলতা তাঁর কবিতায় সর্বত্র, এতেই বাস্তবতা মারাত্মক ফুটেছে :

আমার বন্ধুকে আমি সুচিরোমা জন্তুর শরীরে
ঘ্রাণের প্রচুর অর্থ জেগে থাকে, দেখিয়েছি ; ক্লান্ত জাগরণে
প্রতি মুহূর্তের নিদ্রা মৃত্যু হয় ; সংগ্রামী পুরুষ
সূর্যেন্দু সংগম কোনো দীঘল রাত্রির শেষে বয়োধর্ম স্বীকারে প্রস্তুত ;
এবং বয়স্কা নারী তার বয়সের স্মৃতি ভুলে গিয়ে হয় প্রমাথিনী,
জরায়ু জটিল তবু চরিত্র স্খলন ক'রে ক্লোমরসে ঋণী
হ'তে চায় ; বিনোদিনী কোথায় বাহুর স্রোতে খোঁজে দেবদূত ;
দক্ষ প্রতিবেশী এক শ্লীপদী ব্যথায় ভুগে হয় অমানুষ,
পরস্বাপহারী ; দেব দ্বিজ তার প্রজ্ঞার প্রাচীর ভেঙে দূর আমন্ত্রণে—
রাত্রি শেষে চ'লে যায় কোনো এক স্থূলমতী নারীর গভীরে !'
'আমার বন্ধুকে আমি'

বিনয় মজুমদার

বিনয়ই প্রকৃত প্রেমিক, প্রেমের জন্যে জীবন সমর্পণ করতে পারেন। ব্যর্থ প্রেমের রিক্ততায় অনেকেই ক্ষণিকের জন্যে আত্মহারা হয়ে আবার যথারীতি কার্যে মনোনিবেশ করে, হয়তো অবচেতনে এই রিক্ততা সক্রিয় বলে কখনো কোনো কোনো কবির কাব্যসৃষ্টিতে বিদ্যুৎ-উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে, কিন্তু প্রেমের জন্যে জীবনদান এবং এই জীবন থেকেই প্রেমের কবিতার আবির্ভাব বিনয়ের কবিতার মধ্যেই এ যুগে একমাত্র দেখা গেছে, সুতরাং বিনয়ের কবিতা শুধু

কাব্যশিল্প নয়, ওঁর জীবনেরই আত্মনিবেদন। আর এ কবিতাগুলির রচয়িতা বিনয় হলেও বিনয়ের প্রেমিকারই রচনা। 'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থের 'আত্মার আত্মীয়া' কবিতায় বিনয় নিজেই বলেছেন : 'সেইহেতু প্রকৃতপক্ষে এই কাব্য, কবিতাসমূহ / ঈশ্বরীর স্বরচিত ; আমি তার লিপিকার স্বামী।' ব্যক্তিগত প্রেমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিশ্বপ্রেম। তাতেই গাণিতিক নিয়মে দেখা দিয়েছে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম। ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পরম পবিত্রতা দুজনের জীবনের লক্ষ্য, তাই তাঁর কাব্যে বারংবার দেবতার উল্লেখ। 'আমাদের দ্বৈত চিন্তা' কবিতায় বলেছেন : 'দেহহীন সব সত্তা, পক্ষপাত প্রীত তারকারা / সময় আকাশ আলো ঐশ্বরিক প্রতিভায় জ্বলে। / বিশ্বের প্রতিটি বস্তু তাদের পবিত্র প্রতিষ্ঠায় / পৃথিবীতে আজ এক বিস্ময় সঞ্চার ক'রে চলে।' বিনয়ের বিশ্বপ্রেম অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে' অভিব্যক্ত বিশ্বপ্রেমের মতো, বিনয় শিলার ও রবীন্দ্রনাথের মতোই মনে করেন ঘাস পাখি মানুষ একদিন এক হয়েছিল, আজ তারা বিচ্ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন বলেই রিক্ততা এবং মিলনের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর : 'তবুও কেন যে আজো, হায় হাসি, হায় দেবদারু, / মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়।' অথবা 'বৃক্ষ ও প্রাণীরা মিলে বায়ুমণ্ডলকে সুস্থ, স্বাস্থ্যকর রাখে।' নতুবা 'এ সকল সংখ্যাতীত উদ্ভিদ বা তৃণ, গুল্ম ইত্যাদির মূল / অন্তরালে মিশে গিয়ে অত্যন্ত জটিলভাবে থাকা স্বাভাবিক।' তাই একে গ্রহণ করবার জন্যে 'হৃদয়ের অন্তর্গত ঘ্রাণ' নিতে চেয়েছেন। এই বিরাট বিশ্ব পটভূমিকায় তাঁর প্রীতি ও ব্যক্তিগত প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থে 'চাকা' যেমন কোনো ব্যক্তিগত রমণী, তেমনি এই রমণী বিশ্বপ্রকৃতিও বটে, তাঁর কাছ থেকে দূরে এসেছেন, অথচ একদিন তাঁর কাছে ছিলেন, ছিলেন বলেই তাঁর বিরহের তীব্রতা মারাত্মক। বিনয় সাম্প্রতিক একটি কবিতায় এই বিশ্ববোধ স্পষ্ট করে বলেছেন : 'আলো ব্যোম ও সময় জীবিত ও সীমাহীন, বিশ্বময় ব্যাপ্ত সত্তা' 'আলো, ব্যোম, সময়, কবিতা, দেহ একদিন হয়েছিল ; কথা ছিল হবে পুনরায় কবে যেন।'

বিনয়ের কবিতার স্বাদ বিনয়ের ভাষায়ই বলা চলে : 'শাশ্বত, সহজতম এই দান—শুধু অঙ্কুরের/উদ্গমে বাধা না দেওয়া, নিষ্পেষিত আলোকে রেখে/ফ্যাকাশে হলুদ বর্ণ না করে শ্যামল হতে দেওয়া।' ওঁর কবিতা মনে হয় এতোই সহজ যেন প্রকৃতির মতো হয়ে উঠেছে, এর জন্যে কোনো আয়াস তাঁকে করতে

হয় নি। প্রকৃতির মতো নিবিড় শ্যামল হয়ে ওঠে। কবিতার ভাষা ছন্দে স্বচ্ছন্দতা, গভীরতর সঙ্কেত নিবিড় সুর, সুরের প্রবহমানতা এবং সামগ্রিক নিটোলতা আমাদের মনকে পেয়ে বসে। ভাষার মধ্যে যে ত্রুটি ও অপটুতা রয়েছে তা তাঁর চিত্তের অসহায় রূপকেই প্রতীকিত করছে। বলা বাহুল্য, কবিতাগুলি লিরিকের মতো একমুখীন, কিন্তু প্রতিটি সুর ও শব্দ অর্থযুক্ত, ঘন সম্পর্কে সম্পৃক্ত, কোনো উল্লম্ফন বা অস্পষ্টতা নেই, নিবিড়তার জন্যে তাঁরই ভাষায় তাঁর কবিতা-গুলিকে বলা চলে : 'বেদনার গাঢ় রসে আপক্ব রক্তিম হল ফল।' এক একটি কবিতায় বক্তব্যের অনুভূতি একটিই, অতি সরল, কতকগুলি চিত্রকল্প ও উপমা ছবিতে তাকে নিটোল করে তোলেন। এবং ছবিগুলি তাঁর ব্যক্তিজীবনের গাঢ় অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে। বিশেষ করে প্রাচীন বিশেষণ প্রয়োগ বিনয়ের এক বৈশিষ্ট্য, 'পুষ্পকুঞ্জ', 'দৃশ্যাবলী', 'মেঘমালা' 'অশ্রুমালা' 'কেশমালা' 'কবিকুল' 'ক্ষমতাবলী' 'বাষ্পপুঞ্জ'। এই সঙ্গে এই জাতীয় শব্দব্যবহার আকর্ষণীয় করে তোলে তাঁর রচনা : 'ব্যথাতুর অসুবিধা' 'লীলাময়ী রসার্ত বয়স' 'লীলাময়ী করপুটে' 'অশিক্ষিত গর্তরাশি' 'বিরহী ভয়'। সংস্কৃত শব্দের প্রতি ঝোঁক অসাধারণ এবং সেই সঙ্গে অভূতপূর্ব চিত্রকল্প রচনা : 'মাঝে মাঝে অগোচরে ঘুমের ভিতরে / প্রস্রাব করার মতো অস্থানে বেদনা ঝরে যাবে।' 'সেই কোন ভোর বেলা ইটের মতন চূর্ণ হয়ে / পড়ে আছি নানাস্থানে', 'নিজের চুলের মৃদু ঘ্রাণের মতন তোমাকেও / হয়তো পাই না আমি', 'কৃষ্ণবর্ণ অরণ্যের অন্তরালে ঘ্রাণময় হ্রদে / আমার হৃদয় স্বপ্নে মুগ্ধ হয়, একা স্নান করে।' বিনয়ের রচনায় জীবনানন্দের চিত্রকল্প ও বুদ্ধদেবের ভাষা প্রায়ই চোখে পড়ে : 'সবই অতিশয় শান্ত, নির্বাক ডিমের ভাঙা খোসা / শালপাতা, হাহাকার বকুল বৃক্ষের দীর্ঘশ্বাস।' কিন্তু এই অনায়াসলভ্য রচনার পেছনে বিনয়ের চেষ্টা যে নিহিত রয়েছে জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতার আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কাব্যের ক্ষেত্রে রচনায় elimination বা বর্জন যে আবশ্যিক তার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন : 'Elimination-এর ফলে রহস্যময়তা বাড়ে, দুর্বোধ্যতা বাড়ে—মাঝে মাঝে কবিতার অর্থ 'কোনোদিন বোঝা যাবে না' অবস্থায়ও এসে দাঁড়ায়। কিন্তু কবির চরম উদ্দেশ্য পাঠককে ভালো লাগানো, বোঝানো নয়, এবং দেখা গেছে আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বাস্তব বস্তুগুলি—চাঁদ, তারা, ফুল, লতা, নানাবিধ পাখি,

পাখিদের গতিভঙ্গি ইত্যাদি কখনোই আমরা সম্পূর্ণ বুঝি না। বুঝি না বলে যে ভালো লাগে তা হয়তো নয়, হয়তো ভালো লাগাতে গিয়ে রহস্যময় ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে।' এই সঙ্গে কাব্যকে সাংবাদিকতা থেকে কতোখানি কিভাবে সরিয়ে আনতে হবে তার কথা বলেছেন, উপমা প্রয়োগের অনিবার্যতার কথা উল্লেখ করেছেন, রচনার মার্জনার নির্দেশ দিয়েছেন। কবিতার ক্ষেত্রে যেমন উপরোক্ত গুণগুলি দরকার, তেমনি আবশ্যিক কবিতার বক্তব্যের মধ্যে আবিষ্কার, এবং কবিতায় উপমা, উপমা থেকে প্রতীক, প্রতীক থেকে সাদৃশ্য রচনা, 'চারিত্রিক সমীকরণ' প্রয়োজন। রচনাকে সুন্দর সাবলীল অনায়াস উচ্চার্য ও ছন্দিত হতে হবে, কবিতাকে গভীর সংযত ও অর্থে বহুমাত্রিক করে তুলতে হবে। এই সব চিন্তাভাবনা থেকে বোঝা যায় তাঁর কবিতায় আপাত সহজ সাধনার মূলে তাঁর প্রচেষ্টা সক্রিয়, কিন্তু এই প্রচেষ্টার সঙ্গে হৃদয়ের যোগ ঘনিষ্ঠ বলেই কবিতাগুলি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

প্রেমই তাঁর কবিতার মূল সুর, প্রেমের রিক্তবেদনায় সমস্ত আকাশবাতাস রাঙিয়েছেন, ব্যর্থতার জন্যে তিনি নিজেকেই দায়ী করেছেন, তাই নিজেকে প্রেমের ও কাব্যের জন্যে একান্ত প্রস্তুত করছেন নিয়ত। এবং প্রেমের সঙ্গেই নিজের জীবনের নিরাশ্রয় ব্যর্থতা এসেছে, মাঝে মাঝে প্রেমের রিক্ততাকে বিরহের দার্শনিকতায় ফেলে শূন্যতা ভুলতে চেয়েছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রণা আরো গভীরতর হয়ে উঠেছে : 'শুধু তার যন্ত্রণায় ভরে থাক হৃদয়, শরীর,' এই প্রেমে তিনি এতো একনিষ্ঠ যে অন্য নারী তাঁকে মুগ্ধ করতে পারে না : 'তারপর আর কেন আরো উদ্বৃত্ত ফুলের প্রতি তাকাবো উদ্যত বাসনায়?' কিন্তু ট্রাজেডি হচ্ছে এই নারী আজ অন্যের বধূ। এবং শেষ পর্যন্ত কবিতাই নারী হয়ে উঠেছে, কেননা নিষ্কৃতিই হচ্ছে কবিতার মূল লক্ষ্য, তাই হৃদয়কে নিঃশব্দে বাজতে অনুরোধ জানিয়েছেন, কারণ অন্যকে শোনানো যায় না : 'কবিতা বা গান……ভাবি, পাখিরা কোকিল গান গায় / নিজের নিষ্কৃতি পেতে, পৃথিবীর কথা সে ভাবে না।' মাঝে মাঝে বিরহের তীব্রতায় নারীকে অচেতন লতার সঙ্গে তুলনা করেছেন, এটা বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে নয়, না-পাওয়ার বেদনায় এবং না বুঝতে পেরেই নারীকে অচেতন বলেছেন। কেননা বিশ্বরূপের প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই তো তাঁর ঈশ্বরী বিদ্যমান। তাকে নিয়েই তো তাঁর জগৎ আবর্তিত, কখনো ব্যর্থতায় মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা, এবং

পাইনের মতো আকাঙ্ক্ষা কখনো বাড়ে তাকে পাবার জন্যে। কিন্তু সব শুদ্ধ তাঁর মনোভাব এই চিত্রকল্পের মধ্যেই প্রকাশিত : 'আমি বৃক্ষ, রোগশয্যা পরিত্যক্ত টিপয়ের মতো জীর্ণ, ধূলিময়, ম্লান।' প্রেম ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ফুটে উঠেছে একটি কবিতায় :

বাতাস আমার কাছে আবেগের মথিত প্রতীক
জ্যোৎস্না মানে হৃদয়ের দ্যুতি, প্রেম ; মেঘ—শরীরের
কামনার বাষ্পপুঞ্জ ; মুকুট, আকাশ, সরোবর,
সাগর, কুসুম, তারা, অঙ্গুরীয়—এ সকল তুমি।
তোমাকে সর্বত্র দেখি ; প্রাকৃতিক সকল কিছুই
টীকা ও টিপ্পনী মাত্র, পরিচিত গভীর গ্রন্থের।
অথচ তুমি কি, নারি, বেজে ওঠো কোনো অবকাশে ?
একটা বয়সের ক্ষত—ক্ষত হয়নি কি কোনো কালে ?

কিন্তু তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা : 'ফুল নয়, চাঁদ নয়, মহিলার দেহস্থিত মন অতি অল্পকালে যদি বিকশিত হয় তবে হয় / না হলে কাঁটার মতো বিঁধে ফের কিছু ভেঙে থাকে।' তাইতো কাঁটার আঘাতে তাঁর চিত্ত রক্তাক্ত, এবং রক্তাক্ত চিত্তের ক্ষরণই 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থে ফুটে উঠেছে আর্ত হাহাকারে :

এসো হে বদ্বীপ, এসো তমোরস, এসো জ্বালা, প্রেম
আলোড়ন, ঝঞ্ঝা, লোভ, সংযত সংহার মালা, এসো
নিয়ে যাও মূলে, রসে, বাষ্পীভূত ক'রে মেলে দাও
আয়ুষ্কালব্যাপী নভে, আবিষ্কৃত আকাশের স্বাদে।

অথবা, আমি মুগ্ধ ; উড়ে গেছ ; ফিরে এসো, ফিরে এসো, চাকা,
রথ হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো।
আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো, প্রেম হবো, অবয়বহীন
সুর হয়ে লিপ্ত হবো পৃথিবীর সকল আকাশে।

'ফিরে এসো, চাকা' ১৯৬০-এর মার্চ মাস থেকে ১৯৬২-এর জুন মাস পর্যন্ত লেখা, 'ঈশ্বরীর' কবিতাগুলি ১৯৬৪ সালের মার্চ মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত লেখা ; এই বইয়ের কবিতাগুলি খুব দ্রুত রচিত, ৯ই অক্টোবর তিনি ছ'টি কবিতা লিখেছেন একসঙ্গে। আসলে রচনার উন্মাদনা তাঁকে পেয়ে বসেছে।

'ফিরে এসো, চাকা'র মধ্যে মাংস ও অবয়বহীন প্রেমের দ্বন্দ্ব ছিল, কিন্তু প্রেমকে বিরহের পটভূমিকায় স্থাপিত করেছেন বলে হৃদয়ের গভীর যন্ত্রণা ও ব্যথার অনুভূতিকেই প্রকাশ করেছেন। ফলে তা সামগ্রিক বেদনার সামগ্রী হয়ে উঠেছে। 'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির প্রথমদিকে প্রেমের পবিত্র-বোধ সমগ্র বিশ্বে কেমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তার হার্দ্যিক বর্ণনা আছে, কিন্তু শেষের দিকে কবিতায় ভাবকল্পনার কামুকতা এতোদূর পর্যন্ত উঠেছে, সেখানে 'যোনি' ও 'লিঙ্গ' ছাড়া অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করতে পারেন নি। এবং এখানেই ফ্রয়েডের লিবিডোর কথা আসে, এখানে লিবিডো বা যৌন চেতনা কোনোকিছু বাধা স্বীকার না করে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পেতে চেয়েছে, ইগো (ego)র সঙ্গে কোনো বিরোধ বাধে নি। 'ফিরে এসো, চাকা' এবং 'ঈশ্বরীর' কবিতাগুলির প্রথমদিকে লিবিডো 'ইদের' স্তরে ছিল বলেই কোনো সক্রিয়তা দেখাতে পারে নি, বরং উপরিস্তরে ইগোর সংঘর্ষে এই 'ইদ্' লিবিডোতে মিশে আরো তীব্রতর হয়েছে, তীব্রতর হয়েছে বলেই কবিতায় যন্ত্রণা স্ফটিকের মতো ফুটে উঠেছে। কিন্তু 'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থের শেষের দিকের কবিতায় এই যৌন চেতনা বল্গাহীন হয়ে উঠেছে, ইগোর বিরোধিতা আর স্বীকার করেন নি, ফলে 'ইদে'র জটিলতাও স্বীকৃত হয় নি। অথচ এই গ্রন্থের প্রথমদিকের কবিতাগুলি 'ঈশ্বরীর' পবিত্র ভাবনায় অনুরঞ্জিত, সর্বত্র তাঁদের উপস্থিতি বিদ্যমান : 'সর্বত্র বিরাজমান ; বিশ্বের সকল কিছুতেই / রূপ ও প্রকৃতি হয়ে বিদ্যমান আছি দু'জনেই।' এই উপস্থিতির সঙ্গে দেবদেবীগণকেও স্বীকার করেছেন, 'একাই সকল কিছু, অধিকন্তু রয়েছেন দেবদেবীগণ।' এবং সত্য ও সরলতার প্রতি আকাঙ্ক্ষাও এখানে গভীর, কবির প্রেমের জীবনে এই সততাই প্রত্যাশা করেছেন এবং এই সহজ সরলতার পথেই প্রেমের ক্ষেত্রে এসে দেখেছেন প্রেমে বিশ্বভুবন পরিপ্লাবিত, প্রেমের মধুতে সব ভরে যায়, প্রেমেই মুক্তি, প্রেমের মধ্য দিয়েই কর্ম ও চিন্তাহীন নিরাপদ উন্নতি, প্রেমই তিনটি কালকে এক করে দিতে পারে, এমনিভাবে প্রেমের মধ্যেই তিনি বাস করেছেন। প্রেমের জন্যেই নিজের সম্বন্ধে বলতে পেরেছেন : 'আমার কোলের চেয়ে বেশি উচ্চ, সম্মানিত কোনো / আসন এ বিশ্বে নেই, আর সে আসন ঈশ্বরীর।' কখনো অনুভব করেছেন : 'শিথিল কোমলতার মতো তুমি শুয়ে থাকো বুকের ওপরে।' এবং এই অনুভব থেকেই প্রত্যক্ষ অথচ কল্পনার সংগমক্রিয়ার চিত্র কামুকতার স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। বিনয়ের অবচেতনার মধ্যেই যে এই যৌন চেতনা লুকিয়েছিল, তিনি নিজেই তা স্বীকার করেছেন : 'কোনো রচনা বা

বিষয়ের / বিভিন্ন নিগূঢ় অর্থ করার প্রচেষ্টা করে গেলে / বিভিন্ন অর্থের রূপে অবচেতনার কথাগুলি / মাঝে মাঝে দেখা দেয় ; ফলে দেখি, বিশ্বময় যোনি—' সবচেয়ে আশ্চর্য এই সংগমক্রিয়ার কামুকতার চিত্র অঙ্কিত করতে গিয়েও তাঁর ভাষায় কবিত্বগুণের অভাব ঘটে নি। আর সংগমকে যদি প্রেমের সঙ্কেত হিসাবে গণ্য করি, তাহলে আর অশ্লীলতা স্পর্শ করে না। এবং এই গ্রন্থ থেকেই গণিত-শাস্ত্রের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ বিশ্বাস ফুটে উঠেছে, যা তাঁর পরবর্তী কবিতায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি বিচ্ছিন্ন কবিতা নয়, একটি দীর্ঘ কবিতারই বিভিন্ন অংশ, এইভাবেই আরম্ভ এবং উত্থান বর্ণিত হয়েছে। এবং কবিতাগুলি যে কবির নিজের মনের মধ্যে দয়িতের সঙ্গে প্রেমালাপ 'তোমার আমার মানসিক' কবিতায় তা স্পষ্ট বলেছেন : 'যাই হোক, নিজ মনে ভালোবাসা উদ্রেকের নিমিত্ত, ঈশ্বরী, / সকল চিন্তাই শুধু দয়িতের সঙ্গে প্রেমালাপের মতন— / মনে মনে উভয়ের কথোপকথনরূপে করা অভিপ্রেত।' তবে এ কথা সত্য প্লেটোনিক যে উন্মাদনায় 'ফিরে এসো, চাকা' ও 'ঈশ্বরীর' কিছু কবিতা রচিত, পরবর্তী কবিতায় নারী ও বিশ্ববোধের ব্যাপকতা থাকলেও অনেক নীরস মনে নয়। তবে পরিবর্তনের ধারা লক্ষণীয়।

সুনীল বসু

'কখনো দস্যু কখনো প্রেমিকা'র কবি সুনীল বসু কবিশক্তির অধিকারী এতে সন্দেহ নেই, কিন্তু বড়ো সোচ্চার, বক্তৃতার ভঙ্গি বড়ো উচ্চকিত, ভাষার মধ্যে যে সংযম ও সংহতি প্রত্যাশা করা যায়, তা নেই। সুনীল বসুর জীবন-দর্শন ও জগতে এখনো বৃহত্তর জীবনবোধের প্রসারতা আসে নি, আকাঙ্ক্ষা করাও ঠিক নয়। কিন্তু কামনার তীব্রতা মারাত্মক, তাঁর জগৎ ঘিরে রয়েছে নারী, নারীর কামনা ও আনন্দ লিপ্সা : 'ওই তনুর তন্দুরে রক্ত সেঁকে হতে চাই শুচি।' নারীই তাঁকে চালিত করছে, জন্ম দিচ্ছে, তাই নারী নিয়তি। দু-একটি কবিতায় প্রেমের স্মৃতিবেদনা থাকলেও রক্ত-মাংসের নারীর অধিকার ও মোহই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। এবং এই নারীর সঙ্গে মিশে আছে মধ্যযুগীয় ইতিহাসের রোমান্সসুলভ বিলাস-প্রাচুর্যের মত্ততা। 'এনেছি মৃগের চর্ম, সুগন্ধ, কর্পূর, মসলিন / হাতির দাঁতের বাঁট, মিশরের ইস্পাতের ছোরা / উজ্জ্বল মুক্তোর মালা, সুদূর স্পেনের ভায়োলিন।' এই সঙ্গেই ব্ল্যাক রোমান্টিকতার চতুর্দিকে ঘুরেছেন, নরকের বীভৎস অন্ধকার তীব্র শব্দে ব্যক্ত : 'স্মৃতির লবণে দেহের শোণিতে সাঁতরায় বিষ।' তাঁর কাব্যে হৃদয় হৃদয় খেলা থাকলেও, কামনা ও রিরংসা থাকলেও একটা রোমান্টিক বেদনা তাঁকে মাঝে মাঝে

পীড়িত করে, তাই বলে ওঠেন, 'রজনী নিঝুম হলে, মনে হয় থাক বহুকাল, পৃথিবীর বক্ষোদেশে জোছনার সূক্ষ্ম ইন্দ্রজাল।' এই গ্রন্থের তিনটি অংশ, 'জাগুয়ার', 'রাই সর্ষের ক্ষেত' এবং 'কমিক! কমিক'!! কমিক জাতীয় কবিতার ভূমিকায় 'ছিন্নভিন্ন এই আমি দূষিত হাওয়ায়' মনে হয়, এই চেতনা থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই কমিকের ভাঁড়ামির মধ্যে নিজেকে বিস্মৃত হতে চাইছেন, তাই শব্দে ধ্বনিতে নিরর্থকতা ফুটে উঠেছে। মাত্রাত্রিক ছন্দ স্বচ্ছন্দ গতিতে তাঁর হাতে খেলে, ভাষার শাক্তিও স্বীকার্য।

সুনীল বসুর কবিতা পড়তে পড়তে আমার বারবার মনে পড়ছে পঞ্চাশের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায় ষাটের বহু কবিকে যতোটা প্রভাবিত করেছেন, অলোকরঞ্জন শঙ্খ ঘোষ আলোক সরকার ততোটা করতে পারেন নি। সুনীলের প্রভাবের হয়তো একটা কারণ যে তিনি 'কৃত্তিবাসে'র একটা গোষ্ঠী তৈরি করতে চেয়েছিলেন এবং সার্থক হয়েছেন। আর নারী প্রেম রিরংসা কামনা যেহেতু সকলকে কম বেশি নাড়ায়, সেইহেতু এই বোধ অস্বীকার করে উপায় নেই। এবং শক্তির প্রভাব চিরকালীন রোমান্টিক উদাসীনতার গেরুয়া বাউলের এবং ভাষার জাদুকরী ওলোটপালটে, যা সহজেই আকর্ষণ করতে বাধ্য হয়। সেখানে শঙ্খ ঘোষের সূক্ষ্ম গভীর দ্বন্দ্ব ও জীবনবোধ এবং অন্তর্লীন সংগীতের ধ্বনি ধ্যানস্থ না হলে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। বামপন্থী কবিতায়ও তরুণের সম্পাদিত 'সীমান্ত' ও 'পরিচয়ের' গোষ্ঠীবদ্ধতার জন্য শিল্পসংগ্রহে সমর্থ হয়েছেন তিনি। অথচ কবিতার ক্ষেত্রে স্থান নেই। তরুণের কবিতায় আবেগ ও উচ্ছ্বাসের হাহা ও হিহি আছে, সময়ের স্রোতে যৌবন চলে যাবার বেদনায় কাতর অনুভূতি বিদ্যমান, পৃথিবীর সমগ্র বস্তুর প্রতি এক প্রকার সর্বব্যাপক মমত্ববোধও সক্রিয়, উপমায় যান্ত্রিক শব্দ-ব্যবহার করবার প্রবণতায় ফিউচারিস্ট কাব্যধারায় অনুকরণ আছে, তাই ম্যাশিন, কলকারখানা এ্যারোপ্লেন প্রভৃতি যান্ত্রিক শব্দে আগ্রহ, এবং বাক্যগঠনে প্রথা-নিয়ম ভাঙবার আকাঙ্ক্ষা সুতীব্র, বাক্য ও ভাষা অমসৃণ ও এবড়োখেবড়ো, কখনো ধ্বনিস্পন্দময়, বাস্তবতার সঙ্গে একটা প্রত্যয় জুড়ে দিতে উল্লসিত, কিন্তু সব মিলিয়ে একটা গভীর ঐক্য গড়ে ওঠে না, পূর্ব নির্ধারিত আদর্শের বুকনি শব্দের তুবড়িতে প্রকাশ পায়। কাব্যে উল্লম্ফনতা স্বীকার করা যায়, কিন্তু বিচ্ছিন্নতা অসহ্য। বরং 'মাটির বেহালা'য় সহজ আন্তরিকতার বেদনা স্বাভাবিক এবং ব্যক্তিগত হৃদয়ের প্রকাশে তাঁর অনুভূতি স্বচ্ছন্দ, কিন্তু তাঁর প্রথাগত দীর্ঘ কবিতা একান্তই কৃত্রিম, শুধু শব্দের কথা।

১৯৭১ জুন

ষাটের কবিতা

পঞ্চাশের দশক সারা ভারতবর্ষে আশার উদ্দীপনায় সঙ্কল্পের প্রস্তুতিপর্ব। ভেতরে যে গলদই থাকুক, হৃদয় খুঁড়ে যে শূন্যতা বোধই থাকুক না কেন. ক্ষমতা হাতে আসবার পরে কৃষিশিল্পে ব্যাবসা-বাণিজ্যে বৈদেশিক নীতিতে আশাবোধ দেখা দিচ্ছে। বাংলা ও পঞ্জাব এই আশাবাদে অংশীদার হতে না পারলেও বিভিন্ন পরিকল্পনায় নিজের দুঃখ ভুলতে চেয়েছে। চাকরিবাকরির সংস্থান হচ্ছে, শিক্ষার প্রসার ঘটছে, ইঞ্জিনিয়ার ও চিকিৎসাবিদ্যায় নূতন উদ্যম দেখা দিয়েছে, শিল্পের উন্নতিতে মনোযোগী হয়েছে ; চীন, রাশিয়া, আমেরিকা ব্রিটেন প্রভৃতি বিরোধী শক্তির সঙ্গে ভারত একসঙ্গে ওঠানামা করছে, এশিয়ার মধ্যে ভারত চীনের চেয়েও বৈদেশিক নীতিতে প্রাধান্য লাভ করছে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সুস্থ জীবনের প্রতি আকর্ষণ দেখা দিচ্ছিল, সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো রাশিয়া ও আমেরিকা দুই বিরোধী শক্তি অনেকটা পরস্পরের কাছে এসেছে। যদিও ভারতের নিরপেক্ষ নীতির সুড়ঙ্গ পথে চীনের সঙ্গে আঁতাতে তিব্বতদানে মৃত্যুর অন্ধকার জমা হচ্ছিল, তবু শাসনতন্ত্রের নূতন উদ্দীপনায় দুই পরিকল্পনা ভারতকে ও বাংলাদেশকে নূতন প্রাণের সঞ্চার করেছিল, হয়তো উদ্বাস্তু সংখ্যা, ভাষা সমস্যা, বাংলাবিহার মিশলের সমস্যা, খাদ্য আন্দোলন এর ব্যতিক্রম।

এখন একটু তলিয়ে দেখলে যাবে ১৯৪৭-এর ব্যর্থ স্বাধীনতার গ্লানি আমাদের জীবনের মেদমজ্জার মধ্যে কতোখানি ঢুকেছে, ব্যর্থতাকে ঢাকবার জন্যে সফলতার ছদ্মবেশ কেমন চাকচিক্য আমাদের ভুলিয়েছে, এবং চাকচিক্য সরে গিয়ে চীনা আক্রমণে আমরা কেমন মুখ থুবড়ে পড়েছি।

কিন্তু ১৯৫৮ সাল থেকেই পটভূমি পাল্টাতে লাগল, এবং এই পটভূমি শুধু ভারতের নয়, সমগ্র পৃথিবীর। লণ্ডনের 'ইন্‌স্টিট্যুট ফর্ স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ্' ঘোষণা করছে ১৮৯৮-এর পর ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৭ সাল সবচেয়ে রক্তাক্ত দশক। দেশের সশস্ত্র সৈন্য জনতা যুদ্ধে এখানে নিয়োজিত হয়েছে, হত্যা ও আঘাতের জন্য যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। ১৮৯৮ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত একশ আটাশটি সংঘর্ষ ঘটেছে সারা পৃথিবীতে, তার মধ্যে ১৯৫৮-১৯৬৭ এর মধ্যে

পঁয়তাল্লিশটি সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষের কেন্দ্রস্থল এশিয়া ও আফ্রিকা। সাত দশকের মধ্যে একশ আটটি সংঘর্ষের মধ্যে এশিয়ায় চল্লিশটি সংঘর্ষ এবং আফ্রিকায় তেত্রিশটি সংঘর্ষ বাধে। সারা পৃথিবীতে ১৯৫৮-৬৭ এক দশকের পঁয়তাল্লিশটি সংঘাতের এক ভারতবর্ষেই ন'টি সংঘাত লেগেছে। নাগা বিদ্রোহ, গোয়া আক্রমণ, চীনা আক্রমণ, কুচ সংঘর্ষ, ১৯৬৫ এর ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষ, অমৃতসর হাঙ্গামা প্রভৃতি। ভারতে ও বাংলা দেশে দুই নেতার মৃত্যু রাজনৈতিক স্থিতিকে বান্‌চাল করে দিয়েছে, নেহেরুর মৃত্যু জাতীয় অখণ্ডতা ও কংগ্রেসের সংহতি ধ্বংস করেছে, লাল বাহাদুরের মৃত্যুও তাই। কেননা, নেহেরুর মৃত্যুর পর প্রধান মন্ত্রীর গদি নিয়ে মাংসের এতো ছেঁড়াছেঁড়ি ভাবা যায় না, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দলাদলি জাতীয় সংহতিকে বিনষ্ট করছে, ১৯৬৭ এর সাধারণ নির্বাচন তার সাক্ষী। বাংলাদেশে বিধান রায়ের মৃত্যুও তদনুরূপ ঘটনা। ভারতের বাইরে ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আলজেরিয়ার সংঘর্ষ, রুশ ও চীনের সংঘর্ষ, রোডেশিয়ায় স্মিথ সরকারের ঘৃণ্য শাসন, পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের আঁতাত, চেকোশ্লোভাকিয়ায় রাশিয়ায় অনুপ্রবেশ কোনো সুস্থ পরিবেশকে ইঙ্গিতবহ করছে না। ভারতে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে কংগ্রেসের আধিপত্য ক্রমশ চলে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বিরোধী শক্তির একাত্মতা ও সুস্থ নীতিবোধও দেখা যাচ্ছে না। পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বকলহসংঘাত লেগেই আছে, ফলে সরকারের ভাঙাগড়া চলছে, শাসন নীতিতে রাজ্যপালের স্বৈরতন্ত্র দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে বিরোধ বাধছে। চীনা আক্রমণের ধাক্কায় নেহেরু মারা গেলেন, এবং এই আক্রমণের ধাক্কায় দেশের কৃষি বাণিজ্য শিল্পও ক্রমান্বয়ে মৃত্যুমুখী, প্রসার ঘটছে না। তদুপরি বাংলাদেশে যুক্তফ্রন্টের আবির্ভাবে নূতন শ্রমনীতিতে শ্রমিকের স্বার্থের প্রতি জোর দেওয়ায় মালিক পক্ষের ষড়যন্ত্রে এবং রাজনৈতিক চক্রান্তে বাংলাদেশের শিল্প বাণিজ্য মৃত্যুর সম্মুখীন। ছোটখাট কত কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। বড় শিল্প ও ব্যাবসার প্রসার ঘটছে না, বেকারি ক্রমবর্ধমান, তদুপরি ভারত সরকারের অর্থের অবমূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য-বৃদ্ধি বিশেষভাবে স্মরণীয়। অর্থনীতিবিদরা বলেন সারা ভারতে ১৯৬৭-৬৮ সালে শিল্পের উৎপাদন শতকরা একভাগেরও কম। এই অন্ধকার রাজত্বে যে মানসিকতার সৃষ্টি হয় তা জীবনানন্দ দাশের প্যাঁচার। এছাড়া সরকারি

কর্মচারীর ইংরাজ স্বভাবানুকরণে নির্বোধ অহংকারের নিষ্ক্রিয় কার্যনীতির দ্বারা ব্যক্তিস্বার্থের পূর্তি তো আছেই। সর্বোপরি সারা পৃথিবীতে বর্ণবিদ্বেষ দারিদ্র্য ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ভীতি মানসিক অন্ধকারকে আরো জমাট করে দিয়েছে। এর পরই একাত্তর সালে পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়া খাঁর বর্বর আক্রমণ ভারতে একদিকে জাতীয় আদর্শ জাগাচ্ছে, অন্যদিকে শরণার্থীর সমস্যা অর্থ নৈতিক অবস্থাকে বিপর্যস্ত করছে। বিশ্বের বিরাট শক্তি সেখানে মানবতার অপমানে বধির।

এই পরিবেশে ষাটের কবিদের জন্ম ও আবির্ভাব। চীন আক্রমণ করেছে কিনা এই নিয়ে যে-দেশে একটি পার্টির মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়, দু তিন বছরের মধ্যে দু তিনটি দল গঠিত হয়, সেখানে বিপ্লবের সম্ভাবনা কোথায়?

ষাটের কবিরা তিরিশের কবিদের জ্ঞানমনস্কতা, আন্তর্জাতিক বোধের প্রসার, চল্লিশের কবিদের বুদ্ধিবাদ ও জ্ঞানচর্চ্চা এবং পঞ্চাশের কোনো কোনো কবির পড়াশোনার প্রতি দুর্ময় আগ্রহ দেখে প্রতিক্রিয়ায় বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে অশিক্ষিত হতে চেয়েছেন। ফলে দেশবিদেশের কবিদের সঙ্গে তাঁদের যোগ তেমন সংস্থাপিত হয় নি, পৃথিবীর কাব্যের ধারা তাঁদের অজ্ঞাত, আছে শুধু হৃদয় মাটি সংস্কৃতি। তবুও পটভূমির জন্য সারা পৃথিবীর এবং পঞ্চাশষাটের কবিদের কবিকৃতি জানা আবশ্যক। কিন্তু এঁরা গ্রহণ করেছেন চল্লিশের দশকের কবিদের আদর্শ, এই আদর্শ গ্রহণের ফলে বাস্তবতার সঙ্গে একটা বিরোধ দেখা দিয়েছে, হয়তো অন্তরে যা অনুভব করেন, কবিতায় অন্য কিছু প্রকাশ করেন। যদিও ষাটের সমাজ-তান্ত্রিকতার সঙ্গে পঞ্চাশের অনুসরণ আছে, কামুকতার প্রভাব আছে, তবু মূল সুরটা কবিতায় সমাজচৈতন্যে এবং ফর্মের দিক থেকে একমুখীন সরল সহজতায়। যদি তিনটি স্তর কল্পনা করি, তাহলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বুর্জোয়া মনোভাব, সাম্যবাদী চিন্তায় উদ্বোধিত আশার বাণী, এবং দুয়ের মাঝখানে দোদুল্যমান কবিচিত্ত। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না। কবির সার্থক পরিচয় কবির ব্যক্তিত্বের সামগ্রিকবোধের প্রকাশে। আশা করবো, জীবনের ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতায় সৎ আন্তরিকতার পথে স্থিতধীর জ্ঞানে হয়তো কোনো কবির মধ্যে সামগ্রিকতার বোধ আসবে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

পবিত্রের সমস্ত কবিতার মধ্যে একটা ধ্বংস, অন্ধকার, ক্লেদ, বিষাদ, নিঃসঙ্গতা, মৃত্যুর আগুন, অবিশ্বাস, শীতলতা ও যন্ত্রণাবিদ্ধ উপলব্ধির তীব্র বিষময় সুরা অনুভব করা যায়। এই যন্ত্রণাময় উপলব্ধির মাঝে মাঝে চকিতে স্মৃতিরোমন্থিত স্বপ্নের সবুজ বনানী, প্রেমের বিষণ্ণমলিন হেমন্তসন্ধ্যা, ভবিষ্যতের ঐশ্বর্যময় মহানশিল্পের পুষ্পসম্ভার দেখা দেয়, ফলে যন্ত্রণাকে আরো তীব্র করে তুলছে, তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বকে অনবরত ভাঙছে গড়ছে, কোথাও স্থির হতে দেয় নি, স্থির হতে দেয়নি বলেই নামহীন শ্রমণের মতো তীব্র আর্তনাদ করে উঠেছেন। নিজেকে মনে হয়েছে পাতক, এবং নরকের জঘন্য কীট, সিসিফাসের মতো ব্যর্থ কর্মে নিযুক্ত এবং পরদেশে ও প্রেতলোকে একান্ত নির্বাসিত। তাই সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন : 'ধ্বংসই নিয়ত সহচর, / প্রেম বা প্রত্যয় নয়, ঘৃণা / দাহ করে একান্ত নির্ভর, / বেলা শেষে নিজেকে চিনি না।' এই কারণেই তাঁর যুগের সমবয়সী কবিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন : 'আমার বন্ধুরা আজো ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নের শিকার / বালিতে শরীর ঢেকে বিস্মরণ খোঁজে অনায়াসে / সর্বাঙ্গে তৃপ্তির রেখা, মুখ শোভা সরল সুন্দর / পুরনো বিশ্বাস নীতি নিয়ে তুষ্ট ক্ষয়িষ্ণু সংসার।' সুতরাং এই বিষাদক্লিষ্ট, ধ্বংসমুখীন, প্রেতলোকে নির্বাসিত যন্ত্রণায় জর্জড়িত কবি ভালোমন্দ শুভঅশুভের প্রশ্নে কণ্টকিত, নরকে বাস করেও কাতর প্রার্থনা করেছেন : 'ধ্বংস কোথায়? কতোকাল আছি প্রতীক্ষিত নাস্তির ক্রীতদাস।' অর্থাৎ নরকের ধ্বংসের মধ্যে তাঁর নিজের নাস্তির ক্রীতদাসত্ব মোচন করতে চান। কিন্তু এটা শুধু চাওয়াই, পরমুহূর্তেই 'জননী পঙ্কের স্বর্গে' মাথা রেখে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছেন, এবং শবদেহ হয়ে গেছেন, শববাহক হয়েছে চতুর্দিক। তাঁর 'শবযাত্রা' (১৯৬১) দীর্ঘকবিতায় এই অনুভূতিকেই দীর্ঘপয়ারে ষাণ্মাত্রিক সপ্তমাত্রিক ও ভাঙাপয়ার ছন্দে, উপলব্ধিময় যন্ত্রণাজর্জর চিত্রশোভন অলংকৃত ভাষায় তীব্র উচ্ছ্বাসের আধিক্যে পাঁচটি স্বর্গে প্রকাশ করেছেন। কোনো কাহিনী বা গল্প নেই, অসংলগ্ন বা সূক্ষ্ম একটা পরিণাম আছে। আদমের মতো স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে তাঁর পতন ঘটেছে, মর্ত্য থেকে নির্বান্ধব প্রেতপুরীতে অন্ধকারের মধ্যে বাস করতে করতে কাতর প্রার্থনায় আর্তনাদ করে উঠেছেন, পবিত্র অনলের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে চেয়েছেন, তার পরেই মৃত্যু, এই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সহমরণ ঘটেছে

সৌধচূড়ার, মহার্ঘমন্দিরের যুগাতীত বিশ্বাসের, সুন্দর গম্ভীর দেবালয়ের, মুখরিত জনপদের ; 'সাজানো বাগান, নীলগিরিশ্রেণী শ্যামবনরেখা বিশালপ্রান্তর' বনতল সব তলিয়ে গেছে। সমস্ত ধ্বংসের পরে সর্বভুক অগ্নির কাছে প্রার্থনা : 'হে দেব প্রিয়তম সর্বভুক, শোনো আহুতি নাও প্রিয় ক্লান্তিভার।' এই সর্বাত্মক ধ্বংসে ঈশ্বরও যক্ষ্মারুগীর মতো ধুঁকছে, অক্ষম ঈশ্বর কবির যন্ত্রণায় কোনো প্রতিকার করতে পারে না। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মতো ঈশ্বরের প্রতি তাঁর করুণাই জেগেছে। এই 'শবযাত্রা' গ্রন্থে হয়তো বাংলা অনুবাদের সাহায্যেই এলিঅট দান্তে বোদ্‌লেয়ারের অনেক চিত্র এসেছে, বিশেষ করে বোদ্‌লেয়ারের নরক পতন ও পাপবোধ, দান্তের নরকের চুল্লি, এলিঅটের 'জলহীন এই প্রান্তর এই শুষ্ক নদী / বন্ধ্যা মাটির অন্তর জুড়ে বিষণ্ণতা' প্রভৃতি এসেছে। কিন্তু এ সব এলেও তাঁর ব্যক্তিগত তীব্র উচ্ছ্বাস ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে এই ঋণ বিশেষ কিছু নয়। কারণ এই ধ্বংসাত্মক ও নিরাশ্রয় বেদনা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা ঐ সব কবিদের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে পান নি, ঐ বেদনা তাঁর নিজস্ব বেদনাকে পুষ্টি করেছে মাত্র, 'প্রেম পুনর্বার' কবিতাগুচ্ছের তেরো সংখ্যক কবিতায় বলেছেন : 'অনাদর আর অবহেলা সয়ে সঙ্কুচিত / অপরাধী আমি, মাটিতে মিশাই অন্ধকারে /' ব্যক্তিগত জীবনের এই অনাদর ও অবহেলা তাঁর জীবনকে সঙ্কুচিত করেছে, অপরাধবোধের জন্ম দিয়েছে, তাতেই অন্ধকারে মিশে যাবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়েছে। মূলত এই সুর গোটা দশ বছরে একইভাবে আছে, বরং পরবর্তীকালে আরো তীব্র হয়েছে, 'শবযাত্রা'য় যে সুন্দর ও নতুনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে তাঁর দেহমনকে প্রশ্ন কণ্টকিত করেছিল, পরবর্তী জীবনে তা হারিয়ে গেছে, তার বদলে বাসা নিয়েছে শৈশব ও যৌবনের আনন্দময় স্মৃতিবেদনা। এ কাব্যে যে কথা বলেছেন, পরবর্তী কাব্যেও সে একই কথা : 'কে বাঁচায়? সকলেই পরবাসে, নিদ্রিত নায়ক।'

প্রেমের মধ্যেই এই যন্ত্রণাজর্জরিত পাতক মুক্তি চেয়েছে, এখানেই তার উদ্ধার, নতুবা নরকই তার বাঞ্ছিত। 'শবযাত্রা'য় যদি তাঁর ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য প্রকাশিত হয়ে থাকে, তবে প্রেমে তাঁর সদর্থক ও আকাঙ্ক্ষার জগৎ প্রকাশ পেয়েছে। এবং এই দুই জগতের মধ্যে টানাপোড়েনে তাঁর হৃদয় পেণ্ডুলামের মত দোলায়িত। প্রেমিকাকে কেন্দ্র করে তাঁর হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে; কখনো মৃত্যুর কল্পনায় ভেঙে পড়েছেন, কখনো প্রেমিকার রূপের

সঙ্গে প্রকৃতির বিচিত্র বস্তু মিলিত হয়েছে, কখনো বর্ষণমুখরিত শ্রাবণ রাত্রে প্রেমিকাকে মৃত্যু-অরণ্যের মতো দেখে ভীত হয়েছেন, কখনো বিস্মৃতি চেয়েছেন বিচ্ছেদের বেদনায়, আবার কখনো অতীতের প্রেম ভুলে ক্ষণকালের মধ্যেই মজতে চেয়েছেন, তাকে না পেয়ে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়েছে, আবার তাকে পেলেই নিখিলবিশ্ব আনন্দময়, নারীর প্রেমের কাছে 'বন্ধু বা ঐশ্বর্য যশ মুখরতা কিছুই পারে না সে অসীম শূন্যতাকে ভরে দিতে।' এসব কথা স্বীকার করেও কবির মনে হয়েছে প্রেম মৃত্যুকে বাঁধতে পারে না, সেখানে বিফলতা বেঁচে থাকে, এই কারণেই নির্বাসিত যক্ষের মতো কবি 'সুচির প্রবাসী'। এই প্রেম কবিতাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' 'ছবি ও গানে'র উচ্ছ্বাসের তীব্রতার সঙ্গে বুদ্ধদেবের প্যাশন জড়িয়ে আছে। এবং মাঝে মাঝে মনে হয় তাঁর দুঃখ যন্ত্রণা হয়তো যৌবনের প্রেমজাত বিচ্ছেদ থেকেই সৃষ্ট।

কিন্তু পরবর্তীকালে 'প্রকীর্ণ কবিতাবলী' (১৯৬৩-৬৫) 'বিষাদাশ্রিত কবিতা' (১৯৬৫-৬৬) 'আগুনের বাসিন্দা' (১৯৬৭) এই মনোভাবকে বর্জন করতে বাধ্য করে। তাঁর কবিতায় ধর্ষণের তৃষ্ণার গর্জন আছে, অথচ বীর্যহীন খোজার মতো বন্ধ্যা, 'আহত দন্তহীন সাপ ফুঁসতে পারি দংশনের নেই ক্ষমতা'। এ সমস্ত চিত্রের মধ্যে যুগের বন্ধ্যাত্বই প্রকাশ পাচ্ছে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা নয়। তাই এ শতাব্দীর মানুষকে পবিত্র মনে করেছেন সন্তানের শব, তাদের কেউ সনাক্ত করতে পারে না। একথা কবি নিজেই সোচ্চারে বলেছেন: 'মানবিকতার এই ধ্বংসস্তূপে ছিন্নমস্তা ঈশ্বরী আমার।' 'তোমার মুখশ্রী ততো স্পষ্ট নয়, যতো স্পষ্ট আমার নিয়তি / আমাদের মানবতা অস্তগামী ততোধিক প্রয়াণে উন্মুখ।' অথবা 'কবে নির্জনে আত্মার মুখোমুখি / হবো বিংশ শতকের জরতপ্ত জারজ যুবক / দুঃস্বপ্নমন্থিত জন্ম, শুদ্ধ কোনো সংকল্পের স্বপ্নও দেখে না।' এই কারণেই প্রচলিত চিত্রকল্পের মধ্যে তাঁর নিজস্ব কল্পনার প্যাটার্ন খেলা করে, কর্ণ অভিমন্যুকে নিজের মতো সাজিয়েছেন, যে সাপ লরেন্সের কাছে মোহনীয় নারী, সৌন্দর্যের ও উর্বরা শক্তির প্রতীক, সেই সাপই কবির কাছে ধরা পড়েছে মৃত্যুর রূপে, যে মৃত্যুর আলিঙ্গনে বিষাক্ত পঙ্কিল জীবনের অবসান ঘটে। এ সেই সর্বভুক অগ্নির মতো, তাই সাপ কবিতা অতি প্রিয়। কবি নিজেকে 'মৃত্যুলোভাতুর'

বলে অভিহিত করেছেন, কারণ মৃত্যুই পারে সুন্দরী রমণীকে কালের ও প্রেমিকের হাত থেকে জরামুক্ত করতে, কারণ প্রেমিক রমণীর দেহে তীক্ষ্ণ নখে উল্কি পরায়, দীপ্ত ললাটে কুচক্রীকালের ছবি ফুটে ওঠে। এই ব্যর্থ নৈরাশ্যের অন্ধকারে জগৎও তাঁর আচ্ছন্ন, যেখানে মৃত্যুর ছায়া, 'ছেঁড়া মেঘের চাদরে ঢাকা মৃত প্রায় অগণন নক্ষত্র চাঁদ যেন ব্যাধিগ্রস্ত ঈশ্বরের মুখ', ঈশ্বরও এখানে যক্ষ্মা রুগীর মতো ধুঁকছে। কবির এ বিশ্বব্যাপী নৈরাশ্য। এই নৈরাশ্য ও নৈরাজ্য যেমন আদিম মানুষের মতো হিংস্র করে তোলে, তেমনি শুদ্ধতম আত্মার গান শুনে তাঁর হাতের উদ্যত খড়্গ খসে পড়ে, এই দুই বিপরীত শক্তি পবিত্রের কবিতায় প্রোজ্জ্বল।

এই কবিতাগুলি থেকেই পবিত্র পয়ার ও মাত্রা প্রধান ছন্দের নিয়মিত প্যাটার্ন ভাঙতে চেয়েছেন, মিল ব্যবহার উঠিয়ে দিতে চাইছেন, ভাঙা পয়ার ও গদ্য ছন্দ মেলাতে চেষ্টা করছেন। উচ্চারণ অনুযায়ী চরণে পদবিন্যাস করতে সচেষ্ট, ফাঁক দিতে চেয়েছেন। এই রীতির পেছনে রত্নেশ্বরের অবদান কতখানি জানি না; তবে এঁরা দুজনেই এই রীতি প্রয়োগ করছেন, রত্নেশ্বর ইম্প্রেশনিস্টদের মতো ভাঙা ছবি তৈরি করছেন শিল্পের জন্যে, পবিত্র তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করতে চাইছেন আবেগের তীব্রতায়। এবং এই রীতিই প্রকাশিত হতে দেখি 'ইব্লিসের আত্মদর্শন' নামক দীর্ঘ কবিতায় ও 'অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সংক্রান্ত' কাব্যগ্রন্থে। এখানে তিনি পুরোপুরি 'ইতি ও নেতির টানে গড়াতে গড়াতে সূর্য পশ্চিম শ্মশানে।' ইব্লিস একটা নাম শুধু, যে ইব্লিস ফেরেস্তাবাসী, আগুনে নির্মিত, কিন্তু আদমের প্রতি ঈর্ষায় ঈশ্বরবিদ্রোহী, ঈশ্বর বিদ্রোহিতার জন্যে ঈশ্বর কর্তৃক স্বর্গচ্যুত হবার পর থেকেই আদম এবং আদমের সন্তানের নাশে সে বদ্ধ পরিকর। এবং ইব্লিস সাপের দাঁতের ফাঁকে হাওয়া হয়ে নিষিদ্ধ ফলের মধ্যে ঢুকে আদম ও ইভকে স্বর্গভ্রষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল। এই কাব্যেও নিজে স্বর্গভ্রষ্ট, যারা আছে, তাদেরকেও স্বর্গভ্রষ্ট করতে চেয়েছেন কবি। এই ধ্বংসমূলক অনুভূতির একাত্মতা ঘটেছে এখানে। ব্যর্থতা, হতাশা থেকেই ঈর্ষা ও হিংসা, সেখান থেকেই খিস্তি ষড়যন্ত্র নারীভোগ অত্যাচার, পাপ ও পাপবোধ তীব্রতর হয়। স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে তাঁর মনের মধ্যে যে যন্ত্রণার চিতা জ্বলছে তাকে নেবাতে চাইছেন না, নেবালে জীবন হবে মৃত্যুর সামিল, তাই ভালোমন্দের, আঁধারআলোকের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ব্যক্তিত্ব

আনন্দের অন্বেষণ করেছে, অন্বেষণ করতে গিয়ে 'বুকের সুড়ঙ্গ থেকে প্রেতের নিঃশ্বাস উঠে আসে।' সান্ত্বনার পরিবর্তে 'হৃদপিণ্ডের তলে খাদ হাহা-শব্দে প্রতিধ্বনি তোলে।' নারী-ভোগ, শাস্ত্র, ঈশ্বর, মরফিয়া এগুলির মধ্যে মুক্তি নেই, যন্ত্রণাময় অগ্রসরণই কবির মুক্তি, 'অবিশ্বাস আর পরিণত প্রজ্ঞাই আমার শেষ যাত্রায় অস্তিমবাহক।' স্পেংগ্লার-এর মতন বৃত্তচারী সভ্যতার অনিবার্য পতনে কবিচিত্ত ব্যথাতুর, তাই কোনো অবলম্বন তাঁর নেই; 'শবযাত্রা'য় অগ্নির কাছে যে প্রার্থনা করেছিলেন, সেই অগ্নির প্রার্থনাও অনুপস্থিত এখানে।

কাব্যের রূপগঠনের দিক থেকে, পবিত্রের এই জাতীয় দীর্ঘ কাব্যের ব্যর্থতা মারাত্মক। কাহিনীহীন বৃত্তের কথা স্বীকার করলেও একই কথা বারংবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে, দীর্ঘ কবিতা এবং কাহিনীকাব্যের বস্তুঘটনা চরিত্রের যে বস্তুধর্মিতা, নিরপেক্ষতা ও সংযম থাকা দরকার এখানে তার কোনো চিহ্ন নেই, উচ্ছ্বাসউচ্ছ্রিত বেদনার চিত্রময় প্রকাশমাত্র। মাঝে মাঝে দীর্ঘকাব্যে কৌতুকদৃশ্য ও নাটকীয়তা থাকে বটে, কিন্তু মূলচরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলে না। প্রসঙ্গনির্দেশ কাহিনীকে প্রসারিত হতে দিলেও ইব্লিসের অনুষঙ্গে ভারতীয় দর্শনের গূঢ়ার্থ প্রকাশ ঔচিত্যবোধকে নষ্ট করে। ইব্লিসকাব্যে পবিত্রের মনের ক্লেদ খিস্তির আকারে পরিস্রুত হয়েছে : 'ঈশ্বরের মুখ ভাবলে চিন্তায় বা অনুভবে অক্ষতযোনির ছবি ভাসে' অথবা 'গুহ্যদ্বার থেকে ছিটকে পড়েছি অকালে শরীরে মলমূত্র লেগে।' হয়তো 'বিবর' তাঁকে উৎসাহ দিয়েছে। পবিত্রের এই জাতীয় অনুভূতির মধ্যে আন্তরিকতা নেই, একথা বলছি না, কিন্তু নানা কবির টুকরো ছবি তাঁর কাব্যকে স্বকীয়তায় দূরপ্রান্তে নিয়ে যায়। বোদ্লেয়ার র‍্যাবো রিল্কে জীবনানন্দ তাঁর কাব্যে যদি প্রভাবপাত করে, তাহলে পবিত্রের কবিত্ব শক্তি কোথায়? আর এঁদের জীবনের দর্শন তো শুধু ধ্বংস বা নরকে নেই, সদর্থক অনুভূতির মধ্যে কাজ করছে. নিজেদের হৃদয়কে বিশ্লেষণ করেছেন। আমার মাঝে মাঝে ভয় হয়, অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের আবেগই তাঁকে স্থিতধী হতে দিচ্ছে না, তাই তাঁর কবিত্বশক্তি থাকা সত্ত্বেও শিল্পরূপে প্যাটার্ন তৈরি হতে পারছে না, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নিরন্তর কাব্যচর্চা করতে গিয়ে পবিত্র বাংলা কাব্য ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কয়েকটি

ব্যাপারে অগ্রণী। ষাটের দশকে দীর্ঘ কবিতার চর্চা 'শবযাত্রা'র মধ্যেই প্রথম সূত্রপাত, পরে মণীন্দ্র রায় কৃষ্ণ ধর এবং আরো অনেকে করেছেন। সমরেশ বসুর 'বিবর' 'পাতকে'র মধ্যে যে নাস্তিক্যবাদ ও যুগের ধ্বংসলীলা প্রকাশ পেয়েছে, 'শবযাত্রা' কাব্যে তার শুরু। তৃতীয়ত, ধ্বংসকালীন কবিতার মুখপাত্র হচ্ছেন পবিত্র, তাঁরি ছত্রতলে প্রভাত চৌধুরী শম্ভু রক্ষিত প্রভৃতি কবি এসেছেন, হাংরি জেনারেশনের সঙ্গে তাঁর একটা যোগসূত্রও রয়েছে। কিন্তু এসব কৃতিত্ব ঢাকা পড়ে যায়, যখন পবিত্রের কাব্যে শিল্পরূপের কথা ভাবি। আশা করবো, সত্তর দশকে নূতন ভাবনা ও রূপের সাধনায় এগোবেন তিনি।

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

মণিভূষণের কবিতা যেখানে সার্থক, সেখানে তাঁর শব্দ বৃহৎ বলয়ে ঝঙ্কৃত, অনুষঙ্গময়, পরিমিত, অন্ত্যমিলের দোলায় কম্পমান, চিত্র ও বর্ণনায় অ-লৌকিক শিহরন জাগে। চিত্রিত শব্দের ঝঙ্কারে ঝড় তোলে, গন্ধবহ সুরের তরল আগুনের শিখা নেই। তাঁর বক্তব্যে হয়তো কোনো নতুনত্ব নেই, কিন্তু চিত্রময় শব্দের ঝঙ্কারে একপ্রকার আবেশ জাগে, 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর' কাব্যগ্রন্থে অন্ধকার, নির্বাসন, নির্জনতা, মৃতশরীর, শীতলতা এগুলির মধ্যেই তাঁর চিত্ত আচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু ছন্দমিল স্পন্দনে সেখানে তিনি দীক্ষিত করেছেন নিজেকে, সব ছন্দেই কুশলতা দেখিয়েছেন, পরবর্তীকালে ছন্দের ও মিলের মোহ না থাকলেও গোপন মিল, অন্ত্যানুপ্রাস, ঝঙ্কার তাঁকে বারংবার মোহাবিষ্ট করেছে। ধ্বনিময় চিত্রগুলিই মণিভূষণের কবিতার পরম সম্পদ, এবং বিশেষ করে প্রকৃতির বৃহৎ ব্যাপ্ত চিত্র-উদ্ভাসনে তাঁর ভাষা সত্যি অপূর্ব। অনেক শব্দগুচ্ছেই তাঁর পূর্ববর্তী বহু কবির অনেক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত, তবু তাঁদের সুরের সঙ্গে নিজের অনুভূতিকে মেলাতে চেষ্টা করেছেন। যদিও রচনার পারম্পর্যে কিছু ত্রুটি আছে। একটি কাহিনীবৃত্ত রচনা করতে চান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারম্পর্য থাকে না, একটা অসংলগ্নতা আসে। নূতন বোধ ও উপলব্ধি নয়, প্রচলিত উপলব্ধিকে নিজের উপলব্ধি করে তুলেছেন, তাই তাঁর শেষের কাব্যের মধ্যে তাঁর ভাষা স্বকীয়তা পেয়েছে। সাধারণ জীবনের কথার থেকে নিজের

ব্যক্তি-অনুভূতির ও প্রেমের বেদনাপ্রকাশের ভাষা ভালোভাবে ব্যক্ত হয়। অন্ধকার থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন, আলোকে আসতে চেয়েছেন, এবং যুগের ব্যর্থতা, গ্লানি, হতাশা, অবক্ষয়, বিবিক্তচারিতা থেকে দূরে আসতে চেয়েছেন, কিন্তু পারেন নি। এই সমাজসচেতনতা তাঁর কাব্যের মূল স্বরূপ কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে, কারণ পরবর্তী কবিতায় প্রকৃতি প্রেম স্বপ্ন রোমান্টিকতা ও মনের বিচিত্র দ্বন্দ্ব, রাজহাঁসকে কেন্দ্র করে মনের সৌন্দর্য আকাঙ্ক্ষা; এসব বিচিত্র অনুভূতি নানা ছন্দে প্রকাশ পেয়েছে। এবং 'উৎকণ্ঠ শর্বরী'র মধ্যেও দুজাতের কবিতা রয়েছে; ব্যক্তিগত বিষয় ও সমষ্টিগত বিষয়, বিকাশ ও অন্ধকার, দ্রুত ভাষণের সঙ্গে সংহতচিত্রের দীপ্ত উন্মাদনা। যদিও ঝোঁকটা নিশীথ জ্যোৎস্নায় বিকাশের দিকে, দিগন্ত বিশাল ধ্বনির সঙ্গে যোগ দিতে না পারায় উৎকণ্ঠ শর্বরীর জ্বালা রয়েছে। কবিতার স্বকীয়তা উচ্ছলতায় নয় অথচ যুগের সহজ দাবিতে মণিভূষণ তাতে সমর্পণ করতে চাইছেন। কিন্তু এখানে তাঁর কবিসত্তা একটা নিজস্ব রূপ নিয়েছে। তাঁর রাজহাঁস কবিতাগুচ্ছ চতুর্দশপদীর নিটোল ছন্দোরূপের জন্যেই বিশিষ্ট। মালার্মের রাজহাঁস যেমন বন্ধ্যা বিশুদ্ধতা ও জীবনের উষ্ণ তাপের বিরোধে দ্বন্দ্বময়, মণিভূষণের রাজহাঁস বিশ্বজনীন সৌন্দর্যের প্রতিভাসে নারী ও প্রকৃতিকে নিয়ে সমুজ্জ্বল।

রত্নেশ্বর হাজরা

ষাটের কবিদের মধ্যে রত্নেশ্বরের নাম উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এ যুগের কবিদের ক্ষয়িষ্ণু জীবনবোধের মধ্যে ও তাকে ছাপিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোকিত চেতনার প্রত্যয়কে অতিসহজে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে পারেন তিনি। তাঁর হৃদয়ে, 'বিষাদ, সুখী যন্ত্রণা বাসা স্বপ্ন অবদমিত তৃষ্ণা রক্তের সব কণাগুলো নিয়ে খেলা করে রোজ চড়ুই।' ক্ষুধার্ত বাতাস আর হাঙরমুখো পাতাল খেলা করলেও চেতনার হাস্যধ্বনির কাছে সব তুচ্ছ। দুঃখবেদনা মৃত্যুকে ভালোবেসেছেন বলেই, প্রতিদিন জন্মদিন বলে মনে হয়েছে, প্রত্যেক মুহূর্তই জন্মক্ষণ বলে মনে হয়েছে, তাই সহজ প্রত্যয়কে, যেন জন্ম থেকে লব্ধ বিশ্বাসে বলতে পেরেছেন, 'যতই গভীর হোক-স্বপ্নে ধ্যেয় হিরণ্ময় বিশ্বাসের

মন্ত্রে ভোর নীড়ে ও শিমুলে'; বলেছেন; 'মরেও নিস্তার নেই মৃত্যু, তুমি নতুন জন্মের নামে কানে কানে পৃথিবীর কণ্ঠে দাও কোষ তাই কাঁপে চেতনায়।' চেতনাই চাবুক হয়ে তাকে শাসন করে। এই বিশ্বাস ও বোধের মধ্যে নূতনত্ব না থাক, কিন্তু পুরনো প্রদীপকে অনুভবে উস্কে নিলে অনেক নূতন দিক বিভাসিত হয়ে ওঠে। রত্নেশ্বরের মধ্যে সেটি আছে। দ্রুত শিথিল চলন্ত চিত্রকল্প, বিরোধী ভাবের সমন্বয়ে নূতন বোধের জন্ম, সহজ প্রত্যয় ও বিস্ময়বোধ, প্রেমের উষ্ণতা, রবীন্দ্রনাথের বোধ ও বিষ্ণু দে'র মধ্য দিয়ে এলিঅটীয় কিছু চেতনাপ্রবাহ ('দুপুর' দ্রঃ), কথ্যসংগীতরীতি রত্নেশ্বরের কবিতায় এ পর্যন্ত ধরা পড়েছে। তবে এ যুগের অভিশাপের মতো ক্ষণিক বোধের উদ্‌ভাসে চলন্ত চিত্রের চমক, শিথিলবদ্ধ কাব্যরূপ ও দ্রুত চিত্ররীতি রয়েছে, এতে ধ্যানস্থ হয়ে যদি বিশিষ্ট মনোভাবে স্ফটিক মূর্তি প্রকাশ পায়, তবেই তাঁর বোধস্পর্শজনিত কাব্যচিত্র সার্থক হবে। রত্নেশ্বরের কবিতার সুর ভীরু নয়, যে-প্রত্যয়ের জন্যে অনেক কবিকে সারা জীবন সংগ্রাম করতে হয়, সেই প্রত্যয়ও করায়ত্ত, বয়সজনোচিত স্থৈর্যের শুধু প্রতীক্ষা।

'লোকায়ত অলৌকিক'এর পর 'জলবায়ু' কাব্যগ্রন্থে বৈচিত্র্যের প্রত্যাশা করা ভুল, এতো স্বল্প সময়ে একই প্রত্যয়জাত বৈচিত্র্য কখনই আসতে পারে না। কিন্তু 'গতকাল আজ এবং আমি'র মধ্যেও ভাবনা বা রূপ প্রকাশের অভিনবত্ব নেই। পাশ্চাত্যে আধুনিককালে মালার্মের (লে কু দ্য দে), ও বাংলাদেশে ত্রিপদী চৌপদীর ঐতিহ্যে, রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায়, সত্যেন্দ্রনাথের উৎসাহে এবং সিদ্ধেশ্বর সেনের কাব্যনিষ্ঠায় এই পঙক্তিভাঙা রীতি অনুধাবনীয়। এই ঐতিহ্যকেই রত্নেশ্বর গ্রহণ করেছেন।

কালীকৃষ্ণ গুহ

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেছিলেন কবিরা যৌবনে আনন্দের ভেতর দিয়ে জীবন শুরু করে, কিন্তু তারপর নৈরাশ্য ও উন্মাদনা আসে। নৈরাশ্য ও উন্মাদনা হয়তো ফ্রস্টের প্রাজ্ঞজ্ঞানের জন্ম দেয়। কিন্তু বাংলা দেশের অধিকাংশ তরুণ কবিদের প্রারম্ভিক জীবন নৈরাশ্য ও উন্মাদনায়, এবং তারপরই তাঁরা আনন্দের আলোকে যাত্রা করেন। কালীকৃষ্ণের কবিতায় তার নজির রয়েছে। কালীকৃষ্ণ

বহির্জগতের সমস্ত বেদনা জ্বালা রক্তক্ষরণ এবং অন্তরজগতের বেদনা বুকের ভেতর নিয়ে নিবিড় যন্ত্রণায় বাস করছেন। এখানে বহির্জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, নিবিড় হৃদয়ের অন্ধকারে প্রতীকের মতো তারার আলো নিয়ে জ্বলছে। পালক অন্ধকার নাবিক পাখি মাঝি পাতা শব ছায়া তাঁর হৃদয়ের স্বপ্নের জগতে প্রতীকের মতো কাজ করছে। শব্দের ঝঙ্কারে ও চিত্রে কবিতা-গুলি এতো স্পর্শকাতর, ফুলের রেণুর মতো মসৃণ, মনে হয় ধরলেই যেন নষ্ট হয়ে যাবে। যদিচ নগরের চিত্রকল্প নেই, ছন্দের নিয়ম নেই, তবু কবিহৃদয়ের আন্তরিকতায় একটা জৈবঐক্য সৃষ্টি হচ্ছে ; কাব্যিক চিত্রকল্পে ব্যক্তিগত মিথ্ তৈরি হচ্ছে। এই অন্ধকারময় বিবিক্ত হৃদয় থেকে জেগে উঠবার তীব্র কামনা প্রকাশ করেছেন শেষের দিকে, 'এখন তোমাকে নিয়ে অনুষ্ঠানের আলোর মধ্যে দাঁড়াব' ; কিন্তু সেই প্রত্যয়ের দৃঢ় ভূমি তৈরি হয় নি। চিত্রকল্পের মধ্যে জীবনানন্দের প্রভাব কিছু আছে। যদিও কালীকৃষ্ণের কবিতায় হৃদয়ই নায়ক, তথাপি এই হৃদয়ের বেদনা সর্বজনীন, ব্যক্তিগত নয়, প্রেম বা অন্তরবাসিনীর বেদনায় প্যাশন নয়, একটা বাৎসল্যভাব কাজ করছে, যার সঙ্গে বিষাদ জড়িয়ে রয়েছে। এবং শেষের দিকের কবিতাগুলি আগের মতো অনুভূতিতে নিবিড় নয়।

কালীকৃষ্ণের এ কবিতাগুলি নিটোল ও নিবিড়ভাবে আমাদের জড়িয়ে ধরে না, ভাষা শব্দভাব চিত্রকল্পের ঘনসংহতি, শব্দের নিপুণ কৌশল, সঙ্কেতের রহস্যব্যঞ্জনা, সংগীতের অনুরণন সামগ্রিক ভাবনার ব্যাপকতায় নয় ; রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ-দেখা তারার আলোর মতো কয়েকটি শব্দ, বা একটি দুটি পঙক্তি আমাদের চিত্তকে বিস্ফারিত করে দেয়, সংকীর্ণ সীমা-থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায়, এই শব্দগুচ্ছ বা পঙক্তিগুলির মধ্যেই তাঁর কাব্যভাবনা রহস্যের পরম সংগীত দিগন্তের আলোয় মিলে যায়। এগুলি শুধু একটা ইম্প্রেশন তৈরি করে।

কালীকৃষ্ণের সাম্প্রতিক ও ইদানীং কবিতায় বিশেষ কোনো দ্বন্দ্ব বা টেন্‌সন নেই, অন্ধকারের বেদনার রহস্যভেদী অতি চিৎকার নেই, বরং ব্যাপ্ত ও মহান জীবনের পরম বিশ্বাসে তাঁর কবিচিত্ত সকালের শিশিরের মতো টলছে। আকাঙ্ক্ষা ও বিস্ময় এখানে মিশে আছে, এ বিস্ময় আনন্দের ও মিলনের। এই ব্যাপ্ত ও প্রসারিত অনুভূতির জন্যেই তাঁর কবিতায়

'প্রার্থনা', 'ব্রাহ্মমুহূর্ত', 'হাওয়া' 'পথিক' 'ভোর' প্রভৃতি শব্দ সঙ্কেতের দ্যোতনা নিয়ে আসে, এবং চমকে দেয়! যদিও একই রকম চিত্রকল্পেরও শব্দের পুনরাবৃত্তি আমাদের বেশি দূরে টেনে নিয়ে যায় না; যেমন মায়ের আকাশ শব্দটি।

কালীকৃষ্ণের বিশ্বাস তাঁর কবিতায় ছেদ, যতি ও স্থান নির্দেশের সাহায্যে কবিতায় আবেগ ও অনাবেগকে একসঙ্গে মেশান, এতেই দুয়ের স্বর জুড়ি ইমেজ লাগে। তিনি জানিয়েছেন; 'আমি কবিতায় বক্তব্যে যতোটা বিশ্বাসী, ততোটাই বিশ্বাসী—আবেগ অনাবেগের স্তরে স্তরে সেই বক্তব্যকে স্থাপন করায়।' তাই তাঁর কবিতায় ক্ষুদ্র পঙক্তির পরেই বৃহৎ পঙক্তি বসে, ছেদের ড্যাশের ব্যবহার বেশি থাকে, ছেদ চিহ্নের মধ্যেই তাঁর কণ্ঠের উত্থানপতন হয়। বলাবাহুল্য এই চেষ্টা মধুসূদনের লেখা থেকেই শুরু হয়েছে, তাই মধুসূদন আট-ছয় যতির মধ্যেও তিন-দুই-পাঁচের পর ছেদ বসিয়েছেন, যেমন; 'অকালে, কহ, হে দেবি অমৃত ভাষিণি', এখানে ছেদের বিচারে তিন-দুই-নয় হয়েছে। এরকমভাবে পঙক্তিবিন্যাস করবার রীতি সিদ্ধেশ্বর সেনের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল।

র‍্যাঁবোর বিদ্রোহ, বিট ও ক্রুদ্ধ যুবকের সমাজসংস্কারবিধ্বংসী মনোভাব, তরুণের তীব্র কামনা ও না-পাবার প্রচণ্ড জ্বালা পঞ্চাশের ও ষাটের একটি গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেছিল। 'কৃত্তিবাসে'র ধারাকেই ষাটের সাম্প্রতিকের ধ্বংসকালীন কবিতায় এবং 'ব্লুজে'র বিদ্রোহে প্রকাশিত। বিট্‌রা চেয়েছিল সর্বপ্রকার মোহ চুরমার করতে, মুখোশ খুলে ফেলতে, নিঃসঙ্গ একাকিত্বে ও আকস্মিক মৃত্যুতে প্রবেশ করতে। এদের দাবি ছিল ইতিহাসের জীবকে অভিজ্ঞতার জীবে পরিণত করা। হাইদেগের ও সার্ত্রে নিরন্তর উদ্বিগ্নতার মধ্যে অর্থ খুঁজতে খুঁজতে বিভীষিকার স্বরূপে পৌঁছেছেন, এরাও পঞ্চাশষাটের সামাজিক পটভূমিকায় পরিবেশের সংঘর্ষে আপন হৃদয়ে ভীষণতার স্বরূপে পৌঁছেছে। সুতরাং এই আত্মআবিষ্কার ও আত্মমন্থনের মধ্যেই তাদের কৃতিত্ব, তাই বিশ্বের বিশৃঙ্খলাকেই তারা গ্রহণ করেছে, এই কারণেই সূক্ষ্মতাসৌন্দর্য তাদের ভাষায় নেই। কেরুআকের ভাষায় এই আত্মআবিষ্কারের সাহায্যেই সোঽহম্‌তত্ত্বে গিয়ে তারা পৌঁছেছে। আর ক্রুদ্ধ যুবকেরা চেয়েছিল বর্বর প্রচণ্ডতায় টোরিগোষ্ঠীর সামাজিক আধিপত্যকে ধ্বংস করে হৃদয়ের মধ্যে নয়, বাইরে

সমাজবাদের সৌধ তৈরি করতে, আত্মজিজ্ঞাসাই তাদের মূলধন। ধ্বংস-কালীন কবিতার প্রবক্তা পবিত্র মুখোপাধ্যায় বিটদের কথার প্রতিধ্বনি করেই বলেছেন : 'কবিতা আত্মমন্থনের সারাৎসার, অভিজ্ঞতা ও বোধের অ্যালকেমি। চিন্তার যুক্তি নয়, বোধের যুক্তি ; চেতন মনের নয় অবচেতনায় সামগ্রিক অনুভব প্রবাহ থেকে উদ্ভূত শব্দের বুদ্বুদই কবিতার শুক্রবীজ', 'আমাদের অভিজ্ঞতা এখন ক্লান্তি', 'আমরা ধ্বংসকালীন সময়ের অপরিচিত মানুষ, অভিজ্ঞতার ভারে ন্যুব্জ, সভ্যতার বর্তমান টেন্‌সান ও টানাপোড়েনে ক্লান্ত, বিপর্যয়ে উদ্‌ভ্রান্ত, অস্তিত্বের কেন্দ্র নির্ণয়ে অসমর্থ', 'শুভ, শুভঙ্করবোধের প্রকাশ ছাড়া কবিতা হয় না—একথা প্রচণ্ড হাস্যকর, জীবনের সামগ্রিক-বোধে আলোর চেয়ে অন্ধকারেরই আধিপত্য, তাকে বাস্তব চেহারা দিতে হবে।' সাম্প্রতিক, ১১ সংকলন মে ১৯৬৯। এবং এঁদের কবিতায় তাই যৌনচেতনা ও যৌনঅঙ্গের চিত্রের আধিপত্য থাকে। এই গোষ্ঠী ছাড়া ষাটের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদী কবিতার পত্র 'শ্রুতি' রয়েছে। প্রভাত চৌধুরী ধ্বংসকালীন কবিতার সমস্ত উপাদানকেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বলিষ্ঠ অভিনব চিত্রকল্প ও হৃদয়বোধের তীব্রতায় প্রকাশ করেছেন। একাকিত্বের ভয়ংকর গহ্বরে অন্ধকারে আপনার হৃদয়ের আগ্নেয়গিরির জ্বালা নিয়ে তীব্র প্যাশনে রক্তক্ষরণ করে যাচ্ছেন, এই জ্বালার পরই রয়েছে নৈঃশব্দ্য ও মৃত্যু। প্রভাতের মতো এত প্রচণ্ডশক্তির বিস্ফোরণ ষাটের অন্য কবির মধ্যে দেখা যায় না। 'ভাঙা মন্দিরের চাতাল ফুঁড়ে-ওঠা বিগ্রহের মতন তোমার শরীর জুড়ে ইন্দ্রজাল হাসি।' 'তোমার বিস্মরণে যারা বিদ্যুৎ জ্বালাবে / তুমি ফিলামেণ্ট হয়ে ফিরে এসো তাদের রাত্রিতে।' 'মধ্যরাত্রে রক্তের ভিতর রোজ ট্রাঙ্ককল আসে।' 'প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সূর্যের চোয়াল খসে পড়ে।' 'মৃত সাপের কালচে রক্তে আমার তর্পণ' 'নিজেকে জাগিয়ে দেবার জন্যে আত্মমৈথুন অনিবার্য, নির্বাসন একমাত্র বাঁচার মাধ্যম আমি তাই একই বিন্দুতে স্থির অথর্ব।' শম্ভু রক্ষিতের কাব্য 'সময়ের কাছে কেন আমি কেন বা মানুষ'-এও তাঁর তেজে বীর্যবত্তায় ও আদিম কল্পনায় হাঙরি ও এ্যাঙরি একত্র মিলেছে এবং সমস্ত বিরোধকে স্বীকার করলেও তাঁর অনুভূতি হচ্ছে : 'আমার কণ্ঠ সোনার। আমি সোনার পৃথিবীর রহস্যের বর্ণের বিধিদত্ত রহস্যবৃত্তের মধ্যে।'

একালের আধুনিক কাব্যচর্চা

অতি আধুনিক তরুণ কবিদের সম্পর্কে লিখতে গেলেই জাঁ জেনের 'লে বন্' নাটকটির কথা মনে পড়ে। দুটি দাসী পরস্পরের সঙ্গে প্রেমঈর্ষায় জড়িত। এই দু'জনের প্রেম ও ঈর্ষা আবার মালিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই তাদের সঙ্গে কোনো বিচ্ছেদ ঘটতে পারে না, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলে, মালিককে ঘৃণা করলেও তার প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করে। তাই তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্যে দুটি দাসী পালা করে মালিক ও দাসী সাজে। মালিক সেজে মালিকের গর্ব, অহংকার, আভিজাত্য, প্রেম ও অত্যাচার ব্যক্ত করে, অন্যজন নীরবে সহ্য করে, আবার তার পালা এলে মালিক সেজে সে-ও এই ভূমিকা গ্রহণ করে। এই নকল ভূমিকার শেষ হয় না, কারণ এই ভূমিকা শেষ হলে পরিণতি স্বীকার করতে হয়। পরিণতি নেই বলেই শুধু পুনরাবৃত্তির জন্যেই মালিকের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ হিংসা, যার ফলে তাকে হত্যা করবার চেষ্টা বাস্তবে রূপায়িত হয় না। মালিকের কাপে ঢেলে-দেয়া বিষ মালিকের ভূমিকায় অভিনেত্রী গ্রহণ করে মৃত্যু বরণ করে এবং অন্যজনও সেই পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মালিকের তরফ থেকেও মিথ্যা জগতের প্রতিভাস মারাত্মক, সে জানে না কাদের নিয়ে বাস করছে। এমনিভাবে সব দিক থেকেই সার্ত্রের ভাষায় অস্তিত্বের অনস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের অস্তিত্ব সর্বব্যাপী শূন্যতাকে ব্যক্ত করছে। উপলব্ধির শূন্যতাই তাঁর কাম্য।

বাংলার আধুনিক তরুণ কবিরাও দুই দাসীর মতো ইচ্ছাপূরণের কল্পজগতের জাদুতে ভুলে অন্য বড়ো কবিদের নকল অভিনয় করে ঈর্ষা হিংসা প্রেমে জড়িয়ে পড়ে, তাঁদের নাশ করতে গিয়ে তাঁদের দেওয়া-বিষ খেয়ে নিজেরা মৃত্যু বরণ করে। কারণ তাঁদের জগৎও কল্পজগৎ, জাদুর জগৎ, আদিম যুগের ইচ্ছাপূরণের জগৎ, যার জন্যে এই অভিনয়ে সমাজবাদী পত্রিকায় লেখে, আবার প্রতিক্রিয়াশীল কাগজে লেখে। সর্বত্র লেখার মধ্যে দোষ নেই, যদি তাঁর প্রতিভা সর্বব্যাপী হয়, কিন্তু বুদ্ধিতে যে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ ঘষে, অবুদ্ধিতে সে সুড়ঙ্গ পথে ঢোকে কি করে, যৌন পত্রিকায় লিখতে দ্বিধা নেই কেন? যদিও এটা আমাদের ঐতিহ্য, তিরিশ চল্লিশের

কবি ও কথা সাহিত্যিকেরা করে এসেছেন এবং করছেন, পঞ্চাশ ঘাটে তারই ধারা চলেছে। তারই ফলে জেনের জগতের শূন্যতায়, দর্পণের কঠোর সীমাবদ্ধতায় আমরা আবদ্ধ হই। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'পরিচয়ে' যখন গল্প লেখেন তখন প্রগতিবাদী আন্দোলনের লাল সূর্য পরিণামে উঁকি মারতে চায়, 'দেশে' যখন গল্প লেখেন তখন মায়ের অবচেতন মনের কোণের অন্ধকারে স্বামী-পূর্ব প্রেমিকের জন্য যৌবনের তীব্র বেদনার কান্নায় ভাষাকে রঞ্জিত করেন। সমরেশ বসুও এ পথের পথিক। এক নামকরা সাপ্তাহিকের মার্ক্সবাদী সম্পাদককে বলেছিলুম ; এ উপন্যাস ছাপলেন কি করে? অম্লান বদনে উত্তর দিলেন ; ভাই, চাকরি করি, পত্রিকার কাটতি দেখতে হয়। অথচ ইনিই যখন কিছু লেখেন, তখন সূর্য আলো সমুদ্র নদীর ছড়াছড়ি ঘটে, এমনি করে শুধু হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের, মনের সঙ্গে মনের আপোশ ও নকল অভিনয় চলেছে। এঁদের কাছেইতো তরুণদের শিক্ষা!

তরুণ কবিদের লেখা পড়বার পর আমার চোখের ওপর একটি ইমেজ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মফস্বল শহরে গাঁয়ের চাষী মাঠ থেকে শীতের সকালে নবীন সবুজ সতেজ শস্য ও ফলমূল বিক্রি করতে নিয়ে আসে। পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা মজা করবার জন্যে চাষীর মাথায় ঝুড়ি বোঝাই ফসল থেকে কিছু পরিমাণ পেছনে দৌড়ে নিয়ে পালায়, চাষী কিছু বলে না, চুরির মাত্রা অতিরিক্ত হলে পিছনে ফিরে তাকিয়ে ধমকায়, কিন্তু তারপরই আপন মনে নিঃশব্দে চলে যায়। হয়তো ভাবে, তোরা আর কত চুরি করবি, আমার মাঠে প্রচুর ফসল। আমি আর এক ঝুড়ি নিয়ে এসে বিক্রি করবো। শীতের শান্ত দুপুরে নিঃশব্দে সে হেঁটে যায়, নদী পার হয়ে গিয়ে মাঠ থেকে আবার শস্য তোলে। এই চাষীই প্রকৃত কবি, আর দুষ্টু ছোকরারা কবি যশঃপ্রার্থী নবীন লিখিয়ে। চাষীর পরিশ্রমকে তাই তারা এমনিভাবে হরণ করে নেয়। এবং নিজেদের গৌরব প্রকাশ করে। তাই গল্প শুনি একজন পঞ্চাশের প্রাজ্ঞ কবি তাঁর বানানো ইমেজ অন্য তরুণ কবিরা ব্যবহার করেছে বলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো রাজপথে দাঁড়িয়ে থাকেন, যাকে পান, তার কাছেই আক্ষেপ করেন। মনে রাখতে হবে, এই কবির কাছে ইমেজ তৈরি হয় না, তিনি বানান। বানানো বাহারি পর্দা কে না ব্যবহার করে!

এ ছাড়া আর একটি তৃতীয় চিত্রের কথা মনে রাখা দরকার। এরা শীতের

মাঠে তপ্ত রৌদ্রে নবীন সতেজ ছোলার মতো প্রথমে তেড়ে ফুঁড়ে ওঠে, তারপরে আলো বাতাস ও অন্য কোনো চাপে শিটকে যায়, গাঁয়ের ধোপার গাধা এসে একদিন মুড়িয়ে খেয়ে ফেলে।

যদি আমার মনের মধ্যে এবংবিধ চিত্র জাজ্বল্যমান থাকে, তাহলে তাঁদের কাব্য আলোচনা করবার কোনো মানে হয় না। কারণ কাব্য শিল্প, শিল্প গড়ে ওঠে সংহতিতে, এবং এই সংহতি তৈরি হয় কবির ব্যক্তিগত আন্তরিক অভিজ্ঞতায়। এই আন্তরিকতা যদি না থাকে, এই সংহতির কোনো মানে হয় না, এবং সংহতি যদি না গড়ে ওঠে তাহলে অন্তর উপাদানের কোনো মূল্য নেই। তরুণ কবিদের মনের মধ্যে অনেকের ধারণা নজরুলের মতোই ; শিল্প ! দে গরুর গা ধুইয়ে। মনে যা আসে, তাই লিখবো, তাই কাব্য। বলা বাহুল্য, নজরুলের অজ্ঞতার মতো এও একপ্রকার প্রচণ্ড অজ্ঞতা। যে কোনো অজ্ঞতা কোনো শিল্পের উপাদান হতে পারে না। নজরুলকে নিয়ে হৈ চৈ করবার পেছনে শিল্পবুদ্ধির কোনো প্ররোচনা নেই, আছে রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিতৃপ্তি। রাজনীতিবিদও সমাজে ও জাতির কাছে শ্রদ্ধেয়, কিন্তু রাজনীতির আদর্শকে শিল্পের আদর্শের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলা কোনো সৎবুদ্ধির পরিচয় বহন করে না। কিন্তু তাই বলে সাহিত্য রাজনীতিবর্জিত হবে এমন মূর্খতাও শোভন নয়।

দ্বন্দ্ববাদ মার্কসীয়পন্থায় এক বিশেষ মতবাদ, সুতরাং কবিতায় তার প্রতিফলন থাকবেই। তাই বামপন্থী কবিতায় আশার উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে পাবার জন্যে ভিত্তিস্বরূপ অন্ধকারের কথা অবশ্যই বলতে হয়। এবং এই অন্ধকারের কথা বলাতে বাঙালি কবিদের তরুণ উৎসাহ স্বতঃস্ফূর্ত। এই স্বতঃস্ফূর্ততার একটি চমৎকার নজির উৎপল দত্তের নাটক। অন্ধকারকে এমন জোর দিয়ে সোচ্চারে আন্তরিকতার সঙ্গে প্যাশনে রাঙিয়ে বলেন যে আশার কথাটা যে মুখ্য উদ্দেশ্য তা আর মনেই থাকে না, ক্ষয়িষ্ণু জীবনবোধের মধ্যেই রচনা পরিসমাপ্ত হলো। বলা বাহুল্য, এই অন্ধকারে গা ভাসানোর মধ্যে একটা পরম আস্বাদ ও আনন্দ রয়েছে, এবং এতে অনুভূতির আন্তরিকতা যতোটা সহজে আনতে পারা যায়, আদর্শবাদের উচ্চশিখরে হৃদয়ে ততোটা মুক্ত হতে পারে না!

হেগেলই বলি, বা মার্কসই বলি, অন্ধকারের সঙ্গে আলোর বিরোধকে

বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি, যেখানে বিচ্ছিন্ন হয় না, সেখানে কবিতার রূপগঠনে একটা জৈব প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে, যেমন মালার্মের কবিতায়, ইয়েট্‌সের কবিতায় এবং এলিঅটের প্রথম পর্বের সার্থক কবিতায়। এবং বিচ্ছিন্ন হলেই একমুখীন ও সরল হয়, এই সরল একমুখীনতা এই জাতীয় কবিতায় মারাত্মকভাবে পীড়া দেয়। তবু এই সরলতার মধ্যে আন্তরিকতার অভিনবত্ব থাকলে মাঝে মাঝে মুগ্ধ হওয়া যায়, কিন্তু তরুণ কবিরা যেখানে সর্বদা প্যাটার্ন মেনে চলেন, ইমেজ চুরি করেন, মায়াকোভস্কির সিঁড়িভাঙা বিন্যাস মানেন, তা পাঠকের কাছে এক বিষময় বস্তু হয়ে ওঠে। বোঝা যায়, এই বক্তব্যের সঙ্গে এই ভাষা ও ছবি আসবে। যেমন রবীন্দ্রনাথ 'তরুণ' বললেই 'অরুণ' অন্ত্যমিল বসাতেন, যেমন সরকারি চিড়িয়াখানায় এম. আই. জি. স্কিমের ফ্ল্যাট পেলেই একই ধাঁচে সোফা ইলিকট্রিক আয়রন হিটার ফ্রিজ ও গ্যাস ব্যবহার করে বিশেষ শ্রেণীর নিঃসঙ্গ অহংকারে উন্নীত হয়।

যাঁরা বামপন্থী কবিতা সামান্য মনোযোগ সহকারে পড়েছেন, তাঁরাই দেখেছেন, এঁদের কবিতায় 'রোদের হাতুড়ি' 'যন্ত্রণার শর' 'ঘুণপোকার কুরে কুরে খাওয়া' 'মুক্তিবীজ সূর্য' 'সংগ্রামের প্রবল অধিকার' 'রক্তের মধ্যে নক্ষত্র জ্বলা' 'ফসল তোলার গান' 'প্রাণের শিকড়ে বীজের গান' 'ফণিমনসার কাঁটা ঝোপ' 'কাঁটাঝোপের ওপর আলোর বিদ্যুৎ' 'হ্যাঁ-না'র থমকানো চমকানো ফেরা' 'গোলাপজামের রৌদ্র' 'হিজল ফুলের ছায়া' 'সময়ের রক্তপদ্ম' 'থ্যাতলানো পলাশের উল্লাস' 'মিছিলে মুক্তি' 'মহিষ সমুদ্রের গর্জন' 'ইস্পাতের মুখ' 'মেকঙ গঙ্গা ভোলগার ত্রিস্রোত' 'শুওরের দাঁতের মতো দাঁতালো স্মৃতি' 'রুদ্রের ঢোলক' 'বর্শার ফলক' 'রোদ্দুরে অবগাহন' 'বুর্জোয়া জীবনের সাপ খেলানো সুর' 'দুঃখের মশাল' 'রক্তকরবী' 'সময়ের বাঁকা ফণা' 'রোয়া ধান-বোনা তপ্ত মুখ' 'বোধের গভীরে' 'চৈতন্যের ব্যাপ্তি' 'ধ্বনিত বৃক্ষ' 'চেতনাহীন বিবর্ণ সময়' 'সর্বাঙ্গে নিষ্ঠুর ক্ষত' 'গৈরিক সময়' 'বন্যা ঝড় বিদ্যুৎ' 'সময়ের কঙ্কাল' 'ভাঙা কফিন' 'সূর্যের মতো সমুদ্র' এই শব্দ ও চিত্রগুলি বার বার আসে। এক কবি যে প্রতীক ব্যবহার করেন, অন্য কবির কাছে সেই প্রতীকগুলি কখনোই কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে না, যদি সেই কবি সৎকবি হন। সাহিত্যে শিল্পে আমরা প্যাটার্ন বা বাঁধন ভাঙবার চেষ্টা করি, কিন্তু এঁরা সেই প্যাটার্নকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছেন। জানি না, এঁদের মনের মধ্যে প্লেটো কাজ করছে কিনা, প্লেটোর প্রজাতন্ত্র ধর্মতত্ত্ব নন্দনতত্ত্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতো। অর্থাৎ প্রজাতন্ত্রের আদর্শেই সকলকে নিয়ন্ত্রিত হতে হবে, এমনি এক সাহিত্যের প্রজাতন্ত্রের নির্দেশ যদি কবিরা মেনে চলেন, তাহলে সাহিত্যের সেই মিলনমন্ত্র কার দ্বারা ঘোষিত হবে! নিয়ন্ত্রণে তা একদিন ফাটল ধরবেই।

আর এর অন্যদিকেই আছে নারীর যৌন শরীর নিয়ে দুর্বার বেলেল্লাপনা।

যেহেতু যৌনতা প্রত্যেক নরনারীর ব্যক্তিগত ও পৈতৃক সম্পত্তি, সেইহেতু একে নিয়ে সাহিত্য করবার অধিকার প্রত্যেক লেখকের আছে। কিন্তু যা আছে তাকে আমরা অধিকার করি না, ভালোভাবে অনুভব করতে চেষ্টা করি, এবং অনুভবের চেষ্টায়ই সে উদ্বর্তিত হয়, নচেৎ একে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্বে বর্ণিত নিম্নভাগে বিধৃত আইনশৃঙ্খলা ব্যবহার করতে হয়। যৌনতার অনুভবপ্রকাশে আন্তরিকতার খুব একটা অভাব ঘটে না, যেটা গ্লানিকর ও আপত্তিকর সেটা হলো জন্মলগ্নে নারীর দেহ থেকে নির্গত ক্লেদরক্তের সতেজ বীভৎসতা। এরা স্বেচ্ছায় নির্বাসন বেছে নিয়েছে, সমাজ এদের নির্বাসিত করে নি, সুতরাং সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ বা সংগ্রাম নেই, আছে ব্যক্তিগত কামনার ও প্রবৃত্তির উল্লসিত নগ্নতা। ব্ল্যাক রোমান্টিকদের সঙ্গে সাদৃশ্য অন্বেষণ করলে ভুল হবে, কারণ মেতুসার সৌন্দর্যের মধ্যে সমাজজীবনের একটা জ্বালা আছে। কিন্তু আধুনিক অন্ধকার প্রেমিক তরুণ বাঙালি কবিরা অন্ধকার নর্দমার কীট হয়ে অন্ধকার খুঁড়ে খায়, নিজের সঙ্গে নিজে সংগম করে, তাদের চারদিকে সমুদ্র শ্যাওলা সোঁদা গন্ধ, স্যাঁৎসেতে ভেজা শীতলতা, এরা মা ও মেয়েকে একই সঙ্গে সংগমের আনন্দে লাভ করতে চায়, এদের প্রেমিকার সবুজ তলপেট ও জরায়ু খুঁড়ে প্রেমিকার মাতার স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ ফিরে পেতে চায়। কখনো এরা স্বপ্নস্মৃতিচেতনা অন্ধকারের জরায়ু গর্ভে নিমজ্জিত করে স্বেচ্ছা নির্বাসনে কবন্ধ অধীশ্বর হয়ে ওঠে, আশ্রয় খোঁজে বেশ্যার উলঙ্গ দেহে, তার দেহের তমসার মধ্যেই আত্মার নশ্বরতা পায়। এদের কবিতায় 'ঝুলে পড়া স্তন' 'কটিদেশের নিশ্চিন্ত আশ্রয়' 'রঙিন উলের বল' 'বিশাল পুরু উরুদেশের উপত্যকা' 'ছলছল অন্ধকার' 'প্রবৃত্তির মোহন অন্ধকার' 'চুলের গন্ধছানা' 'কুকুরের মতো লুটিয়ে পড়া' 'বিষাদ গাঢ় স্বপ্ন' 'শুঁড়িখানা পান্থনিবাস' 'মদের ভাঁড়ে মুখ দিয়ে পড়া' 'সুন্দরীদের পাছা' এ সমস্ত শব্দ বারংবার প্রতিধ্বনিত হয়। এবং এগুলির মধ্যেই তাদের পরমতৃপ্তি। পূর্বোক্ত কবিরা সমাজবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যেমন প্রথাগত প্যাটার্নে নিজেদের অনুভূতিকে জড় করে রেখেছিল, তেমনি এখানকার কবিরাও সমাজজীবন থেকে দূরে স্বেচ্ছানির্বাসনে নিজেই অধীশ্বর হয়ে কবন্ধ ব'নে গেছে। দুই জাতীয় কবিতারই ফলশ্রুতি অসাড়তা।

এদের মধ্যে অন্য এক দল আছে, যারা তামাকও খায়, দুধও খেতে চায়। দুধে ও তামাকে মিলে যে মিশ্রবস্তু তৈরি হয়, তার উদাহরণ নাইবা দিলুম। এসবের মধ্যে ষাটের দশকের সমাজই বর্ণিত।

কবিতাকে মুক্ত করতে গেলে লেখা কমানো দরকার, পাঠকের সীমানা অতিক্রম করে কবির সীমায় অনাধিকার প্রবেশ জোর করে নিষেধ করে দিতে হবে। এবং কবিতাকে যথার্থ কবিতা করতে গেলে সীমানা পেরিয়ে বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রাখা কর্তব্য। কিন্তু যারা বুদ্ধির কারসাজিতে

ছন্দের ও শব্দের কেরামতির চাতুরি দেখিয়ে কবিতার জগতে অলৌকিক শঙ্খ বাজান. তাঁদের কবিতার প্রতিমা বেশিদিন বেঁচে থাকে না, দিবসরাত্রির রৌদ্রজলে রঙ চল্‌টে যায়। বীভৎস হয়ে ওঠে। এও একরকম নকল অভিনয়। আমরা অভিনয়ে খুব উন্নত এ কথাই বারংবার কথায় ও কর্মে প্রমাণিত হচ্ছে।

একদল কবিকে আবার দেখা যায় তারা প্রবীণ কবির ক্ষণিক মুহূর্তের আন্তরিক উদ্‌ভাসন সঙ্গে সঙ্গে নোটমেকারের মতো সারসংক্ষেপ করে নূতন একটি কবিতা লেখে, এরা কবিতার নোটমেকার। বড়ো কবিদের মনের মধ্যে সম্ভবত দুটো দিক একই সঙ্গে কাজ করে। দল গঠনে ও তাঁদের কবিতা প্রচারে এই নোটমেকাররা যথেষ্ট সাহায্য করে, সুতরাং তাদের চটিয়ে লাভ নেই। এমনিভাবে বড়ো কবিরা তাঁদের ছায়ায় এদের তুষ্ট করছেন, এবং নোটমেকাররা বড়ো পত্রিকায় কবি বলে খ্যাত হচ্ছে, দুপক্ষেরই লাভ। এই রকম নোটমেকার কবিরা মূলত সহৃদয় পাঠক হতে পারতো, কিন্তু বাংলাদেশে তারা কবির দলের গোষ্ঠী তৈরি করেছে। এদের দৌরাত্ম্য বড়ো মারাত্মক!

সমাজ, অর্থ, দাবি, সম্মান, জীবিকা প্রভৃতির ব্যাপারে কবিদের সম্পর্কে অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু সে সব কথা বলবার আগে আমাদের হৃদয়ের আন্তরিকতার প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। চারিদিকে অরাজকতা, কিন্তু এই অরাজকতার মধ্যে কবিও যদি অরাজক হয় তবে তার পক্ষে বলার কিছু থাকে না, কোনো চোর অন্য চোরের বিরুদ্ধে কৈফিয়ত তলব করতে পারে না। প্লেটোর ভাষায়ই বলি : 'কবিদের হৃদয়ে একটা উন্মাদনা থাকা প্রয়োজন, কবিতাদেবীর দ্বারা আক্রান্ত হলেই এই উন্মাদনা আসে, সূক্ষ্ম মনের ওপর এই উন্মাদনা প্রবেশ করে, সেখানে তাদের উন্মাদনায় অনুপ্রাণিত করে, কিন্তু যার হৃদয়ে কবিতাদেবীর এই উন্মাদনার স্পর্শ নেই, সে দরজার কাছে আসে, মন্দিরে প্রবেশ করতে চায়, সে এবং তার কবিতা স্বীকৃত হয় না।' কিন্তু বাংলা দেশে জোর করে মন্দিরপ্রবেশকারীই স্বীকৃত, কারণ কোনো প্রহরী নেই, হয়তো মন্দিরে সেই দেবতাও নেই!

আমার বক্তব্য হচ্ছে হৃদয়ের এই উন্মাদনায় সম্প্রতিকালে প্রবীণ বা নবীন ক'টি কবিতা লিখছে? যদি না লিখে থাকে, তাহলে তাদের এই চৌর্যবৃত্তির জন্যে কবিতার কোন পুলিশ কমিশনার আসবে? সমাজ চোর হলে, ব্যক্তি চোর হতে বাধ্য, একথা স্বীকার করেও বলি, কবিতায় আমরা মুক্তি চাই, ফর্স্টারের ভাষায় আন্তর শৃঙ্খলা ও সংগতি চাই। এখানেই তো কবিদের জিত।

আলোচিত কবিদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা